এই দেশ এই মাটি

প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকার

শেখ মুজিবুর রহমান

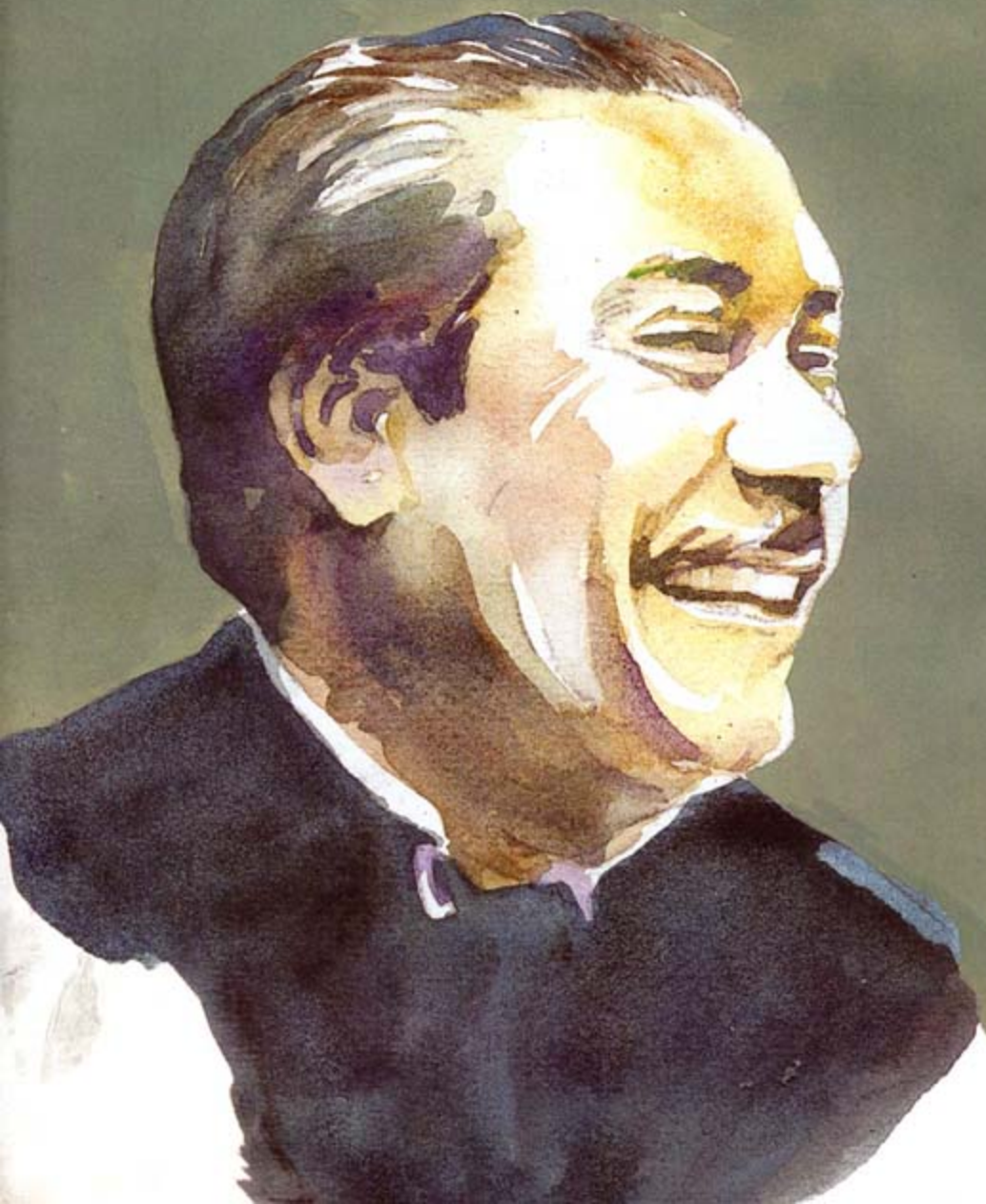

এই দেশ এই মাটি

প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকার

বাংলা ই-বুক
www.facebook.com/groups/BanglaEbook

এই দেশ এই মাটি

প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকার

শেখ মুজিবুর রহমান

সম্পাদনা

আবুল মাল আবদুল মুহিত

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

মো. জাহিদ হোসেন

বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি

এই দেশ এই মাটি

প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকার

প্রথম প্রকাশ : ১৭ মার্চ ২০০৮
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
বর্ণবিন্যাস : সরদার কালার প্রসেস
১৪৫ আরামবাগ, দ্বিতীয় তলা, ঢাকা, ফোন : ৭১০১০০৬
মুদ্রণ : গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৫৪৮০৪
প্রকাশনা : বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি
স্বত্ব : বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি
কার্যালয় : ৯৮ ফকিরের পুল, তৃতীয় তলা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৯২০২ (বিকেল ৫টা-রাত ৯টা)

মূল্য : ১,০০০.০০ টাকা
এক হাজার টাকা

পরিবেশক : আগামী প্রকাশনী
৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭১১১৩৩২

EI DESH EI MATI
Articles, Speaches, Messages, Orders & Interviews
of Bangabandhu Shiekh Mujibur Rahman

First Published : 17 March 2008

Published by : Bangabandhu Lalitkala Academy
98 Fakirer pool, 2nd floor, Dhaka-1000,
Bangladesh, Tel : 9349202 (4 pm-9 pm)

Price : Tk. 1,000.00
US$ 30.00

ISBN 984 70006 0014 1

উৎসর্গ

বাংলাদেশের স্বাধিকার থেকে
স্বাধীনতা সংগ্রামের
বীর যোদ্ধাদের উদ্দেশে–

যাঁরা জীবন দিয়েছেন,
যাঁরা সম্ভ্রম হারিয়েছেন,
যাঁরা পঙ্গুত্ববরণ করেছেন

জা তী য় সং গী ত

রচনা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে, আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি॥

কু চ কা ও য়া জ সং গী ত

রচনা ও সুর : কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল,
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্॥

উষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নৌ-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান-
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান
ভাঙ্‌রে ভাঙ্ পাগল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্॥

জন্ম : ১৭ মার্চ ১৯২০

মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

ভূ মি কা

ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখালেখি

বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শুধু একজন জাতীয় নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ইতিহাসের মহানায়ক। ২০০৪ সালে বিবিসি-র এক বিশ্বজরিপ তাঁকে এদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে ঘোষণা দেয়। তাঁকে নিয়ে লেখার এত ছড়াছড়ি নিতান্তই স্বাভাবিক। তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে বাংলা একাডেমী এবারই একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছে। আমি নিজেও সংবাদপত্রের কলামে এবং বিস্তর সংকলনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি। ২০০১ সালে প্রকাশিত আমার একটি বই 'মহাপুরুষদের কথা : কাছে থেকে দেখা'র প্রায় অর্ধেকটিই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা।

এই বইটির বিশেষত্ব হলো যে, বইটি মূলতঃ বঙ্গবন্ধুরই লেখা ও কথার একটি সংকলন। সম্পাদনা পরিষদ শুধু এগুলো একত্র করেছেন এবং অতিরিক্ত কিছু তথ্য ও লেখা তাতে সংযোজন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের ধ্যানধারণার সম্যকচিত্র এই বইতে পাওয়া যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। পাঠকের হাতে 'এই দেশ এই মাটি' তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য এবং গর্বিত বটে।

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রথম আমি দেখি ১৯৪৭ সালের জুন মাসে। তিনি তখন আমার জেলা সিলেটে দেশ বিভাগের সময় যে গণভোট হয় তাতে পাকিস্তানের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ইসলামিয়া কলেজের (বর্তমানে আবুল কালাম আজাদ কলেজ) ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক, বাংলা মুসলিম ছাত্র লীগের অন্যতম নেতা এবং গোলাপগঞ্জ মুসলিম লীগের একজন বিশেষ নেতা। অতপর, ১৯৫১ সালে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে ঢাকায় আসি তখন তিনি একজন জাতীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন এবং সেই সময়টিতে কারাগারে বন্দি ছিলেন। ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি হন এর যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫৩ সালের আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিলে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

আমার পাঁচ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ১৯৫১-৫৬ সালে (অতিরিক্ত এক বছর আইন অধ্যয়নে) ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার কারণে তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। জাতীয় রাজনীতির পুরোভাগে থাকলেও তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের পৃষ্ঠপোষকও। আমি ছাত্র লীগে না থাকা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর বাসস্থানেও আমার বেশ আনাগোনা ছিল। ১৯৫৬ সালে আমি সরকারি চাকরি করতে শুরু করি। তাঁর সঙ্গে পরিচয় নবায়িত হয় যখন তিনি ছিলেন পূর্ববাংলার আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় একজন মন্ত্রী। '৫০-এর দশকের শেষ দিকে যখন সামরিক শাসনের অধীনে দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল তখন তাঁর সঙ্গে নিয়মিত দেখা হতো ঢাকার ফুটবল খেলার মাঠে।

সামরিক শাসনের নানা বিধিনিষেধ, অবদমন এবং নির্যাতন অতিক্রম করে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ছয়-দফা কার্যক্রম ঘোষণা করেন। সেই বছর মার্চ মাসে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ছয়-দফা আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকলে মে মাসে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত

হন। ১৯৬৮ সালে তিনি আগরতলা মামলার প্রধান আসামি হিসেবে বিচারের সম্মুখীন হন। ১৯৬৮ সালের শেষলগ্নে দেশে মারাত্মক রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং এই সংকট সমাধানের জন্য তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান একটি জাতীয় গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। ১৯৬৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এই গোলটেবিল বৈঠকে দেশের প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং দলগুলোকে সমবেত করার লক্ষ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা খারিজ করে দেওয়া হয় এবং বঙ্গবন্ধুকে এই বৈঠকে যোগদান করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এই গোলটেবিল বৈঠক রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু যোগ দেন। এই গোলটেবিল বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবর্গের দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয় এবং বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ তখন হয়।

১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি আমি পাকিস্তানের দূতাবাসে নিযুক্তি নিয়ে ওয়াশিংটনে চলে যাই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুন মাসের ৩০ তারিখে আমি পাকিস্তান দূতাবাস পরিত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। এই আনুগত্য ছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। ১৯৭২-৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের একজন জ্যেষ্ঠ আমলা হিসেবে বাস্তবেই বঙ্গবন্ধুকে পাই সরকার প্রধান রূপে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত আমি নানা কাজে ঢাকায় ছিলাম এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকি। এইসব কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জেলায় জেলায় প্রতিনিধিত্বশীল স্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের জন্য জাতিসংঘের জাইলার মিশনের দেখাশোনা। সোভিয়েত পরিকল্পনা মিশন এবং জাপানি ত্রাণ মিশনের সফরের সঙ্গেও আমি সম্পৃক্ত ছিলাম। ১৯৭২-৭৪ সাল পর্যন্ত আমি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে এবং কিছুদিন যুগপৎভাবে বিশ্বব্যাংকে কর্মরত ছিলাম। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু যখন নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন সফরে যান তখন তাঁর ভ্রমণসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আমার ছিল একটি মুখ্য ভূমিকা। আমেরিকায় তাঁর পুরো কার্যক্রমের সঙ্গে আমি ছিলাম গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ১৯৭৪ সালের শেষলগ্নে আমি ম্যানিলায় যাই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশ এবং ভারতের পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত জাতি গঠনের এই ক্রান্তিকালে আমাকে প্রায়ই ঢাকা থাকতে হতো। বঙ্গবন্ধু সরকারের নির্দেশে আমাকে সে সময় অর্থনৈতিক কূটনীতিতে নানাভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়। ১৯৭৩ সালে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে দেনা নিয়ে আলোচনায় আমি বাংলাদেশ দলের একজন সদস্য ছিলাম। ১৯৭৪ সালে ইসলামি ব্যাংকের প্রস্তুতি কমিটিতে আমাকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সদস্য মনোনীত করা হয় এবং ১৯৭৫-এ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী সম্মেলনে আমাকে অংশ নিতে হয়। ইসলামি রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সূচনাপর্বে আমাকে পরপর দুইটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে (১৯৭৪ ও ১৯৭৫) বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য করা হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে পেট্রল সংগ্রহের একটি উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে আমাকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়। ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে আমি সৌদি আরব যাই আমাদের কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও পেট্রল আমদানি বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে। এবং সৌদি আরবকে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান ও বাংলাদেশ এইড গ্রুপের সদস্য হওয়ার জন্য আমি তদবির করি। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় আমাকে সেখানেও উপস্থিত থাকতে হয় এবং বিশেষ করে অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদ বিভাজনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এইসব প্রত্যেকটি উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর সঙ্গে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয়– যদিও জুলাই মাসেও তাঁর সহকর্মী এবং অধিনস্ত আমলাদের সঙ্গে ঢাকায় আমার দেখা হয়। আমি মনে করি, তাঁর মতো একজন কালজয়ী মহাপুরুষের স্নেহধন্য হওয়া এবং তাঁর একজন বিশ্বস্তজন হিসেবে তাঁর জন্য কাজ করা ছিল আমার একটি অনন্য সৌভাগ্য।

বঙ্গবন্ধুর নজিরবিহীন অর্জন এবং অতুলনীয় কৃতিত্ব

১৯৬৯ সালে বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন, "এই দেশের কষ্টিপাথরে এ যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন বাংলাভাষা থাকবে, যতদিন বাংলা থাকবে, বাঙালি থাকবে; গঙ্গা-যমুনা, পদ্মা-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, করতোয়া, কীর্তনখোলা নদীর দুই তীরের মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, যতদিন এদেশের মানুষের হৃদয়ে উত্তাপ থাকবে, ততদিন অন্তরের মণিকোঠায় একটি নাম চির জাগরূক থাকবে– শেখ মুজিবুর রহমান।" মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একান্তই নিজের ত্যাগ-তিতিক্ষা, দৃঢ়তা, সততা, দুঃসাহস এবং জনসেবায় নিবেদনের জোরে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

এই জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয় প্রক্রিয়া ন্যূনপক্ষে ১,৫০০ বছর ধরে চলে। এই ভূখণ্ডের সীমানা নির্ধারিত হতে থাকে সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের সময় থেকে। ১৩৪২ সালে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এই ভূখণ্ডের নামও প্রদান করেন যখন তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি হলেন 'শাহে বাঙালিয়া'। সপ্তম শতাব্দীতেই (বিকল্পে দশম শতাব্দীতে) বাংলাভাষার বিকাশ শুরু হয়। এবং প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে সংগঠিত হয় একটি যৌগিক জাতি যেখানে পৌত্তলিকতা (পেগানিজম) এবং চারটি ধর্মবিশ্বাস– হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রিস্টান– তাদের নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। এই ভূখণ্ডে গণতন্ত্রের পত্তন হয় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে যখন রাজা গোপাল দেশাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সম্পৃক্তির সূচনা হয় ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে উনবিংশ শতাব্দীতে পর্দাপণ কালে।

জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া এত দীর্ঘ হলেও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় কিন্তু মাত্র শত বছরের বিষয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা মূর্ত হয় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। কিন্তু তা চাপা পড়ে যায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং এই সংগ্রামের শেষ পর্বে হিন্দু-মুসলিম বিভেদের জাঁতাকলে।

বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বলগ্নে যখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শরৎচন্দ্র বসু যুক্তবাংলার নিলনক্শা প্রণয়ন করেন। পরবর্তী যে উদ্যোগটি ছিল সেই প্রক্রিয়ার শেষ অধ্যায়টি হয় পূর্ব পাকিস্তানে এবং তা সার্বিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যান শেখ মুজিব। ১৯৪৭ থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৪৮-এ ছাত্র লীগ ও ১৯৪৯-এ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনী বিজয়, ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন এবং ১৯৬০ সাল থেকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন– সব কিছুতেই তিনি ছিলেন সংগ্রামী, ত্যাগী এবং অকুতোভয় সংগঠক ও নেতা। ১৯৬৪-তে তিনি হলেন আওয়ামী লীগের কাণ্ডারী, ১৯৬৬ সালে তিনিই উপস্থাপন করলেন বাংলাদেশের বাঁচার দাবি 'ছয়-দফা' এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে তিনিই মোকাবিলা করলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মিথ্যা অভিযোগ। সামরিক কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বিজয়ী রাষ্ট্রনেতা তখনই হলেন 'বঙ্গবন্ধু' এবং ধাপে ধাপে জাতিকে এগিয়ে দিলেন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে।

১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন পাকিস্তান জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তদনুযায়ী ক্ষমতা গ্রহণের অপ্রতিরোধ্য অধিকার। এই অধিকার যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং পশ্চিমের এক ফ্যাসিবাদী নেতা মানলো না তখনই শুরু হলো বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্যায়। একাত্তরের ৭ মার্চে তিনি ঘোষণা করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" পাকিস্তান সরকার সংলাপ ছেড়ে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন।

নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ভারি অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য ভারতের সাহায্য গ্রহণ করে। ৩ ডিসেম্বরে পশ্চিম ভারতে বিমান আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তান পাক-ভারত যুদ্ধের সূচনা করে। পূর্ব রণাঙ্গনে বাংলাদেশ ও ভারত তখন যৌথ কম্যান্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই যৌথ কম্যান্ডের হাতে পাকিস্তানের দখলদার সেনাবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বপটে আবির্ভাব হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

অনুপস্থিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। এবং মুক্তিযুদ্ধ হয় তাঁর নামে ও তাঁর প্রেরণায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানে কারাবন্দি ছিলেন। সেখানে রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য তাঁর বিচার হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। তবে বাংলাদেশের বিজয়ের পর পাকিস্তানে ক্ষমতা পরিবর্তন হয় এবং ইয়াহিয়া জান্তার পরিবর্তে জুলফিকার আলী ভুট্টো সামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান বিশ্বজনমত এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন ও দিল্লি হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে তিনি দেশগড়ার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দলের উর্ধ্বে উঠে তিনি হন রাষ্ট্রের মহানায়ক, জাতির পিতা এবং জনগণের বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রথম কর্তব্য হয় বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যাহার। যুদ্ধবিরতির তিনমাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আগ্রহে এবং অনুরোধে ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৯৭২ সালের ১৫ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। এত দ্রুততার সঙ্গে মিত্রবাহিনীর প্রত্যাহার ছিল ইতিহাসে বিরল।

বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী দায়িত্ব হয় পাকিস্তানি দস্যুবাহিনীর হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার বাংলাদেশের জনগণের পুনর্বাসন এবং অর্থনীতির পুনর্গঠন। তিন বছরের শেষে পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসেই বাংলাদেশ গণপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গণপরিষদ নয় মাসের মধ্যে জাতিকে একটি চমৎকার সংবিধান উপহার দেয়। বাংলাদেশে পুরনো ঐতিহ্য ধারণ করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। সেখানে শক্তিশালী স্বশাসিত ও সয়ম্ভর স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই সংবিধান বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমুন্নত করে এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগকে ক্ষমতা প্রদান করে। এই সংবিধান আরো নিশ্চিত করে যে, অকারণে কোন ব্যক্তিকে বিচার প্রক্রিয়ার বাহিরে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন অহিংস নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির কূটকৌশলের একজন নিপুণ শিল্পী। তাঁর সারা জীবনের আন্দোলন ছিল জনগণের ক্ষমতায়ন, সামরিক শাসনের উচ্ছেদ ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। দায়বদ্ধ প্রশাসন এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাজাতে সচেষ্ট হন। বাংলাদেশের মজ্জাগত মূল্যবোধ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ, জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র এবং সামাজিক সুবিচার ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বার্থে সমাজতন্ত্র।

একেবারে নতুন করে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়। বিংশ শতাব্দীতে বিচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রেরই উদ্ভব হয়। এজন্য বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে অনেক বেগ পেতে হয়। বাংলাদেশকে নতুনভাবে তার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তিন বছরে বাংলাদেশ সমুদয় আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন এবং ইসলামি রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থার সদস্যও হয় বাংলাদেশ। ১৯৭৪ সালের মধ্যেই ১২১টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ জাতিসংঘেরও সদস্যপদ লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় সম্মানবোধ সম্বন্ধে ছিলেন গভীরভাবে সচেতন। বিধ্বস্ত বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে বিশ্বসভায় নিজের স্থান নির্ধারণ করবে এই ছিল তার অঙ্গীকার। প্রথমেই তিনি পদক্ষেপ নেন যাতে বাংলাদেশ কোন একটি দেশ বা কোন একটি বলয়ের উপর নির্ভরশীল না থাকে। ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারিতে তিনি ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং কারো সঙ্গে বৈরিতা করবে না। তিনি বলেন যে, তিনি বাংলাদেশকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলবেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দিনে যাতে সকলের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায় তিনি সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্রত হন।

পাকিস্তানের দেনার ভাগ নেওয়ার জন্য যখন তাঁর উপর শক্তিশালী চাপ আসে তিনি তা নাকচ করে দেন এবং জানিয়ে দেন যে, চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করেও দেশটি কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না। তিনি জানিয়ে দেন যে, যতদিন পাকিস্তান বাংলাদেশের উপর তাদের অধিকার পরিত্যাগ না করবে ততদিন পাকিস্তানের দেনার কোন হিস্যা বাংলাদেশ নেবে না। ১৯৭৪ সালে মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদের এক বড় দল বাংলাদেশকে ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে পীড়াপীড়ি করেন। বঙ্গবন্ধুর সাফ জবাব ছিল যে, লাহোরে যেতে হলে প্রথমে তাঁকে পাকিস্তানের কূটনৈতিক স্বীকৃতি পেতে হবে। পাকিস্তান যে দিন স্বীকৃতি দিল তার পরদিন বঙ্গবন্ধু এই সম্মেলনে গেলেন।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য ও সহায়তার জন্য তিনি উচ্চকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এই দুইটি দেশেই স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমতার ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং তাতে তিনি সাফল্যও অর্জন করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বশান্তির শক্তিশালী প্রবক্তা, তাঁর কথা ছিল, 'ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি।'

তিনি দেশের সমস্ত জনগণকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর কথা ছিল যে, তিনি তাঁর দেশ ও জনগণকে ভালোবাসেন এবং তাঁর জনগণ তাঁকে ভালোবাসে। বিষয়টি এতই আলোচিত যে, এই সত্যটি ছিল দেশে-বিদেশে সকলের জানা। তিনি বলতেন যে, 'আমি দক্ষিণপন্থীও নই, বামপন্থীও নই, আমি দেশবাসীর স্বার্থের পক্ষে।' জনগণের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অকুণ্ঠ ও অটুট। এবং এদের ভাগ্যোন্নয়নে ছিল তাঁর আজীবন ব্রত।

দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটি প্রতিবিপ্লব সাধন করে। বিপথগামী হঠকারী কতিপয় সেনা সদস্য অত্যন্ত নৃশংসভাবে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার পরিজন এবং সহকর্মীসহ মোট ১৮ জনকে হত্যা করে এবং দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এই সামরিক ক্যুর অভিশাপ ও কুফল জাতি আজো বয়ে বেড়াচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ এখনও সুইজারল্যান্ড হয় নি। এই সোনার বাংলায় সামরিক শাসনের পৌনঃপুনিক অভিশাপ এখনো বিলুপ্ত হয় নি। এই সোনার বাংলাদেশে এখনও স্থানীয় স্বশাসনের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন হয় নি। এই সোনার বাংলাদেশে এখনও প্রায় ৪০ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে। তারা অর্থনৈতিক মুক্তি অথবা ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা এখনো পায় নি। এখানেই হলো বাংলাদেশের ব্যর্থতা। কিন্তু এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণই হবে বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এই বইয়ের বিষয়

বঙ্গবন্ধু নিয়মিতভাবে রোজনামচা লিখতেন। তাঁর অতি সামান্যই তাঁর শাহাদাতের পরে উদ্ধার করা যায়। তাঁর ডায়েরির কিয়দংশ সম্পাদনার কাজ এগিয়ে চলছে এবং ভবিষ্যতে তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি একটি আত্মজীবনী রচনায় মনোনিবেশ করেন। সেই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমির মো. জাহিদ হোসেন ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধুর আলোকচিত্র নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সেখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য এবং পুরনো আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হয় যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই পরিচয়ের সূত্রে মো. জাহিদ হোসেন চার মাস আগে আমাকে তার একাডেমিতে নিয়ে যান। ছাত্র-ছাত্রীদের ললিতকলায় শিক্ষাদান হচ্ছে এই একাডেমির প্রধান কাজ। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে যৎসামান্য গবেষণা ও সংগ্রহের কাজও এই একাডেমি পরিচালনা করে।

তিনি আমাকে বঙ্গবন্ধুর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ দেখান। চারটি প্রবন্ধ দৈনিক ইত্তেফাক ও একটি দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলো রাষ্ট্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে নিয়ে লেখা হলেও রাজনীতি, নেতৃত্ব, জনসেবা, আনুগত্য, সাম্প্রদায়িকতা, জনমত গঠন, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, কর্মীদের প্রতি কর্তব্য, বন্ধু-বাৎসল্য ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বিশ্বাস ব্যক্ত করে। আমার মনে হলো যে, বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য বক্তৃতা আমরা সহজে পেলেও তাঁর লিখিত রচনা আমাদের হাতে তেমন নেই। আমি ভাবলাম যে, তাঁর প্রবন্ধগুলোর প্রকাশনা খুবই জরুরি। তবে একটি যথোপযুক্ত প্রকাশনার জন্য আরো কিছু সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

জাহিদ কালক্ষেপণ না করে কাজটি হাতে নেন এবং তাতে আমি খুবই আশান্বিত হই। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে এই সংকলনের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে পেয়ে যাই। বন্ধুবর শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদ ও অলংকরণের দায়িত্ব নিয়ে বাস্তবে একজন সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেছেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের কাছে পাই বইয়ের নাম ও বিষয়াদি নিয়ে মূল্যবান পরামর্শ। বইটি প্রকাশনায় নানাভাবে সাহয্য করেছেন সাবের হোসেন চৌধুরী, শিল্পী আসাদুজ্জামান নূর, ব্যাংকার আকরামুদ্দিন আহমদ এবং যুক্তরাজ্যের রাজনীতিবিদ শফিকুল হক চৌধুরী। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বজিত ঘোষ, কাজল বন্দোপাধ্যায়, মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী এবং সৈয়দ আজিজুল হক এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত থেকেছেন। তাদের সবাইকে সম্পাদনা পরিষদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। একাডেমি যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহায়তায় এতদিন ধরে চলছে তাদেরও এই সুযোগে স্মরণ করছি। তাদের অনেকেই ইতোমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

বঙ্গবন্ধুর আসন্ন জন্মবার্ষিকী (১৭ মার্চ ২০০৮) উপলক্ষে এই বইটি জাতির কাছে আমাদের একটি সাদর উপহার। তবে শুরুতেই আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

বইটির মূল অংশ সবই বঙ্গবন্ধুর নিজের রচনা ও কথা দিয়ে সাজানো হয়েছে। পাঁচটি প্রবন্ধ দিয়ে গ্রন্থের শুরু। জাহিদ অত্যন্ত কষ্ট করে বিগত শতাব্দীর পঞ্চম থেকে সপ্তম দশকে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ১০০টি বক্তৃতা নির্বাচন করে সংগ্রহ করেছেন। সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং অন্যান্য প্রকাশনা থেকে এগুলো সংগৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তৃতা হচ্ছে : ছয়-দফা ঘোষণা নিয়ে বক্তব্য, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জবানবন্দি, গোলটেবিল বৈঠকের ভাষণ, ১৯৭০ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতা এবং ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। বাংলাদেশে প্রদত্ত তাঁর সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারিতে একটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি নতুন রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং তাঁর সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ হয় ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাইতে যখন তিনি জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন। সংকলনটির এইভাগে আরো আছে বঙ্গবন্ধুর পঁচিশটি বাণী, নয়টি নির্দেশ এবং তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারিতে মার্কিন টেলিভিশন মাধ্যমে প্রচারিত বিখ্যাত টেলিভিশন সম্প্রচারক স্যার ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে তাঁর একঘন্টাব্যাপী আলাপচারিতা, সেই বছরেই মে মাসে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার এবং বছর শেষে ডিসেম্বর মাসে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসকে প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকার এই সংকলনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

শেষভাগে আরো কিছু বিষয় স্থান পেয়েছে যেমন, বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কতিপয় কবিতা, মুক্তির গান, একুশ-দফা, ছয়-দফা ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল।

সর্বশেষে আছে বঙ্গবন্ধুর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী। আমি প্রায় দেড়দশক ধরে বিভিন্ন সূত্র অবলম্বন করে তাঁর একটি বস্তুনিষ্ঠ সম্পূর্ণ জীবনালেখ্য প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর সঙ্গে চারটি সংযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই চারটি সংযুক্তি হচ্ছে : বঙ্গবন্ধুর কারাবাসের কালক্রম, তাঁর বিদেশ সফরের তালিকা, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় অভিযুক্ত খুনিদের তালিকা এবং বঙ্গবন্ধুর বংশ পরিচয়।

বইটি পাঠকদের, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তরুণদের আকর্ষণ করলে আমাদের উদ্যোগ যথার্থ হবে বলে মনে করব এবং খুবই খুশি হবো।

ঢাকা
১৭ মার্চ ২০০৮

আবুল মাল আবদুল মুহিত

প্রা ক্ ক থ ন

বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী (১৭ মার্চ ২০০৮) উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি 'এই দেশ এই মাটি' নামে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। জাতির জনকের স্বলিখিত পাঁচটি প্রবন্ধসহ বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ, বক্তব্য, বিবৃতি, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব বিদ্যুচ্চমকের মতো আলোকিত করেছে আমাদের চেতনাজগৎ। বাঙালিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি- স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

বিবিসি-র (ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন) বাংলা সার্ভিসের বিশ্বব্যাপী পরিচালিত শ্রোতা জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে বিবিসি-র যেমন রয়েছে গ্রহণযোগ্যতা, তেমনি তার শ্রোতাদের অভিমতও বিবেচিত হয় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুর অবদানের মহিমা বাঙালি জাতির নিকট সুস্পষ্ট। তিনি এই বাঙালি জাতিকে, বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে, হাজার বছরের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন। শুধু শাসন-শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা নয়, বাঙালি জাতি সম্পর্কে হাজার বছর ধরে যেসব নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত ছিল সেসব দূর করে তাদের একটি অধিকারসচেতন, সংগ্রামশীল, মানবিক গুণসম্পন্ন, অকুতোভয় ও আত্মমর্যাদাসতর্ক জাতি হিসেবে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরেছেন। বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি আজ একই সূত্রে গ্রথিত। বাঙালি জাতির মাঝে বঙ্গবন্ধু থাকবেন চিরকাল জীবিত।

বাঙালি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ভালোবাসা ও মমতা, তাঁর দেশপ্রেম, জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনপণ সংগ্রামের সাহসিকতা, এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব প্রভৃতি প্রশ্নে কারো মনে কোন সংশয় নেই। অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রের একমাত্র সাধারণ নির্বাচনে (১৯৭০) জনগণের নিরঙ্কুশ রায়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর এসব মহত্তম বৈশিষ্ট্য স্বীকৃতি লাভ করে। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলস্বরূপ নির্বাচনী এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন এদেশের অবিসংবাদিত নেতা। একাত্তরের (১৯৭১) মার্চ মাসে তাঁর ডাকা অসহযোগ আন্দোলনে যেমন জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া মেলে, তেমনি এর মধ্য দিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ওপর তাঁর নেতৃত্বও পূর্ণতরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এই প্রতিষ্ঠা এমনই দৃঢ়মূল যে, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র ৭ই মার্চের এই বক্তৃতা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এ বক্তৃতা ছিল আমাদের সিংহনাদ বা যুদ্ধ স্লোগান। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সকলের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত এই বক্তৃতা শ্রবণে। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে উচ্চারিত এই ভাষণের পৌনঃপুনিক প্রচার ও সম্প্রচার সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করে নি, তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল কারণ এ ভাষণই ছিল কার্যত আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা। তাঁর নামের মাহাত্ম্যই ওই সময়ে সমগ্র জাতির জন্য সাহস, উজ্জীবন ও প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে আর এভাবেই তাঁর নেতৃত্ব সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। একটি নতুন দেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ অবদানের ফলে তিনি উন্নীত হন 'জাতির জনক'-এর শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সর্বার্থে সমার্থক। বঙ্গবন্ধু তাঁর সংক্ষিপ্ত ৫৫ বৎসরের জীবনে আমাদের দিয়ে গেছেন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীন পতাকা, গণতান্ত্রিক সংবিধান, বাঙালি, বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সর্বোপরি বাঙালি মননে জাত্যভিমান। ভারত বিভাগের সাত মাসের মাথায়ই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাকিস্তানের কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাঙালির মুক্তি আদৌ সম্ভব নয় আর তখন থেকেই তিনি বাঙালির সার্বিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে অবিচল থেকে আজীবন সংগ্রাম করে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সে কারণে পাকিস্তানের কারাগার হয় তাঁর স্থায়ী ঠিকানা আর তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির অনপনেয় পরিচয়স্থল।

চরম ধৈর্য, পরম নিষ্ঠা ও সতত আত্মনিবেদনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে স্বাধীনতা বিনির্মাণে নেতৃত্ব প্রদান করে অনন্য সৃষ্টিশীল রাজনীতির উদ্ভব ঘটান যা সমসাময়িক বিশ্বে এক বিরল দৃষ্টান্ত। আন্তর্জাতিক সাময়িকী 'নিউজউইক' বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' অভিধায় অভিহিত করে সেই একাত্তরেই প্রচ্ছদনিবন্ধ প্রকাশ করে। সারাজীবন বঙ্গবন্ধু যেমন ছিলেন নির্ভীক, সংবেদনশীল ও অভিজাত রাজনীতিক, মৃত্যু মুহূর্তেও ঘাতকের গুলির সম্মুখে তিনি ছিলেন শান্ত, নিঃশঙ্ক ও সম্ভ্রান্ত।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির জীবনে এক নিষ্ঠুর বজ্রপাত। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সংবাদে দেশবাসী দ্বিধান্বিত ছিল বহুদিন– কারুর বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, বঙ্গবন্ধু আর বেঁচে নেই। সেদিনের সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের আত্মস্বীকৃত খুনিদের এখনও শাস্তি দেয়া হয় নি। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য জাতির জনক ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে হত্যার মাধ্যমে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট দেশে সন্ত্রাসী শক্তির যে অশুভ উত্থান ঘটানো হয়, স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সে-ষড়যন্ত্র প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত রয়েছে। ২১শে আগস্টের (২০০৪) নির্মম ঘটনাসহ বহু মর্মন্তুদ ঘটনা তারই দুর্ভাগ্যজনক ধারাবাহিকতা।

বঙ্গবন্ধুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পরও হত্যাকারীরা স্বস্তিবোধ করে না, ফলে নিহত বঙ্গবন্ধুও হয়ে ওঠেন তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। এভাবে ১৯৭৫ সালের আগস্ট-পরবর্তী দুই দশকে দেশে এমন একটি প্রজন্ম গড়ে ওঠে যারা এদের পরিকল্পিত অপপ্রচারণায় বিভ্রান্তির শিকার হয়। এই দীর্ঘ সময়ে এরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে তারা এতটা শক্তি সঞ্চয় করেছে যে, স্বাধীনতাবিরোধী চক্র আজ রাষ্ট্র শাসনে অংশ গ্রহণ করে।

ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের রাজনৈতিক কার্যোদ্ধারই হয়ে উঠেছে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের প্রধান প্রবণতা। স্বাধীনতার তথাকথিত ঘোষক সম্পর্কিত বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এদেশের রাজনীতিতে তাদের প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস। বিগত জোট সরকারের আমলে এই প্রয়াস এমন বিকৃত রূপ ধারণ করে যে, তারা আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের সংবিধান সবকিছুকে মিথ্যার জালে জড়িয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিচিত্র সম্ভার ও দীর্ঘ সংগ্রাম-আন্দোলনের ঐতিহাসিক উপাদান ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। দেশের ভেতর গুটিকয়েক স্বার্থান্ধ ব্যক্তির মিথ্যাচারের ফলে ঐতিহাসিক সত্যের কোন স্থায়ী ক্ষতিসাধন সম্ভব নয়। সত্যের কখনও মৃত্যু নেই, বিনাশ নেই– সত্য চিরকালই সত্য। মুক্তিযুদ্ধের তন্তুজালের অভ্যন্তরে কোন বিন্দু বা বিন্দুসমষ্টি তন্তুজালের নির্মাতার সমকক্ষ যে হতে পারে না তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের যতদিন অস্তিত্ব থাকবে ততদিন জাতির জনক হিসেবে পৃথিবীতে প্রকীর্তিত হবে বঙ্গবন্ধুর নাম– এটিই চিরায়ত সত্য।

ইতিহাস বিকৃতির বিষময় ফল হিসেবে একটি বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মূল্যবোধহীনতা, সুবিধাবাদ, ন্যায়-নীতিবিবর্জিত উচ্চাভিলাষ, স্বার্থলোলুপতা প্রভৃতি প্রবল হয়ে উঠেছে। যা

আমাদের সমগ্র দেশকে এক সর্বনাশা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জরুরি তাগিদ অনুভব করে আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছি। স্মতর্ব্য যে, বঙ্গবন্ধু আমৃত্যু গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য এবং সুখী-সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গড়ার জন্য লড়াই করে গেছেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতেও তাই বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য আমাদের জন্য এবং অধিকারসচেতন প্রতিটি বাঙালির জন্য একান্ত প্রাসঙ্গিক। এ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে এবং সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত অবদানকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরাও আমাদের লক্ষ্য। আমরা জানি, ইতিহাসের সত্যকে স্তব্ধ করা যায় না। কিন্তু একটি বিশেষ চক্র এক সংঘবদ্ধ মিথ্যাচারের মাধ্যমে জনগণের একাংশকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করতে যেভাবে প্রয়াস চালাচ্ছে তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্ধার করা জরুরি প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়েছে। আশা করি, এ গ্রন্থ ইতিহাসের সত্য অনুধাবনে পাঠককে সহায়তা করবে।

এ গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বেশ কিছু কবিতা ও গান। গানের তালিকায় অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের গানসহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশাত্মবোধক সংগীতও স্থান পেয়েছে। দেশের সেরা কবি ও গীতিকারদের রচিত এসব কবিতা ও গান থেকে উপলব্ধি করা সহজ হবে বঙ্গবন্ধু এঁদের হৃদয়ে কতটা সুউচ্চ স্থান দখল করে আছেন। দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনে এই বিরল ব্যক্তিত্বের যুগান্তকারী তট-অতিক্রমী অবদানকে আমাদের দেশের সেরা সৃষ্টিশীল ব্যক্তিগণ এসব রচনায় স্মরণ করে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এছাড়া এ গ্রন্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, আমাদের পরাধীনতা-বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলের সংযোজন। ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর শতাধিক দুর্লভ আলোকচিত্র এ গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে। এসব ছবি আজ ইতিহাসের অংশ। এ গ্রন্থে সংকলিত বঙ্গবন্ধুর প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বাণী, নির্দেশ, সাক্ষাৎকারসহ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা ও মুক্তির গান এবং ঐতিহাসিক দলিলসমূহ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অপরিসীম আন্তরিকতা নিয়ে বিপুল শ্রম স্বীকার করেছেন বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ হোসেন।

এছাড়া এ গ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজকে সুষ্ঠু, সাবলীল, পরিমার্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে বরেণ্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ড. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, ড. সৈয়দ আজিজুল হক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটির সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের সার্বক্ষণিক সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ সম্পাদনা পরিষদকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। আমি জনাব মুহিতকে এ সুযোগে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত শাহজাহান কবিরের স্মৃতির প্রতি আমাদের একান্ত শ্রদ্ধা। তাঁর স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু-কেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে নতুন প্রজন্মকে দেশ ও জাতির ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত রাখা। একাডেমির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম এ খায়েরসহ প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৯৪) থেকে এ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও শুভ-কামনা।এঁদের নিরন্তর প্রয়াস নবপ্রজন্মের প্রতি আমাকে সর্বদা রাখে আশাবাদী ও উদ্দীপিত।

ঢাকা
মার্চ ১৭, ২০০৮

ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

প্র স ঙ্গ ক থা

শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু-জাতির পিতা ও স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক

ব্রিটিশ শাসিত অন্ধকারময় এক পশ্চাৎপদ সমাজে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক অভিজাত মুসলিম শেখ পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ শেখ মুজিবুর র-হমান জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা শেখ সাহারা খাতুন ছোট বেলায় আদর করে ডাকতেন 'খোকা' নামে। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয়। পিতা-মাতার ইচ্ছায় বেগম ফজিলাতুন্নেসা(রেণু)'র সাথে শেখ মুজিবের বিয়ে হয় কিশোর বয়সেই। তাঁদের দুই কন্যা ও তিন পুত্র।

জানা যায় শেখ মুজিব স্কুল জীবন থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়নীতির পক্ষে গণতান্ত্রিক ধারায় বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয়তাবাদী চেতনায় ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবে ছিলেন সৎ, ত্যাগী, সাহসী, নির্ভীক ও অবিচল। অফুরন্ত ঘটনার মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটির উল্লেখ করছি।

১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শনকালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-এ বাংলা এ কে ফজলুল হক ও শিক্ষামন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে স্কুলছাত্র শেখ মুজিব ছাত্রাবাসের ছাদ মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবি আদায়ের মাধ্যমেই তাঁর শুরু হয় অধিকারহারা গণমানুষের পক্ষে দাঁড়ানোর পথচলা।

১৯৪৭ সালে কলকাতায় মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রতিবাদে অনশনে অংশগ্রহণ করেন ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রসংসদের নির্বাচিত জিএস শেখ মুজিব। এ সময় থেকে গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের নীতি তাঁকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে প্রবীণ রাজনীতিক সোহরাওয়ার্দীর দীক্ষায় হয়ে ওঠেন তিনি একজন নির্ভেজাল অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবিভক্ত বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সোহরাওয়ার্দী-বসু চুক্তিরও বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব।

১৯৪৮-৪৯ সাল থেকেই শুরু হয় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এদেশের বঞ্চিত নির্যাতিত গণমানুষের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রাম। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঐতিহ্যমণ্ডিত ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবের উদ্যোগ ও অবদান স্মরণীয়। ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সচিবালয়ের সামনে পিকেটিংরত অবস্থায় শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হন। বাহান্ন'র ২১ ফেব্রুয়ারি'র আগ পর্যন্ত ১১ মার্চই ছিল বাঙালির ভাষাদিবস। তিনি জেলে থাকা অবস্থায় ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন নব প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদকের পদে মনোনীত হন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের পূর্ব থেকে শেখ মুজিব জেলে ছিলেন। অসুস্থতার কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। হাসপাতালে থেকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আমরণ অনশন কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং জেলের বাহিরে সংগ্রামরত নেতৃবৃন্দকে ২১ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। শেখ মুজিব অনশন কর্মসূচি নেয়ায় জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ফরিদপুর জেলে প্রেরণ করে। ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। আমরণ অনশনের কারণে স্বাস্থ্যের অবনতি হলে ২৭ ফেব্রুয়ারি কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে শেখ মুজিব মন্ত্রী হন এবং এই সরকারই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ মুজিব যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হিসাবে এফডিসি উদ্বোধন করেন।

১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত দলের কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবের প্রস্তাব অনুযায়ী 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নামকরণ করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ'। দলে সকল ধর্মের লোকের সহঅবস্থান নিশ্চিত করে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হয় দলের নবযাত্রা। মূলত শেখ মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক অবস্থান এখান থেকেই জাতীয়ভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়।

১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্ব পান শেখ মুজিবুর রহমান। ২১ মে দলের নির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয় দলের পদ ও মন্ত্রিত্ব একই সঙ্গে পালন করা যাবে না। যেকোন একটি থেকে পদত্যাগ করতে হবে। দলের অন্য মন্ত্রীরা দলীয় পদ থেকে পদত্যাগ করলেও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ৩১ মে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করে দলীয় পদে বহাল থাকেন।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি'র প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধীদলের এক সম্মেলনে যোগ দেন। উক্ত সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদলের নেতা ও সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয়-দফা কর্মসূচি জমা দেন। কিন্তু সম্মেলনে এই বিষয় উত্থাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে তিনি সংবাদ সম্মেলনে তাঁর ছয়-দফা উপস্থাপন করে দেশে ফিরে আসেন এবং ঢাকা বিমানবন্দরে বাংলার স্বাধিকার দাবি যা বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ২০ ফেব্রুয়ারি দলীয় নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়ে দলীয় কর্মসূচিতে পরিণত হয় ছয়-দফা। ওই বছরই ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ দলের কাউন্সিলে ছয়-দফা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় এবং সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। এই কাউন্সিলে ছয়-দফার বিস্তারিত যেমন ব্যাখ্যা দেন তেমনি সমাজতন্ত্রের কথাও বলেন দৃপ্তকণ্ঠে। শুরু হয় তাঁর ছয়-দফা নিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গণসংযোগ। সাথে সাথে তাঁর উপর চলে ক্ষমতাসীনদের নির্যাতনের স্টিমরোলার।

শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনকে নিয়ে শাসকগোষ্ঠী শুরু করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯৬৯ সালে দেশের আপামর ছাত্র-জনতার তীব্র গণ আন্দোলনে জানুয়ারিতে গণঅভ্যুত্থান ঘটে যায়। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দি ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জেল থেকে মুক্তি পান।

সদ্য কারামুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবকে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ রমনা রেসকোর্সে প্রদত্ত গণসংবর্ধনায় উপস্থিত দশ লক্ষেরও অধিক জনতার সমর্থনে সভার সভাপতি ও ডাকসুর ভিপি জনাব তোফায়েল আহমদের প্রস্তাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন শেখ মুজিব।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী-শের-এ বাংলার মাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, "আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।"

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ছয়-দফা ও এগার-দফার পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেড গ্রহণের জন্যই কতিপয় দল ও নেতার বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন ও নিরঙ্কুষভাবে বিজয়ী হন।

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানের ছাত্র-জনসভায় স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ঘোষিত প্রথম স্বাধীনতার ইশতেহারে বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলার 'জাতির পিতা' এবং স্বাধীন বাংলাদেশের 'সর্বাধিনায়ক' ঘোষণা করে।

নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও ক্ষমতা হস্তান্তরে ক্ষমতাসীনদের ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরে বঙ্গবন্ধু ডাক দেন অসহযোগ আন্দোলনের। এসময় পূর্বপাকিস্তান তাঁর আদেশ নির্দেশেই পরিচালিত হয়।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, তৎকালীন ইপিআর হেড কোয়ার্টার পিলখানাসহ ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালির উপর ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করে নির্বিচারে হত্যা করে অগণিত মুক্তি পাগল নারী পুরুষ। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে (বঙ্গবন্ধুর নাম অনুসারে মুজিবনগর) নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও প্রায় তিন লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বদরবারে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ'।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর রমনা রেসকোর্সে দৃপ্তকণ্ঠে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন : 'ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।'

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাষ্টপতি থেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র ১০ মাসের মধ্যে ৪ নভেম্বর দুশত পঁচিশ বছরের পরাধীনতার পর লাখো শহীদের রক্তে লেখা প্রথম সংবিধান বাংলাদেশ গণপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির আলোকে (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা) অনুমোদিত হয় বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ নেতৃত্বে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের উপর দাঁড়িয়ে শূন্য তহবিল নিয়ে বঙ্গবন্ধু সরকারের যাত্রা শুরু হলেও অতিঅল্প সময়েই ভারত ফেরৎ প্রায় এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র ফিরিয়ে নেয়া, মিত্রবাহিনীকে ফেরত পাঠানো, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনা, ভেঙ্গে পড়া ব্রিজ ও নষ্ট-ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত, অচল বন্দর চালু করা, দেশের সকল প্রাইমারি স্কুলকে সরকারিকরণ, ইসলামি ফাউন্ডেশন ও মাদ্রাসা বোর্ড গঠন, ধর্মের নামে ব্যবসা বন্ধ করা, মদ-জুয়া,

ঘোড়দৌড়সহ ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, বাংলাদেশ সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা, ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও শিক্ষাসহ বঙ্গবন্ধুর হাজারো স্মরণীয় পদক্ষেপ আছে, যা স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরে বিশ্বের প্রায় দু শ' দেশের স্বীকৃতি প্রাপ্তি, জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ সংস্থা, কমনওয়েলথ, ওআইসি, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বখাদ্য পরিষদসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি বঙ্গবন্ধুর এক বিরল দৃষ্টান্ত।

ভারতের সাথে সীমান্ত চুক্তি (মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি), বাণিজ্যচুক্তি ও ফারাক্কার পানিবন্টন চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য ৪৪ হাজার কিউসেক পানি প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের অনন্য অবদান।

১৯৭২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি প্রদান করে। একই বছরে মস্কোর প্যাটিক লুমুম্বা মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করে বিশেষ পদক। পূর্ব ঘোষণা অনুয়ায়ী ১৯৭৩ সালের ২৩ মে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বশান্তি পরিষদ 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত করে। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে কতিপয় উচ্চাভিলাষী, বিভ্রান্ত, ক্ষমতালোভী, '৭১-এর পরাজিত বাহিনীর দোসর সামরিক বাহিনীর কতিপয় খুনিচক্র অরক্ষিত ৩২ নম্বরের নিজ বাসভবনে নির্বিচারে ব্রাশ ফায়ারে নৃশংস ও নির্মমভাবে হত্যা করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং পরিবারের সকল সদস্যকে (দুই কন্যা ব্যাতীত)।

ভাষা, শিক্ষা, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশের গণমানুষের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে যান বঙ্গবন্ধু এবং হয়ে ওঠেন বাঙালির মূর্তপ্রতীক। বাঙালির জাতিসত্তায় বঙ্গবন্ধু একটি আদর্শ, একটি ধারা, একটি চেতনা, একটি মূল্যবোধ সর্বোপরি বাঙালির গর্বের পরিচয়। তাই বাঙালি চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি নিরন্তর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নশ্বর দেহ পৃথিবীতে নাই ঠিকই কিন্তু আছে তাঁর চেতনা ও আদর্শ। যতদিন যাবে ততই তাঁর চেতনা ও আদর্শ শাণিত হবে। কারণ, তিনি যা করেছেন ও করতে চেয়েছেন ওইসবই ছিল নিরন্ন অধিকার হারা অতিসাধারণ মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায়।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু', 'জাতির পিতা' ও স্বাধীন বাংলাদেশের 'সর্বাধিনায়ক' উপাধিতে ভূষিত হন লাখ লাখ সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে ও সমর্থনে গণমানুষের পক্ষ থেকে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক। তাঁর রাজনীতির শুরু থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন– জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা এবং বাঙালি জাতি-রাষ্ট্রের স্থপতি। অথচ ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান।

বঙ্গবন্ধু প্রায়ই বলতেন, "শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। প্রয়োজন হলে নিজের রক্ত দিয়ে শহীদের রক্তের ঋণ শোধ করে যাব।" আসলে তিনি তাই করলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায়-

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবর রহমান।"

'বঙ্গবন্ধু ললিলকলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠা

"ছয়-দফা ও এগার-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের অর্থই হচ্ছে– রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক স্বাধিকার। জয় বাংলা শ্লোগানেরও লক্ষ্য এই সামগ্রিক স্বাধিকার অর্জন। জনগণের সরকার কায়েম হলে বাংলার মাটিতে জাতীয় সংগীত প্রতিষ্ঠা ও 'ললিতকলা একাডেমী' গঠন করতে হবে"-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান সংগীত শিল্পীসমাজ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত সংবর্ধনার জবাবে বঙ্গবন্ধু এ কথা বলেন)।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সংগীত, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' কুচকাওয়াজ সংগীত এবং সংশোধিত আকারে জাতীয় পতাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী' রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭৫ পরবর্তী ইতিহাস বাঙালির দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। সংবিধান স্থগিত, সামরিক শাসনের জাঁতাকলে জনমানুষ হয় নিষ্পেষিত, যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতিতে ঘটে অনুপ্রবেশ, বন্দি হয় গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদকে বোরকা পরিয়ে করা হয় বাংলাদেশী, ধর্মনিরপেক্ষতাকে দেওয়া হয় নির্বাসন, সংস্কৃতির ধারা পড়ে মুখথুবড়ে। ইত্যকার ঘটনাক্রমে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী অপসংস্কৃতির কালো থাবায় জাতি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের শেষ সীমায় পৌছায়।

এমতাবস্থায়, বঙ্গবন্ধুর চেতনায়, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ তথা আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে নবপ্রজন্ম ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার মানসে ১৯৯৪ সালের ১০ এপ্রিল 'বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাঙালি জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রসহ বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার, মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও প্রকাশ এবং সংস্কৃতি বিকাশে বাধামুক্ত পরিবেশ এ সবই বাঙালি পেয়েছে– স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু ও জাতির জনক উপাধিতে ভূষিত বঙ্গবন্ধুর নির্ভীক, সাহসী, ত্যাগী, বিচক্ষণ ও আপসহীন দেশপ্রেমের কারণেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ১৯৭২ থেকে ১৫ আগস্ট ৭৫ পর্যন্ত। সেজন্যই আমরা মনে করি, বাংলাদেশের বিশুদ্ধ নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এজন্যই ললিতকলার মাধ্যমে আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নবপ্রজন্ম ও জাতিকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আমরা 'বঙ্গবন্ধু'র নাম নির্বাচন করে গড়ে তুলি 'বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি'।

নিয়ম অনুযায়ী অত্র একাডেমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট থেকে 'বঙ্গবন্ধু'র নাম ও প্রতিকৃতি ব্যবহারের অনুমতিপ্রাপ্ত এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ঢাকাস্থ সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনকৃত।

একাডেমির কার্যক্রম

'বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ললিতকলার সবগুলো মাধ্যমের যেমন সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও অভিনয়ের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও চর্চা শুরু হয়। একাধিক প্রয়োজনাকেন্দ্রিক আবৃত্তি ও নাট্যকর্মশালা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দেশাত্মবোধক সংগীতের কয়েকটি অডিও এবং সিডি ক্যাসেট প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, 'পিতা তোমাকে ভুলিনি', 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন', 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু তুমি' এবং শ্রুতিকাব্য 'সত্যিকার রূপকথার সত্যিকার রাজপুত্র' ইত্যাদি। এছাড়াও জাতীয় নির্বাচন ২০০১ উপলক্ষে 'নায়ে বহিছে গণতন্ত্রের জয় গান' ও 'যেই নৌকাতে বঙ্গবন্ধু, সেই নৌকাতে শেখ হাসিনা' নামে দুটি অডিও ক্যাসেটও প্রকাশ করা হয়।

অপসংস্কৃতি ও ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে জাতিকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে বাঙালির বিভিন্ন গৌরবের জাতীয় দিবসসমূহ স্মরণে আলোচনা সভা, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 'বঙ্গবন্ধু' নামে সংকলনের নিয়মিত প্রকাশনার ধারা অব্যাহত আছে। বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, লালন শাহসহ স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্বের জন্ম-মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

বিবিসি'র বিশ্বজরিপে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে নির্বাচিত করার পর ২০০৪ সালে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু' এবং ২০০৬ সালের ১ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দেশের প্রধান বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু সম্পর্কীয় প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও কবিতা সমন্বয়ে 'স্মৃতিতে আগস্ট ২০০৬' নামে দুটি বিশেষ সংকলন আমার সম্পাদনায় 'বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি' প্রকাশ করে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ ২,২০০টি ছবি (১৯৪০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত) নিয়ে সপ্তাহব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী ধানমণ্ডিস্থ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণে ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠা কন্যা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা জননেত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন এবং ৩১ আগস্ট সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব মো. আবদুল জলিল সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

অনেক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূল অবস্থার পরও একাডেমিতে এখনও নিয়মিত সংগীতের প্রশিক্ষণ ও চর্চা অব্যাহত আছে।

বই প্রকাশের পেছনের কথা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংগ্রহ করে প্রদর্শনের লক্ষ্যে কাজ করার সময় এই প্রবন্ধগুলো ও বইতে স্থান পাওয়া অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন পত্রিকা থেকে আমি সংগ্রহ করি। বঙ্গবন্ধুর লেখা প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলো নিয়ে একটি বই প্রকাশের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক দৈন্যতার কারণে হয়ে ওঠেনি। ২০০৬ সালের ২৬-৩১ আগস্ট পর্যন্ত ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণে সপ্তাহব্যাপী বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রদর্শনী চলাকালীন সময়ে সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত আসেন এবং প্রদর্শনী ঘুরে দেখার পর তিনি আমার সাথে অল্পক্ষণ কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া ছবিগুলো দিয়ে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করতে। আমি বললাম, এটা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, এ ধরনের কাজে তিনি নিঃসন্দেহে অংশ নিবেন। এক বছর পর এই দুঃসময়ে ওই সূত্র ধরে তার বাসার ঠিকানা যোগাড় করে আমি বাসায় যাই এবং আমন্ত্রণ জানালে তিনি ২০০৭ সালের ৩০ নভেম্বর একাডেমির কার্যালয় পরিদর্শনে আসেন। এরও একমাস পর ২৫ ডিসেম্বর তার বাসায় আমি আবার যাই এবং বঙ্গবন্ধুর লেখা প্রবন্ধগুলো নিয়ে একটা

বই প্রকাশের কথা জানালে তিনি সানন্দে সম্মতি ও প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দেন। বইয়ে প্রবন্ধের সাথে তাঁর বক্তৃতা ও আরও কিছু যোগ করতে বলেন। সে মোতাবেক বইয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকার-এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা, মুক্তির গান, ঐতিহাসিক দলিলপত্র ও বঙ্গবন্ধুর কিছু দুর্লভ ছবি যোগ করা হয়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী এই বইয়ে স্থান পেয়েছে জনাব মুহিত সাহেবের উদ্যোগে ও সম্পাদনায়। বইয়ে স্থান পাওয়া সবগুলো বিষয় তিনি দেখে দেন এবং 'এই দেশ এই মাটি' বইয়ের নামও তিনি নির্বাচন করেন। তার অফুরন্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। সুতরাং, রবীন্দ্রসংগীত অনুরাগী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতকে আমার ও বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমির পক্ষ থেকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দীর্ঘদিন যাবৎ একাডেমির সকল কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেই তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত দিয়ে গৃহীত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একাডেমির অগ্রযাত্রাকে স্বার্থক করার কাজে নিয়োজিত আছেন। জঙ্গিচক্রের গুপ্ত হামলার লাগাতার হুমকির মুখেও জীবনের নিরাপত্তাহীন অবস্থায় অনেক ব্যস্ততার মাঝেও এই বই প্রকাশে তিনি যেমন উৎসাহিত করেছেন তেমন প্রচুর সময় দিয়েছেন। তার মাধ্যমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এই বইয়ের কাজকে নির্ভুল ও সুন্দর করতে সহযোগিতা করেছেন। তারা হলেন অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিত ঘোষ, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক ও অধ্যাপক ড. কাজল বন্দোপাধ্যায়। প্রবীণ শিল্পী অধ্যাপক কাইয়ুম চৌধুরী অতিঅল্প সময়ে অত্যন্ত নিপুণভাবে বইয়ের অলংকরণ ও প্রচ্ছদ করেছেন। আগামী প্রকাশনীর মালিক জনাব ওসমান গনি আনন্দের সাথেই বইটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এছাড়াও বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরির পত্রিকা বিভাগ ও বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছি বিধায় এ দুটি প্রতিষ্ঠানসহ উল্লিখিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

'এই দেশ এই মাটি' বইতে যা আছে

এই বইয়ের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম জানবে বঙ্গবন্ধু শুধু একজন মহান নেতাই নন তিনি একজন বিচক্ষণ চিন্তাবিদ ও লেখকও ছিলেন। বইয়ে যা আছে : বঙ্গবন্ধুর লেখা ৫টি প্রবন্ধ, ১০০টি বক্তৃতা, ২৫টি বাণী, ৯টি নির্দেশ ও ৩টি সাক্ষাৎকার এবং পাঠকের কথা বিবেচনায় রেখে আরো কিছু উপাদান যোগ করা হলো। যেমন, বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা ৪২টি, মুক্তির গান ৪০টি, ঐতিহাসিক দলিলপত্র কয়েকটি, বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দুর্লভ কিছু ছবি নিয়ে সাজানো হয়েছে 'এই দেশ এই মাটি' বইটি। এই বইয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর দীর্ঘ বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবনের অতিঅল্প কিছু স্বল্প পরিসরে আমরা তুলে ধরেছি। সুযোগ হলে পরবর্তীতে আরো কিছু করার ইচ্ছা আছে।

পাঠকবৃন্দ– এই বইটি যেহেতু অতিতাড়াতাড়ি ছাপাতে হলো। অনিচ্ছাকৃত ভুল হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের নজরে আসলে পরবর্তীতে সংশোধন করে ছাপানোর অঙ্গীকার রইলো। বইটি আপনাদের কাছে সমাদৃত হলে কৃতজ্ঞ হবো।

'এই দেশ এই মাটি' বইটি যেহেতু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর লেখা ও কথা। তাই তাঁর নামে এবং তাঁরই ৮৮তম জন্মবার্ষিকী ১৭ মার্চ ২০০৮ উপলক্ষে এই বই প্রকাশে আমাদের উদ্যোগ।

কৃতজ্ঞতা

সংস্কৃতিমনা শাহজাহান কবীর (ব্যাংকার)-এর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও ঐকান্তিক সহযোগিতায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একাডেমির কর্মকর্তা, সদস্য/সদস্যা ও শিল্পীবৃন্দ ছিল দারুন উৎসাহী। মরহুম শাহজাহান কবীর (১৯৪২-৩১ মে ২০০০) ছিলেন অত্র একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। আমি তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। অনেকেই বিভিন্নভাবে একাডেমিকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং এখনও করছেন, তাদের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত প্রিয় সাবেক অর্থমন্ত্রী মরহুম শাহ এ এম এস কিবরিয়া (১ মে ১৯৩১-বোমা হামলায় নিহত ২৭ জানুয়ারি ২০০৫), সাবেক অতিরিক্ত সচিব এম এ ওয়াদুদ, একাডেমির সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মো. ওমর ফরুক ভুইয়া, অধ্যাপক ড. সুলতানা শফি, বর্তমান চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম এ খায়ের বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে একাডেমির ভাইস চেয়ারম্যান সুলতান আহমেদ ও জনাব মোহাম্মদ আলী খোকনের অনুপ্রেরণা ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমির ওয়াহিদুজ্জামান, অমল, জাহিদুল ইসলাম, ঝুমুর, রাখী, জাহানসহ যারা 'এই দেশ এই মাটি' বই প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং একাডেমির সকল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন ও আছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ঢাকা
১৭ মার্চ ২০০৮

মো. জাহিদ হোসেন
উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

নেতাকে যেমন দেখিয়াছি ... ৪১

শহীদ চরিত্রের অজানা দিক ... ৫২

স্মৃতির মিছিল : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ... ৫৭

আমাদের মানিক ভাই ... ৬১

আমার মানিক ভাই ... ৬৫

বক্তৃতা

'পূর্ববাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণের বিরুদ্ধে
পাকিস্তান গণপরিষদ, করাচি, ২৫ আগস্ট ১৯৫৫ ... ৭১

উভয় অংশের মধ্যে অটুট ঐক্য ও সুদৃঢ়
সংহতি গড়িয়া তোলার জন্য ছয়-দফা
ঢাকা বিমানবন্দর, ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ ... ৭২

দেশপ্রেমিক কে? ছয়-দফার সমালোচকরা? –ওরা তো বহুরূপী
আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, হোটেল ইডেন, ঢাকা, ১৮ মার্চ ১৯৬৬ ... ৭৪

আওয়ামী লীগ সভাপতি পদে নির্বাচনের পর নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা
ঢাকা, ১৯ মার্চ ১৯৬৬ ... ৮৪

চরম ত্যাগের প্রস্তুতির বাণী লইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন
পল্টন ময়দান, ঢাকা, ২০ মার্চ ১৯৬৬ ... ৮৫

ছয়-দফা কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানিয়াছে– তাই বিরোধিতা
চট্টগ্রাম, ২৫ মার্চ ১৯৬৬ ... ৮৭

শোষণ মুক্তির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাঁধের প্রয়োজন
সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম, ২৬ মার্চ ১৯৬৬ ... ৮৭

'সম্মুখ সমর' তবে খাস কামরায় নহে
স্থান পল্টন ময়দান নয় তো স্টেডিয়াম
ঢাকা, ১৩ এপ্রিল ১৯৬৬ ... ৮৯

ছয়-দফার নৈতিক বিজয় সূচিত হইয়াছে
যশোর, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬ ... ৯০

জেল বহুবার দেখিয়াছি
বুলেটের আঘাতও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত
খুলনা, ১৭ এপ্রিল ১৯৬৬ ... ৯২

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে লিখিত জবানবন্দি
ঢাকা, জুন ১৯৬৮ ... ৯৩

শান্তি চাই আর চাই শৃঙ্খলা
ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ... ৯৮

আমি ছ'দফা মানি, আমি এগার-দফা মানি
ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ... ৯৯

প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিয়া আবার কারাগারে যাইব
কিন্তু দেশবাসীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিব না
রমনা রেসকোর্স, ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ... ৯৯

"বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত
রমনা রেসকোর্স, ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ... ১০২

দল গঠনের স্বাধীনতা বিধান করিতে হইবে
ঢাকা বিমানবন্দর, ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ... ১০৩

আমি দেশবাসীর স্বার্থের পক্ষে
লাহোর বিমানবন্দর, পাকিস্তান, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ... ১০৪

গণদাবির প্রশ্নে লেন-দেনের কোনই অবকাশ নাই
লাহোর, পাকিস্তান, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ... ১০৫

প্রেসিডেন্ট হইতে চাহিনা
রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ... ১০৫

গোলটেবিল বৈঠকে ভাষণ
রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান, ১০ মার্চ ১৯৬৯ ... ১০৭

স্বৈরাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম
করাচি, পাকিস্তান, ৯ আগস্ট ১৯৬৯ ... ১১৩

পাকিস্তানের প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণের প্রতি সুবিচার করা হোক
করাচি, পাকিস্তান, ১০ আগস্ট ১৯৬৯ ... ১১৪

শাসনতান্ত্রিক সমস্যার চির সমাধান করিতে হইবে
করাচি, পাকিস্তান, ১১ আগস্ট ১৯৬৯ ... ১১৫

দুনিয়ার কোন শক্তিই বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি
ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না
সোহরাওয়ার্দী-শের-এ বাংলা মাজার প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ ... ১১৭

অতঃপর এ প্রদেশের নাম হইবে 'বাংলাদেশ'
সোহরাওয়ার্দী-শের-এ বাংলা মাজার প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ ... ১১৯

আগামী নির্বাচনে প্রদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে
সোহরাওয়ার্দী-শের-এ বাংলা মাজার প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯ ... ১১৯

আওয়ামী লীগ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ : বেতার ভাষণ
ঢাকা, ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ ... ১২১

বাংলার মানুষ কাহারো করুণা চাহে না, চায় ইনসাফ
ঢাকা, ৩০ অক্টোবর ১৯৭০ ... ১২৮

নির্বাচনী আবেদন
ঢাকা, ১ ডিসেম্বর ১৯৭০ .... ১২৯

আমার দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিবে
ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০ ... ১৩২

বিজয়ী নেতার শোকরিয়া
ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭০ ... ১৩৩

এই বিজয় বাংলার শোষিত জনগণেরই বিজয়
ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭০ ... ১৩৩

সংগ্রাম শেষ হয় নাই–সংগ্রাম শুরু
রমনা রেসকোর্স, ঢাকা, ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ ... ১৩৪

বাঙালির ইতিহাস নূতনভাবে রচনা করিতে হইবে
রমনা পার্ক, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১ ... ১৩৭

বাঙালির বিরুদ্ধে চক্রান্ত আগুন লইয়া খেলার শামিল
ঢাকা, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১ ... ১৩৮

শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতি এগিয়ে আসবে
ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সিটিটিউট, ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭১ ... ১৩৯

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল বাংলা একাডেমী
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ... ১৪১

মেশিনগানের মুখেও নীতির বিচ্যুতি ঘটিবে না
কারিগরি মিলনায়তন, ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ... ১৪২

কোন শক্তি এখন আর বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না
ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সিটিটিউট, ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ... ১৪৪

বাঙালি আর শহীদ হইবে না– গাজী হইবে
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি'র প্রথম প্রহর ১৯৭১ ... ১৪৪

আর উপনিবেশে বাস করিতে চাই না
আওয়ামী লীগ অফিস, ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ... ১৪৫

ছয়-দফার ব্যাপারে আপসের প্রশ্ন উঠিতে পারেনা
ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ... ১৫০

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
রমনা রেসকোর্স, ঢাকা, ৭ মার্চ ১৯৭১ ... ১৫১

আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা : ৩৫টি নির্দেশ
ঢাকা, ১৪ মার্চ ১৯৭১ ... ১৫৪

আমরা ভারতের নিকট কৃতজ্ঞ
প্যারেড ময়দান, ক্যান্টনমেন্ট, নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ১৬১

ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি
বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা
রমনা রেসকোর্স, ঢাকা, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ১৬৩

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বঙ্গভবনে শপথ নেয়ার পর
জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম বাণী
বঙ্গভবন, ঢাকা, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ১৬৫

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই লক্ষ্য
প্রধানমন্ত্রী ভবন (বেলী রোডস্থ সাবেক প্রেসিডেন্ট ভবন), ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ১৬৬

বাংলাদেশ'কে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসাবে গঠন করিতে চাই
প্রধানমন্ত্রী ভবন (বেলী রোডস্থ সাবেক প্রেসিডেন্ট ভবন), ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ১৭০

দেশের মুক্তির জন্য যে সকল যুবক সংগ্রাম করিয়াছেন
তাহাদের সমাজে যোগ্য স্থান দেওয়া হইবে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ১৭১

মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদানের স্মরণে
রেসকোর্স ময়দানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হইবে
আওয়ামী লীগ অফিস, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ১৭১

আমরা শান্তিতে বসবাস করিতে চাই
ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ১৭২

১০ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ
ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ১৭৩

অস্ত্র গোপনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি
ঢাকা স্টেডিয়াম, ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ১৭৫

বাংলাদেশ ও ভারতের মৈত্রী-বন্ধন চিরস্থায়ী
ব্রিগেড প্যারেড ময়দান, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ ... ১৭৬

শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসুন : বেতার ভাষণ
ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ ... ১৭৯

পরিবার পিছু একশত বিঘার বেশি জমি রাখা চলবে না
শান্তির হাট, ভোলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ ... ১৮০

নির্যাতিত মা-বোনদের সমাজে টেনে নিন
নগরবাড়ি, পাবনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ ... ১৮১

আমরা উভয়ই বিশ্বশান্তি চাই
লেনিনগ্রাদ, রাশিয়া, ৪ মার্চ ১৯৭২ ... ১৮১

বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের মানুষ ভারতের জনগণের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিয়া যাইবে
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা, ১৭ মার্চ ১৯৭২ ... ১৮২

শোষণ ও অবিচারমুক্ত নতুন সমাজ আমরা গড়িব : বেতার ও টিভি ভাষণ
ঢাকা, ২৬ মার্চ ১৯৭২ ... ১৮৩

আমলা নয় মানুষ সৃষ্টি করুন
চট্টগ্রাম, ৩০ মার্চ ১৯৭২ ... ১৮৭

দেশগড়ার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, ঢাকা, ৭ এপ্রিল ১৯৭২ .... ১৮৮

শাসনতন্ত্রে গণঅধিকার স্বীকৃত হবে
বাংলাদেশ গণপরিষদ, ঢাকা, ১০ এপ্রিল ১৯৭২ ... ১৯১

বাংলাদেশে ঘোড়দৌড় থাকবে না
ঢাকা, ১৬ এপ্রিল ১৯৭২ ... ১৯৩

বাংলাদেশে ধর্মের নামে শোষণ চলিবে না
বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ২৯ এপ্রিল ১৯৭২ ... ১৯৪

শ্রমিকের নয়া ভূমিকা নিতে হবে : বেতার ও টিভি ভাষণ
ঢাকা, ১ মে ১৯৭২ ... ১৯৫

ভারত ও সোভিয়েত বিরোধীরা হুঁশিয়ার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৬ মে ১৯৭২ ... ২০০

বন্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে
সিলেট, ২৭ জুন ১৯৭২ ... ২০২

স্বাধীনতা রক্ষায় সুশৃঙ্খল ও সজাগ থাকুন
ময়নামতি, কুমিল্লা সেনানিবাস, ৫ জুলাই ১৯৭২ ... ২০৪

সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে
জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা, ১৬ জুলাই ১৯৭২ ... ২০৬

এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্তে লেখা
বাংলাদেশ গণপরিষদ, ঢাকা, ৪ নভেম্বর ১৯৭২ ... ২১২

সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাসী
বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট, ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭২ ... ২২৪

মেহনতি মানুষের জন্য ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়িবে
শের-এ বাংলা নগর, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭২ ... ২২৫

শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ুন
মিরপুর, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২ ... ২২৬

এই শোষিত দুর্ভাগা দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই আমার স্বপ্ন
গোপালগঞ্জ, ৬ জানুয়ারি ১৯৭৩ ... ২২৭

ষড়যন্ত্রকারী ও সমাজবিরোধীদের রুখিয়া দাঁড়াও
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩ ... ২২৯

এ বিজয় জনগণের
গণভবন, ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৭৩ ... ২৩২

চাই দেশগড়ার কারিগর, দেশকে ভিক্ষুকের রাষ্ট্র করতে চাই না
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৫ মার্চ ১৯৭৩ ... ২৩৩

বিশ্বের সকল শান্তিকামী শক্তি সুসংহত হউন
শের-এ বাংলা নগর, ঢাকা, ২৩ মে ১৯৭৩ ... ২৩৬

পার্বত্য জনগণ সমান সুবিধা ভোগ করবে
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা, ৬ জুন ১৯৭৩ ... ২৩৭

আমাদের শান্তির প্রতিশ্রুতি সর্বাত্মক
অটোয়া, কানাডা, ৩ আগস্ট ১৯৭৩ ... ২৩৭

আমরা বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সংহতির এবং নির্যাতিত
জনগণ ও তাহাদের ন্যায়ের সংগ্রামের সমর্থকদের সপক্ষে
আলজিয়ার্স, আলজেরিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ ... ২৩৯

টোকিওর ভোজসভায় ভাষণ
টোকিও, জাপান, ১৮ অক্টোবর ১৯৭৩ ... ২৪২

আত্মসমালোচনা আত্মসংযম আত্মশুদ্ধি চাই
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন
ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪ .... ২৪৪

আত্মশুদ্ধ যুবশক্তির উন্মেষ চাই
আওয়ামী যুবলীগের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস
পল্টন ময়দান, ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ .... ২৬১

মূল্যবোধের এই সংকট কাটাতেই হবে
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ ... ২৬৩

ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি
লাহোর, পাকিস্তান, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ ... ২৬৪

বৃত্তিমূলক শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে
সুপারিশ বাস্তবায়নে সেল গঠিত হবে
গণভবন, ঢাকা, ৭ জুন ১৯৭৪ .... ২৬৬

ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়া প্রয়োজন
জাতিসংঘ সদরদপ্তর, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ .... ২৬৭

কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াতে হবে : বেতার ও টিভি ভাষণ
ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ... ২৭২

জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় সেনাবাহিনীকে একাত্ম হতে হবে
কুমিল্লা সেনানিবাস, ১১ জানুয়ারি ১৯৭৫ ... ২৭৬

বাংলার মানুষ চায় তারা যেন শান্তিতে ঘুমাতে পারে
রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ ... ২৮১

শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ ... ২৮৫

জাতীয় সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষিত থাকবে
রাঙামাটি, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ ... ২৯৬

বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা, ২৬ মার্চ ১৯৭৫ ... ২৯৭

উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে
কিংস্টন, জ্যামাইকা, ৩ মে ১৯৭৫ .... ৩০৭

দেশের মাটির সাথে সংযোগ রাখিয়াই শোষণহীন সমাজ গড়িব
দরবার হল, বঙ্গভবন, ঢাকা, ১৯ জুন ১৯৭৫ .... ৩০৯

উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিক কল্যাণে ব্রতী হন
গণভবন, ঢাকা, ১১ জুলাই ১৯৭৫ ... ৩২১

নয়া ব্যবস্থার সুফল জনগণকে পৌঁছে দিতে হবে
দরবার হল, বঙ্গভবন, ঢাকা, ২১ জুলাই ১৯৭৫ .... ৩২২

বাণী

সংবর্ধনা-উত্তর দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ... ৩৩৭

বিচারের ভার আপনাদের (সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে)
৬ ডিসেম্বর ১৯৭০ .... ৩৩৭

জাতীয় শোক দিবসে
১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ৩৩৮

কোসিগিন ও ইন্দিরার নিকট
৬ মার্চ ১৯৭২ ... ৩৩৯

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে
১৩ এপ্রিল ১৯৭২ ... ৩৩৯

রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে
৭ মে ১৯৭২ ... ৩৪০

বিদ্রোহী কবির কাছে চিঠি
২০ মে ১৯৭২ ... ৩৪১

নজরুল-জন্মোৎসবে
২৪ মে ১৯৭২ .... ৩৪১

প্রথম জাতীয় বিজয় দিবসে
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ .... ৩৪২

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে
৭ এপ্রিল ১৯৭৩ .... ৩৪৩

৭ জুন উপলক্ষে
৬ জুন ১৯৭৩ .... ৩৪৪

বার্লিন যুব উৎসবে
২১ জুলাই ১৯৭৩ ... ৩৪৪

ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে
২৬ অক্টোবর ১৯৭৩ .... ৩৪৫

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার মুখবন্ধ
২৭ নভেম্বর ১৯৭৩ ... ৩৪৬

বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি উপলক্ষে
৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ ... ৩৪৭

স্বাধীনতা দিবসে
২৫ মার্চ ১৯৭৪ .... ৩৪৭

আরাফাতের নিকট
১৩ নভেম্বর ১৯৭৪ ... ৩৪৮

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে
৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ .... ৩৪৯

একুশে ফেব্রুয়ারিতে
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ .... ৩৫০

শের-এ বাংলার মৃত্যুবার্ষিকীতে
২৭ এপ্রিল ১৯৭৫ ... ৩৫০

মানিক মিয়া স্মরণে
১ জুন ১৯৭৫ ... ৩৫১

সংবাদপত্রে 'বাংলার স্বাধিকার' শিরোনামে
বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষে স্বহস্তে লেখা
২২ মার্চ ১৯৭১ ... ৩৫২

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে
৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ ... ৩৫৩

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক
কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে
১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪ ... ৩৫৪

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে
৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ ... ৩৫৫

নির্দেশ

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মদ নিষিদ্ধ
ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ৩৫৬

তদ্বির চলিবে না
ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ ... ৩৫৬

লাল ফিতার দৌরাত্ম্য অবসানকল্পে
ঢাকা, ১০ জুন ১৯৭২ ... ৩৫৬

মহিলাদের চাকরিতে সমান সুযোগ দিতে হবে
ঢাকা, ১৯ জুন ১৯৭৩ ... ৩৫৭

'৬৯-৭০ সালের সব রাজনৈতিক মামলা তুলে নাও
ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩ ... ৩৫৭

মন্ত্রীদের সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে
গণভবন, ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ .... ৩৫৮

সংসদ সদস্যদের সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে
ঢাকা, ১৩ মার্চ ১৯৭৫ ... ৩৫৮

সস্তায় রেডিও-টিভি দেওয়ার ব্যবস্থা
এক ব্যান্ডের রেডিও ও ২০ ইঞ্চি টিভির লাইসেন্স ফি বাতিল
ঢাকা, ৩ জুলাই ১৯৭৫ ... ৩৫৯

'চালনা বন্দর শ্রমিক কল্যাণ তহবিল' গঠনে
ঢাকা, ৯ আগস্ট ১৯৭৫ ... ৩৬০

সাক্ষাৎকার

যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনে এ সাক্ষাৎকারটি
১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি প্রচারিত
ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের নেওয়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ৩৬৩

বিদেশি (এবিসি) টেলিভিশন সাংবাদিকের সাথে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার
ঢাকা, ১৩ মে ১৯৭২ ... ৩৭৯

"মুজিববাদ" বইয়ের লেখক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস-এর
কতিপয় প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ ... ৩৮৮

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা

বঙ্গবন্ধু
অন্নদাশঙ্কর রায় ... ৩৯৩

প্রতিশোধ
অসীম সাহা ... ৩৯৩

নামে সাহস নামেই মায়া
আনজীর লিটন ... ৩৯৪

প্রতিশোধে হ্যামলেট
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ... ৩৯৫

বঙ্গবন্ধুকে
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ... ৩৯৫

এ কেমন জন্মদিন
আসাদ চৌধুরী ... ৩৯৬

মুজিব মানে তো
আহমাদ মাযহার ... ৩৯৭

শেখ মুজিবের মহাপ্রয়াণে
এলাংবম নীলকান্ত ... ৩৯৮

শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিব
কাজী মোস্তফা ... ৩৯৯

বাংলার কবি
কামাল চৌধুরী ... ৪০০

রাখাল রাজার জন্যে
খালেক বিন জয়েনউদ্দীন ... ৪০০

তোমার জন্যে হে জনক
খালেদা এদিব চৌধুরী ... ৪০১

বঙ্গ-বন্ধু
জসীম উদ্‌দীন ... ৪০২

কোন্ ছবিগুলি
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ... ৪০৩

তুমি চলে গেছো বলে
ত্রিদিব দস্তিদার ... ৪০৪

বঙ্গবন্ধু
দক্ষিণারঞ্জন বসু ... ৪০৪

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো
নির্মলেন্দু গুণ ... ৪০৫

আমার পতাকাই তুমি
পান্না কায়সার ... ৪০৬

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
প্রত্যয় জসীম ... ৪০৭

পঁচাত্তরের যীশু
বাদল ঘোষ ... ৪০৭

সে ছিল দিঘল পুরুষ
বাবুল জোয়ারদার ... ৪০৭

বঙ্গবন্ধু মুজিবর
বিভূতি ভট্টাচার্য ... ৪০৮

মানব মহান
বেলাল চৌধুরী ... ৪০৮

আমি কি বলতে পেরেছিলাম
মহাদেব সাহা ... ৪০৯

বঙ্গবন্ধু
মুস্তাফা মাসুদ ... ৪১১

মুজিবমিনার
মুহম্মদ নূরুল হুদা ... ৪১২

এই সিঁড়ি
রফিক আজাদ ... ৪১২

বঙ্গবন্ধু
রবীন্দ্র গোপ ... ৪১৩

একটি রাতের গল্প
রাজু আহমেদ ... ৪১৪

বঙ্গবন্ধুকে
রাহাত খান ... ৪১৪

১৫ আগস্টের এলিজি
শওকত ওসমান ... ৪১৫

পিতা হত্যার বদলা নেবোই
শাফিকুর রাহী ... ৪১৬

ধন্য সেই পুরুষ
শামসুর রাহমান ... ৪১৭

মুজিব তুমি
শেখ হিজবুল্লাহ ... ৪১৮

ফিরে আসছেন শেখ মুজিব
সিকান্দার আবু জাফর ... ৪১৯

বাপের বেটা
সুকুমার বড়ুয়া ... ৪২০

রূপকথা হার মানে
সুজন বড়ুয়া ... ৪২০

ডাকিছে তোমারে
সুফিয়া কামাল ... ৪২১

আমার পরিচয়
সৈয়দ শামসুল হক ... ৪২২

মানুষের নাম শেখ মুজিবুর রহমান
হাবিবুল্লাহ্ সিরাজী ... ৪২৩

মুজিবের এপিটাফ
হায়াৎ মামুদ .. ৪২৩

শেখ মুজিবুর রহমান
হীরা লাল বালা ... ৪২৪

মুক্তির গান

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি ... ৪২৭

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ... ৪২৭

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা ... ৪২৮

ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা ... ৪২৮

ও আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই
জয় বাংলা বলিয়া আইসো রঙিন পাল উড়াই ... ৪২৯

ও তোর ভয় নাইরে জোরে মার টান
এই নৌকার কাণ্ডারী আছে মুজিবুর রহমান ... ৪২৯

ওরা আমার মুখের কথা
কাইড়া নিতে চায় ... ৪৩০

ক'জনকে তুই দিবি ফাঁসি বন্দি করবি কর
আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে লক্ষ মুজিবর ... ৪৩১

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙ্গে ফেল্ কর্‌রে লোপাট ... ৪৩১

গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা
ও তার দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা ... ৪৩২

চাষাদের মুটেদের মজুরের
গরিবের নিঃস্বের ফকিরের ... ৪৩৩

জগৎবাসী একবার আসিয়া
বাংলাদেশকে যাও দেখিয়ারে ... ৪৩৩

জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ... ৪৩৩

জয় বাংলা জয় বাংলা বইলা রে
মাঝি বাদাম দাও তুলিয়া ... ৪৩৪

জয় বাংলা জয় বাংলা বলিয়ারে
তরী দিলাম ছাড়ি ... ৪৩৫

জয় বাংলা বাংলার জয়
হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয় ... ৪৩৬

তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি ... ৪৩৭

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার ... ৪৩৭

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে
তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায় তুমি ... ৪৩৮

বাংলার দুর্জয় জনতা
মুজিবের মন্ত্রের দীক্ষায় ... ৪৩৯

বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ
বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান
আমরা সবাই বাঙালি ... ৪৩৯

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা ... ৪৪০

মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে
একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না, ও বন্ধু ... ৪৪০

মানুষ হ' মানুষ হ'
আবার তোরা মানুষ হ' ... ৪৪১

মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হলো বলিদান ... ৪৪১

মুজিব বাইয়া যাওরে
নির্যাতিত দেশের মাঝে
জনগণের নাও ওরে ... ৪৪২

মোদের গরব, মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালোবাসা ... ৪৪২

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ... ৪৪৩

যায় যদি যাক প্রাণ
তবু দেব না দেব না
দেব না গোলার ধান ... ৪৪৩

রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি
বাংলাদেশের নাম ... ৪৪৪

লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয়
শোষিত মানুষের একতার জয় ... ৪৪৪

শোনো একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ ধ্বনি, প্রতিধ্বনি ... ৪৪৪

সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনাতে নজরুল
যতই আসুক বিঘ্ন বিপদ হাওয়া হোক প্রতিকূল ... ৪৪৫

সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম
মুজিবর, মুজিবর, মুজিবর ... ৪৪৫

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হে বিধাতা
তোমায় নমস্কার ... ৪৪৬

সালাম সালাম হাজার সালাম
সকল শহীদ স্মরণে ... ৪৪৬

সোনা সোনা সোনা, লোকে বলে সোনা
সোনা নয় তত খাঁটি ... ৪৪৭

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে ... ৪৪৭

বাংলাদেশ –জর্জ হ্যারিসন ['দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'] ... ৪৪৮

যশোর রোডে সেপ্টেম্বর –অ্যালেন গিন্সবার্গ ... ৪৪৯

ঐতিহাসিক দলিলপত্র

লাহোর প্রস্তাব, ২৩ মার্চ ১৯৪০ .... ৪৫৫

যুক্তফ্রন্ট ও একুশ-দফা, ১৯৫৪ ... ৪৫৭

বাঙালির মুক্তিসনদ ঐতিহাসিক ছয়-দফা, ১৯৬৬ ... ৪৫৯

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের এগার–দফা, ১৯৬৯ .. ৪৬১

স্বাধীনতার ঘোষণা (বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মহান স্বাধীনতা ঘোষণা), ২৬ মার্চ ১৯৭১ ... ৪৬৪

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত), মুজিবনগর, বাংলাদেশ. ১০ এপ্রিল ১৯৭১ ... ৪৬৫

মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক
'জয়বাংলা' পত্রিকার একটি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা ... ৪৬৭

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল ... ৪৬৮

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ... ৪৭১

বঙ্গবন্ধুর আলোকচিত্র .. ৪৮৯

প্র ব ন্ধ

নেতাকে যেমন দেখিয়াছি

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে এত বেশি বিরল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে কয়েক খণ্ড পুস্তক রচনার প্রয়োজন। সুদীর্ঘ প্রায় এক চতুর্থ শতাব্দীকাল তাঁহার সংস্পর্শে থাকার ফলে আমার মনের কোণে তাঁহার যে ছবিটি অঙ্কিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা কোন সাধারণ মানুষের নহে, একজন প্রায় অতিমানবের। তাঁহার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মহৎ গুণের যে সমাবেশ ঘটিয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে একজন বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মানুষে পরিণত করিয়াছিল।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর অন্যতম বিশিষ্ট চারিত্রিক গুণ ছিল এই যে, তিনি কোন ব্যাপারেই ধানাই-পানাই বা লুকোচুরিতে বিশ্বাস করিতেন না। প্রত্যেকটি জাতীয় সমস্যাকেই তিনি সরল সোজা দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতেন। ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও তিনি উচ্চনৈতিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতেন না, বরং যে-কোন অবস্থাতেই তিনি নিজ নীতিতেই অবিচল থাকিতেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর জীবনে এরূপ ঘটনার অভাব নাই। নিম্নবর্ণিত ঘটনা হইতেই পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যাইবে যে, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের চাইতে নীতি তাঁহার নিকট কত বড় ছিল। ১৯৪৭ সালের জুন মাস। সিলেট গণভোটের ঠিক অব্যবহিত পরের ঘটনা। নবগঠিত পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন করার জন্য মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা কাহাকে নির্বাচন করা হইবে, উহা লইয়া তোড়জোড় চলিতেছে। ওই সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী। সিলেটের ১৭ জন পরিষদ সদস্য মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিতে যোগ দিলেন। তাঁহারা জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহাদেরকে তিনটি মন্ত্রিত্ব ও তিনটি পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির পদ দান করা হইলে নেতা নির্বাচনে তাঁহারা তাঁহাকেই সমর্থন করিবেন। বরাবরের ন্যায় এক্ষেত্রেও জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার নীতিতে অবিচল রহিলেন এবং সিলেটি সদস্যদের জানাইয়া দিলেন যে, পূর্বাহ্নে তিনি কাহাকেও অনুরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিবেন না। বিফল মনোরথ হইয়া তাঁহারা নেতৃত্বের অপর প্রার্থী খাজা নাজিমুদ্দিনের নিকট গমন করিয়া উক্ত প্রতিশ্রুতি দাবি করিলেন। খাজা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উহাতে রাজি হইয়া গেলেন এবং নিজের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পথ নিশ্চিত করিলেন। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচনে খাজা সাহেব বিজয়ী হইয়া পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান) প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পদে সমাসীন হইলেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী দেশ বিভাগের পর ভারতে ফেলিয়া আসা অসহায় মুসলমানদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা একদিকে যেমন তাঁহার উচ্চমানের কর্তব্যবোধের পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি অপরিসীম ত্যাগের প্রমাণ। অসহায় মুসলমানদের রক্ষা করার মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে যাইয়া তাঁহাকে কায়েদে আজমের একটি নয়, দুইটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি উচ্চপদ গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। কায়েদে আজম তাঁহাকে ১. ভারতে পাকিস্তানি হাইকমিশনার, ২. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব, ৩.পাঞ্জাবের গভর্নর পদ, ৪. জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধির পদ এবং সর্বশেষ ৫. বিদেশে কায়েদে

আজমের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের অসহায় মুসলমানদের রক্ষার চাইতে তিনি কোন উচ্চ-পদকেই বড় মনে করেন নাই। তাই, কোন পদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইয়া তিনি ভারতে থাকিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং একে একে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার লীলাভূমি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থান, পূর্ব পাঞ্জাব, আলওয়ার, ভরতপুর, দিল্লি ও যুক্ত প্রদেশ সফর করিলেন। এই সকল স্থানের কোন কোনটায় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে গিয়েছিলেন, আবার কোন কোন স্থানে একাকীই গিয়াছিলেন। তবে সব জায়গাতেই তাঁহার জীবন বিপন্ন ছিল।

শুধু ভারতে নহে, তিনি পূর্ব বাংলাও সফর করিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি করিয়া মানুষের নিকট পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের স্বার্থেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। এই শান্তি মিশনে জনগণের অভ্যার্থনা, অভিনন্দন ও সাড়ার মাধ্যমে তাঁহার অচিন্তনীয় জনপ্রিয়তার যে চিত্র ফুটিয়া উঠিল, তদ্দৃষ্টে ক্ষমতাসীনদের বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাই, তাঁহারা সাত-তাড়াতাড়ি স্টিমারযোগে টাঙ্গাইল রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাদামতলী ঘাটে তাঁহার উপর বহিষ্কার আদেশ জারি করিলেন। এ সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। জনাব সোহরাওয়ার্দীকে কলকাতা ফিরিয়া যাইতে হইল এবং সেখানে গিয়া তিনি পুনরায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। গান্ধীজীর সহায়তায় তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কলকাতাসহ পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অংশ, আসাম ও ভারতের পাকিস্তান সন্নিহিত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মুসলমানদের পাকিস্তান পাড়ি রোধ করিতে সক্ষম হইলেন। এইভাবে তিনি এই নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে কোটি কোটি মোহাজেরের চাপজনিত গুরুতর বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিলেন। অন্যাথায় এই নবীন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি এবং অসংগঠিত ও টলটলায়মান অর্থনীতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থা সেই সময়েই চুরমার হইয়া যাইত। সুতরাং, জনাব সোহরাওয়ার্দীর দূরদৃষ্টি এমন এক সময় পাকিস্তানকে রক্ষা করিল, যখন কেন্দ্র ও এখানকার সরকার তাঁহাকে একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে প্রচার করিতে ব্যস্ত।

একজন দুঃসাহসিক মানুষ

জনাব সোহরাওয়ার্দীর সাহসের কথা সর্বজনবিদিত। শত বিপদ-আপদেও তিনি অটল ছিলেন, অথচ ইহার যে-কোনটিতে তাঁহার জীবন খতম হইতে পারিত। কিন্তু কোন পরোয়া নাই! তাঁহার খোদা ভীরুতাই ইহার একমাত্র কারণ। শত্রু-অধ্যুষিত এলাকায় রওয়ানা হইলে আমরা যখন বাধা দিতাম, তখন তিনি বলিতেন, "খোদা তায়ালা যে সময় নির্ধারণ করিয়াছে তৎপূর্বে কেহই আমাকে হত্যা করিতে পারিবে না।" এই প্রসঙ্গে আমি তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্বাপণ প্রচেষ্টার কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৯২৬ সালে কলকাতার সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার সময় কিভাবে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিজ মুখেই আমি তাহা শুনিয়াছি। একবার তিনি শুদ্ধি-আন্দোলনের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিভাবে রক্তক্ষয় বন্ধ করা যায়, এ-সম্পর্কে তাঁহারা দুইজন রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আলাপ-আলোচনা করিতে ছিলেন। ঠিক এই সময় একব্যক্তি পিছন হইতে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী ইহা লক্ষ্য করেন নাই। আততায়ী তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিবে–ঠিক সেই মুহূর্তে স্বামীজী উহা দেখিতে পাইয়া জড়াইয়া ধরিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীকে একপাশে ঠেলিয়া দেন, আততায়ীর লক্ষ্যচ্যুতি ঘটিল। স্বামীজী জনাব সোহরাওয়ার্দীকে মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ওই স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীও একাকী গাড়ি চালাইয়া চলিয়া গেলেন।

আরেকটি ঘটনা। ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গার সময় গাড়িতে চড়িয়া একাকী জনাব সোহরাওয়ার্দী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া অসহায় লোকদের সাহায্য ও সাম্প্রদায়িক শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ এক সময় তাঁহার গাড়িতে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইল এবং উহার বিস্ফোরণও ঘটিল। সামান্য আহত হইলেও তাহাতে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। তিনি লাফ দিয়া গাড়ির বাহিরে আসিয়া প্রাণে বাঁচিলেন।

দেশ বিভাগের পর কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকার সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী গান্ধীজীর সঙ্গে বেলিয়াঘাটার একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে অবস্থান করিতেন। তখনও কলকাতার মুসলিম-নিধনযজ্ঞ পুরাদমে চলিতেছিল। একদিন প্রায় বিশ সহস্র লোকের একটি জনতা তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিল। কিন্তু ভয় পাওয়ার পাত্র তিনি নন। তাই, তিনিও বুক ফুলাইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি আমাকে হত্যা করিতে চাও, তবে এখনই কর। কিন্তু তৎপূর্বে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, আমার পরে তোমরা আর কোনও মুসলমানকে হত্যা করিবে না।" সোরগোল শুনিয়া গান্ধীজীও বাহির হইয়া আসিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর পাশে দাঁড়াইলেন এবং উন্মত্ত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি শহীদকে খুন করিতে চাও, তাহা হইলে প্রথমে আমাকে খুন কর।" একথা জনতার উপর যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া গেল।

তাঁহার জীবনের উপর আঘাত হানার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে দিল্লিতে। তখন জনাব সোহরাওয়ার্দী গান্ধীজীর সহিত নয়াদিল্লিতে বিড়লা ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করার কাজে নিয়োজিত জনৈক ব্যক্তি গৃহের ভেন্টিলেটরের মধ্য দিয়ে তাঁহার প্রতি পিস্তলের লক্ষ্য স্থির করে; কিন্তু বিছানায় জনাব সোহরাওয়ার্দীর স্থলে একজন কানা লোককে শায়িত দেখিয়া একটু পরে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, কোন ব্যাপারে চিন্তামগ্ন থাকার সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী সর্বদা একচোখ বন্ধ করিয়া রাখিতেন। পরে লোকটি তাহার অপরাপর সহযোগীর গালমন্দ শোনে। সৌভাগ্যবশত জনাব সোহরাওয়ার্দী পরের দিনই কলকাতার উদ্দেশ্যে দিল্লি ত্যাগ করেন। এই সমগ্র ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছিল গান্ধী হত্যা মামলার বিচারকারী আদালতে একজন রাজসাক্ষী (Approver) তাহার সাক্ষে। সে আরও প্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহাদের লক্ষ্য ছিল তিনজনকে হত্যা করা– গান্ধীজী, জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মি. জওয়াহেরলাল নেহরু।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর ভারত সরকার জনাব সোহরাওয়ার্দীর উপর বিপুল পরিমাণ আয়কর ধার্য করিলেন এবং তাহার কিছুদিন পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। সেই সময়- ভারতের সাম্প্রদায়িক দিগন্তের শান্তি বিরাজ করিতেছিল। তাই, জনাব সোহরাওয়ার্দী বসবাসের উদ্দেশ্যে করাচি চলিয়া আসিলেন এবং তাঁহার শ্বশুর মরহুম স্যার আবদুর রহিমের ১৩, করাচি রোডস্থ বাড়িতে বসবাস করিতে শুরু করেন। ইহা ছিল একতলা একখানা দালান। সেখানেও একদিন রাত্রে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে হত্যা করার জন্য জনৈক ব্যক্তি উন্মুক্ত তরবারী হস্তে তাঁহার শয্যা কক্ষে প্রবেশ করে। সৌভাগ্যবশত জনাব সোহরাওয়ার্দী তখনও ঘুমাইয়া পড়েন নাই। লোকটি তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিতে যাইবে, ঠিক এই সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লোকটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং তাহার হাতের কব্জা ধরিয়া ফেলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর চীৎকারে গৃহে চাকর-বাকর আসিয়া লোকটিকে পাকড়াও করিয়া আটক করে। তখন লোকটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকে। তাঁহার কান্নায় দয়ার সাগর সোহরাওয়ার্দীর মন গলিয়া গেল। তিনি লোকটিকে

বিচারের জন্য পুলিশের হাতে সোপর্দ করার পরিবর্তে সেই গভীর রাত্রেই মুক্ত করিয়া দিলেন।

তাঁহার জীবনের উপর সর্বশেষ হামলা হয় ১৯৬২ সালে পশ্চিম পাকিস্তান সফরের সময় গুজরানওয়ালা রেল স্টেশনে। আমি নিজে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য প্লাটফরমে প্রায় ৫ শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দী গাড়ির কামরা হইতে বাহিরে আসা মাত্র রিভলবারের একটি গুলি তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান চেরাগ আলী নামক একজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে বিদ্ধ করে। রিভলবারের এই গুলির লক্ষ্যস্থল যে জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কিভাবে ঘটনাটি চাপা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনেকের নিকটই অজ্ঞাত নহে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই অলৌকিক উপায়ে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

সাধারণ মানব নহে

আমি কোনদিনও তাঁহাকে কাহারও উপর এমনকি তাঁহার রাজনৈতিক শত্রুর উপরও ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা রাজনৈতিক কারণে প্রতিশোধ নিতে দেখি নাই। সুদূর বৈরুতে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন কিনা, তাহা একমাত্র আল্লাহতায়ালাই জানেন। তবে, তিনি আর আমাদের মধ্যে নাই; কিন্তু একজন সাধারণ কর্মী, অনুসারী ও ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে দীর্ঘ তেইশ বৎসরকাল আমি তাঁহার মধ্যে যে মানুষটির পরিচয় পাইয়াছি, সে সাধারণ মানব নহে– অতিমানব।

দানশীল সোহরাওয়ার্দী

একজন দীপ্তিমান আইনজীবী হিসাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করিতেন; কিন্তু আবার ব্যয়ও করিতেন দরাজ হস্তে। তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য চাইতে আসিয়া কোনদিনও কেহ খালি হাতে ফিরিয়া যাইত না। তবে, তাঁহার দানের বিরল-বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি কোন সময় অন্য কাহারও নিকট নিজের দানের কথা অথবা দান প্রাপ্তদের কথা প্রকাশ করিতেন না। আমি জানি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু ছাত্র তাঁহার অর্থে লেখাপড়া শিখিত।

এ প্রসঙ্গে আমি আমার নেতার দানশীলতার একটি নজির উল্লেখ করিতেছি। আমাদের দলের অনেকেই জানেন যে, জনাব সোহওয়ার্দী যখনই ঢাকা আসিতেন, তখনই চল্লিশোর্ধ বয়সের জনৈক ব্যক্তি ঢাকা আসিয়া উপনীত হইত এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীর অবস্থান কালে সব সময় সে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচারক হিসাবে কাজ করিত। একদিন আমি ও জনাব সোহরাওয়ার্দী বাহিরে গেলাম। রুমে রাখিয়া গেলাম কেবলমাত্র সেই লোকটিকে। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল, জনাব সোহরাওয়ার্দীর তহবিলে ৩,০০০ টাকা নাই। সেই লোকটিই যে এ কাজ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে আমাদের মোটেই কষ্ট হইল না। জনাব সোহরাওয়ার্দীও তাহাতে নিঃসন্দেহে ছিলেন। আমি থানায় টেলিফোন করিয়া লোকটিকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করিলাম। আমি চলিয়া যাওয়ার পর রাত্রে জনাব সোহরাওয়ার্দী থানায় টেলিফোন করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার কোনরূপ অভিযোগ নাই। সুতরাং, পুলিশ লোকটিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। পরের দিন সকালে দেখা গেল লোকটি পূর্ববৎ জনাব সোহরাওয়ার্দীর সেবায় নিয়োজিত। আমি ও মানিক ভাই (ইত্তেফাক সম্পাদক) লোকটিকে চলিয়া যাইতে এবং কোনদিনও আর সেখানে না আসিতে বলিলাম। তারপর হইতে লোকটি প্রত্যেকদিনই আমাদের অনুপস্থিতির সময়ে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিকট আসিত এবং প্রতিদিন জনাব সোহরাওয়ার্দী তাহাকে কিছু না কিছু টাকা দিতেন। একদিন আমরা লোকটিকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিকট দেখিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী

আমাদের শুনাইয়া তাহাকে আর না আসিতে বলিলেন। আমাদের খুশি করা ও নাজুক অবস্থা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্যেই যে জনাব সোহরাওয়ার্দী লোকটিকে আর আসিতে নিষেধ করিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের বাকি রহিল না। ইহার পর একদিন ওই লোকটির হাতেই জনাব সোহাওয়ার্দীকে ৮০০ টাকা দিতে দেখিয়া আমি রীতিমত স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। আমার কিছু বলার আগেই জনাব সোহরাওয়র্দী বলিতে শুরু করিলেন যে, গরিব লোকটির একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি তাহাকে এই শেষ দান করিলেন। ইহা জনাব সোহরাওয়র্দীর জীবনের অনুরূপ শত শত ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র।

দেশ বিভাগের পূর্বে আমি ঘটনাক্রমে একদিন নেতার ৪০, থিয়েটার রোডস্থ বাসভবনে একটি 'কালোখাতা' দেখিয়া ফেলিলাম। ওই খাতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি পেনসনভোগী লোকের একটি তালিকা ছিল। তাহাদের তিনি মাসিক সর্বমোট ৩,০০০ টাকা পেনসন দিতেন। তালিকাভুক্ত এই লোকদের মধ্যে ছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে পুরাতন চাকর-বাকর, নাপিত, শ্রমিক, কর্মী, কিছু সংখ্যক প্রবীণ লেখক ও রাজনৈতিক কর্মী।

এই খাতাটি তিনি কোনদিনও কাহাকে দেখাইতেন না। আমার প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল বলিয়াই এই খাতাটি দেখার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

অসংখ্যবার মফস্বল সফরের সময়ও আমি তাঁহাকে অনেক মানুষকে সাহায্য করিতে দেখিয়াছি। একথা বলার প্রয়োজন রাখে না যে, দেশ বিভাগের পূর্বে ও পরে নিজ দলের অধিকাংশ ব্যয়ই তিনি নিজে একাই বহন করিতেন।

গুজরানওয়ালার জনসভা ব্যতীত জীবনের আর কোন সময় কেহ তাঁহাকে শত শত্রুতার মুখেও কোন কাজ হইতে বিরত করিতে পারে নাই। তিনি কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করিতেন না। শত্রুদল যত সুসংগঠিতই হউক না কেন, জনাব সোহরাওয়ার্দী কোনদিনও তাঁহার নির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতাদান হইতে পিছপাও হইতেন না। বরং, অসীম সাহসের সহিত তিনি পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতেন এবং তাঁহার মোহনীয় বক্তৃতার মাধ্যমে যাদুমন্ত্রের ন্যায় শত্রুদেরকেও বশিভূত করিয়া ফেলিতেন।

কুচক্রীদের শিকার কেন হইলেন

জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার সারা জীবনে কোনদিন রাজনৈতিক বা জনসাধারণকে ধাপ্পা দিয়াছেন তাঁহার বিরুদ্ধে এমন অপবাদ তাঁহার শত্রুরাও দিতে পারিবেন না। সম্ভবত এই কারণেই তিনি পাকিস্তানে রাজনৈতিক কুচক্রের শিকারে পরিণত হইয়াছেন। তিনি কোন দিনও গুজগুজ রাজনীতি, গোপন কারসাজি, ধাপ্পাবাজি ও চক্রান্তে বিশ্বাস করিতেন না; তিনি কেবল আইনের অনুশাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করিতেন। তিনি খোলাখুলি রাজনীতিতে বিশ্বাস করিতেন। তিনি কোনদিনও কাহাকে মিথ্যা আশা দেন নাই। বরং, কাহাকেও সাহায্য করার প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি নির্ধারিত গণ্ডি অতিক্রম করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের খোঁজ-খবর ও কাজ-কর্মের তত্ত্বতালাশ করিতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবেই কর্মীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহাদের পরিবারের খরচ প্রদান করিতেন। আমি কলকাতা ও ঢাকা– এই উভয় স্থানেই তাঁহাকে কিছু সংখ্যক যক্ষ্মা আক্রান্ত রাজনৈতিক কর্মীর চিকিৎসা ও তাহাদের পরিবারের খরচা প্রদান করিতে দেখিয়াছি।

অদ্বিতীয়

পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে সম্ভবত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাজপ্রাসাদ হইতে গরিবের কুটির পর্যন্ত সর্বত্র নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিতেন। প্রয়োজনবোধে তিনি মাইলের

পর মাইল পায়ে হাঁটিতে ও দিনের পর দিন ছোট নৌকায় চলিতে পারিতেন। অনেক সময় মফস্বল সফরের সময় তাঁহাকে রাতদিন কিছু না খাইয়াই কাটাইতে দেখা গিয়াছে। তিনি কোন দিনও ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশকে রাজনৈতিক, সামাজিক বা রিলিফ কাজের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতেন না। কাজই ছিল জীবনে তাঁহার নিকট সবচেয়ে বড় জিনিস। এখানে আমি একটিমাত্র নজির উল্লেখ করিতে চাই। ১৯৪৫ সাল। আমাদিগকে সিন্দিয়াঘাট হইতে দেশি নৌকায় গোপালগঞ্জে যাইতে হইবে– দূরত্ব প্রায় ২০ মাইল। সঙ্গে আমাদের কোনও খাবার দ্রব্য নাই। রাত্রেই আমাদের গোপালগঞ্জ পৌছার কথা। কারণ, সকালে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে জনমত যাচাই করিতে হইবে। আমাদের যাত্রাও শুরু হইয়াছে পূর্ব নির্ধারিত তারিখের ১ দিন পরে। দলে আমরা প্রায় ১৫ জন কর্মী। তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য মাঝিদের কেহ কেহ নৌকার গুণ টানিতে ছিল আর বাকি মাঝিদের লইয়া আমরা দাঁড় টানিতেছিলাম। সাতপাড় বাজারে (একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্য বাজার) পৌছার পর জনাব সোহরাওয়ার্দী আমাদিগকে অল্পক্ষণের জন্য নৌকা থামাইতে বলিয়া নিজে নিচে নামিয়া গেলেন এবং নিজ হাতেই কিছু 'চিড়া ও খেজুরের গুড়' কিনিয়া আনিলেন। অথচ আমরা কেহ তাঁহাকে খাবার জিনিস কিনার কোন কথা বলি নাই। তারপর তিনি মাঝি ও আমাদের মধ্যে ওই চিড়া বিতরণ করিয়া দিলেন এবং নিজেও অত্যন্ত তৃপ্তি সহিত উহা খাইলেন। ওইদিন সারারাত্র তিনি ও আমরা আর কোন খাবারের মুখ দেখি নাই। অনুরূপ শত শত ঘটনার কথা আমার জানা আছে।

কাজের মানুষ সোহরাওয়ার্দী

কাজই ছিল জনাব সোহরাওয়ার্দীর মূলমন্ত্র। কঠোর পরিশ্রম করাই ছিল তাঁহার অভ্যাস। সাধারণত তিনি দৈনিক ১৮ হইতে ২০ ঘন্টা খাটিতেন। জরুরি অবস্থার সময়ে সামান্য টিফিন খাইয়া তাঁহাকে দিবারাত্র বিনা নিদ্রাতেই কাজ করিতে দেখা যাইত। এই সময় দিনের পর দিন তিনি দাড়ি কাটারও সময় পাইতেন না। যুক্ত বাংলার সরবরাহমন্ত্রী এবং যুক্ত বাংলার ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমি তাঁহাকে অনুরূপভাবেই খাটিতে দেখিয়াছি। সবচেয়ে বেশি জটিল প্রশাসনিক সমস্যাও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পরিত না এবং তিনি মুহূর্তের মধ্যেই ওই সকল সমস্যার সঠিক সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি ফাইল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেন, কোনদিনও অন্ধের ন্যায় অফিসারদের নোটিং-এর উপর 'ডিটো' মারিতেন না। তিনিই বাংলার প্রথম শ্রমমন্ত্রী যিনি শ্রমিকদের সর্বমুখী স্বার্থ সংরক্ষণে উপযোগী উন্নতমানের শ্রম আইন প্রবর্তন করেন। তাঁহার এই সকল আইন পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতে প্রচলিত হয়। ১৯৪২-৪৩ সালের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর পরই জনাব সোরাওয়ার্দী বাংলার খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় টাকা দিয়াও খাদ্য পাওয়া যাইত না। বাংলার চাউলের বেশি অংশ আসিত বার্মা হইতে। সেই বার্মা জাপানি দখলে চলিয়া যাওয়ার ফলে পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হইয়া পড়ে। একদিকে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ নীতির প্রত্যক্ষ ফল আন্তঃজেলা কর্ডন প্রথা অপরদিকে স্যার আজিজুল হকের স্থলে সদ্য নিযুক্ত ভারতীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী নিবাসের অসহযোগিতামূলক মনোভাব সোহরাওয়ার্দীর খাদ্য সংগ্রহের পথে আরও প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। সামরিক লোকজনের জন্য ইতোমধ্যেই বিপুল পরিমাণ খাদ্য গুদামজাত করা হইয়াছিল। জাহাজের অভাব ও বোমা ভীতির ফলে খাদ্য সংগ্রহ দুরূহ হইয়া উঠিল। সামরিক কর্তৃপক্ষের 'ডিনায়েল পলিসি' অনুসারে সমগ্র প্রদেশের, বিশেষভাবে সীমান্ত অঞ্চলের সমস্ত দেশি নৌকা ও অন্যান্য যানবাহন হয় নষ্ট করা হইয়াছে, নতুবা সৈন্য বাহিনীর জন্য

রিকুইজিশন করা হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমার নেতা পরিস্থিতির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন না; করার মতো লোকও তিনি ছিলেন না। তিনি কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে সরকারি গুদাম ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে বেসরকারি জনগণের জন্য খাদ্য দিতে বাধ্য করিলেন। আর নিজে শাসনতন্ত্রকে সংগঠন করিলেন, দেশব্যাপী রেশনশপ খুলিলেন, সর্বত্র খিচুড়িখানা চালু করিলেন ও অতিরিক্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিলেন। এইভাবে তিনি সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করিয়াছিলেন। তাঁহার চরম সমালোচকও স্বীকার করিবেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর সুযোগ্য ও সুনিপুণ পরিচালনা না হইলে বাংলার সেই দুর্ভিক্ষে অনেক বেশি লোক প্রাণ হারাইত।

নিয়মিতভাবে কলকাতা ক্লাবে যাওয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর একটি 'হবি' ছিল। কিন্তু কাজের চাপে দুর্ভিক্ষের সময় দীর্ঘ ১৬ মাসকালের মধ্যে তিনি একদিনও কলকাতা ক্লাবে যান নাই। আমি কোনদিন তাঁহাকে রাত্রি ১১টার পূর্বে অফিস হইতে বাসায় ফিরিতে দেখি নাই। কোন সময়ে আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলেই তিনি বলিতেন, "রাত্রিতে এসো, তার আগে আমার সময় হবে না।"

১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন

আমি তাঁহাকে বিখ্যাত নাটোর ও বালুরঘাট উপনির্বাচনে কাজ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার সংগ্রাম-নিপুণতাই ওই সকল নির্বাচনে জয়লাভের কারণ। আমি তাঁহাকে পাকিস্তান ইস্যুতে অনুষ্ঠিত ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনেও কাজ করিতে দেখিয়াছি। এমন কোন স্থান বা জায়গা ছিল না যেখানে তিনি যান নাই। তিনি প্রদেশব্যাপী জনমত সংগঠন করেন এবং নির্বাচনী অভিযান এমনভাবে পরিচালিত করেন যাহাতে সর্বাধিক দক্ষতা হইতে সর্বাধিক ফল পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই 'মুসলিম লীগ' শতকরা ৯৭টি আসল লাভ করিয়াছিল। তাঁহার ঝটিকা সফর, কর্মী ও ছাত্রদের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সংযোগ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগের ফলেই এই অভাবিতপূর্ব বিজয় সম্ভব হইয়াছিল।

১৯৫৪ সনে পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনকালে তিনি কিভাবে কাজ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। ওই সময়ে তিনি যুক্তফ্রন্টের 'সিমসন' রোডস্থ অফিসে অবস্থান করিতেন। সেখানে তিনি একজন সাধারণ লোকের মতো খাটিয়ার উপর রাত্রি যাপন করিতেন। সময় সময় হেটেল হইতে তাঁহার খাবার আসিত। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমি প্রধানমন্ত্রীর 'প্রাইভেট সেক্রেটারি' জনাব এ এ শাহকে রাত্রি ১১টার সময় ফাইল পত্র লইয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাত্রি তিনটার সময় বাহির হইতে দেখিয়াছি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলিকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হইলেও জনাব সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্বের সম্মুখে কিছুই দাঁড়াইতে পারিত না। একবার কোন এক বিভাগীয় 'সেক্রেটারি' জনৈক সিনিয়র আই.সি.এস. অফিসার কি 'নোট'সহ একটি ফাইল লইয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর কাছে আসিলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী উক্ত নোটগুলি, বিশেষভাবে 'নোটে'র ভাষা অনুমোদন করিলেন না এবং অনুরূপ 'নোট' লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারকে তিরস্কার করিলেন। তিনি বিষয়টি গভর্নরের গোচরে আনিলেন এবং গভর্নর একদিন আলাপ প্রসঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বলিলেন যে, অফিসারটি শুধু সিনিয়র আই.সি.এস. অফিসারই নহেন, অক্সফোর্ডের একজন এম.এ.ও। উত্তরে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলিলেন, "আমিও অক্সফোর্ডের একজন এম. এ. এবং প্রত্যেক ইংরেজ ভালো ইংরেজি জানেনা।" ইহার পর গভর্নর বলার কিছু পাইলেন না।

কলকাতার দাঙ্গা

প্রত্যক্ষ কর্ম-পন্থার পর কলকাতা রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইল। মুসলমানরা শহরের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ মাত্র এবং তাহাদের অধিকাংশ ছিল বস্তিবাসী। পরিস্থিতির মোকাবিলার পক্ষে কলকাতা পুলিশের শক্তি যথেষ্ট ছিল না।

তৎকালীন যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী জনৈক ইউরোপীয় অফিসারের নিকট হইতে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে বসিয়া দাঙ্গা দমনে সব ব্যবস্থা নিজেই পরিচালনা করেন। অসহায়দের রক্ষা করার জন্য যে তিনি স্বয়ং দাঙ্গা-প্রীড়িত এলাকায় দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন, এমন নজির শত শত আছে। কেহ সাহায্য চাহিলে তাহাদের উদ্ধারের ব্যাপারে তিনি সাহায্যকারী পুলিশ পাঠান নাই এমন অভিযোগ কেহই করিতে পারিবেন না। এ-ব্যাপারে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। এই প্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি। একবার শত্রুভাবাপন্ন একদল মুসলমান কর্তৃক নারিকেলডাঙ্গা এলাকায় একটি হিন্দু মহল্লা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। টেলিফোনকল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দী গাড়ি চালাইয়া ঘটনার স্থলে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সাধারণ বা সশস্ত্র রক্ষীদের কাহাকেও নিলেন না। তিনি উত্তেজিত মুসলমান জনতার সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাদিগকে ছত্র-ভঙ্গ হইতে বাধ্য করিলেন। তারপর নিজে সেখানে থাকিয়া সমস্ত হিন্দু অধিবাসীকে অন্যত্র নিরাপদ স্থলে অপসারণের যাবতীয় ব্যবস্থা করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ওই দাঙ্গায় নেতার ভূমিকা সম্পর্কে অমুসলমানদের মধ্যে আজও বিতর্কমূলক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

একজন শাসন পরিচালক ও পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে তাঁহার যে অসীম দক্ষতা ছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পার্লামেন্টে তাঁহার বাচনভঙ্গী ছিল অতি চমৎকার। শাসনযন্ত্রের সমস্ত সমস্যা ছিল তাহার নখ দর্পণে। ১৯৫৬ সালে আমরা যখন পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করি, তখন চাউলের মূল্য ছিল মণ প্রতি ৭০ টাকা। এখানে সেখানে মানুষ না খাইয়া মরিতে ছিল। সরকারি গুদামে খাদ্যদ্রব্য ছিল না বলিলেই চলে। জনাব সোহরাওয়ার্দী কালবিলম্ব না করিয়া ভারত, বার্মা, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়নের ব্যবস্থা করিলেন এবং সুদূর পল্লি অঞ্চলেও খাদ্যদ্রব্য পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য বিশেষ বিমান বহরের ব্যবস্থা করিলেন।

প্রদেশের সামগ্রিক খাদ্যনীতি ছিল তাঁহারই পরিকল্পনা প্রসূত। তিনি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা যাইত। তিনি 'টেস্ট রিলিফ' কাজেরও উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন এবং তজ্জন্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে কোটি কোটি টাকা প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে তিনি পাকিস্তানের উপেক্ষিত অঞ্চলসমূহের ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া পূরণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই জন্যই কতিপয় শক্তিশালী আমলাতন্ত্রীসহ দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাঁহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। তিনি যখন যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে দেশে সত্বর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ হইতে অপসারিত হন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত প্রধানমন্ত্রী জনাব ফিরোজ খান নুনকে মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের কোন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ব্যতীতই কেবল ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্ত নির্বাচন প্রথায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্তে সমর্থনদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে পুনরায় সেই কায়েমী স্বার্থী মহলের অন্তর কাঁপিয়া উঠে এবং তাঁহারা তৎপর হন। তাঁহারা দেশে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া সামরিক আইন জারি করেন।

কেবলমাত্র তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলেই সমস্ত রাজবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং কাহাকেও রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত করা হয় নাই। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সমানহারে উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বের অনেক জাতির মনেই পাকিস্তানের প্রতি শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের ভাব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট চীন, তারপরে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সফরে যান। তিনি রাশিয়াসহ বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং চীন ও রাশিয়ায় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপর ব্লক অর্থাৎ আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত ব্লকের সহিতও বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন রাখিতে কম তৎপর ছিলেন না। তাঁহার আমন্ত্রণক্রমেই চীনের প্রধানমন্ত্রী মি. চৌ এন লাই পাকিস্তান সফরে আসেন। এ ভাবেই জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার বিঘোষিত পররাষ্ট্রনীতি 'সকলের সহিত বন্ধুত্ব এবং কাহারো প্রতি বৈরিতা নয়'-এর বাস্তব রূপ দান করেন।

মুসলিম লীগ

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরা পাকিস্তান চায় কি-না এই প্রশ্নের ভিত্তিতে ১৯৪৬ সনে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে একমাত্র বাংলাদেশেই মুসলিম লীগ শতকরা ৯৭টি মুসলিম আসন দখল করে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ অথবা বেলুচিস্তানের কোথাও মুসলিম লীগ সংখ্যাধিক্য আসন লাভ করিতে পারে নাই। যে ক্ষেত্রে সিন্ধুর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন ছিল মুসলমান সেখানে মুসলিম লীগ মাত্র একটি আসনের সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছিল। বাংলার এই নির্বাচন-সাফল্যর কৃতিত্ব কাহার? একমাত্র জনাব সোহরাওয়ার্দীর সংগঠনী প্রতিভার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মুসলমান জনসাধারণকে সুসংগঠিত করিয়াছিলেন এবং একদল একনিষ্ঠ কর্মী গড়িয়ে তুলিয়াছিলেন, যাহার ফলে এই যুদ্ধ জয় সম্ভব হইয়াছিল। তিনি কয়েকটি সফরে কোন বিশ্রাম গ্রহণ না করিয়াই পর্যায়ক্রমে ২৫/৩০টি জনসভায় বক্তৃতা করিতেন এবং এছাড়াও তিনি রাত্রে কর্মীসভায় বক্তৃতা করিতেন।

আওয়ামী লীগ

আমার পরিষ্কার মনে আছে, ১৯৫২ সালে আওয়ামী লীগ সংগঠনে বাহির হইয়া তিনি এক সফরে একাধারে ২৭টি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, মাঝখানে তিনি একদিনের জন্যও বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। তৎকালীন সরকার যে, তাঁহার প্রতি কত বৈরী ভাবাপন্ন ছিল, জনাব সোহরাওয়ার্দীর নির্ধারিত বহু জনসভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। তাঁহার অবিশ্বাস্য সাংগঠনিক দক্ষতাই ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের এবং ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ ছিল।

দুটি ঘটনা

১৯৫৪ সালে আমার পল্লিভবন হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে জনাব সোহরাওয়ার্দী এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। জনসভার শেষে আমরা পদব্রজে আমাদের বাড়ি যাই। তখন পথিমধ্যে আমাদিগকে একটি খাল অতিক্রম করিতে হয়। তখন উহা শুষ্ক ছিল। শহীদ সাহেব আমাকে খালটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, খালটিতে পানি না থাকায় মানুষকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতেই হয়। ১৯৫৭ সালে আমি যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য, তখন একদিন হঠাৎ শহীদ সহেব আমাকে বলিলেন, "মুজিব ১৯৫৪ সালে তোমার বাড়ির কাছে আমি যে শুকনা খালটি দেখিয়াছি, তাহার তুমি কতদূর ঠিক করিয়াছ? তুমি এখন ক্ষমতাসীন। মানুষ কি এখনো পানির অভাবে কষ্ট পাইতেছে?" আমি সানন্দে তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি সেই খালটি পুনঃখননের ব্যবস্থা করাইয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি

আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার স্মরণশক্তি কত প্রখর ছিল এবং মানুষের কথা তিনি কত ভাবিতেন।

আর একটি ঘটনা। ১৯৪৫ সাল। আমরা প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি নিখিল ভারত মুসলিম কনভেনশনে যোগদানের জন্য দিল্লি যাইতেছিলাম। আমাদের জন্য স্পেশ্যাল ট্রেন রিজার্ভ করা হইয়াছিল। আমাদের বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য স্টেশনে সমাগত ৫০ জনেরও বেশি ছাত্র টিকিটের প্রয়োজন নাই দেখিয়া আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া দিল্লি রওয়ানা দিলেন। দিল্লি পৌছার পর এই অতিরিক্ত লোকের থাকা-খাওয়া, আশ্রয়ের সমস্যা প্রকট হইয়া দেখা দিল। পরনের কাপড়-চোপড় ছাড়া তাহাদের কাছে আর কিছুই ছিল না। টাকা-পয়সার কথা তো না বলিলেই চলে। আমরা বিষয়টি জনাব সোহরাওয়ার্দীকে জানাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মরহুম জনাব লিয়াকত আলীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

কনভেনশনে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তাহা আজও আমার কানে বাজে। কনভেনশন শেষে জনাব সোহরাওয়ার্দী তাহার দিল্লির কতিপয় বন্ধুর নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়া ছাত্রদের প্রত্যেককে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্য ২৫ টাকা করিয়া দেন। কর্মী ও ছাত্রদের স্থান যে জনাব সোহরাওয়ার্দীর অন্তরে কত উচ্চে ছিল, এ ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধনীর দুলাল হইয়াও গরিবের বন্ধু

একটি কৃষ্টিবান ও ধনী পরিবারের জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দী এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের পশ্চাদপদ জনগণের স্বার্থে ব্যক্তিগত আরাম আয়েশ ত্যাগ করিয়া রাজনীতিতে নামিয়া পড়েন। তবে সংখ্যাগুরু অমুসলিম সম্প্রদায়ের সহিত তিনি সর্বদা বন্ধুত্ব-পূর্ণ মীমাংসায় আসিতে চেষ্টা করিতেন। কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচন সম্পর্কে পরলোকগত মি. এস. আর. দাসের সঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে 'রাজনৈতিক বন্ধুত্ব' করিয়াছিলেন, তাহা এবং সোহরাওয়ার্দী-দাসচুক্তি আজও একটি গৌরবের বস্তু হিসাবে পরিগণিত। দেশবন্ধুর জীবিতকালে এই চুক্তি একবারও ভঙ্গ করা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর মি. সুভাষচন্দ্র বসু ও জনাব সোহরাওয়ার্দী উহা রিনিউ করেন। ইহাই সোহরাওয়ার্দী-বোস চুক্তি নামে পরিচিত। প্রথমোক্ত চুক্তি অনুযায়ী দেশবন্ধু কলকাতা করপোরেশনের মেয়র ও শহীদ সাহেব ডেপুটি মেয়র হন। এই চুক্তি অনুসারেই প্রতি তিন বছরে একবারের জন্য করপোরেশনের মেয়র পদ মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করা হয়।

তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রত্যাখ্যান করিয়া আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচন প্রথার নীতিতে প্রণীত 'নেহরু ফর্মুলা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মরহুম মওলানা মুহম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী ও ড. আনসারীসহ তৎকালীন আর অন্য কোন মুসলিম নেতা নেহরু ফর্মুলার বিরোধিতা করেন নাই। সেদিন যদি জনাব সোহরাওয়ার্দী নেহরু ফর্মুলার বিরোধিতা না করিতেন আর যদি তাহা গৃহীত হইয়া যাইত, তাহা হইলে উহা মুসলমানদের ভবিষ্যৎ তথা পাকিস্তান আন্দোলনের মূলেই কুঠারঘাত করিত।

আবার তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি খণ্ডিত পাকিস্তানে খণ্ডিত বাংলার কুফল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ফলে উদ্ভব হইয়াছিল বৃহত্তর বাংলার 'সোহরাওয়ার্দী-বসু চুক্তি' (জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মি. শরৎচন্দ্র বসুর নাম অনুসারে)। এই পরিকল্পনার প্রতি কায়েদে

আজমেরও আশীর্বাদ ছিল। কিন্তু মি. বল্লভ ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পরিচালিত চরমপন্থী-কংগ্রেস মহল এবং মি. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর ন্যায় সাম্প্রদায়িকতাবাদিগণ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে দেয় নাই।

দুঃখের বিষয়, জনাব সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক প্রতিবাদীরা পরিকল্পনাটিতে ভিন্ন উদ্দেশ্য আরোপ করিয়া উহা জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে মূলধন হিসাবে লাগাইতে এখনও চেষ্টা করেন। আমি নিশ্চিত যে, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হইলে তাহা কত ভালো হইত, জনগণ আজ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। এই স্বল্পপরিসর জায়গায় পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা সম্ভব নহে। আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, এই পরিকল্পনায় উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা ছাড়াও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার বিধান ছিল। সর্বোপরি বাংলা, আসাম এবং বিহার, উড়িষ্যার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে লইয়া প্রস্তাবিত রাষ্ট্রটি গঠিত হইলে উহা সম্পদের দিক দিয়া বিশ্বের মধ্যে অন্যতম ধনী ও সম্পদশালী রাষ্ট্র হইত।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অতি-মানবীয় দক্ষতাকে অনেকেই ভয় করিতেন। সেই জন্যই অবিভক্ত ভারতে এবং পাকিস্তানে বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগ মহলের অনেকেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ও তাঁহার বিরুদ্ধে সদা-সর্বদা চক্রান্তের খেলায় লিপ্ত ছিলেন। জনগণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগী নেতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানাইবার মতো ভাষা আমার নাই। মৃত্যুকালে তিনি ব্যাংকে ১৩ হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের ইহা শোধ করিতে হইবে। অথচ তিনি শুধুমাত্র আইন ব্যবসায়ের দ্বারাই অতি সহজে কোটি কোটি টাকার সম্পদ গড়িতে পারিতেন। যদি তাঁহার মতো এত বড় ব্যক্তিত্বশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা কোন উন্নত দেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি যুগের পর যুগ ক্ষমতার উচ্চতর শিখরে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি যে এ-দুর্ভাগা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৪। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বরের *ইত্তেফাকে* এ-লেখাটি পুনঃমুদ্রিত হয়।

শহীদ চরিত্রের অজানা দিক

যুগে যুগে দেশে দেশে জাতির কর্ণধাররূপে জাতীয় ইতিহাসে যুগমানবরূপে যাঁদের আবির্ভাব হয়, সেই যুগস্রষ্টা মহর্ষিদের কর্মময় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ জাতীয় জীবনে বিরাট পাথেয় হয়ে বিরাজ করে। ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা সাধারণ মানুষ নন, তাঁরা অতিমানব। তাঁদের গোটা জীবনের নিরলস সাধনা জাতির অমূল্য সম্পদ। চলার পথের মন্ত্রণা। জাতীয়তাবোধের প্রেরণা। এক কথায়, তাঁরা জাতির গৌরব। অনুন্নত, পশ্চাদপদ বা উপনিবেশবাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত সর্বহারাদের এঁরা মুক্তিত্রাতা মহামানব। দেশে দেশে এঁদেরই ব্যক্তিজীবনের ত্যাগ ও বিরামহীন সংগ্রাম ছিন্ন করেছে পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খল, অবসান ঘটিয়েছে স্বৈরাচারী বিধি-ব্যবস্থার নাগপাশের। এঁরা সবাই বিশ্বের সর্বহারাদের অতি আপনজন আর প্রতিক্রিয়াশীলদের ত্রাস। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপবাদকে তাঁরা বরণ করেছেন আশীর্বাদ হিসেবেই।

আমি আজ এমন এক মহান নেতার কর্মময় জীবনের কিছু অংশ এই ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যক্ত করার প্রয়াস পাচ্ছি, যাঁর নিরলস পরিশ্রম ও কঠোর সাধনায় আমরাও পরাধীনতার রেড়ি ছিন্ন করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। তিনি আমাদের মহান নেতা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। আজ হতে দুছর আগে এই মহান নেতা জাতির এক মহা দুর্দিনে এ দেশের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষকে শোক ও হতাশার মহাসাগরে ভাসিয়ে মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর প্রিয় দেশবাসী জাতির সেই মহাসঙ্কট মুহূর্তে যখন একান্তভাবেই মাতৃভূমির বুকে তাঁর উপস্থিতি কামনায় আকুল আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে, ঠিকই সেই মুহূর্তেই বিনা মেঘে, বজ্রাঘাতের মতো তাঁর মহাপ্রায়াণের সংবাদে গোটা জাতি হতাশায় মুষড়ে পড়ে। লক্ষ-কোটি মানুষের বুকফাটা কান্নায় সেদিন দেশের আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। নেতার মহাপ্রয়াণে জাতি মুষড়িয়ে পড়লেও তাঁর সংগ্রামী জীবন জাতিকে ফিরিয়ে দেয় সম্বিৎ– নতুন করে তারা শপথ নেয় মরহুম নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলবার।

সোহরাওয়ার্দীতে ছিল বহুমুখী প্রতিভার এক অপূর্ব সমন্বয়। দেশপ্রেম, মানব-প্রেম আর জাতি-প্রেমই ছিল তাঁর জীবনদর্শন। যাঁরা তাঁকে দূর হতে দেখেছেন, তাঁদের পক্ষে সোহরাওয়ার্দী-চরিত্রের গভীরতা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আমি জীবনের একটানা সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর নেতার সংস্পর্শে ছিলাম।

তাঁর ব্যক্তি-জীবনের বহু ঘটনা আছে, যেগুলি থেকে তাঁর জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গভীরভাবে জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

সোহরাওয়ার্দী এমন এক মানুষ ছিলেন যাঁর প্রকৃত জীবন-চরিত লিখলে সে হবে এক মহাগ্রন্থ। আমি শুধু তাঁর জীবনের একটা দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

দাতা সোহরাওয়ার্দীকে সমাজে কয়জন জানেন? অথচ এটাই ছিল রাজনীতিক বলে পরিচিত সোহরাওয়ার্দী চরিত্রের একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। তিনি যা দান করতেন, তা কারও গোচরে করতেন না, এমনকি তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহরচদের অনেকেও তা জানতেন না। তাঁর

একান্ত কাছের মানুষ হিসেবে তাঁর এই দানের ছিটে-ফোঁটা পরিচয় পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সে ছিটেফোঁটা থেকে প্রকৃত সমুদ্রের আঁচ করা কঠিন নয়।

পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার হিসেবে সোহরাওয়ার্দী প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। সঞ্চয়ের আসক্তি তাঁর জীবনে কোনকালেই ছিল না। কোন অসহায় মানুষ তাঁর কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে শূন্য হাতে ফিরে এসেছে– এমনটা কখনও দেখি নি। জাতি-ধর্ম-বর্ণের কোন ভেদাভেদ তাঁর কাছে ছিল না। মানুষকে তিনি দেখেছেন মানুষ হিসেবেই। তাই, পরিচারক হয়েও শিবুর স্থান ছিল তাঁর সংসারে অনেক উচ্চে। শিবুর বাড়ি ছিল উড়িষ্যায়। সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর শিবু শহীদ সাহেবের সেবা করেছে। শহীদ পরিবারে শিবুর প্রভাব ছিল অসামান্য। শহীদ সাহেব যখন কলকাতা হতে পাকিস্তানে চলে আসেন, তখন নিজ আসবাবপত্র ছাড়াও শিবুকে প্রচুর অর্থ দিয়ে আসেন। কলকাতায় থাকাকালীন তাঁর ড্রাইভার বার্ধক্য হেতু চাকরি হতে বিদায় নিলে শহীদ সাহেব তাকে নিয়মিত পেনসন দিতেন। তার বাড়ি ছিল বিহারের আরা জেলায়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন অবিভক্ত বাংলার সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী, তখনকার একটি ঘটনা। নিজ ডেস্কে বসে একদিন তিনি ওই দিনের ডাক দেখছেন। এক খানা পোস্টকার্ড তুলে নিয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ দেখি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। কারণ জিজ্ঞেস করতেই বললেন, আমাকে এক্ষুণি একবার বেরুতে হবে খিদিরপুরের দিকে। কথা শেষ না হতেই ডেস্ক ছেড়ে সোজা উঠলেন গিয়ে গাড়িতে। মুখটা তাঁর ম্লান। কিছুই বুঝছি না। থিয়েটার রোড থেকে বেরিয়ে কলকাতার বিভিন্ন রাজপথ মাড়িয়ে আমরা খিদিরপুর পৌছলাম। নেতা নিজেই ড্রাইভ করছেন। হঠাৎ দেখি, গাড়িটা মোড় নিচ্ছে একটা গলির দিকে। ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক ঠেকছে। কিছুক্ষণ পরই দেখি আমরা ওয়ার্ডগঞ্জ শ্রমিক বস্তিতে। শহীদ সাহেবকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই সারা বস্তি যেন ভেঙে পড়ল নিমেষে। জনারণ্যে তিনি হারিয়ে গেলেন। ওদের শত কথার মধ্যেও শহীদ সাহেব কেমন যেন অন্যমনস্ক। একটা লোকের নাম করে উনি জানতে চাইলেন, তার 'ঘরটা' কোথায়। সারা বস্তির লোক এবার শহীদ সাহেবকে যেন স্রোতের মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলল। একটা অতি নোংরা ঝুপড়ির কাছে এসে সবাই আমরা থামলাম। বস্তিবাসীদের বাইরে দাঁড়াতে বলে শহীদ সাহেব মাথা নিচু করে ঢুকলেন সেই ঝুপড়িতে। সামনেই মাটিতে পাতা মাদুরের উপর রোগ-জর্জরিত এক বৃদ্ধকে দেখে ব্যাপারটা আমার কাছে এবার অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এলো। কিন্তু আমার মনের এতক্ষণকার সব প্রশ্ন যেন ভিড় করল সকল বস্তিবাসীর মনে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। শহীদ সাহেব জানতে চাইলেন, কবে থেকে বৃদ্ধের এই অবস্থা, এতদিন কেন তাঁকে জানান হয় নি, প্রভৃতি। আর বেশি কথা না বলে লোকটিকে তিনি গাড়িতে তুলে নিলেন। ভৎর্সনা করলেন বস্তি-বাসীদের, কেন তারা বৃদ্ধের এই অবস্থার কথা তাঁকে জানায় নি। বস্তিবাসী সলজ্জবদনে দাঁড়িয়ে রইল আর শহীদ সাহেব বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে পড়লেন বস্তি থেকে। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল। হাসপাতালে গিয়ে বৃদ্ধকে শুধু ভর্তি করাই নয়, তার চিকিৎসার যাতে কোন রকমের ত্রুটি না হয়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে কড়া নির্দেশ দিয়ে বৃদ্ধের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। তার পর ফিরে এলেন থিয়েটার রোডে নিজ বাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে এই প্রথম তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন, 'মুজিব, তুমি যেন কি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে।' জবাব দিলাম, কখন স্যার! বললেন, 'আমি যখন ডেস্কে ডাক দেখছিলাম।' বললাম, একখানা পোস্টকার্ড পড়তে পড়তে আপনি হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে

পড়লেন কি-না, তাই তার কারণ জানতে চেয়েছিলাম। বহুদূরের কোন চিন্তারাজ্য থেকে যেন তিনি জবাব দিলেন, 'ওই বৃদ্ধ আমার কাছে তার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা চেয়েছিল। কিন্তু শুধু টাকায় কি ওর চিকিৎসা হয়!'

বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে যাদবপুর হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ রোগীকেই বহন করতে হতো। বৃদ্ধের চিকিৎসার ভার তাই শহীদ সাহেব নিজেই নিয়েছিলেন, আর তার রোগমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সে খরচ তিনি বরাবর বহন করে এসেছিলেন।

বস্তুত, শহীদের মানসিকতার সত্যিকার পরিচয় এইখানেই। উচ্চ-নিচ ভেদাভেদের উর্ধ্বে থেকে সমাজের নিচতলার মানুষের প্রত্যক্ষ সেবায়, বিপদের দিনে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর এ ধরনের ঘটনা শহীদ সাহেবের জীবনে এই নতুন নয়। এমন হাজারো ঘটনায় তার জীবন সমৃদ্ধ।

১৯৪৩ সালের কথা। শহীদ সাহেবের ঘরে বসে আছি। বিছানার ওপর একটা 'কালো খাতা' নজরে পড়ল। এমনিতেই সেটা নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছি। দেখি, কেবল কতকগুলো লোকের নাম আর ঠিকানা। আর তার পাশে একটা করে টাকার অঙ্ক লেখা। একুনে সাড়ে তিন হাজার টাকার মতো। প্রশ্নের জবাবে নেতা জানালেন, ওরা অত্যন্ত বিপন্ন, তাই ওদেরকে মাসে মাসে 'পেনসন' দিয়ে উনি বাঁচিয়ে রাখছেন। বললাম, মাসে মাসে নিয়মিতভাবে এতটাকা আপনি যাকে-তাকে পেনসন দিয়ে যাচ্ছেন, তার কারণ? সোজা জবাব না দিয়ে করুণ একটা হাসি হেসে বললেন, দেশের অবস্থা তো জান না। ও তালিকা তো আমার দিন দিন বাড়ছে। ভাবছি, কবে ওদের একটা হিল্লা করতে পারব।

এমন একটা মারাত্মক বোঝাকেও তিনি অত সহজ করে দেখছেন কি করে, ভেবে অবাক হলাম। বুঝলাম, এ কেবল শহীদ সাহেবেই সম্ভব।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে, শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। সোনার চামচ মুখে নিয়ে বিরাট ঐতিহ্যমণ্ডিত সোহরাওয়ার্দী পরিবারে যাঁর জন্ম, সমাজের উপর তলার মানুষদের মধ্যেই তাঁর আনাগোনা হওয়ার কথা। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিল তার ব্যতিক্রম। তাই, ব্যারিস্টারি পাস করে কলকাতায় ফিরে এসেই তিনি আরামের জীবন বেছে না নিয়ে সমাজের নিচু তলার মানুষের সেবায়ই নিজেকে নিয়োজিত করেন। কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করে যা কিছু উপার্জন করতেন, ব্যয় করতেন তা বস্তি এলাকার সহায়-সম্বলহীন অধিকারহারা শ্রমিকদের পিছনে।

বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ শাসনের ভরা যৌবনে ভারতের কোথাও শ্রমিক সংগঠন দানা বাঁধতে পারে নি সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে। অবিভক্ত বাংলায়ও এই অবস্থার ব্যতিক্রম ছিল না। তথাকথিত নেতৃত্বের নামে এক শ্রেণীর স্বার্থ সন্ধানী মানুষ তখন অসহায় শ্রমিকদের স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের ভাগ্য গড়ে চলেছিল। কলকারখানার শ্বেতাঙ্গ মালিকদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের কোন আন্দোলন করা, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা অথবা ধর্মঘট করার অধিকার ছিল না। শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন বলতে কিছুই তখন ছিল না, যার ফলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সামান্যতম আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার তুচ্ছ অজুহাতে ছাঁটাই চলত নির্বিচারে। মিথ্যা মামলায় আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হতো পাইকারি হারে। এই সব কারণে দীনতার বোঝায় পিষ্ট শ্রমজীবীরা শত লাঞ্ছনা ভোগ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহস করত না।

শ্রমিক সমাজের সেই ঘোর দুর্দিনে তরুণ ব্যারিস্টার সোহরাওয়ার্দী শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম দফায় তিনি "ঘোড়াগাড়ি ইউনিয়ন", "গরুর গাড়ি ইউনিয়ন", "খানসামা ইউনিয়ন", "সি মেনস ইউনিয়ন", "বাস ড্রাইভার ইউনিয়ন", "ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউনিয়ন", "জুট শ্রমিক ইউনিয়ন"সহ কতিপয় শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে তার পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। এই সব শ্রমিক সংস্থার অফিস ছিল শহীদ সাহেবের বাসায়। শ্রমিক সদস্যদের গতিবিধি ছিল সেখানে অবাধ। শ্রমিকদের তিনি এমনই আপনজন বলে মনে করেছেন যে, তাদের কোন ব্যাপারেই কখনো তিনি বিরক্ত প্রকাশ করেন নি। শ্রমিকদের সাথে তিনি সকাল-দুপুর-রাত্রি নির্বিশেষে সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, শ্রমিক-মালিক বিরোধে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের তিনি নিজে আর্থিক সাহায্য যুগিয়েছেন। শ্রমিকদের কাছ থেকে কোনরূপ চাঁদা গ্রহণ না করে নিজ উপার্জিত অর্থেই তিনি শ্রমিক আন্দোলন চালিয়েছেন। ব্যারিস্টারি করে উপার্জিত অর্থ এই পথে খরচ করার মধ্যে তিনি অপার আনন্দের সন্ধ্যান পেতেন। রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে শ্রমিক আন্দোলনে এভাবে জড়িত ছিলেন বলেই শহীদ সাহেব শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ এবং তার প্রতিকারের আইনসম্মত বিধি-ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন সর্বাধিক। তারপর ১৯৩৮ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে শ্রমমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণের পর প্রথম সুযোগে শহীদ সোহরাওয়ার্দীই সর্বপ্রথম শ্রমিক আইন পাস করেন। সে আইন আজ বলবৎ আছে। বলা বাহুল্য, সেই হতেই এদেশে শ্রমিক সংস্থার রেজিস্ট্রেশন কার্যকরী হয়।

শহীদ সাহেবকে অনেকে অনেক সময় হিন্দুবিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কথা কেবল তাঁর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীরাই প্রচার করতেন। প্রকৃত পক্ষে শহীদ সাহেব কখনও কোন সম্প্রদায়-বিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে হিন্দুবিদ্বেষের নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। শহীদ সাহেব ছিলেন মানুষের নেতা। তিনি যে-ভাবে সাবইকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন, এমনটা আর কারও মধ্যে দেখি নি। মানুষকে তিনি মানুষ হিসেবেই দেখেছেন। বিভিন্ন সময়কার সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সময় তিনি যেমন মুসলমান দুর্গতদের উদ্ধার করেছেন, তেমনি তিনি হিন্দু দুর্গতদেরও উদ্ধার করেছেন। বহু ধরনের বহু ঘটনা আমার জানা আছে। শহীদ সাহেবের এমন অনেক ব্যক্তিগত হিন্দু বন্ধু ছিলেন বা আছেন– যাঁরা তাঁর ব্যক্তিসত্তার আসল রূপ জানতেন। শহীদ সাহেব যদি সত্যই হিন্দুবিদ্বেষী হতেন তাহলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সকলকে ছেড়ে তাঁকে তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী করতেন না, হিন্দু-মুসলিম চুক্তিও স্বাক্ষরিত হতো না এবং কলকাতা করপোরেশনের ডেপুটি মেয়রের পদে শহীদ সাহেব নির্বাচিত হতে পারতেন না। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে শহীদ সাহেবের হৃদ্যতাও কারও অজানা নেই।

কলকাতার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে কেউ কেউ শহীদ চরিত্রে এই কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের এ অপপ্রচার যে কত মিথ্যা, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধী নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। বিভাগোত্তর যুগে সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশে যে ব্যক্তির স্কন্ধে ভর করে গান্ধীজী তার সাম্প্রদায়িক শান্তি মিশন চালিয়েছেন, সে ব্যক্তিটি কোনও হিন্দু ছিলেন না, সে ব্যক্তি ছিলেন জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। দিল্লির বিড়লা ভবনের যে আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজী নিহত হন, তাদের লক্ষ্য যে শহীদ সাহেবও ছিলেন, গান্ধীহত্যা মামলার রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যেই তার প্রমাণ মিলে। বস্তুত, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে গান্ধীজীর আন্তরিকতায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে, সাম্প্রদায়িক শান্তি মিশনে গান্ধীজী যদি কায়া হন, তবে শহীদ সাহেব ছিলেন তার ছায়া। যে সমস্ত মহৎ গুণে মহান

ব্যক্তিদের জীবন মহিমান্বিত, সেই সব গুণেরই অধিকারী ছিলেন শহীদ সাহেব। রাজনৈতিক জীবনে প্রতিপক্ষের প্রত্যক্ষ দুশমনদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখা যায় নি তাঁকে। বরং, প্রতিপক্ষকে ক্ষমা প্রদর্শনই ছিল তাঁর ধর্ম। তিনি ছিলেন স্বচ্ছ রাজনীতিতে বিশ্বাসী, গণতন্ত্র আর ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর জীবনাদর্শের মূল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র। ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সোহরাওয়ার্দী যদি ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করতেন, তাহলে তিনি পাকিস্তানে একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। এই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ যদি ইউরোপের মতো স্বচ্ছ রাজনীতির দেশে জন্ম নিতেন, তাহলে আজীবন তিনি সে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দেশের সেবা করতে পারতেন। জাতি যখন তাঁর নেতৃত্ব কামনায় মন-প্রাণ দিয়ে উন্মুখ, ঠিক সেই সময়েই আমরা তাঁকে হারালাম। সে মুহূর্তে জাতির অশ্রুবিসর্জন ছাড়া আর কি-ই বা করণীয় ছিল!

এদেশ, এদেশের মানুষ, এদেশের আকাশ-বাতাস শহীদ সাহেব তাঁর জীবনের চেয়েও ভালোবাসতেন। শহীদ সাহেব বাংলার মাটিতে জন্মিয়েছেন। বাংলাই ছিল তার প্রিয় জন্মভূমি। তাই, মৃত্যুর পর এই মাটির মায়া তিনি কাটাতে পারেন নি। আর মহাপ্রয়াণের পর তাই এই মাটির বুকেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে। অভিমানভরে দূরে-বৈরুতের মাটিতে সরে থাকতে তিনি পারেন নি। তাঁর মাজার আজ আমাদের পবিত্র তীর্থ।

প্রাচুর্যের মোহ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কোনদিনই ছিল না। ইচ্ছা করলে তিনি একমাত্র আইন ব্যবসায়েই অগাধ সম্পত্তির মালিক হতে পারতেন। তিনি তা চান নি। হনও নি। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর জাতি দেখেছে সারা জাতির চিত্ত জুড়ে যাঁর বাস, মৃত্যুকালে তিনি ১৩ হাজার টাকা ঋণ রেখে গিয়েছেন। শহীদ সাহেব দুবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার্থে ইউরোপে গিয়েছেন। বলতে আপত্তি নেই, এই প্রতিবারেই তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ের মোটা অংশই চাঁদা থেকে সংগ্রহ করা হয়। শহীদ সাহেব ইচ্ছা করলে তাঁর একমাত্র পুত্র রাশেদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে শিল্পপতি করে রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু আজ রাশেদের পড়ার খরচ শহীদ সাহেবের কন্যাকে বহন করতে হয়। জাতির দুর্ভাগ্য যে, এহেন অনন্যসাধারণ মহাপুরুষকেও রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। হয়ত সেই অভিমানেই জীবদ্দশায় তিনি আর দেশে ফিরে আসতে চান নি– আসেনও নি। আজ শহীদ সাহেব আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আছে তাঁর আদর্শ, আছে তাঁর বাণী, আর আছে তাঁর দেওয়া পথ-নির্দেশ। তাঁর রাজনৈতিক জীবনদর্শন আমাদের জাতীয় জীবনের মহা সম্পদ। তাঁর আদর্শ আমাদের মুক্তির প্রেরণা। শহীদ সাহেব দশ বছর আগে যা কিছু বলে গেছেন, তা তখনও সত্য ছিল, আজও সত্য, ভবিষ্যতেও সত্য হয়ে থাকবে। তাঁর সে বক্তব্য হলো জনগণের সার্বভৌমত্ব, নির্ভেজাল গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। জাতীয় জীবনে এ সত্যের বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ দেশবাসীর।

সূত্র : *ইত্তেফাক, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৫

স্মৃতির মিছিল : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

অগুণতি উজ্জ্বল ঘটনার স্মৃতি। অফুরান কাহিনীর মিছিল।

স্মৃতি যদি হয় এমন এক জনের যাঁর গোটা জীবন একটি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর কথক যদি হন এমন আর একজন যিনি, এই ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ অংশীদার, সেই মহৎ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গতম পরিচয়ের গৌরবাধিকারী তবে অসংখ্য কথার শেষেও মনে হয় যেন, কিছুই বলা হলো না।

মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে বলছিলেন তাঁর সুযোগ্য রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী শেখ মুজিবুর রহমান দৈনিক পাকিস্তানের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে। অনেক কথা। দীর্ঘ ইতিহাস। শেখ সাহেব বললেন, তাঁর কথা আমি বলতে পারিনে সহজ কণ্ঠে অথবা নিস্পৃহ সুরে। শহীদ সাহেবের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আবেগ আমার ভাষাকে জড়িয়ে দেয়, ভারাতুর স্মৃতি কান্নায় ভরে দেয় দুই চোখ। তাঁর সঙ্গে আমি এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম, তিনি আমাকে এতখানি ভালোবাসতেন যে, অনেকে ঠাট্টা করে বলতেন, আমার প্রতি শহীদ সাহেবের মনোভাব পক্ষপাতিত্বমূলক।

কিন্তু তা সত্য নয়। শেখ সাহেব স্বগতোক্তির মতো করে বললেন। সর্গীয় নেতার কাছ থেকে এই আস্থা তিনি অর্জন করেছিলেন দুর্লভ কর্মনিষ্ঠায়, অবিচল আনুগত্যে। কোন রাজনৈতিক প্রশ্নে ভিন্ন মত থাকলে আমি নিঃসঙ্কোচে তা বলতাম, সময় সময় তর্কও হতো কিন্তু তিনি যখন কোন আদেশ করতেন, নির্দেশ দিতেন আমি তা সব সময় পালন করতাম। সংগঠনের বহু অর্থ ব্যয় হতো আমার হাত দিয়ে কিন্তু শহীদ সাহেব কখনও হিসেব চাইতেন না। তিনি জানতেন, আমার হাত দিয়ে অর্থের অপচয় হবে না। আমার উপর তাঁর আস্থা ছিল অপরিসীম।

তিনি আমাকে নিজের হাতে গড়তে চেয়েছিলেন, শেখ সাহেব বললেন, শহীদ সাহেব আমাকে রাজনীতি পাঠ দিতেন সযত্নে। প্রথমবার যখন আমি পার্লামেন্টে ভাষণ দেই, তখন তাতে জনসভার সুর প্রাধান্য পেয়েছিল। অধিবেশন শেষে শহীদ সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, 'মুজিব, তোমার বক্তৃতায় এখনও পল্টনের ধ্বনি। এখানে কথা বলবে, আস্তে, ধীরে, নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে।' সেদিনের কথা মনে করে শেখ মুজিব হাসলেন উদারকণ্ঠে।

সংগঠক সোহরাওয়ার্দী

কথায় কথায় শেখ মুজিব ফিরে গেলেন পুরনো দিনগুলোতে। ডুব দিলেন স্মৃতির উজ্জ্বল সমুদ্রে। বললেন, তাঁর মতো এমন নিপুণ সংগঠক আমি আর দেখি নি। বাংলাদেশে মুসলিম লীগকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এই কাজে তিনি বিশ্রাম জানতেন না। আজ এখানে, কাল ওখানে। সার্বক্ষণিক তৎপরতা। এমনও দিন গেছে এক মাঝির নৌকায় করে নদী পথে আমরা পাড়ি দিয়েছি মাইলের পর মাইল। চড়েছি ঘসী নৌকায়। শহীদ সাহেব কখনও এসে নৌকার হাল ধরতেন কখনও বাইতেন দাঁড়। আমরা

ভাবতাম আজন্ম শহুরে পরিবেশে অভিজাত পরিবারে লালিত এই মানুষটি গ্রামের দীন-দরিদ্র পটভূমিতে মিলিয়ে নেবেন কি করে, তিনি থাকবেন কোথায়, খাবেন কি করে? কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর সহজ আত্মীয়তা। গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে তাঁর একটুও কষ্ট হতো না। তিনি খেতেন মাছ-ভাত। ভালোবাসতেন কাঁচা-লঙ্কা আর মুড়ি। তাঁর জন্যে আলাদাভাবে চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করলে শহীদ সাহেব রাগ করতেন। এই নিষ্ঠা, শ্রম এবং মানুষের জন্যে ভালোবাসার জোরেই তিনি বাংলাদেশে মুসলিম লীগ সংগঠন দৃঢ়-ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এই সংগঠনের জন্যই পাকিস্তান আন্দোলন সফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। নিজের দৃষ্টান্তে তিনি তৈরি করেছিলেন অসংখ্য নিষ্ঠাবান কর্মী ও অনুসারী।

কর্মীদের জন্যে মমতা

রাজনৈতিক সংগঠক হিসাবে মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা বলতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখ করলেন, তাঁর চরিত্রের একটি বিশিষ্টতার কথা। শহীদ সাহেবের প্রতি কর্মীদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা যেমন ছিল অপরিসীম তেমনি তাদের জন্যও তাঁর ভালোবাসা ছিল অগাধ। তিনি সময় সময় কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন, কুশল সংবাদ নিতেন প্রতিজনের। কেউ কোন অসুখে অথবা বিপদে পড়লে তিনি প্রসারিত করে দিতেন তাঁর উদার হাত। কিন্তু তাঁর সাহায্যের কথা বাইরের কেউ জানত না। জনসাধারণের অগোচরে দুঃস্থের কাছে পৌছে যেত তাঁর দান। শেখ সাহেব একাধিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বললেন, আন্দোলনের সময় বহু কর্মী টিবি আক্রান্ত হয়েছে, বিপদে পড়েছে, শহীদ সাহেব গিয়ে দাঁড়িয়েছেন পাশে। দূর গ্রাম থেকে সামান্য একটা পোস্টকার্ডে দু-ছত্র লিখে কেউ সাহায্যের আবেদন জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাতে সাড়া দিতেন। কাউকে তিনি অবজ্ঞা করতেন না।

শেখ সাহেব বললেন, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা রাজনীতিতে এসে প্রায়ই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পরিবারের একমাত্র ভরসা একটি ছেলে, রাজনীতি করতে এসে হয়ত তার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেল সরকারি রোষে পড়ে। এই ঝুঁকি নিয়ে তাই সইজে কেউ রাজনীতিতে আসতে চায় না, অনেকে পথ ছেড়ে চলে যায় হতাশ হয়ে। কিন্তু শহীদ সাহেব সব সময় এইসব কর্মীদের পাশে দাঁড়াতেন, সাহায্য করতেন, সমর্থন দিতেন। তাঁর চরিত্রের আরও একটা গুণ, তিনি সবাইকে বড় হওয়ার সুযোগ দিতেন, তিনি চাইতেন কর্মীরা নেতৃত্বের সারিতে এসে দাঁড়াক। সাধারণতঃ নেতাদের মধ্যে যে রক্ষণশীলতা অথবা নেতৃপদ আঁকড়ে থাকার প্রবণতা দেখা যায় মরহুম সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। সাধারণ কর্মীর মধ্যে নেতৃত্বের গুণ বিকশিত করে তোলার জন্যে তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন।

ব্যক্তি বনাম সংগঠন

এই কারণে শেখ সাহেব বললেন, শহীদ সাহেব যেমন রেখে গেছেন তাঁর নীতি ও আদর্শ তেমনি সৃষ্টি করে গেছেন এক মজবুত সংগঠন তাঁর আদর্শকে সামনে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। শেখ সাহেব বললেন, সংজ্ঞাহীন, অসংগঠিত জনসমর্থন বেশিদিন স্থায়ী হয় না, সংগঠন ছাড়া রাজনীতিতে কেবল ব্যক্তির ভূমিকা অসম্পূর্ণ। শহীদ সাহেব ছিলেন দুটোরই অধিকারী। তাঁর যেমন ছিল জনপ্রিয়তা তেমনি ছিল সংগঠন। এই কারণে আজও গ্রাম-গ্রামান্তের ঘরে ঘরে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

শ্রমিক আন্দোলন

শেখ মুজিব বললেন, আমাদের শ্রমিক আন্দোলন তাঁর অবদান। শ্রমিকদের স্বার্থে, তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠন ও আন্দোলনের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টিরও বহু আগে, তখন কলকাতার আশেপাশের খিদিরপুর, কাশীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শ্রমিকরা মোটেও সংগঠিত ছিল না। তিনি নিজের উদ্যোগে সে সব অঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলেন। গরুগাড়ি চালক, রিকশাওয়ালা, খানসামা, নাবিক প্রভৃতি প্রতিস্তরের শ্রমিকের জন্য তাঁর ঘরের দুয়ার ছিল অবারিত। তখন কলকাতার এমন কোন বস্তি ছিল না যেখানে তাঁর সমর্থক ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থায়। বলতেন, এক দল মানুষ খাবে আর একদল উপোষ করবে এই অবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।

সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য শহীদ সাহেব কখনও পরোয়া করতেন না। নিজে যা সত্য বলে বুঝতেন তাই তিনি ব্যক্ত করতেন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে। কর্মীদের মনে কখনও তিনি মিথ্যা আশা সৃষ্টি করতেন না, রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পুরোপুরিভাবে বাস্তবনিষ্ঠ। তিনি বলতেন, একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাও, ফলের প্রত্যাশা কর না।

শেখ সাহেব আলো ফেলছিলেন শহীদ সাহেবের ঘটনাবহুলসম্পন্ন জীবনের এক-একটি দিকের উপর। রাজনীতির কাজকর্ম সেরে গভীর রাতে বই নিয়ে বসতেন শহীদ সাহেব। ইংরেজি ভাষায় ছিল তাঁর অসামান্য দখল। কিন্তু হাতের কাছে সব সময় মজুত থাকত একটা অভিধান। বলতেন, মানুষের শেখা কখনও শেষ হয় না, যা পারি জেনে নেই। শহীদ সাহেব ছিলেন সর্ব-গুণান্বিত। আইন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, রাজনীতির ক্ষেত্রে অপরাজেয়, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য, পার্লামেন্টারিয়ান রূপে অদ্বিতীয়। কিন্তু ছোটখাট কাজেও তাঁর দক্ষতা ছিল আশ্চর্যজনক। পথে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল, তিনি নিজেই লেগে যেতেন মেরামত করতে। ঘড়ি আর ক্যামেরা সারাতেন নিজের হাতে, প্রয়োজন পড়লে বসে যেতেন টাইপ-রাইটার নিয়ে। আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব।

শেখ মুজিবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজকের দিনে, দেশের মানুষ যখন গণতন্ত্রের স্বপ্নে উজ্জীবিত তখন শহীদ সাহেবের জীবনের কোন শিক্ষা আমাদের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

শেখ সাহেব বললেন, তিনি ছিলেন একজন খাটি গণতন্ত্রী। নিজের জীবনে, সংগঠনে এবং রাজনীতিতে এই আদর্শ তিনি অনুসরণ করে গেছেন অবিচলভাবে। শহীদ সাহেব চাইতেন, দেশের সকল মানুষ তাদের অধিকার লাভ করুক। উদাহরণ দিয়ে বললেন, আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে যখন আওয়ামী লীগ রাখা হয় তখন সুদীর্ঘ নয়-দশ ঘন্টাকাল ধরে বিতর্ক চলে। শহীদ সাহেব ধৈর্য ধরে প্রতিটি বক্তার কথা শুনেছেন এবং তাদের মতামতকে পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন।

তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ মানতেন না যদিও নিজের জীবনে শহীদ সাহেব ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। ১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গার সময় মুসলমানদের জানমাল রক্ষার জন্য তিনি যা করেছিলেন, সে ইতিহাস সুবিদিত। কিন্তু বহু বিপন্ন হিন্দু পরিবারকেও তিনি উদ্ধার করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন।

যদি দেশের কাজে না লাগি ...

সোহরাওয়ার্দীর জীবনের অন্তিম অধ্যায়ের কথা বলতে গিয়ে বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর। বললেন, মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে, আত্মীয় পরিজনহীন অবস্থায় তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। তিনি তাঁর জনগণের সমর্থনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই জন্য তাঁকে জেলে পাঠান হয়েছে। তাঁর কর্মীদের কারারুদ্ধ করা হয়েছে। দেশের জন্যে তাঁর ত্যাগ সর্বোচ্চ।

মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে বিদেশ থেকে শেখ মুজিবের কাছে চিঠি লিখে খেদোক্তি করেছিলেন, বেঁচে আর কি করব দেশের কাজে যদি না লাগলাম। যে মানুষকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন তাদের পাশে ফিরে আসতে পারলেন না তিনি জীবিতাবস্থায়। শেখ মুজিব বললেন, মৃত্যুর মাঝে তাঁর আত্মা চিরশান্তি লাভ করেছে। আজ দেশের এই অবস্থা দেখলে তাঁর মনোভাব যে কি হতো আমি বলতে পারি না। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। মধ্যবিত্ত নিদারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন। চারদিকে বিরাজ করছে দুর্ভিক্ষাবস্থা। এই অবস্থা দেখলে তাঁর হৃদয় শতখান হয়ে যেত দুঃখে-বেদনায়।

তিনি বরাবর পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়াকে সামনে তুলে ধরেছেন। শেখ সাহেব বললেন, ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নেই বলে শহীদ সাহেব তা প্রত্যাখান করেছিলেন। প্রদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ তিনিই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলেই ক্রুগ মিশন গঠিত হয়। তিনি বলতেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা না হলে পূর্ব পাকিস্তান মরুভূমি হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে আমাদের সামনে প্রধান কর্তব্য। তিনি বেঁচে থাকলে ছয়-দফাকে শুধু সমর্থনই করতেন না, শেখ সাহেব বললেন, শহীদ সাহেব সম্ভবতঃ ছয়-দফার চাইতে বেশি দাবি করতেন।

সূত্র : *দৈনিক পাকিস্তান*, বিশেষ প্রতিনিধি, শুক্রবার, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯। ১৯৭২ সালের ৫ ডিসেম্বর *দৈনিক বাংলার* বিশেষ সংখ্যায় এ-লেখাটি পুনঃমুদ্রিত হয়।

আমাদের মানিক ভাই

গভীর রাত। পিভি থেকে টেলিফোনে খবর পেলাম, মানিক ভাই আর আমাদের মাঝে নেই। মনে হলো চারদিক যেন ভয়ানক ফিকা, শূন্য, একেবারেই অন্ধকার। দাউ দাউ করে জ্বলছিল যেন এক মশাল, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় চারপাশ ঝলমল, নাট্যশালার মহাসমারোহ; সব থেমে গেল।

এ যেন মুহূর্তের অনুভূতি। একটি সংবাদ, একটি বার্তা, মাত্র একটি ঘটনা যে কতবড় হৃদয়বিদারক হতে পারে, কত বেশি মর্মান্তিক হতে পারে, তারই প্রমাণ।

পর মুহূর্তে আমার মানসে ফুটে উঠল দূর অতীত। ১৯৪৩ সন। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনে কলকাতায় তাঁর সাথে আমার পরিচয়। একই নেতার দুই শিষ্য, যেন একই পিতার দুই সন্তান। বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে কোনদিনই আমরা বিচ্ছিন্ন হই নি, কোন ঘটনা আমাদের মধ্যে বিভেদ টানতে পারে নি। নেতা মারা যাবার পরেও আমরা এক ও অভিন্ন ছিলাম। বর্ষার মেঘরাজির ন্যায় তাঁর অপার স্নেহ সর্বক্ষণ আমাকে ঘিরে থাকত। বিশাল বারিধির ন্যায় তাঁর প্রশান্ত বিপুল বক্ষে আমার ঠাঁই হয়েছিল। কোন ষড়যন্ত্র, কানকথা, নিন্দাবাক্য সেখান থেকে আমাকে দূরে ঠেলে দিতে পারে নি। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল আবেগমিশ্রিত, হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির রসে সিক্ত। মানিক ভাইর ভালোবাসার কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না।

আজ মানিক ভাই সম্পর্কে লিখতে বসে আমার কলম বার বার থেমে যাচ্ছে, আমার ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, হয়ত ভাববার ক্ষমতাও। তবুও মানিক ভাই সম্পর্কে আমার যেটা ব্যক্তিগত অনুভূতি, তা আমি প্রকাশ করব।

মানিক ভাইর কর্মময় জীবনের পরিধি খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাঁর সাথে আমার পঁচিশ বছরের পরিচয়ের ইতিহাস এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, আলোড়ন-আন্দোলন, অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলা ও পরবর্তীকালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মানিক ভাইর আসন দর্শকের গ্যালারিতে ছিল না। দূরত্ব বজায় রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক বলে তিনি আরাম-আয়েশ ভোগ করেন নি; বিপদসংকুল দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছেন। নিজ জীবনের ঝুঁকি এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের মারগুলো মাথায় পেতে নিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ত্যাগব্রতী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিমূর্ত দেশ প্রেমিকতা, স্বাদেশিকতা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। গণশক্তির উপর ছিল তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। নিয়মতান্ত্রিক গণ-অভ্যুত্থানকে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ছিলেন ইবনে খালেদুন ও রুশোর প্রকৃতিদত্ত মানব স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের জাগ্রত চিন্তাবাহী, লিংকনের "Government of the people, by the people, and for the people"-এর পূজারি, প্রকৃতি প্রদত্ত বৈচিত্র মেনে নিয়ে "সব মানুষ সমান" এই তত্ত্ববাদে

বিশ্বাসী। নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন। একান্ত কঠিন ও নিতান্ত অনমনীয়। পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় অটল। কায়েমী স্বার্থের নিক্ষিপ্ত শরগুলো তাঁর বক্ষে এসে ভেঙে ভেঙে পড়েছে। 'ইত্তেফাক' বারবার বন্ধ হয়ে গেছে। মানিক ভাই টলেন নি। রোগাক্রান্ত হয়ে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে দিন কাটিয়েছেন। তবু আপস করেন নি।

মানিক ভাই ছিলেন কর্মবাদী পুরুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন, কাজের মাঝেই মানুষ বেঁচে থাকে। পদের মাঝে নয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সনের নির্বাচন, '৬২র গণ-জাগরণ, '৬৫ সনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ১৯৬৬ সন ও তার পরবর্তীকালের স্বায়ত্তশাসন কায়েমের গণঅভ্যুত্থানে মানিক ভাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। কর্মী ও নেতাদের দিকনির্দেশ করেছেন। লেখনীর দ্বারা আমাদের দাবি-দাওয়াকে জনগণের দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। নিজের জন্যে কোনদিন তিনি কিছু চান নি। একটু ইঙ্গিত করলে, সামান্য আভাস দিলে, একটু পট-পরিবর্তন করলে প্রভূত ঐশ্বর্য মানিক ভাইর পায়ের কাছে এসে জমা হতো। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর একবার আমি নিজে তাঁকে আওয়ামী লীগের সভাপতি হবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, মানিক ভাই হেসে বলেছিলেন, "সংগঠন আপনাদের, কলম আমার।" প্রত্যাখানের কি অপূর্ব সুন্দর পদ্ধতি। ১৯৫৫ সনে তাঁকে গণপরিষেদের সদস্যপদ গ্রহণের জন্যে বলা হয়েছিল। তিনি সেদিনও তা গ্রহণ করেন নি। আমার জানা আছে, আইয়ুব শাসনামলে তাঁকে বহুবার উচ্চ পদমর্যাদার প্রলোভন দেখানো হয়েছে। তিনি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিছু না চেয়ে দেবার যে প্রেরণা মানুষকে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দান করে, মানিক ভাইর মধ্যে সেই তাগিদ ছিল একান্ত আন্তরিক।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি 'ইত্তেফাক' দাঁড় করিয়েছিলেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের অসহযোগিতা, অসহিষ্ণুতা, প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতা ইত্তেফাকের যাত্রাপথে কন্টক হয়ে দেখা দিয়েছিল। আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল আর একটি বড় বাধা। তাঁর সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য করবার ক্ষমতা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ ও অপ্রতুল। ইচ্ছে থাকলেও কিছু করবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। একমাত্র নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারাই তিনি 'ইত্তেফাক' বাঁচিয়ে রেখেছেন। নিজের কর্ম দ্বারা তিনি বড় হয়েছেন। উপর থেকে কেউ তাঁকে টেনে তোলেন নি।

বাংলার সবচাইতে জনপ্রিয় সাংবাদিক ছিলেন মানিক ভাই। কলামিস্ট হিসেবে খোদাপ্রদত্ত গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। সমস্যা-সচেতনতা, বাস্তবাশ্রিত আবেগ, অনুভূতির তীব্রতা, ভাষার সাবলীল গতি, বোধগম্যতা, যুক্তি-আশ্রয়ী মননশীলতা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। শক্ত বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে পরিবেশন করবার ভাষা-চাতুর্য তিনি রপ্ত করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের নির্ভীকতা ও সততা তাঁর রচনাগুলোকে প্রভাবিত করেছে। জীবনের ন্যায় লেখার মধ্যেও তিনি কোনদিন মিথ্যার প্রশ্রয় দেন নি।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল গণমুখী। জনগণের কথা বলার জন্যেই তিনি লেখনী হাতে নিয়ে ছিলেন। জনগণের ভাষায় তিনি কথা বলতেন। অলঙ্কারের বাহুল্যচমক তাঁর বিষয়বস্তুকে কোনদিন আবৃত করতে পারে নি। তিনি নিজে সৃষ্টি করেছিলেন এক নতুন সাংবাদিক ভাষা। কঠিন তাত্ত্বিক আলোচনার মাঝে রসালো গ্রামীণ গল্প ও সর্বজনপরিচিত কাহিনী সংযোগ করে তিনি তাঁর রচনাগুলোতে প্রাণসঞ্চার করতেন। শব্দ সংগ্রহ ও প্রয়োগে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ও সিদ্ধহস্ত। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলো অনেক সময় নিজস্ব আভিধানিক অর্থ ছাড়িয়ে নতুন অর্থ ব্যক্ত করত।

তিনি ছিলেন উঁচুদরের গাল্পিক। রসিয়ে গল্প বলার ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ আমি আর কাউকে দেখি না। Wit ও Humour-এর অপূর্ব সমন্বয় ঘটত তাঁর আলাপ-আলোচনায়। লেখার মধ্যেও আমরা এর প্রভাব দেখতে পাব। তত্ত্বগত তার্কিক আলোচনার পাশাপাশি সাধারণ রসালো গল্পগুলো স্থান পেয়েছে।

তাঁকে ভুল বুঝবার অবকাশ ছিল প্রচুর। যেন ক্ষ্যাপা দুর্বাশা। সব সময় যেন বিক্ষুব্ধভাব। আসলে তিনি ছিলেন ঘোর বিপ্লবী; অন্যায়, অত্যাচার, জালেম, জুলুমের বিরুদ্ধে সর্বদা খড়গহস্ত। উৎপীড়ন, নির্যাতনকারীদের প্রতি মারমুখী। অন্তরে তিনি ছিলেন কোমল। ভালোবাসা, স্নেহ, মমতার জারক রসে তাঁর মন ছিল সিক্ত। মানিক ভাই ভালোবাসতে জানতেন। প্রাণ দিয়ে তিনি ভালোবেসেছিলেন বাংলাদেশকে। এদেশের মাটিকে, মানুষকে। তারুণ্যের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন পক্ষাপাতিত্ব। তরুণ রাজনৈতিক কর্মী ও নির্যাতনভোগীদের প্রতি তাঁর ছিল অন্তরের অশেষ দরদ। শেষের দিককার লেখাগুলোকে একেবারে নিজেকে উজাড় করে তিনি ধরা দিয়েছিলেন এঁদের কাছে।

তিনি ছিলেন এক সার্বক্ষণিক প্রেরণা। অতি বড় দুর্দিনেও তাঁর উপর আমরা ভরসা রাখতে পেরেছি। কাছে গিয়ে সাহস ফিরে পেয়েছি। তিনি নিষ্ঠাবান সংগ্রামী ছিলেন। সংগ্রামীদেরকে তিনি ভালোবাসতেন।

তিনি ছিলেন ভয়ানক আবেগ-প্রবণ। তাঁর হৃদয়ের সৃজনশীল তন্ত্রীগুলো সামান্য আলোড়নে ঝঙ্কার তুলতো। অনুভূতি প্রবণ মন তাঁর ক্ষুদ্র কারণে বিস্ফোরিত হতো। আগ্নেয়গিরির ন্যায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত। এরই মধ্যে ছিল একটা যুক্তিনির্ভর মনন। যাকে তিনি আক্রমণ করতেন, আঘাত করবার জন্যে উদ্যত হতেন, যুক্তি নিয়ে, শুভবুদ্ধি নিয়ে, সৎ বাসনা নিয়ে, মানুষের কল্যাণের ইচ্ছে নিয়ে উপস্থিত হলে তার কথাই শুনতেন। ফলে তাঁর জীবনে দেখেছি এক অপূর্ব ভারসাম্য।

মানিক ভাই ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সাদাসিধে। বিলাস ও বাহুল্যকে তিনি কোনদিন কাছে ঘেঁষতে দেন নি। সামান্য আসবাবে সজ্জিত ছিল 'ইত্তেফাক' অফিসে তাঁর ব্যক্তিগত বসবার ঘরখানি। একখানা মাত্র ডেকচেয়ার; সহযোগীদের জন্যে অতি সাধারণ টেবিল, ক'খানা চেয়ার, একটা বইয়ের আলমারি। সেদিন পর্যন্ত পুরাতন একখানা ভাঙা হিলম্যান গাড়ি ব্যবহার করেছেন মানিক ভাই। ভাঙা নড়বড়ে। মাঝপথে সেটা বন্ধ হয়ে যেত। তবুও মানিক ভাই পাল্টাতে চান নি। বুড় ড্রাইভার ও পুরাতন গাড়ি তাঁকে পেয়ে বসেছিল। শুনেছি, ছেলে মেয়েরা অনেক কষ্টে শেষতক সেটাকে বিদায় করতে সক্ষম হয়েছিল।

মানিক ভাই ছিলেন ঘোর সংসারী। নিজে তিনি বাজার করতেন। মাছ কিনবার দিকে তাঁর ছিল ঝোঁক। ভাবীকেও তাঁর সাথে যেতে হতো হাটেবাজারে। ছেলে-মেয়েদেরকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। অমন স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ের পরিচয় আমি আর পাই নি।

মানিক ভাই জানতেন, কি করে ক্ষমা করতে হয়। এই গুণটি তিনি নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে মারাত্মক লোকসান ঘটিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালে তিনি ক্ষমা করে দিতেন।

সর্বোপরি মানিক ভাইকে আমরা পেয়েছি এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে। মহাকালের আবর্তন-বিবর্তনের পথে যে মশালধারী বীর সেনানীরা আপন জীবনের স্বাক্ষর রেখে যায় ইতিহাসের পাতায়, মানিক ভাই তাঁদেরই একজন। এদেশের সত্যিকার ইতিহাস যদি

কোনদিন লেখা হয়, তাহলে সেখানে মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) তাঁর সত্য আসনটি পাবেন ও অমর-অক্ষয় এক প্রজ্বলিত জ্যোতিষ্কের ন্যায় সেখানে বিরাজ করবেন।

ধন্য বাঙালি জাতি, যে তাঁকে বক্ষে ধারণ করেছিল। ধন্য বাংলার সাংবাদিক পরিমণ্ডল, যে তাঁকে নিজেদের জগতে পেয়েছিল। ধন্য আমরা সকলে যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছিলাম।

অকালে পরপারে পাড়ি জমিয়েও মানিক ভাই আমাদের সকলের মাঝে বেঁচে রইলেন।

দেশের– বিশেষ করে পূর্ববাংলার জন্য আজ এক সঙ্কটময় ক্রান্তিকাল। এ ক্রান্তিকালে মানিক ভাইর তিরোধান শুধু আমার বা আমাদের জন্য নয়, সাড়ে ছয় কোটি মানুষের জন্য এক বিরাট বিপর্যয়। আমরা পথ প্রদর্শককে হারিয়েছি। কিন্তু সেই পথের রেখা আমরা কিছুতেই মুছে যেতে দেব না। বরং, তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাঁরই পতাকা হাতে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পথ কন্টকাকীর্ণ, এতদিন যিনি ছিলেন পাশে সাহস ও ভরসার মতো, তিনিও নেই। তবু আমার একান্ত প্রার্থনা, যে পতাকা বহনের দায়িত্ব আমরা পেয়েছি, তাকে সার্থক লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার শক্তিও যেন অর্জন করতে পারি।

চিরবিশ্রামে শায়িত মানিক ভাইর স্মৃতির প্রতি এটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সূত্র : ইত্তেফাক, সোমবার, ৯ জুন ১৯৬৯

আমার মানিক ভাই

স্বাধীনতা সংগ্রামে মানিক ভাইর অবদানের কাহিনী অনেকেরই অজানা। পক্ষান্তরে, আমার ব্যক্তিগত জীবনে মানিক ভাই'র প্রভাব যে কত গভীর তা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। ১৯৪৩ সাল থেকে তাঁর সাথে আমার পরিচয়। সে পরিচয়ের পর থেকে সারাটা জীবন আমরা দু'ভাই এক সাথে জনগণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম করেছি। সে সংগ্রাম সাধনার পথের বাঁকে বাঁকে একে যে অন্যের প্রতি কোনদিন মান-অভিমানও করি নি তা নয়। তবে তা ছিল ক্ষণিকের বিভ্রমের মতো। একটা বিষয়ে আমরা উভয়েই একমত ছিলাম। এবং তা হলো, বাংলার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ভিন্ন বাঙালির মুক্তি নেই, এ বিষয়ে আমাদের মাঝে কোন দ্বিধা-দ্বন্দের অবকাশ ছিল না। আর ছিল না বলেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও দুজন দু-ফ্রন্টে থেকে কাজ করেছি। আমি কাজ করেছি মাঠে-ময়দানে আর মানিক ভাই তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর সাহায্যে।

দৈহিক অর্থে মানিক ভাই আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর স্মৃতি অনির্বাণ দীপ শিখার মতো উজ্জ্বল। আজ তাঁর এই মৃত্যুদিবসে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধীদল সংগঠনে আমাদের উভয়ের সংগ্রামের কথা ভাবতে যেয়ে আমি সবচেয়ে বেশি বেদনা-বোধ করছি। তদানীন্তন পাকিস্তানের শাসক ও কায়েমী স্বার্থী চক্র কী সুপরিকল্পিত উপায়ে এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্যের বিনাশ সাধন করতে চেয়েছিল, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিষময় করে তোলার চেষ্টা করেছিল, তা সকলেরই জানা। মানকি ভাই তাঁর লেখনীর সাহায্যে সে ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ করে তুলেছিলেন এদেশের মানুষকে। মানুষের যদি স্মৃতি বিভ্রম ঘটে না থাকে তাহলে সে-সব কাহিনী তাদের ভুলে যাবার কথা নয়। এদেশে যখন মুখ ফুটে কথা বলার অধিকার ছিল না, তখন মানুষের হয়ে মানুষের কথা বলার এবং বিরোধী দলীয় চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরার মতো কেউ ছিল না, তখন মানিক ভাই-ই তাঁর লেখনীর সাহায্যে পালন করেছেন সে গুরুভার দায়িত্ব। আর সে দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে বিভিন্নবার বিচিত্র-রকম দুর্ভোগ তাঁকে পোহাতে হয়েছে। মানিক ভাই যতবার জেলে গেছেন, শুধু রাজনৈতিক কারণে একজন সাংবাদিক বা সংবাদপত্র সম্পাদকের তত দীর্ঘ কারাবরণের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

রাজনীতি সম্পর্কে মানিক ভাই'র ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন মানুষের অধিকারের বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তখন মানিক ভাই'র মাঝে এ দেশ এবং দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা লক্ষ্য করেছি, তা আমাকে অভিভূত করেছে। মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা এবং অনুভূতির প্রখরতা এত সুগভীর ছিল যে, মানুষ কি চায়, কিভাবে সহজেই তিনি তা বুঝতে পারতেন এবং তা তুলে ধরতেন লেখনীর মাধ্যমে।

১৯৫৮ সালে আইয়ুবের মার্শাল ল' জারি হবার পর মানিক ভাইকে সামরিক আইন বলে আটক করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১৪ বছর সশ্রম

কারাদণ্ড। বলা বাহুল্য, আমিও তখন জেলে। আমাকে রাখা হয়েছে একটি নির্জন সেলে। দিন-রাত্রির দীর্ঘ দুঃসহ প্রহর একা একা যাপন করি। এমন সময় খবর পেলাম মানিক ভাইকেও গ্রেপ্তার করে আমার পার্শ্ববর্তী কক্ষে আটক রাখা হয়েছে। দুই ভাই জেলের পাশাপাশি দু'কক্ষে থাকি। কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ করার উপায় নেই। কারণ, কর্তৃপক্ষ কড়া নির্দেশ দিয়েছেন কোনক্রমেই যেন আমাদের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ না ঘটে। অবশ্য, সে কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও আমরা পরস্পরের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ করে নিয়েছিলাম। একদিন এমনি এক সাক্ষাৎকারকালে মানিক ভাই জানালেন, 'সরকার পক্ষ মানিক ভাইকে আপস করার অনুরোধ জানিয়েছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি বলেছেন?' মানিক ভাই উত্তর দিলেন, 'চৌদ্দ বছর জেল খাটতে হয় সে-ও কবুল। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপস চলে না, এ কথাই ওদের জানিয়ে দিয়েছি।' কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, 'আসলে কি জানেন, ওরা আপনার উপরই আরও অত্যাচার চালাবে। কেননা, তাদের ধারণা, আপনার উপর বাংলার মানুষের অগাধ বিশ্বাস। তাই কোনক্রমে যদি আপনাকে শেষ করা যায়, তাহলে সব ঝামেলাই শেষ হয়ে যাবে।' তারপর নিজেই আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, 'অবশ্য এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। সফল আপনি হবেনই।'

আজ এই মর্মন্তুদ বিয়োগ-ব্যাথার দিনে মনে পড়ে এমনি আরও কত কথা, কত ছবি। ১৯৬২ সাল। শ্রদ্ধের নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে জেলে নেবার আর কয়দিন পর আমরা দু'ভাইও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, এ যাত্রা দু'জনকে দুটি স্বতন্ত্র সেলে আটক করা হয় নি; রাখা হয় একই কক্ষে। ফলে পারস্পরিক মত-বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায় সর্বক্ষণ আলাপ আলোচনা করি। সেই আলাপ আলোচনার সময় নীতির প্রতি মানিক ভাই'র যে অবিচল আস্থা দেখতে পাই, সত্যি বলতে কি, তা আমাকেও যুগপৎ প্রভাবিত ও মোহিত করে। তাছাড়া আমার প্রতি মানিক ভাইর ভালোবাসা ও আস্থা যে কত গভীর তা যেন আমি তখন আরও স্পষ্টভাবে অনুভব করি। অথচ, অনেকেই জানত না এ-কথা। জানতো না মানিক ভাই কত ভালোবাসতেন আমাকে। তাই, ক্ষণিকের বিভ্রমের মতো যখন আমাদের মধ্যে মান-অভিমান দেখা দিয়েছে, তখন অনেকেই গেছেন নিজ নিজ উদ্দেশ্যে মানিক ভাইকে প্ররোচিত করতে। কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে বলে মানিক ভাই'র প্রিয় হতে যাঁরা গেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেক সম্মানী ব্যক্তিকেও মানিক ভাই সোজাসুজি ঘর থেকে বের করে দিতে দ্বিধা করেন নি।

সকলেই জানেন, আইয়ুবের শাসনামলে আমাকে বার বার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে, এক সময় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, ভয়ে বন্ধু-বান্ধবদেরও অনেকে আমার পরিবারের খোঁজ-খবর নিবার সাহস হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই যিনি ভয় পান নি এবং আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের পেছনে পাহাড়ের মতো যেয়ে যিনি দাঁড়াতেন, তিনি হলেন মানিক ভাই। তাই, আমার কারাজীবনকালে মানিক ভাই যদি বাইরে থেকেছেন, তাহলে পরিবার সম্পর্কে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছি। আর বিশেষত এরই জন্য তাঁর সম্পর্কে বলতে যেয়ে আমার মনে পড়ছে আরও অনেক কথা। ১৯৪৯ সাল। আড়াই বছর যাবৎ আমি জেলে। মানিক ভাই'রও ভারি দুর্দিন। প্রায় সর্বস্ব হারিয়ে কলকাতা থেকে তিনি এসেছেন। শহীদ সাহেবের অনুসারী আমরা। সরকার আমাদের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত। এমন দুরবস্থা আমাদের যে, ঢাকার বাড়িওয়ালারা পর্যন্ত আমাদের বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না।

সেদিন কোর্টে আমাকে হাজির করা হয়েছে। মানিক ভাই কোর্টে এলেন। বললেন, 'একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সাধ্যে কুলোচ্ছে না।' মানিক ভাইকে তখন কেন্দ্রীয় সরকার তথ্য দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারির পদে নিয়োগ পত্র দিয়েছে। সে নিয়োগপত্র তাঁর পকেটে। ভাবলেশহীনভাবে তিনি বললেন, 'করাচি চলে যাই, কি বলেন?' 'তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা বিঘ্ন হবে না?' জবাব দিলাম আমি। মানিক ভাই বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, যাব না। ছেলেপুলে নিয়ে পানের দোকানদারী করে খাব, সে-ও ভালো। তবু ওদের চাকরি নয়।' নীতির প্রশ্নে এই যে অবিচলতা, এর দৃষ্টান্ত কি খুব সুলভ?

নীতির প্রতি মানিক ভাই'র অবিচলতার এই প্রমাণ উত্তর-জীবনেও পেয়েছি অসংখ্যবার। ১৯৬৬ সাল। ছয়-দফা আন্দোলনের প্রবল জোয়ারকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে আইয়ুব সরকার আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। এর কিছুদিন পর মানিক ভাইও জেলে এসে মিলিত হলেন আমার সাথে। ছয়-দফা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাঁকেও আটক করা হয়েছে; বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ইত্তেফাকের ছাপাখানা। ১৯৬৬ সালে গ্রেপ্তার হবার পর পুরো তিন বছর আমাকে বন্দি জীবন যাপন করতে হয়। আমার বিরুদ্ধে শুরু করা হয় আগরতলা মামলা। অনেকেই জানেন না, মানিক ভাইকেও সে মামলার আসামি করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

সে মানিক ভাই আজ নেই। যদিও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে আজও আমি সন্দিহান। আজও আমার মনে পড়ে সেই রহস্যময় চিঠির কটি কথা : 'আপনারা পিন্ডি বা করাচি আসবেন না। আপনাদের মেরে ফেলা হবে।' প্রায় প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লুঙ্গি পরেই আমি মানিক ভাই'র বাসায় যেয়ে চা খেতাম। সেদিনও চা খাচ্ছি। আর আলোচনা করছি দেশের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে। হঠাৎ মানিক ভাই বললেন, 'পিন্ডি থেকে একটা চিঠি পেলাম। প্রেরকের পরিচয় বলা নেই। তবে তাতে বলা আছে আমি এবং আপনি যেন পিণ্ডি বা করাচি না যাই। গেলেই নাকি আমাদের মেরে ফেলা হবে।' তারপর হেসে তিনি নিজেই বললেন, 'আমাকে কে মারবে? আর মারবেই বা কেন? মারলে বরং আপনাকেই মারতে পারে।' আমি বললাম, 'তবু কি দরকার যাবার। না গেলেই কি নয় মানিক ভাই?' মানিক ভাই বললেন, 'দেখেই আসি না। তাছাড়াও ওরাও খবর পাঠিয়েছে। দু-এক দিনের মাঝেই ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ।' মানিক ভাই গেলেন। কিন্তু ফিরে আসলেন নিষ্প্রাণ দেহে। মানিক ভাই'র কথা যখন ভাবি, তখন আজও আমার মনে পড়ে সে রহস্যময় চিঠির কথা। মনে হয়, শহীদ সাহেবকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, পিন্ডির ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে রহস্যজনকভাবে ডেকে নিয়ে যেয়ে মানিক ভাইকেও হয়ত হত্যা করা হয়েছে সেভাবেই।

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফলের প্রতি মানিক ভাই'র ছিল অসীম অনুরাগ। দেশের দুঃখী মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। আর তাই তিনি সংগ্রাম করেছেন আমৃত্যু। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। শহীদ সাহেবের পরলোক গমনের পর আমার দৃষ্টিতে সব কিছু যখন অন্ধকারময় বোধ হচ্ছিল, তখন মানিক ভাই দিয়েছেন অসীম প্রেরণা ও সাহস। আজ এই মুক্ত বাংলায় বেঁচে থাকলে অনেক সাহায্যই তিনি করতে পারতেন। অবশ্য, ইয়াহিয়া বাহিনী তাঁকে জীবিত রাখত কিনা সেটাও একটা কথা। কেননা, স্বাধীন দেশে বুদ্ধিজীবীর অভাব ঘটানোর জন্য যে সুপরিকল্পিতভাবে ওরা সিরাজ, শহীদ (শহীদুল্লা কায়সার) প্রমুখ সহ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে, তাতে মানিক ভাইকে ওরা জীবিত রাখত, মনে হয় না।

আজ মানিক ভাই যদিও আমাদের চোখের সামনে নেই, তবু তিনি অমর। তাঁর নীতি ও আদর্শের মাঝেই তিনি বেঁচে থাকবেন আবহমানকাল। এদেশের মানুষের জীবনে যদি দু'বেলা দু'মুটো ভাতের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়, যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, যদি অন্যায় অত্যাচারের কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায়, তবেই তাঁর স্মৃতির প্রতি পরিপূর্ণ ও সত্যিকার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সম্ভব হবে। তাই, দৈহিক অর্থে তিনি না থাকলেও আদর্শ ও নীতিতে তিনি চির-অমর। আর আত্মা আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে বাংলার প্রতিটি ঘরে; কারণ, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।

সূত্র : *ইত্তেফাক, বৃহস্পতিবার*, ১ জুন ১৯৭২। ১৯৭৩ সালের ১ জুন *ইত্তেফাকের* তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) স্মৃতি সংখ্যায় এ লেখাটি পুনঃমুদ্রিত হয়।

বক্তৃতা

'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান গণপরিষদে তীব্র প্রতিবাদ করেন গণপরিষদ সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তান গণপরিষদ, করাচি, ২৫ আগস্ট ১৯৫৫

"Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should make Bengal (Pakistan). The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we will have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite."

বঙ্গানুবাদ : "স্যার, আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে 'বাংলা' নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ওই নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কি-না। এক ইউনিটের প্রশ্নটা গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্নটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কী হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই কী সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই বা কী ভাবছেন? পূর্ব বাংলার জনগণ অন্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ওই অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাব তারা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেন্ডাম' অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেওয়া রায়কে মেনে নেন।"

[পাকিস্তান গণপরিষদে (করাচি) ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট, সকাল ১১টায় গণপরিষদ সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে অংশবিশেষ সংকলিত]

সূত্র : *শেখ মুজিব ইন পার্লামেন্ট (১৯৫৫-৫৮)*, শাহরিয়ার ইকবাল সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব নহে, তাই-

লাহোর সম্মেলনের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব

দেশের উভয় অংশের মধ্যে অটুট ঐক্য ও সুদৃঢ় সংহতি গড়িয়া তোলার জন্য ছয়-দফা কর্তব্য নির্দেশ

ঢাকা বিমানবন্দর, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) করাচি হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোষণা করেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী শিবিরের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদিই নয়, গোটা সম্মেলনের সঙ্গেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব নয় বলিয়াই এই সম্মেলনের সঙ্গে তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্মীদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইয়াছে এবং সেইজন্যই সম্মেলনে গৃহীত কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোনরূপ সম্পর্ক বা সংশ্রব নাই। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টাকাল আলাপ-আলোচনা করেন এবং সাংবাদিকদের বহুমুখী প্রশ্নের জবাবদান করেন। যুদ্ধোত্তর দেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া শেখ মুজিব জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির বিবেচনার জন্য দেশের দুই প্রদেশের মধ্যে অটুট ঐক্য, সুদৃঢ় সংহতি ও বৃহত্তর সমঝোতা সৃষ্টির জন্য মুখ্যত যে ছয়-দফা প্রস্তাব করেন সেই সম্পর্কে তিনি সাংবাদিকদের বিস্তারিত বিবরণদান করেন। লাহোর সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে তিনি যেসব সুপারিশ পেশ করেন সেই প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, পাক-ভারতের মধ্যকার বিগত ১৭ দিনের যুদ্ধে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে প্রশাসনিক দিক দিয়া জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের কথা বিবেচনা করিয়া দেশের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তিনি বলেন, বিগত অস্বাভাবিক ধরনের জরুরি দিনগুলিতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানিদের ঐক্যবোধই দেশের দুই প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ঘটনাক্রমে নহে।

শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন যে, জাতীয় সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটিতে তিনি যেসব সুপারিশ করিয়াছেন তাহা পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলকে একত্র ও একই রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে বিশ্বমানচিত্রে কায়েম রাখার জন্যই করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই উদ্দেশ্য নিয়াই তিনি লাহোর সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটিতে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে তিনি একটি শাসনতান্ত্রিক ফেডারেশন গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। সুপারিশকৃত এই শাসনতন্ত্রে বিশ্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার কায়েমের এবং আইন পরিষদসমূহের সার্বভৌমত্বের বিধান থাকিতে হইবে।

ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারাধীন যেসব বিষয় থাকিবে বলিয়া শেখ মুজিব যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা এই যে, ফেডারেল সরকার দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন। এই দুইটি বিষয় ছাড়া আর বাকি যেসব বিষয় থাকিবে তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত স্টেটসমূহের হাতে।

দেশের মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে শেখ মুজিব সাবজেক্ট কমিটিতে অবাধে বিনিময়যোগ্য দুইটি পৃথক ধরনের মুদ্রার অথবা শর্তসাপেক্ষের একটি মুদ্রা ব্যবস্থা কায়েম রাখার সুপারিশ করিয়াছেন।

তিনি সুপারিশ করিয়াছেন যে, ফেডারেশনের জন্য যদি একটি মুদ্রা ব্যবস্থা কায়েম রাখিতে হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে

পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য কার্যকরী শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

কর ধার্য করা সম্পর্কে শেখ মুজিব যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা হইতেছে যে, সর্বপ্রকারের কর ও শুল্ক ধার্যের একচেটিয়া অধিকার ফেডারেশনের স্টেটসমূহের হাতেই থাকিবে। ফেডারেল সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের অধিকার থাকিবে না। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য স্টেটসমূহের করের একটি অংশ ফেডারেল সরকার পাইবেন। স্টেটসমূহের সকল প্রকার করের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ দ্বারাই ফেডারেল সরকারের তহবিল গঠিত হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে শেখ মুজিব ৫-দফা সুপারিশ করিয়াছেন। প্রথমত, ফেডারেশনের প্রতিটি স্টেটের পৃথকভাবে বিদেশি বাণিজ্যের হিসাব রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, বিদেশি বাণিজ্যের দ্বারা আগত বিদেশি মুদ্রা স্টেটগুলির অধিকারে থাকিবে। তৃতীয়ত, ফেডারেল সরকারের বিদেশি মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সম্মত কোন একটা হারে স্টেটসমূহ মিটাইবে। চতুর্থত, প্রয়োজনীয় স্বদেশে প্রস্তুত সকল দ্রব্যই বিনা শুল্কে বা টেরিফের বিধি-বিধানমুক্ত অবস্থায় স্টেটসমূহের মধ্যে যাতয়াত করিবে। শেষত, শাসনতান্ত্রিক বিধান করিয়া স্টেটসমূহকে বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণের এবং সংশ্লিষ্ট স্টেটের স্বার্থে বিদেশে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার দিতে হইবে।

শেখ মুজিব শাসনতন্ত্র মতে স্টেটসমূহকে আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য 'প্যারা-মিলিটারি' বা আঞ্চলিক বাহিনী সংরক্ষণের অধিকার-দানেরও সুপারিশ করেন।

শেখ মুজিব সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রভাবশালী একটি মহল পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া আলোচনা তো দূরের কথা, শুনিতে পর্যন্ত প্রস্তুত না থাকায় তিনি তাঁর প্রতিনিধিদলসহ সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস।

তাসখন্দ ঘোষণা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক তাসখন্দ প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বে এই প্রশ্নে কোন মতামত দেওয়ার কোন এখতিয়ার তাঁহার নাই এবং সেইজন্যই লাহোর সম্মেলনে এই প্রশ্নে তাঁহার কোন মতামত দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আশা করা গিয়াছিল যে, এই সম্মেলনে জাতীয় সমস্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য জাতির সামনে সঠিক একটা কর্মসূচি তুলিয়া ধরা হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সম্মেলনের প্রভাবশালী উদ্যোক্তরা সব কিছুই পূর্বাহ্নে সাজাইয়া রাখিয়াছেন এবং দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাদির কিছুই তাঁহারা বিচার বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নন।

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির কাছে তিনি যে ছয়-দফা সুপারিশ করিয়াছেন, সেই ছয়-দফা অন্তর্ভুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিক কোন সংগ্রামের জন্য কোন প্লাটফরম গঠন করা হইলে তিনি সেই প্লাটফরমের সঙ্গে থাকিবেন। তিনি অবশ্য স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন যে, রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া দিয়া বিভিন্নমুখী মতবাদ সম্পন্ন দলসমূহের সঙ্গে মিলিয়া একদল করা সম্ভব নয় এবং সেই প্রশ্নে তিনি সম্মতও নন।

গতকল্য শেখ মুজিবের সঙ্গে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্য– জনাব তজউদ্দিন আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ, জনাব নূরুল ইসলাম এমএনএ এবং জনাব আবদুল মালেক এমপিএ-ও করাচি হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, শনিবার, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

দেশপ্রেমিক কে? ছয়-দফার সমালোচকরা? –ওরা তো বহুরূপী

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার আলোকে দেশবাসীর নিকট ছয়-দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবের কৈফিয়ত

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, ইডেন হোটেল, ঢাকা, ১৮ মার্চ ১৯৬৬

ঢাকা, ১৮ মার্চ ১৯৬৬। পূর্ব পাকিস্তানের আজিকার অবস্থা যদি পশ্চিম পাকিস্তানের হইত, আর পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা যদি পূর্ব পাকিস্তানের হইত, তাহা হইলে 'আমরা কি করিতাম' দফাওয়ারীভাবে এই প্রশ্নের জবাব দিয়া গতকল্যকার আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইন্‌সাফ-বোধই পাকিস্তানি দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উপর উভয় অঞ্চলের নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন, পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন, ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মতো বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয়-দফা কর্মসূচির বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয়-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।"

শেখ মুজিবের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ :

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ছয়-দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তিসনদ একুশ-দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন প্রথার দাবি, ছাত্র তরুণদের সহজ ও স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষা লাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

ছয়-দফার দাবি জাতীয় দাবি

আমার প্রস্তাবিত ছয়-দফা দাবিতেও এরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তবিত ছয়-দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতি ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায় সংবাদে ও সভাসমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ছয়-দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছে। ফলে ছয়-দফা দাবি

আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবে না সে বিশ্বাস আমার আছে।

ওরা বহুরূপী

কিন্তু এ-ও আমি জানি জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁহাদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক, এঁরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারি দলে; আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনীর বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতোমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার-সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না, তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ছয়-দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা, জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষত আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ছয়-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ছয়-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানিমাত্রেই এই সব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১ নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম-বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ-দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতার অধিষ্ঠিত সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ-দফার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরাতন দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র, তথাপি লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁরা আৎকিয়া উঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীদের দালালী করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইন সভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে, তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভালো, না প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বচন এবং ক্ষমতাহীন আইন সভাই ভালো, এ বিচারভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির

এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে 'জনমত' যাঁচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন, এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।

২ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইঁহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে, 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চালাতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাম পোস্টঅফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে। তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ-দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থী শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি "ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা' সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানি এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত-ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে-কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়-যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না; আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলেরর জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকিবে।

খ. দুই অঞ্চলের জন্য এই একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি না। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয় তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ-দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজি হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যারিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য মানিয়া লইয়াছি, তারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না? আর যদি অবস্থা গতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোন অনিষ্টও হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ-প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ-প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংকের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থদপ্তর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থদপ্তর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐ সব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রীদপ্তর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাংক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পর দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নক্‌শার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে, তেমিন থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শন স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নক্‌শার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখুন–

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সি সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন, সরকারি স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকসহ সমস্ত ব্যাংকের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাংক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এই সব ব্যাংকের ডিপজিটের টাকা, শেয়ারমানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ারমানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালু চরে ঢালা পানির মতো একটানে তলদেশ হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউব-ওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউব-ওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ, সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট অব ক্যাপিটাল বা মুদ্রা পাচারই নয় মুদ্রাস্ফীতি হেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা জনগণের বিশেষত পাটচাষিদের দুর্দশা-সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫ নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট অব ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানিরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ, এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

'পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র?'

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফা খোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্রনীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন।

অতএব, এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ, তাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মতো যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারি তহবিলের সব চেয়ে অমোঘ অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্র বিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান ব্রিটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদপ্তর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থ-মন্ত্রী বা অর্থদপ্তর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী ও পররাষ্ট্রদপ্তর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ, আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়ত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দপ্তর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়ত, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫ নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে,

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে,

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে,

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের

এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

১৮ বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাস কি বলে–

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতোই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে :

ক. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশি মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা বলা হইতেছে।

খ. পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশি আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

গ. পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রপ্তানি করে আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশি মুদ্রা বন্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

পাট চাষিদের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি

ঘ. পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাট-চাষিকে পাটের ন্যায্য মূল্য দূরের কথা আবাদী খরচাটাও দেওয়া হয় না। ফলে, পাট-চাষিদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন; কিন্তু চাষিকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষির ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরিব পাট-চাষি চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রপ্তানিকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া আর কোনও প্রতিকার নাই। একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং করপোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

ঙ. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকস্তানকেই। এই অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষিকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রপ্তানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানির হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬ নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ-দফার দাবিতে আমরা আনসার-বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তা তো করা হয়-ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ইপিআর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করত এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ-দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানির বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজ হাতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচানো হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা-ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই, আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা-নীতি কার্যত আমাদের তাই করিয়া রাখিয়াছে।

দেশরক্ষা কেন্দ্রের হাতে

দেশরক্ষা কেন্দ্রের হাতে কিন্তু সেই সঙ্গে তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করুন। নৌবাহিনীর দপ্তর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন, জানি না। কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের অত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবি-হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

পশ্চিম পাকিস্তানকে আমরা কি দিয়াছি, আর কি দিতাম–

পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই-বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে :

এক. তাঁরা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ছয়-দফা কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানিরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা দায়ী নয়। আমি এ-ও জানি যে, আমাদের মতো দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা

বাহিনীর তিনটি দপ্তরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা ৩২ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানের কথা : সরকারি আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশি মিশনসমূহ তাঁদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরিব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত, তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঐ পরিমাণে গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে সব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার তহমত দিতেছেন, সেই সব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেনে। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মতো আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ঐ সব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হক্‌টাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্‌টাই চাই। আপনাদের হক্‌টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার তাকত থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে :

আমরা কি দিয়াছি

১. প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদরদপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

২. পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানির ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানি মেম্বার নির্বাচন করিয়াছিলাম।

৩. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

৪. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

৫. আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতা-বোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

আমরা কি দিতাম

চার. সুতরাং, পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-যেখানে আমাদের দান করিবার তাকত ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত, তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য সত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকস্তানিরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানির। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা সব অধিকার ও চাকরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পিআইডিসি, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডিআইটি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলত, পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিস্প্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এদের হাতে আমি কোন্ ছার?

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা,

আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ছয়-দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তি-তর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরও অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি, কায়েমী স্বার্থবাদীরা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মতো মুরব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন্ ছার? দেশবাসীর মনে আছে আমাদের নয়ন-মণি শেরে-এ বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এ-ও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সেহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব, দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্দির আমার হইয়াছে। মুরব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানির ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে- কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই-বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লার দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

সূত্র : ইত্তেফাক, শনিবার, ১৯ মার্চ এবং রবিবার, ২০ মার্চ ১৯৬৬

শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য

সভাপতি পদে নির্বাচনের পর শেখ মুজিবের নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা

ঢাকা, ১৯ মার্চ ১৯৬৬

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা-দান প্রসঙ্গে গতকাল (শনিবার) ঘোষণা করেন যে, সমগ্র পাকিস্তানের সার্বিক কল্যাণ সাধন, বিশেষ করিয়া সমগ্র দেশে একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়-দফার প্রণয়ন করিয়াছে এবং সমাজতন্ত্রবাদী কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে।

ইহাদের ভুল ভাঙ্গিবে

নব নির্বাচিত সভাপতি আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আওয়ামী লীগ কর্মীদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছয়-দফার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আজ যে সংগ্রামের পথে পা বাড়াইয়াছে, সে পথ কন্টকাকীর্ণ এবং এই পথে সাফল্য অর্জন সময় সাপেক্ষ। তবে, ছয়-দফার বিরুদ্ধে আজ যে-সব মহল দায়িত্বহীন প্রচারণায় লিপ্ত আছেন, একদিন-না একদিন তারা তাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের যে-সব নেতা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, অথচ ছয়-দফার বিরুদ্ধে প্রচারণা করিতেছেন, তাদের পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার আলোকে ছয়-দফা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ, আওয়ামী লীগের ছয়-দফায় শুধু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনই দাবি করা হয় নাই, এতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও একই স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হইয়াছে। তাই, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ একদিন-না একদিন ছয়-দফা দাবিকে তাদেরও নিজেদের দাবি বলিয়াই মানিয়া লইবেন।

কোন সংক্ষিপ্ত পথ নাই

শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, ছয়-দফার প্রশ্নে কোন আপস নাই। রাজনীতিতেও কোন সংক্ষিপ্ত পথ নাই। নেতৃবৃন্দের ঐক্যের মধ্যেও আওয়ামী লীগ আর আস্থাশীল নয়। নির্দিষ্ট আদর্শ ও সেই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের ঐক্যেই আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগ নেতার দল নয়– এ প্রতিষ্ঠান কর্মীদের প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের জনক মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্মীদের প্রাণাধিক প্রিয় মনে করিতেন। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মী আমার কাছে সহোদর ভাই-এর মতো। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ প্রতিষ্ঠানের নেতা, তাঁর নীতিই আমাদের আদর্শ।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বলেন যে, এদেশে আওয়ামী লীগ সব সংগ্রামেরই বাণী প্রথম বহন করিয়াছে। সংগ্রমের পথে তাহারা নির্যাতন ভোগ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সংগ্রাম তাহাদের ব্যর্থ হয় নাই। ছয়-দফার সংগ্রামও ব্যর্থ হইবে না। ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা এ সংগ্রামকেও আমরা সার্থক করিয়া তুলিব। ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদেরই।

দেশকেই হেয় করা হইতেছে

শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কনভেনশন দলের নেতৃবৃন্দের ছয়-দফা বিরোধী প্রচারণার জবাবদান প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকারি নেতারা ছয়-দফার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া যে-সব বেসামাল উক্তি করিতেছেন তাহাতে দেশ ও দেশবাসীকেই বিশ্বের দরবারে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা গণতন্ত্রের বিশ্বাসী। স্বৈরতন্ত্রের ও কায়েমী স্বার্থবাদের বিরুদ্ধে তাহারা সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর।

সংগ্রামী কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ না করিয়া তাহাদের দাবি-দাওয়াকে যদি সরকার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে বিচার করিতে না শিখেন তবে সংগ্রাম তীব্রতর হইবে, সংগ্রামকে বানচাল করা যাইবে না। ন্যায্য দাবির সংগ্রামের বিরুদ্ধে আজকের সরকারের মতো অতীতের বহু সরকারও হীনতম প্রচারণা চালাইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। ন্যায্য দাবি চিরকালই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবারও আমাদের দাবি যদি ন্যায্য হয়; কুটিল প্রচারণায় এ দাবি দাবাইয়া দেওয়া যাইবে না। সংগ্রাম এবং তীব্রতর সংগ্রামের দ্বারাই আমরা দাবি আদায় করিয়া লইব।

সূত্র :*ইত্তেফাক*, রবিবার, ২০ মার্চ ১৯৬৬

চরম ত্যাগের প্রস্তুতির বাণী লইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন, প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানাইয়া দিন–

সর্বস্ব পণ করিয়াই আমরা আজ আন্দোলনের এ কন্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইয়াছি

পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান

ঢাকা, ২০ মার্চ ১৯৬৬

ঢাকা, ২০ মার্চ ১৯৬৬। কালবৈশাখীর উদ্দাম নতুন ধূলিঝড় এবং বৃষ্টি সত্ত্বেও গতকাল (রবিবর) পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক এক জনসভার মধ্য দিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

প্রকৃতির উদ্দাম তাণ্ডবকে স্তব্ধ করিয়া সভায় সমাগত বিপুল জনতার উদ্দেশ্যে তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে দৃপ্তকণ্ঠে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি ঘোষণা করেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের চোখে-মুখে আজ যে বিরাট জিজ্ঞাসা, কুসুমাস্তীর্ণ পথে সে জিজ্ঞাসার জবাব মিলিবে না- এ জিজ্ঞাসার জবাব পাইতে হইলে জেল-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতনকে আশীর্বাদ বলিয়া বরণ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সাড়ে ৫ কোটি মানুষের ভাগ্য ও দেশের দুই অংশের বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতির এই বাণী লইয়া আপনারা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানাইয়া দিন, দেশের জন্য, দশের জন্য, অনাগতকালের ভাবি বংশধরদের জন্য সবকিছু জানিয়া শুনিয়াই আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা এবার সর্বস্ব পণ করিয়া নিয়মাতান্ত্রিক পথে ছয়-দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে।

সভার সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, কঠোর নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ছয়-দফার দাবি আদায় করিতে হইবে।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষকে ছয়-দফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহবান জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, এইবার যদি কোন গণতান্ত্রিক কর্মীর উপর নির্যাতন নামিয়া আসে, তবে পূর্ব পাকিস্তানের সব কয়টি কারাগার আমরা ভরিয়া তুলিব। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিব। তিনি ঘোষণা করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি এবং দুই প্রদেশের জনসাধারণকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার মধ্যেই পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি নিহিত আছে। গোটা পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও তাহাদের সমৃদ্ধি সাধন কল্পেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়-দফা দাবি উত্থাপন করিয়াছে। বিগত আঠার বৎসরের বঞ্চনা ও নির্যাতনের আলোকে

বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের বাঁচিবার কোন উপায় নাই।

কেন এই বেইনসাফ

পূর্ব পাকিস্তান দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসী বাস করে। তথাপি পূর্ব পাকিস্তানকেই বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকারে পরিণত হইতে হইয়াছে কেন? কেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইনসাফ করা হয় নাই?

যদি পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের তিন-তিনটি রাজধানী থাকিত, যদি সামরিক বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তরই এখানে থাকিত, যদি দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক রাজধানী ঢাকায় হইত, যদি বিদেশি কূটনৈতিক মিশনগুলির সদর দপ্তর এখানে থাকিত, তবে আমরা নয়, ছয়-দফার মতো দাবি লইয়া সংগাম করিতে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা।

চিন্তা করিয়া দেখুন

পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের প্রতি ছয়-দফা দাবির যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করার আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানিরা পাকিস্তান সংগ্রামে কি কোরবানী করিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তান দেশের অর্থনীতিতে কি পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষার জন্য আমরা স্বাধীনতার পরও রাজনীতিক্ষেত্রে কি কোরবানী দিয়াছি পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের আজ তা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। তাদের উপলব্ধি করা দরকার যে, কেন্দ্রে আজ একটি 'মহাশক্তিধর সরকার' থাকা সত্ত্বেও বিগত যুদ্ধের সময় সে সরকার পূর্ব পাকিস্তানের কোন কাজে আসে নাই।

শক্তিশালী কেন্দ্র থাকিয়া কি লাভ হইল

'শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের' প্রধান স্বয়ং যুদ্ধের সময় এখানে আসিতে পারেন নাই। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে কোনরূপ সাহায্য সহায়তা এখানে পাঠানো সম্ভব হয় নাই। জাতির চরম বিপর্যয়ের দিনে আইয়ুব সাহেবের শক্তিশালী সরকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আজ সবাইকে গোটা সমস্যাটিকে তলাইয়া দেখিতে হইবে। পাকিস্তানকে সত্যিকারের শক্তিশালী করিতে হইলে পাকিস্তানের দুইটি হাতকে সমান শক্তিশালী করিতে হইবে। আজ পাকিস্তানের দুইটি হাতের মধ্যে একটি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে আর একটি ফাঁপিয়া উঠিয়াছে- এই অবস্থাকে শক্তিমান অবস্থা বলা যায় না।

পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার প্রশ্নে ওয়ারস'তে মার্কিন ও চীনা রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যে আলোচনার কথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টো সম্প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন, শেখ মুজিব তার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য যদি চীন এবং আমেরিকার দিকে তাকাইয়া ও নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তবে পাকিস্তানের শক্তিশালী কেন্দ্রের আর প্রয়োজনীয়তা কি! দেশরক্ষার প্রশ্নে বিদেশি সরকারের উপর নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার কথাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই তথ্য প্রকাশের পর পূর্ব পাকিস্তানবাসিরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবক্তাদের প্রতি আর ঈমান আনিবে কিভাবে। শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, ছয়-দফা দাবি আদায়ের জন্যে তারা সংগ্রাম করিবে, তাদের উপর অত্যাচার আসিবে, নির্যাতন হইবে, কিন্তু এই অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিয়া লইয়া ছয়-দফার সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, একদিন সবাইকে মরিতে হইবে, সেই মৃত্যুর আদেশ পরম করুণাময়ের নিকট হইতে আসিবে, ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে আসিতে পারে না।

শেখ সাহেবের বক্তৃতা চলিতে থাকা-কালেই বৃষ্টির চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে প্রস্তাবাবলী গ্রহণের পর সভার কাজ শেষ করা হয়।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোমবার, ২১ মার্চ ১৯৬৬

‘ছয়-দফা কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানিয়াছে– তাই বিরোধিতা’

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের কর্মীসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা

চট্টগ্রাম, ২৫ মার্চ ১৯৬৬

চট্টগ্রাম, ২৫ মার্চ– আজ এখানে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে এক কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, ছয়-দফা দাবি কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানিয়োছে বলিয়াই কোন কোন মহল উহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলিতেছে। প্রেসিডেন্ট গৃহযুদ্ধ ও অস্ত্রের ভাষা সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, প্রেসিডেন্টের ন্যায় দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি এই সকল কথা বলায় এই কথাগুলি বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নাই।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, যে মুহূর্তে দেশবাসী ছয়-দফা সম্পর্কে গভীর অবিনিবেশ সহকারে ভাবিতেছেন, তখন অপর কোন বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কর্মী সভায় জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব রফিকুল হোসেন অ্যাডভোকেট এবং জনাব এম এ আজিজও বক্তৃতা করেন। আজ শেখ মুজিবুর রহমান উল্কাযোগে জনাব রফিকুল হোসেন অ্যাডভোকেট সমভিব্যাহারে চট্টগ্রাম পৌছেন। পরে গ্রিন এ্যারো-যোগে আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ চট্টগ্রাম পৌছেন।

সন্দ্বীপ ও সাতকানিয়া সফর

শেখ মুজিবুর রহমান অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে আগামীকাল (শনিবার) সকালে শিপিং করপোরেশনের জাহাজযোগে সন্দ্বীপ গমন করিবেন। বিকালে নেতৃবৃন্দ সন্দ্বীপে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

রবিবার সকালে নেতৃবৃন্দ হেলিকপ্টারযোগে চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং বিকালে সাতকানিয়ায় এক জনসভায বক্তৃতা বরিবেন। নেতৃবৃন্দ রবিবার রাত্রে ঢাকা মেলযোগে ঢাকা রওয়ানা হইবেন এবং সোমবার সকালে ঢাকা পৌছিবেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, শনিবার, ২৬ মার্চ ১৯৬৬

সন্দ্বীপের বিরাট জনসভায় মুজিব : শোষণ মুক্তির জন্য

‘পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিরাপত্তা বাঁধের প্রয়োজন’

সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম, ২৬ মার্চ ১৯৬৬

সন্দ্বীপ, ২৬ মার্চ– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, বঙ্গোপসাগরের বিধ্বংসী গ্রাস আর ভয়াল প্রকৃতির উদ্দামতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দ্বীপাঞ্চলীয় জনসাধারণের যেমন উপকূলীয় বাঁধ অতীব প্রয়োজন, ঠিক তেমনি কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের একটি নিরাপত্তা বাঁধের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে সর্বনাশ নামিয়া আসিয়াছে, সেই সর্বনাশের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য এই নিরাপত্তা বাঁধ নির্মাণে আর কালবিলম্ব করা যায় না। এই নিরাপত্তা বাঁধাই ছয়-দফা।

আজ বেলা আড়াইটায় শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ আজিজ সমভিব্যাহারে জাহাজযোগে সন্দ্বীপ ঘাটে আসিয়া পৌছেন। বঙ্গোপসাগরে তখন জোয়ারের উদ্দামতা। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরের ভয়াল আর্তনাদকে স্তব্ধ করিয়া উপকূলে প্রতীক্ষারত সহস্র সহস্র ছাত্র জনতা, 'ছয়-দফা জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলেন এবং নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান। উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে শেখ মুজিব সদলে একটি সাম্পান যোগে মাঝ দরিয়া হইতে কূলে আসিয়া পৌছিলে শত শত ছাত্র ও কর্মী নেতৃবৃন্দকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করেন। সাগরের জোয়ারের মতো সাগরকূলের মানুষের মধ্যেও যেন জোয়ার জাগিয়া উঠে। জনতা মিছিল করিয়া নেতৃবৃন্দকে শহরে লইয়া যায়। জাহাজঘাট হইতে শহর পর্যন্ত একটানা দুই মাইল পথে মানুষের মিছিল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নাই। মিছিলে প্রতিজন কর্মীর হাতে ফেস্টুনের ভাষায় এবং তাদের কণ্ঠে ছয়-দফা দাবি আদায়ের দৃঢ় সংকল্পের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিধ্বনি ফুটিয়া উঠে। সন্দ্বীপের মতো একটি অবহেলিত দ্বীপের মানুষকেও ছয়-দফা যে কতখানি সংগ্রাম মুখর করিয়া তুলিয়াছে তা সংবর্ধনা মিছিল স্বচক্ষে না দেখিলে অনুমান করা যায় না।

এইদিন নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সন্দ্বীপের ৭টি হাইস্কুলের কোন ছাত্রই ক্লাসে যোগ দেয় নাই। সকাল ১০টা হইতে ছাত্র ও জনতা জাহজঘাটে আসিয়া ভিড় জমায়। আড়াই লক্ষ লোক অধ্যুষিত সন্দ্বীপের ইতিহাসে শেখ মুজিবের এই সংবর্ধনা ও তাঁর জনসভা এক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে।

সাধারণত সন্দ্বীপের যেসব স্থানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, স্থানীয় সরকারি ও আধা-সরকারি কর্তারা তার কোনটাতেই আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেন নাই। বাধ্য হইয়া সন্দ্বীপ আওয়ামী লীগ চাষের জমির মধ্যে জনসভার আয়োজন করেন। চাষের জমিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় সন্দ্বীপের আঠারটি ইউনিয়ন হইতে দলে দলে মানুষ যোগদান করে।

সহস্র সহস্র মানুষের তুমুল হর্ষধ্বনি ও জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করিতে শুরু করেন। সন্দ্বীপবাসীদের কাছে তিনি আওয়ামী লীগের ছয়-দফাকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, সাগরের মাঝেই আপনাদের বাস। প্রতিবছর নিষ্ঠুর প্রকৃতি আপনাদের জান-মালের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। আপনাদের এবং আপনাদের পরবর্তী বংশধরদের খেয়ালী প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আপনারা দ্বীপের চতুর্দিকে একটি প্রতিরক্ষা বাঁধের দাবি করিয়াছেন। আপনাদের দাবির সঙ্গে আমি একমত। বিগত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে যে, গোটা পূর্ব পাকিস্তানই সন্দ্বীপের মতো একটি দ্বীপ। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানেরও কোন সম্পর্ক ছিল না। বিগত ১৮ বৎসর প্রদেশের উপর দিয়া অত্যাচার ও শোষণের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। শোষণ জর্জরিত পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষ আজ হৃতসর্বস্ব। দেশের রাজধানীর উপর পূর্ব পাকিস্তানের কোন কর্তৃত্ব নাই; মূলধনের উপর কোন এখতিয়ার নাই; তদুপরি শুধু সামরিক বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তরই পশ্চিম পাকিস্তানে তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের যথাযোগ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও নাই। তাই, পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্বনাশের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য একটি নিরাপত্তা বাঁধের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত উক্তিতে গভীর দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি জানিতে চান যে, কার বিরুদ্ধে এই গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হইবে। তিনি বলেন, আমাদের সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিসনদ ছয়-দফার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের

প্রায় সকল বিরোধীদলের নেতাও হাত মিলাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, পূর্ব পাকিস্তানের একশ্রেণীর লোক পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থে কোনদিনই এক হইতে পারিলেন না। পূর্ব পাকিস্তানের পলিমাটি হইতে এইসব পরগাছাদের উৎখাত করিতে হইবে।

সন্দ্বীপের প্রবীণ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব মুজিবুল হক এমএ, জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। জনসভায় জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ও জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী বক্তৃতা দান করেন।

আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন

পূর্বাহ্নে শেখ মুজিবুর রহমান সন্দ্বীপে আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতার সৃষ্টি হয়। নিম্নোক্তভাবে সন্দ্বীপ আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হইয়াছে : সভাপতি- জনাব মুজিবুল হক এমএ; সাধারণ সম্পাদক- জনাব গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ- জনাব আবদুর রব খন্দর।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোমবার, ২৮ মার্চ ১৯৬৬

১৭ এপ্রিল 'সম্মুখ সমর,' কিন্তু কোথায়?

শেখ মুজিব বলেন : রাজি, তবে খাস কামরায় নহে

স্থান পল্টন ময়দান নয় তো স্টেডিয়াম

ঢাকা, ১৩ এপ্রিল ১৯৬৬

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত ছয়-দফার প্রশ্নে মোকাবিলা সভায় মিলিত হওয়ার সপক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সর্বশেষ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "নিজ কর্মব্যস্ততার দরুন আমার প্রস্তাব মতে, ২৪ এপ্রিল পল্টন ময়দানের জনসভায় ছয়-দফার প্রশ্নে আমার মোকাবিলা করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আগামী ১৭ এপ্রিল এই মোকাবিলার যে প্রস্তাব দিয়াছেন, আমি সানন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু যেহেতু জনাব ভুট্টোর প্রস্তাবটি খুব স্পষ্ট নহে, সেই হেতু আমি তাঁহাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, জনগণের দাবি ছয়-দফা সম্পর্কে উভয় পক্ষের মোকাবিলা হইবে প্রকাশ্য জনসভায়– কাহারও খাসকামরায় নহে। এবং এই মোকাবিলা সভার প্রিজাইডিং অফিসার হইতে হইবে হাইকোর্টের কোন বিচারপতিকে– কোন রাজনৈতিক দলের কেউ টেউকে নহে।

এই প্রস্তাবে সম্মত থাকিলে নির্ধারিত তারিখেই যাহাতে এই জনসভার এন্তেজাম করা যায়, তজ্জন্য আমি আমার সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিনকে রাখিয়া যাইতেছি। তিনি জনাব ভুট্টোর সহিত মোকাবিলা সভার বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি স্থির করিবেন। জনাব ভুট্টো যেন তাহার দল ও আওয়ামী লীগের যুক্ত উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করিয়া উহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করেন। দিনের দিন আমি আমার প্রদেশ সফরের অবশিষ্ট কর্মসূচি বাতিল করিয়া হইলেও জনাব ভুট্টোর সহিত উক্ত মোকাবিলা সভায় শরীক হইব।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর, যশোর ও খুলনা সফরের জন্য অদ্য ফরিদপুর রওয়ানা হইতেছেন। এক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান যে, মোকাবিলা সভার এন্তেজাম সম্পন্ন হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য নির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করিয়া ঢাকায় আসিয়া হাজির হইবেন।

পূর্বোক্ত এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (বুধবার) তাঁহার ছয়-দফা কর্মসূচি সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে যে-কোন জনসভায় বিতর্ক অনুষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শেখ মুজিব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কর্তৃক পল্টন ময়দানে আহূত ২৪ এপ্রিলের জনসভায় যোগদান করিয়া বিতর্ক অনুষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণের জন্য জনাব ভুট্টোর প্রতি পরামর্শ দেন।

এই বিবৃতিতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট বলেন, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের একদাখ্যাত সেক্রেটারি জেনারেল জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আগমনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তাহার পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে যে-কোন জনসভায় আমার সঙ্গে আমার ছয়-দফা ফর্মুলা ও অন্যান্য প্রশ্নে আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে উহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ছয়-দফা সম্পর্কে আমার সঙ্গে জনাব ভুট্টোর আলোচনায় সম্মত হওয়ার সংবাদে আমি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ২৪ এপ্রিল (রবিবার) পল্টন ময়দানে এক জনসভা আহবান করা হইয়াছে। বিষয়টি আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টো এই জনসভায় যোগদানের সুযোগ গ্রহণ করিলে আমি আনন্দিত হইব। এইরূপ ক্ষেত্রে ২৪ এপ্রিলের জনসভাটি মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেচারি এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারির যৌথ উদ্যোগে আহ্বানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারিকে এজন্য আমি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়াছি।

তদুপরি, ২৪ এপ্রিলের আগেই যদি অনুরূপ জনসভা অনুষ্ঠান জনাব ভুট্টোর পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয়, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাও আমাদের জানাইতে পারেন।

বিবৃতির উপসংহারে শেখ মুজিব বলেন যে, জনাব ভুট্টো উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত একটি নিরপেক্ষ সংস্থার মাধ্যমে সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই প্রশ্নে দেশে গণভোট অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে সম্মত করাইতে পারিলে আরও ভালো হয়। কারণ, অনুরূপ ক্ষেত্রে জনমত যাচাই-এর একটি সর্বজনগ্রাহ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল বিতর্কের অবসান ঘটিবে।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, বৃহস্পতিবার, ১৪ এপ্রিল ১৯৬৬

জনাব ভুট্টো কাটিয়া পড়ায় 'ছয়-দফার নৈতিক বিজয় সূচিত হইয়াছে' –শেখ মুজিব

যশোর, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬

যশোর, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬।-পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় শ্রোতাদের একটানা আনন্দ ও হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আমাকে মোকাবিলা করার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত কাটিয়া পড়ায় ছয়-দফার ব্যাপারে আমাদের প্রথম পর্যায়ের বিজয় সূচিত হইয়াছে। তাঁহার এই পশ্চাদপসরণ শুধু তাহার একারই পরাজয় নহে, ইহা সামগ্রিকভাবে বর্তমান সরকারেরই পরাজয়। কারণ, স্বয়ং প্রেসিডেন্টসহ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের হর্তাকর্তাদের প্রায় সকলেই এখানে উপস্থিত, তখনও তাঁহারা ছয়-দফা প্রশ্নে সামনাসামনি দাঁড়াইতে সক্ষম হন নাই।

শেখ মুজিব বলেন যে, ছয়-দফা সম্পর্কে জনমতের সামনে দাঁড়াইতে তাঁহাদের সাহস না হওয়ায় ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, কেন্দ্রীয় চক্র জনসাধারণ সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত। জনাব ভুট্টোর পিঠটানের মধ্য দিয়া কেন্দ্রীয় চক্র আরও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, ছয়-দফার প্রতি জনসাধারণের সমর্থন রহিয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, আমি এ-ধরনের আঠার শতকী মোবাবিলা প্রস্তাবে বিশ্বাসী নহি। আমরা জনমত যাচাইর জন্য গণভোটে বিশ্বাসী। কিন্তু ভাবাবেগের আতিশয্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টো যখন আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া দিলেন, তখন আমাদের উহা গ্রহণ না করিয়া উপায় ছিল না। আমরা জনপ্রতিনিধি। তাই, জনগণের আদালতেই আমাদের বিচার হইবে। জনাব ভুট্টোর প্রতি এজন্যই করুণার উদ্রেক হয় যে, তিনি আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়া ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আমরা সেই লোক যাঁহারা জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী।

আমরা সর্বদাই জনগণের রায় গ্রহণে প্রস্তুত। ভুট্টো সাহেবের পিঠটানের ফলে আমাদের ছয়-দফার নৈতিক বিজয়ই সূচিত হইয়াছে। ইহা শুধু আমার বা আওয়ামী লীগের জন্যই আনন্দের বিষয় নহে, ইহা বস্তুত জনগণের জন্যই আনন্দের বিষয়। সুতরাং, আসুন, আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করি এবং আমাদের ছয়-দফা দাবি বাস্তবায়িত করার জন্য দশ কোটি লোকের পক্ষ হইতে আপসহীন সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করি।

তিনি বলেন, জনাব ভুট্টোর অগৌরবজনক পশ্চাদপসারণের জন্য আমার দুঃখ হয়। তবে, এই প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারের প্রতি ছয়-দফা প্রশ্নে জনমত যাচাইর জন্য অবিলম্বে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবির পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের উপরই নির্ভর করে। পূর্ব পাকিস্তানই জনশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা পাকিস্তানের অবশিষ্ট অংশকে রক্ষা করিতে পারে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গৃহযুদ্ধের যে-হুমকি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন? কাহাদের মধ্যে এই গৃহযুদ্ধ হইবে? তিনি বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লক্ষ্যে পৌছানোর নীতিতে বিশ্বাস করি। দেশে অসন্তোষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই গৃহযুদ্ধের হুমকি দেওয়া হইতেছে।

তিনি মাওলানা ভাসানীর উক্তিরও সমালোচনা করেন এবং বর্তমান সরকারকে সহযোগিতাদান করায় তাহার বিরুদ্ধে গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ করেন। তিনি মওলানা ভাসানী ও সরকারি নেতবৃন্দকে বল্গাহীন মন্তব্য না করার জন্য আহ্বান জানান।

দাবি আদায়ে জীবন বিসর্জন

অদ্য মাগুরার এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবুর রহমান দাবি আদায়ের জন্য সকলকে জীবন বিসর্জনে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাঁচিয়া থাকার যদি কোন অর্থ থাকে তবেই বাঁচিয়া থাকুন, নইলে গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুবরণই শ্রেয়।

বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বিশেষভাবে সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের আলোকে ছয়-দফা দাবির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, উক্ত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগহীন হইয়া পড়ে। অথচ তথাকথিত সর্বসমর শক্তিধর কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের কোন প্রকার সাহায্যে আগাইয়া আসিতে পারেন নাই। যুদ্ধরত রাষ্ট্র ভারতের দ্বারা আমরা তখন পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ি। কিন্ত পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। একটি বিদেশি রাষ্ট্রের মধ্য রাত্রির হুঁশিয়ারির দরুন ভারত তখন পাকিস্তান আক্রমণ করে নাই চিন্তা করা গৌরবের বিষয় নহে। সরকার তখন নিজেদের শক্তি দ্বারা দেশকে রক্ষা করিতে পারেন নাই,

ইহা অবমাননাকর ছাড়া কিছু হইতে পারে না। নিজেরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে পারিব না এবং এজন্য অন্যের উপর ভরসা করিতে হইবে ইহা অপেক্ষা শোকাবহ কি হইতে পারে? যাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানে একটি অস্ত্র কারখানা স্থাপনেও রাজি নহেন, যুদ্ধের সময় তাহারা এই প্রদেশকে রক্ষার জন্য কি করিয়াছিলেন? দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ এখানে বাস করে। অথচ যুদ্ধের সময় আমাদের ভাগ্য শিকায় ঝুলিতেছিল।

তিনি বলেন, গত ১৮ বছরে পূর্ব পাকিস্তান ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়াছে। এখান হইতে অর্থ ও সম্পদ পাচার হইয়াছে। সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যের চরমে যাইয়া পৌছিতেছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যই আজ ছয়-দফা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। আর এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে।

মাগুরার এই জনসভায় প্রায় বিশ হাজার লোক যোগদান করেন এবং খররৌদ্রের তাপ অগ্রাহ্য করিয়া আওয়ামী লীগ নেতার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। মাগুরার ইতিহাসে দুপুরের প্রখর রৌদ্রে এত বড় জনসভা আর কখনও হয় নাই। বক্তৃতা শ্রবণের সময় শ্রোতারা দরদর হইয়া ঘামিতেছিলেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, শনিবার, ১৬ এপ্রিল ১৯৬৬

"জেল বহুবার দেখিয়াছি, বুলেটের আঘাতও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত"–শেখ মুজিব

খুলনা, ১৭ এপ্রিল ১৯৬৬

খুলনা, ১৭ এপ্রিল ১৯৬৬। আজ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পার্কে এক বিরাট জনসমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন, জেল আমরা বহুবার দেখিয়াছি, বুলেটের আঘাতও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত। আঘাত যতই প্রচণ্ড হইবে, আমাদের সংগ্রাম ততই জোরদার হইবে, আপসহীনভাবে চলিতেই থাকিবে।

শেখ সাহেব বলেন যে, সরকার ছয়-দফার উদ্যোক্তাদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুতি নিতেছেন। তাই, এক্ষণে জনসাধারণকেই সমস্যা অনুধাবন করিতে এবং ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ছয়-দফা জনসাধারণেরই কর্মসূচি এবং ইহা বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।

শেখ মুজিব বলেন, হিন্দু ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইলেই পাকিস্তানের দাবি উত্থাপিত হয় এবং মুসলমানরা পাকিস্তান কায়েম করে। আজ সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানিকেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ছয়-দফা আদায় করিতে হইবে।

অদ্য খুলনায় অনুষ্ঠিত এই জনসভা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ সফরকালীন সর্বশেষ জনসমাবেশ।

প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতায় শেখ সাহেব তাঁহার ছয়-দফার দফাওয়ারী বিশ্লেষণ করেন। প্রতিক্রিয়াশীল এবং কিছুসংখ্যক অতিপ্রগতিবাদী রাজনীতিক কেন ছয়-দফার বিরুদ্ধে জোট বাঁধিয়াছেন, তাহা অনুধাবনের জন্য তিনি জনসাধারণকে আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

ছয়-দফা বিশ্লেষণ করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, ছয়-দফা বঞ্চনার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ, ইহা আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গ্যারান্টি, ইহা সমগ্র পাকিস্তানের জন্যই

ম্যাগনাকার্টা বা বড় সনদ। ছয়-দফার সুযোগ গ্রহণে পশ্চিম পাকিস্তান নারাজ কেন– তাহাও তিনি ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন যে, সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সময় শক্তিশালী কেন্দ্র বা কেন্দ্রের শক্তিমান পুরুষের উপযোগিতা অনুভূত হয় নাই। যুদ্ধকালে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট কেন পূর্ব পাকিস্তানে আসিতে পারেন নাই, তাহা অনুধাবনের জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান গোটা দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, পাকিস্তানের মাতৃত্বের খাতিরে পূর্ব পাকিস্তান সকল প্রকারে আত্মত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু শুভেচ্ছার এই মনোভাবকে দুর্বলতা বলিয়া ভুল বুঝা হইয়াছে।

খুলনার মহামারী, জীবাণুযুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি স্থানীয় সমস্যাদি সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। দূষিত পানি সরবরাহের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন যে, স্থানীয় মন্ত্রীরা বিভিন্ন স্থানে উপদেশ খয়রাত করিতেছেন। কিন্তু মহামারী কবলিত খুলনার জনসাধারণের নিকট আসিতেছেন না। কারণ, জনসাধারণের জন্য তাঁহাদের কোন মমতা নাই, প্রভুর সন্তুষ্টি বিধানই তাঁহাদের কাজ।

সূত্র : ইত্তেফাক, মঙ্গলবার, ১৯ এপ্রিল ১৯৬৬

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত জবানবন্দি

ঢাকা, জুন ১৯৬৮

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠন করার জন্য আমাকে ইতোমধ্যেই কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ওই সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারি করা হয়–যেমন : ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মতো আমার পিছু লগিয়া থাকিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স–বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয়-মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারি কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেইসময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ, যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ, আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্ব-শান্তিতে আস্থাবান। আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান–ছয়-দফা কর্মসূচি উপস্থিত করি। ছয়-দফা কর্মসূচিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান–উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হইয়াছে।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়-দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয়-দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারি নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা-বলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেপ্তার করে।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন, কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন-বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, আটটায়, পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা–বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেটে লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন। কিন্তু আমি মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেপ্তার করে। এবারের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেইরাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীনে মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেপ্তারি প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সঙ্ঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, সম্ভবত আটই মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাতে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেপ্তার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহম্মদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহম্মদ চৌধুরীসহ বহু নেতা। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন অ্যাডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ অ্যাডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এমএনএ জনাব আমজাদ হোসেন, অ্যাডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার অ্যাডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তাফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ অ্যাডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধির ৩২ ধারার (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভাগিনেয়–পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকে কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান

শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করে। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেপ্তার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শই তাঁহার লোকজন এবং সরকারি কর্মচারী সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতদিন তিনি গদিতে আসীন থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন, আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের জানুয়ারির ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না। বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈনিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচার কার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ জুন, আমি প্রথম অ্যাডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে আমার অন্যতম কৌসুলি নিয়োগ করি।

কেবল আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয়-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, লে. মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-করপোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদিন আহম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারীকে কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান–এই তিনজন সি. এস. পি. অফিসারকে আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারি কার্য সম্পাদনকালে তাঁহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোন ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনদিন লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে কোন সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সহিত কোন আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজউদ্দিনের বাসায় সংগঠিত হয় নাই। ওই সকল ব্যক্তি কোনদিন

আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দিই নাই। আমি কখনও ডা. সাইদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাঁহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীর ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এমএনএ ও এমপিএ। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশজন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ; প্রাক্তন এমএনএ; এমপিএ ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাহাদের কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল. এম. এফ. ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোন সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহম্মেদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডা. সাইদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডা. সাইদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল- দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম, ছয়-দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে, তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন বিভাগ হইতে কোন প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না এবং এবম্বিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্রজাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোন কিছু করি নাই কিংবা কোনদিনও এই উদ্দেশ্যে কোন স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারীর সংস্পর্শে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৯ হতে ৩৬৩ (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানের এই লিখিত জবানবন্দি ১৯৬৮ সালের জুন মাসে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়)

শান্তি চাই আর চাই শৃঙ্খলা –শেখ মুজিব

ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গতকল্য (শনিবার) তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হওয়ায় আটকাবস্থা হইতে মুক্তিলাভের স্বল্পক্ষণ পরে স্বীয় বাসভবনের দ্বিতল বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমবেত জনসমুদ্রকে উদ্দেশ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তাঁহার মুক্তিলাভে দেশবাসীর বিজয় সূচিত হইয়াছে। তিনি আরো বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এক, অভিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ। শেখ মুজিব বলেন যে, ছাত্র-জনতার এ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মাহুতি কখনও বিফলে যাইবে না– যাইতে পারে না।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি দিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, দেশবাসীর প্রতিটি দাবি লইয়া তিনি অবিরাম সংগ্রাম করিয়া যাইবেন; কেননা, তিনি বিশ্বাস করেন যে, দেশ ও দেশবাসীর অধিকার ও স্বার্থের স্থান সর্বোচ্চ।

দেশের উভয়াংশের ছাত্র-জনতা যেভাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে সেজন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শেখ সাহেব বলেন, জনগণ এক মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, জাতি কোনদিন তাহা বিস্মৃত হইবে না।

দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশবাসীর দাবি দাওয়ার প্রশ্নে তিনি পর্বতের মতো অটল আছেন এবং তিনি মনে করেন যে, দেশবাসীর অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রক্কালে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে।

এক পর্যায়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শেখ মুজিব বলেন যে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যে সূর্য-সন্তানেরা অকালে হৃদয় নিংড়ানো রক্তে রাজপথ রাঙাইয়া গেলেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমার নাই। আজকের দিনে কোটি কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমিও বলি, "জয়– ছাত্র-জনতার জয়।"

অগণিত ভক্তের প্রেম-ভালোবাসার অনির্বাণ শিখার সামনে আকণ্ঠ মাল্যভূষিত হইয়া শেখ মুজিব দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, সংগ্রামী ছাত্ররা যে এগার-দফা দিয়াছেন তার প্রতি আমারও সমর্থন রহিল। কারণ, এগার-দফার মধ্যে আমার দলের ছয়-দফার রূপরেখাও রহিয়াছে।

দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনার প্রশ্নটির অবতারণা করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সফল করার পূর্বশর্ত। সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন যে, সংগ্রাম হইবে দুর্বার হইতে দুর্বারতর। সে সংগ্রামও পরিচালনায় মুহূর্তের জন্য যেমন বিরতির সুযোগ নাই, ঠিক তেমনি মুহূর্তের জন্য উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়ারও কোন অবকাশ নাই।

হ্রস্ব বক্তৃতার উপসংহারে দেশবাসীকে তিনি আশ্বাস দিয়া বলেন যে, সংগ্রামী বীর যাঁরা মুক্তি সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছেন আমরা তাঁদের রুধির ধারাকে ব্যর্থ হইতে দিব না। প্রয়োজনবোধে আমার নিজের রক্ত দিয়া বিগত কালের সংগ্রামী রক্তের সাফল্যকে চিরন্তন ও চিরজাগরূক রাখিব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ সাহেবের বাসভবনের বাহিরে এবং চতুর্দিকের রাস্তায় তিলধারণের ঠাঁইটুকুও ছিল না। কেবল মানুষ আর মানুষের ঢেউ আসিয়া যেন আছড়াইয়া পড়িতেছিল তাঁর বাসভবনের সম্মুখবর্তী সড়কে, আর লেকের পাড়ে। পাঁচ-দশ মিনিট পর পরই গাড়ি বারান্দায় আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিতে হইতেছিল আগ্রহী জনতার সাথে।

সূত্র : ইত্তেফাক, রবিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব

আমি ছ'দফা মানি, আমি এগার দফা মানি–

ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শনিবার বলেন যে, তিনি প্রথমে মওলানা ভাসানী ও পরে জনাব জেড এ ভুট্টো, বিচারপতি জনাব এস এম মুর্শেদ, এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং জেনারেল আজম খানের সঙ্গে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার পর 'ডাক' নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন।

শেখ সাহেব গতকাল ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বাসগৃহে পৌছানোর অল্প পরেই সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন যে, ছাত্রদের ১১-দফা কর্মসূচির প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি আগামীকাল সোমবার রাওয়ালপিন্ডির পথে লাহোর গমন করবেন। লাহোরে তিনি এয়ার মার্শাল আসগর খান, জেনারেল আজম খান প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

শেখ সাহেব বলেন, তিনি রাওয়ালপিন্ডি গমন করবেন, তবে তার অর্থ এই নয় যে, তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর মন্তব্য ব্যাখ্যা করেন নি।

তিনি আরো বলেন যে, তিনি আজ রবিবার রেসকোর্সের জনসভায় তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন।

সাংবাদিকদের সাথে তিনি যে কয়েক মিনিট আলোচনা করছিলেন, সে সময় তাঁর বাড়ির চতুর্দিকে সমবেত জনতা মুহুর্মুহু ধ্বনি দিতে থাকেন।

ইতিপূর্বে তাঁর ধানমণ্ডি বাসভবনে জমায়েত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমি জালেমকে ঘৃণা করি, মানুষকে ভালোবাসি, আজকের সংগ্রাম জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের।

সাম্প্রতিক আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শেখ মুজিব বলেন, শহীদের রক্তদানকে আমরা ভুলতে পারি না। শহীদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেব না।

বিপুল করতালির মধ্যে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, ছ'দফা আমি মানি। ছাত্রদের এগার দফাও আমি মানি। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের দাবিও আমি মানি। তিনি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সূত্র : *দৈনিক পাকিস্তান*, রবিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিয়া আবার কারাগারে যাইব, কিন্তু দেশবাসীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিব না

ঢাকার বুকে সর্বকালের বৃহত্তম গণসংবর্ধনা সভায় মুজিবের ঘোষণা

রমনা রেসকোর্স, ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঢাকার বুকের সর্বকালের বৃহত্তম গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গতকাল (রবিবার) আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, তিনি সরকার পক্ষের সহিত প্রস্তাবিত রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করিয়া দেশের উভয় অংশের পক্ষ হইতে দেশবাসীর অধিকারের দাবি উত্থাপন করিবেন এবং যদি উত্থাপিত দাবি গ্রাহ্য করা না হয়

তবে সে বৈঠক হইতে ফিরিয়া আসিয়া দাবি আদায়ের জন্য তিনি দুর্বারতর গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবেন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া বজ্রনির্ঘোষে তিনি ঘোষণা করেন যে, সংগ্রাম করিয়া আমি আবার কারাগারে যাইব, কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালোবাসার ডালি মাথায় নিয়া দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না। মুহুর্মুহু করতালি ও গগনভেদী জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, বঞ্চিত বাঙালি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পাঠান আর বেলুচের মধ্যে কোন তফাৎ নাই– কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতে দেশের উভয় অংশের জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হইল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক আজাদী।

গণ-সংবর্ধনায় সংগ্রামী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এগার-দফা দাবি আদায়ের সংগ্রামের সার্বিক দায়িত্ব শেখ মুজিবের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া তাহার নেতৃত্বের প্রতি ছাত্র-জনতার পক্ষ হইতে অকৃত্রিম আস্থা প্রকাশ করে।

অভূতপূর্ব গণমহাসাগরের সামনে দাঁড়াইয়া শেখ মুজিবুর রহমান সাম্প্রতিককালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যাহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, জেলের তালা ভাঙ্গিয়া আমাদেরকে যে মুক্ত করিয়া আনা হইয়াছে তা ছাত্র-জনতার সংগ্রামের এক মহাস্মরণীয় বিজয়। এই বিজয়ের দিনে তিনি ছাত্রদের এগার-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া এগার-দফার সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে শরিক থাকিবেন বলিয়াও সবাইকে আশ্বাস দান করেন।

প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর যোগদানের প্রশ্নে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, আলোচনায় আমি অবশ্যই যাইব– কারণ, নির্ভীক ও আপসহীনভাবে কিভাবে দাবি পেশ করিতে হয় আমি তা জানি। দাবি আদায় না হইলে আবার আমি সংগ্রামকে দুর্বার হইতে দুর্বারতর করিয়া তুলিব, আবার আমি কারাগারে যাইব, আবার ছাত্র-জনতা সংগ্রাম করিয়া জেল হইতে আমাকে বাহির করিয়া আনিবে।

তাঁহার রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সংক্ষিপ্ত রূপরেখার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট চাই এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, চাকরি-বাকরি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব পর্যায়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব চাই। আমি শ্রমিকের শ্রমের নায্যমূল্য চাই, কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য চাই, সাংবাদিকদের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চল– পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। এই দুই অঞ্চলের জন্যই আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যদি এক ইউনিট বাতিল করিতে চায় তবে অবশ্যই এক ইউনিট বাতিল করিতে হইবে এবং সাবেক প্রদেশগুলি "প্রাদেশিক" স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হইবে।

শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য মহল্লায় মহল্লায়, শহর, বন্দর, গঞ্জে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন। দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে, আন্দোলন আমাদের চলিবেই; কিন্তু যে প্রকারেই হোক আমাদের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে। সেই সাথে তিনি সরকারকেও সর্বপ্রকার উস্কানিমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

সরকারের প্রতি তিনি রাজনৈতিক হুলিয়া ও সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার এবং সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়ার দাবি জানান। প্রতিদানে তিনি সরকারকে আশ্বাস দেন যে, দেশে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব সংগ্রাম কমিটিই বহন করিবে।

মৃত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য প্রসঙ্গে

শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশব্যাপী সাম্প্রতিক গণহত্যার ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (নিহত ও আহত) জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের দাবি জানান। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি বেসরকারি সাহায্য কমিটি গঠন করা হইবে এবং উক্ত তহবিলের জন্য সকল মহলের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালানো হইবে।

গণ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গণনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ, ছাত্রনেতা খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাইফুদ্দিন মানিক, মোস্তফা জামাল হায়দার, মাহবুবুল হক দোলন ও মাহবুবুল্লাহ নেতাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ভাষণ প্রদান করেন।

ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা

শেখ মুজিবুর রহমান অতঃপর তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে "ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা" নামে অভিহিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব গতকাল রেসকোর্স ময়দানে "ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলার" পটভূমি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত যখন লাহোর আক্রমণ করে তখন পূর্ব পাকিস্তানের ৬ কোটি মানুষ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যে, লাহরের উপর আক্রমণ পূর্ব পাকিস্তানের উপরই আক্রমণ। এই মনোভাবের মধ্যে দিয়া পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় ঐক্যের এক চরম প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যাপক দূরত্বের ফলে সৃষ্ট বাস্তব সমস্যাদি প্রকট হইয়া দেখা দেয় এবং সবাই উপলব্ধি করিতে শিখে যে, একরাষ্ট্র হইলেও চরম বিপদের সময় কেহ কারও প্রত্যক্ষ কোন উপকারে আসে না। এই উপলব্ধির আলোকেই আমরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ছয়-দফা প্রণয়ন করি।

শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করিতে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ছয়-দফায় তাই শঙ্কিত হইয়া উঠে এবং যে কোন প্রকারের হিংস্রতা ও বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হইলেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের এই দাবিকে দাবাইতে বদ্ধপরিকর হয়। এর ফলশ্রুতিই হইল এই তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলা সাজানোর মন্ত্রণালয় ছিল ইসলামাবাদ।

"এই দেশেতে জন্ম আমার–"

গণসংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে সামরিক হেফাজতে প্রেরণের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি হৃদয় বিদারক কিন্তু গুপ্তশপথের প্রজ্ঞাবহ ঘটনার অবতারণা করেন।

তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, দীর্ঘ দুই বৎসর নিরাপত্তা আইনে কারাগারে থাকার পর একদিন শুনিলাম, সরকার আমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। বিশ্বাস করি নাই। অবিশ্বাসে ভর করিয়া কারাগার ফটকে আসিয়া দেখি, আশঙ্কা অমূলক নয়। সঙ্গীন উঁচাইয়া ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা দণ্ডায়মান। ওরা আসিল, 'শেখ সাহেব, আপনাকে আবার গেপ্তার করা হইল।' আমি জানিতে চাহিলাম, 'কোন্ আইনে?' ওরা কি সব বলিল বুঝি নাই। একটা গাড়ি দেখাইয়া বলিল, 'উঠুন।' মনে মনে চরমক্ষণের জন্য প্রস্তুতি লইলাম। বলিলাম, 'এক মুহূর্ত সময় চাই।' এই মুহূর্তে কারাগারের সামনের রাস্তা হইতে এক মুঠি মাটি লইয়া কপালে লাগাইয়া খোদার কাছে আকুতি জানাইলাম, "এই দেশেতে জন্ম আমার, যেন এই দেশেতেই মরি।"

ঘটনার বর্ণনা দানকালে শেখ সাহেবের কণ্ঠ বুঝিয়া আসিতেছিল প্রবল উচ্ছ্বাসে আর সংবর্ধনা সভার মহাসমুদ্র বিচিত্র দেশপ্রেমের অপূর্ব মহিমার শিহরণ উপলব্ধি করিতেছিল নিষ্পলকে।

রবীন্দ্রসংগীত শুনিবই

বন্দিদশা হইতে সদ্যমুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীতের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের দাবি জানাইয়াছেন।

গতকাল (রবিবার) রেসকোর্সের গণসংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর বর্তমান সরকারের হামলায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, জ্ঞান আহরণের পথে এই সরকার যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন তার নজির বিশ্বে বিরল। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, আমরা মির্জা গালিব, সক্রেটিস, সেক্সপিয়ার, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাওসেতুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখিয়া যিনি বিশ্বকবি হইয়াছেন। শেখ মুজিব দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আমরা এই ব্যবস্থা মানি না– আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়িবই, আমরা রবীন্দ্রসংগীত গাহিবই এবং রবীন্দ্রসংগীত এই দেশে গীত হইবেই।

শেখ মুজিবের রেডিও এবং টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীতের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া অবিলম্বে রেডিও ও টেলিভিশন হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের জোর দাবি জানান।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোমবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

"বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে শেখ মুজিব

রমনা রোসকোর্স, ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের গণমহাসাগর গতকাল (রবিবার) পূর্ব বাংলার নির্যাতিত জননায়ক শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও গতকল্যকার গণসংবর্ধনা সভার সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে অবিচল ও অবিরাম সংগ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ঢাকার ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমরা বক্তৃতা বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করার প্রয়াস পাই। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করিলে যে সত্যটি সবচাইতে ভাস্বর হইয়া উঠে তা হইতেছে তিনি মানব দরদী- বিশেষ করিয়া বাংলা ও বাঙালির দরদী, প্রকৃত বন্ধু। তাই, আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমুদ্রের পক্ষ হইতে আমরা তাঁকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করিতে চাই। রেসকোর্সের জনতার মহাসমুদ্র তখন একবাক্যে বিপুল করতালির মধ্য দিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোমবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ঢাকা ত্যাগকালে মুজিব

দল গঠনের স্বাধীনতা বিধান করিতে হইবে

ঢাকা বিমানবন্দর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলীয় নয়জন প্রতিনিধি সমভিব্যহারে গতকাল (সোমবার) লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগকালে ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, দল সংগঠনের স্বাধীনতা এমনকি কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকার পক্ষে মত্ প্রকাশ করেন।

পিন্ডির উদ্দেশ্যে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে শেখ মুজিব তেজগাঁও বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, লাহোরে তিনি নির্দলীয় বিশিষ্ট নেতা এয়ার মার্শাল আজগর খান, জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান, বিচারপতি জনাব এস. এম. মোর্শেদ, জনাব ভুট্টো এবং তার ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। তারপর তিনি পিন্ডি গমন করিবেন এবং সেখানে ডাক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করিবেন।

সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, লাহোরে তিনি কয়দিন থাকিবেন তা নির্ভর করিতেছে সেখানকার আলাপ-আলোচনার উপর। লাহোরে আলোচনা শীঘ্র সম্পন্ন হইলে তিনি শীঘ্র পিন্ডি গমন করিবেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের স্বাধীনভাবে তাদের কর্মসূচি প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত– এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিকেও স্বাধীনভাবে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী।

পররাষ্ট্রনীতি ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তিনি এই পর্যায়ে সরাসরি কোনরূপ আলোচনায় যাইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, কিছু একটা ঘটিতে পারে এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করা এই পর্যায়ে সমীচীন নয়।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, গত দশ বৎসরে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে দেশব্যাপী সহস্র শ্রেণীর সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্যা যে কত ব্যাপক তার পরিধি নির্ণয় করাই আজ দুরূহ ব্যাপার হইয়া দেখা দিয়াছে। এইসব সমস্যাকে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে সমাধান করাই আজ আমাদের দায়িত্ব।

ডাকের আট-দফা সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ডাকের আট-দফা কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, ইহা বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে প্রদত্ত পূর্বশর্ত মাত্র এবং আমাদের বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাতের ন্যূনতম একটা ভিত্তি মাত্র।

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, এগার-দফার তিনি শুধু সমর্থকই নন, তাঁর দলের ছয়-দফা ছাত্ররা তাদের সংগ্রামী এগার-দফায় স্থান দিয়াছেন দেখিয়া তিনি গৌরববোধ করিতেছেন।

আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের সদস্য মেসার্স তাজউদ্দিন আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মোমেন, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, এমএ আজিজ, ময়েজউদ্দিন এবং এম রহমান একই বিমানে লাহোর যান। সোহারাওয়ার্দী তনয়া বেগম সোলায়মান, তার স্বামী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী ডক্টর কামাল হোসেনও একই বিমানে লাহোর যান।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, মঙ্গলবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

দক্ষিণপন্থীও নই বামপন্থীও নই
"আমি দেশবাসীর স্বার্থের পক্ষে" –শেখ মুজিব

লাহোর বিমানবন্দর, পাকিস্তান, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য বলেন যে, লাহোর উপস্থিতির পর তথাকার অধিবাসীবৃন্দ তাহাকে যে আন্তরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহাতে তিনি অভিভূত হইয়াছেন।

শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডি যাত্রার পূর্বে লাহোর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন যে, লাহোরের বীর নাগরিকদের ভালোবাসা ও অনুরাগের কথা তিনি সর্বদাই স্মরণ রাখিবেন।

এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান প্রমুখ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি তাহাদের সহিত আলোচনায় পুরাপুরি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

পূর্বাহ্নে শেখ মুজিবুর রহমান এবং পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড এ ভুট্টো একই বিমানযোগে ঢাকা হইতে লাহোর পৌছিলে বিমানবন্দরে তাহাদের বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পিডিএম, পিপলস পার্টি এবং আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক কর্মী সংবর্ধনায় অংশ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মালিক গোলাম জিলানী, জনাব জেএ রহীম, জনাব মাহমুদ আলী কাসুরী, এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান উল্লেখযোগ্য।

বিমানবন্দরে এত বিপুল জনসমাগম হয় যে, বিমানের পক্ষে পার্কিং বে'তে পৌছানো একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিমানটি ট্যাক্সিওয়েতে থামিয়া যায় এবং জনাব ভুট্টো জনগণকে পিছনে সরিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু জনতা তাহাকে সেখানেই অবতরণ করিতে বাধ্য করে এবং তাহার পার্টির একটি ট্রাকে উঠিয়া বসিতে বলে। তখন তাহাকে শোভাযাত্রা সহকারে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়।

অনুরূপভাবে শেখ মুজিবও সেখানেই বিমান হইতে অবতরণ করেন এবং তাহাকে শোভাযাত্রা সহকারে বাহিরে নেওয়া হয়।

এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং লে. জেনারেল আজম খান তাঁহার কর্মসূচি সমর্থন করিবেন কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে তাঁহার কোন "মন্তব্য নাই" বলিয়া জানান। তিনি বলেন, তাহাদের সহিত আলোচনায় আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছি, এত আগে সে কথা বলা যায় না।

বামপন্থী কিংবা দক্ষিণপন্থী নই, স্বদেশপন্থী

জনৈক বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, আমি বামপন্থীও নই, কিংবা দক্ষিণপন্থীও নই, আমি আমার স্বদেশবাসীর স্বার্থের পক্ষে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তাহার দল নিরপেক্ষ এবং "সকলের সহিত বন্ধুত্ব কাহারও সহিত শত্রুতা নয়"– এই বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী।

দুর্নীতি প্রসঙ্গ

দেশে বিরাজমান দুর্নীতি প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, উহা বর্তমান সরকারেরই অবদান এবং দর্নীতি বিরোধী কমিটি ও কমিশন গঠনের দ্বারা উহা উচ্ছেদ করা যাবে না। তবে জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দ ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উহার অবসান ঘটিবে। তিনি বলেন যে, দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব মুসলিম লীগকে বিরোধী দলে পরিণত করার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি সেই সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে বিরত থাকেন।

শেখ মুজিব পিন্ডি অবস্থানকালে 'ডাক' নেতৃবৃন্দের সহিত "গুরুত্বপূর্ণ বিষয়" আলোচনা করিবেন বলিয়া জানান। -এপিপি

সূত্র : *দৈনিক পয়গাম*, বুধবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গণদাবির প্রশ্নে লেন-দেনের কোনই অবকাশ নাই

লাহোরে শেখ মুজিবের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা

লাহোর, পাকিস্তান, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে আলোচনার অবকাশ আছে কি না, লাহোরের সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, জনগণের অধিকারের প্রশ্নে কোন লেন-দেন হইতে পারে না। জনগণের অধিকার আমরা কোনক্রমেই বিসর্জন দিব না।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সমগ্র দেশে আজ দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। দেশের উভয় অংশে প্রতিদিন নিরীহ মানুষ গুলিগোলার মুখে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে– ইহার একটা হিল্লা করিতেই হইবে। জনগণের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই একমাত্র পথ।

ইত্তেফাকের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাইতেছেন যে, পিন্ডিতে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৬ কোটি মানুষের স্বার্থের প্রতিকূলে তিনি তাঁহার ছয়-দফা কর্মসূচি বর্জন করিতে কখনই প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, ডাকের ৮-দফা কর্মসূচি আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে বিরোধী দলসমূহের পূর্বশর্ত মাত্র এবং এই ৮-দফার মধ্যে একটি দফা ব্যতীত অপর সব কয়টি দফাই প্রশাসনিক নির্দেশ মারফত বাস্তবায়িত করা চলে।

সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তাহার মনঃপূত হইয়াছে কি-না, এই প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন, জনগণের জন্য জনগণ কর্তৃক প্রণীত একটি শাসনতন্ত্রই আমাদের কাম্য। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার বা অন্যবিধ যেসব টুকটাক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা কাহারো দয়ার দান নয়। জরুরি অবস্থার ছত্রচ্ছায়ায় কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার ও ক্ষমতাসীন সরকারের আটবাট বাঁধার কাজেই জরুরি ক্ষমতা ব্যবহার করা হইয়াছে।

নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় আওয়ামী লীগ ও অপরাপর দলগুলির মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, কেবল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্যই আমি একত্রিত হইয়াছি এবং যৌথ কর্মসূচিও পেশ করিয়াছি।

সূত্র : ইত্তেফাক, মঙ্গলবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

লাহোর ও চাকলালা বিমানবন্দরে নেতৃসংবর্ধনার নয়নাভিরাম দৃশ্য

প্রেসিডেন্ট হইতে চাহি না -শেখ মুজিব

উল্লসিত জনতার চাপে শেখ মুজিবের ভিন্নপথে নিস্ক্রমণ

রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

রাওয়ালপিন্ডি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আজ সন্ধ্যায় লাহোর হইতে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতা বিমানবন্দরের বিরাট জনতার ভিড় এড়াইবার জন্য পাইলটের দরজা দিয়া বাহির হইয়া একখানা মোটরে চড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় তাহাকে খোশ আমদেদ জ্ঞাপনের জন্য বিমানবন্দরে সমাগত জনতাকে হতাশ হইয়া ফিরিতে হয়।

রাত্রি ৮.১০ মিনিটের সময় বিমানবন্দরে অবতরণ করিলে 'পিন্ডি-ঢাকা এক' ধ্বনিরত বিরাট জনতা বিমানখানা ঘিরিয়া ফেলে। ফলে গ্যাংওয়ে বন্ধ হইয়া যায়। বিমান হইতে অবতরণের জন্য আওয়ামী লীগ নেতাকে প্রায় ৪০ মিনিট জনতার সহিত লুকোচুরি খেলিতে হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানকে পথ করিয়া দেওয়ার জন্য তাহার নিজের এবং মালিক গোলাম জিলানীর পুনঃপুন আবেদন নিবেদনও ব্যর্থ হইয়া যায়। দুইজন স্থানীয় ছাত্র নেতা– শেখ আবদুর রশীদ ও হিশামুল্লাহ শেখ মুজিবুর রহমানকে পথ করিয়া দেওয়ার জন্য জনসমুদ্রের প্রতি বার বার আবেদন জানান। কিন্তু তাহাতেও কোন কাজ হয় না।

অবশেষে নেতৃবৃন্দ বাধ্য হইয়া পাইলটের ককপিটের কাছে একখানা গাড়ি প্রেরণ করেন এবং শেখ সাহেব উহাতে উঠিয়া সোজা পূর্ব পাকিস্তান হাউজে চলিয়া যান। তিনি সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমানকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য যাহারা চাকলালা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, সরদার শওকত হায়াত খান ও মুফতি মাহমুদের নাম উল্লেখযোগ্য।

লাহোরে সংবর্ধনা

সকালে সদ্য কারামুক্ত আওয়ামী লীগ নেতাকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য লাহোর বিমানবন্দরে এক অভূতপূর্ব জনসমাবেশ ঘটে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে লইয়া আগত বিমানখানা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠে জিন্দাবাদ ধ্বনি দ্বারা জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়।

বিমানবন্দরে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে এয়ার মার্শাল আসগর খান, লে. জেনারেল আজম খান, মিয়া মাহমুদ আলী আসুরী, মালিক গোলাম জিলানী ও জনাব জে. এ. রহীমের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিমানবন্দরে উপস্থিত বিরাট জনতা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গাইয়া বিমানবন্দর ছাইয়া ফেলে। ফলে বিমানের পার্কিংওয়েতে অবতরণ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিমানখানা টেক্সিওয়েতে অবতরণ করে।

এই পর্যায়ে জনাব ভুট্টো বিমান হইতে মাথা বাহির করিয়া জনতাকে সরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বরং তাহাকে বিমান হতে অবতরণ করিতে বাধ্য করে। অতঃপর তাহাকে একখানা ট্রাকে তুলিয়া দলীয় কর্মীগণ শোভাযাত্রা সহকারে বিমানবন্দর ভবনের বাহিরে লইয়া যায়।

অনুরূপভাবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকেও বিমান হইতে নামাইয়া শোভাযাত্রা সহকারে নিয়া যাওয়া হয়। বিমান হইতে অবতরণের পর তাহাকে একে একে মাল্যভূষিত করেন এয়ার মার্শাল আসগর খান, বিচারপতি মোর্শেদ ও জেনারেল আজম।

বিমানবন্দর হইতে জাতীয় বীরকে বিরাট এক শোভাযাত্রা সহকারে আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম জিলানীর গুলবাগস্থ বাসভবনে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট হইতে চাহি না

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর বিমানবন্দরে নীতিগতভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তিনি বলেন যে, পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারই তাহার দলের দাবি এবং তাহারা প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার পছন্দ করেন না। এমতাবস্থায় তাহার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের যে দাবি উত্থাপন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার এবং তিনি গতকাল ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাতে তিনি অটল। তবে তিনি ব্যাপারটা কোন সম্মেলন টেবিলে উত্থাপনের পূর্বে ডাক নেতৃবৃন্দ ও দল নিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া জানান।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, মঙ্গলবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ

রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান, ১০ মার্চ ১৯৬৯

রাওয়ালপিন্ডি, ১০ মার্চ ১৯৬৯। শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্যে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে যে সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন, তাতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং জুলফিকার আলি ভুট্টো ছাড়া পাকিস্তানের আর সব রাজনৈতিক নেতাই যোগদান করেন। এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয়-দফা ও এগার-দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব পেশ করেন –সম্পাদনা পরিষদ

১৯৬৯ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বৈঠক শুরু হয় ১০ মার্চ থেকে এবং ওইদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

মি. প্রেসিডেন্ট এবং ভদ্রমহোদয়গণ,

জাতি আজ একটি সংকট মোকাবিলা করছে যা তার ভিতকেই কাঁপিয়ে দিয়েছে। যারা জাতিকে ভালোবাসেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে কৃত ত্যাগকে স্মরণ করেন, বর্তমান সময় তাদের জন্যে গভীর উদ্বেগের। সংকটটি নিরসনের জন্যে এর প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা এবং এর কারণ নির্ণয় করা অবশ্য কর্তব্য। দেশে যে অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে, তার ভেতরকার মৌন প্রশ্নগুলোর সঙ্গে এঁটে উঠতে ব্যর্থ হলে তার চেয়ে বিপর্যয়কর আর কিছু হতে পারে না। একুশ বছর যাবৎ এই বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ন্যায়সঙ্গতভাবে এসবের মুখোমুখী হওয়ার সময় এসে গেছে। আমি নিশ্চিত যে আমাদের সমস্যাগুলোর সামগ্রিক সমাধান পেতেই হবে, কারণ, পরিস্থিতি পরিষ্কারভাবেই কোন রকম এবং আধাআধি ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাল দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক। আমাদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে।

মৌলিক বিষয়সমূহ

এই প্রত্যয় থেকেই আমি আমাদের মৌলিক সমস্যাগুলোর একটি সামগ্রিক রূপ ব্যাখ্যা করার দায় বোধ করি। যদি জনগণের বিভিন্ন অংশ কর্তৃক উত্থাপিত দাবিগুলো সযত্নে পরীক্ষা করা হয়, দেখা যাবে যে তাদের ভেতরে তিনটি মৌলিক বিষয় রয়েছে।

প্রথমটি হচ্ছে, রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

দ্বিতীয় হলো, জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি অর্থনৈতিক অবিচার। এই সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশ হলেন শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন এবং মধ্য আয়ের লোক, যাদের বহন করতে হয়েছে উন্নয়নের ব্যয়ের বোঝা, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির আকারে; অথচ উন্নয়নের সুফল ক্রমবর্ধমানভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে কয়েকটি পরিবারের হাতে, যারা আবার একটি এলাকায় কেন্দ্রীভূত।

তৃতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অবিচারের বোধ; যারা দেখতে পাচ্ছে যে বিদ্যমান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা কার্যকর রাজনৈতিক ক্ষমতা না পাওয়ায় তাদের মৌলিক স্বার্থ ধারাবাহিকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্বতন সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোও বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় একইরকম ক্ষুব্ধ।

রাজনৈতিক অধিকার

রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চনার প্রশ্নটি পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের এগার-দফা কর্মসূচি এবং আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কর্মসূচিতে প্রকাশ পেয়েছে সংসদকে মুখ্য করে তোলার

নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবি হিসেবে। ওই সংসদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং তাতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিরা জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত হবে।

অর্থনৈতিক অবিচারের বিষয়টি দেশের অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্যে পরিষ্কার-প্রণীত দাবির আকারে এগার-দফা কর্মসূচিতে প্রতিফলিত। আমার দলের ছয়-দফা কর্মসূচি আমূল অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনকে নির্দেশ করে, এবং এতে উপস্থাপিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং কার্যকর অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসেবেই গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

বিভিন্ন অঞ্চল এবং প্রদেশের প্রতি ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি হচ্ছে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানকারী একটি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার দাবির ভিত্তি, এগার-দফা এবং ছয়-দফা কর্মসূচিতে যা মূর্ত হয়েছে। এক ইউনিট ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একটি উপ-ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার দাবির ভিত্তিও সেটাই।

এই গুরুত্বপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং জাতীয় বিষয়সমূহ নিয়ে ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটিতে খুঁটিনাটি আলাপ-আলোচনা হয়েছে। নিম্নলিখিত সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধনের জরুরি প্রয়োজন সম্পর্কে ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি সর্বদাই সম্পূর্ণ একমত ছিল।

ক. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি প্রতিষ্ঠা;

খ. সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচনের একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন;

নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলোতেও ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটিতে একটি ঐকমত্য প্রায় অনুভবযোগ্য ছিল :

ক. এক ইউনিট ভেঙে দেওয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একটি উপ-ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা;

খ. অঞ্চলটিকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

আবশ্যকীয়সমূহ

কমিটি আরো একমত হয় যে, এর সদস্যরা আরো প্রস্তাব উপস্থিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করবেন, যা বর্তমান সংকটের মূলে যে সমস্যাগুলো রয়েছে, তার কার্যকর এবং স্থায়ী সমাধান অর্জনের জন্যে আবশ্যকীয়।

যেহেতু আমরা তেমন একটি কার্যকর এবং স্থায়ী সমাধান খোঁজার উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি, সেহেতু আমি সকল একাগ্রতা নিয়ে এই সম্মেলনে জোর দিয়ে এটা বলাই আবশ্যিক কর্তব্য মনে করছি যে, এই টেবিলে উপস্থিত প্রত্যেকের এটা উপলব্ধি করা উচিত যে একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং সবল পাকিস্তান অর্জনের জন্যে ফেডারেল আইনসভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা এবং ছয়-দফা কর্মসূচিতে যেভাবে বর্ণিত আছে সেভাবে সম্পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান আবশ্যকীয়।

এক ব্যক্তি এক ভোট

আমি এ কথা বলতে চাই যে, আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি দল। এর প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। আমি কিছুটা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করছি যে, তাঁর নেতৃত্বে আমার সহকর্মী এবং আমি পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রামের অগ্রবাহিনীতে ছিলাম। সম্মেলনে আমি যে সব প্রস্তাব পেশ করছি, সেগুলো এই প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, ওইগুলো পাকিস্তানকে রক্ষা এবং প্রকৃতপক্ষে মজবুত করার জন্যে অত্যন্ত আবশ্যকীয়।

ফেডারেল আইন সভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবি গণতন্ত্রের প্রথম নীতি : এক ব্যক্তি এক ভোট থেকে উৎসারিত। ছয়-দফা কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত জাতীয় ফোরামে বিবেচনার জন্যে আসবে শুধু জাতীয় বিষয়সমূহ। অতএব, সেখানকার প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান থাকবে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো বিবেচনা করার, এবং সে কারণেই ভোট প্রদান আঞ্চলিক ভিত্তিতে হবে না। উপরন্তু, জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো ফেডারেল সংসদে প্রতিনিধিত্ব পাবে, যার ফলে নিশ্চিত হবে যে ভোটাভুটি পার্টিভিত্তিতে হবে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে নয়। প্রকৃতপক্ষে, গত একুশ বছরের অভিজ্ঞতা এ সত্যকেই প্রমাণ করে যে জাতীয় পরিষদে ভোট হয়েছে ব্যতিক্রমহীনভাবেই দলগত ভিত্তিতে।

মিথ্যে সিদ্ধান্তসূত্রসমূহ

প্রতিটি অংশের প্রতিনিধিত্বে সমতার নীতিই বরং এই মিথ্যে সিদ্ধান্ত সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে ফেডারেল সংসদের প্রতিনিধিরা আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভোট দেবেন। সমতার নীতিটিই জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিকতার উপাদানটির ওপর একটি অযুক্তিসিদ্ধ গুরুত্ব প্রদান করে। গত একুশ বছরের সমগ্র ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এ সত্যকেই প্রমাণ করে যে, পূর্ব পাকিস্তান সর্বদাই তার আঞ্চলিক স্বার্থকে চেপে-আসা জাতীয় স্বার্থের অধস্তন করে রেখেছে, অথচ জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ পূর্ব পাকিস্তানের।

এটা স্মরণ করার প্রয়োজন নেই যে, প্রথম গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের ২৮ জনের বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ৪৪ জন প্রতিনিধি, যদিও কোন আঞ্চলিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ওই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ব্যবহার করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, গণপরিষদে ৬ জন পশ্চিম পাকিস্তানিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত করা হয়।

ত্যাগ স্বীকার

সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, শুধু সংসদে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থায়ও পূর্ব পাকিস্তান সমতার নীতিকে মেনে নেয়। এটা লিপিবদ্ধ করা বেদনাদায়ক যে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটা যতটুকু, ততটুকু পর্যন্ত সমতা দ্রুত কার্যকর করা হয়, কিন্তু জনপ্রশাসন, পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা বিভাগসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থায় প্রতিনিধিত্বে সমতার সুবিধে কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে প্রদান করা হয় নি।

ফেডারেল রাজধানী এবং প্রতিরক্ষা সদর-দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপনকে পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান নীরবে মেনে নিয়েছে। এর অর্থ প্রতিরক্ষা এবং বেসামরিক প্রশাসনে কৃত ব্যয়ের মোটা অংশ, যার পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকা কিংবা কেন্দ্রীয় বাজেটের ৭০ শতাংশ, পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়। আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা যদি ফেডারেল আইনসভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করে চলেন, পূর্ব পাকিস্তান তাহলে ফেডারেল রাজধানী এবং প্রতিরক্ষা সদর-দপ্তরসমূহ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরণের জন্যে গোঁ ধরতে বাধ্য হবে।

ইতিবাচক পদক্ষেপ

পাকিস্তানের দুটো অংশের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়করণে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হবে যদি আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা ফেডারেল আইনসভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবির বিরোধিতা না-করে তাদের পূর্ব পাকিস্তানি ভাইদের ওপর তাদের আস্থা ঘোষণা করেন। তেমন একটি পদক্ষেপ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা পুনঃস্থাপনের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হবে।

দেশের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অর্জনে ছয়-দফা কর্মসূচিতে উপস্থাপিত ফেডারেল পরিকল্পনা গ্রহণ একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। আমি পুনরায় বলতে চাই যে, ছয়-দফা কর্মসূচির

অন্তর্লীন চেতনা হলো জাতিসমূহের সমাবেশে পাকিস্তান নিজেকে ১২ কোটি মানুষের একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করবে। এই লক্ষ্য সাধিত হবে ফেডারেল সরকার প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় এবং মুদ্রা—এই তিনটি বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে। একটি শক্তিশালী এবং সবল পাকিস্তান পাওয়ার লক্ষ্যেই আমাদের ভূগোলের সত্যগুলোকে ন্যায্য গুরুত্ব দিয়ে অঞ্চলগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, যাতে তারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত সকল ব্যাপারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারে।

আমাদের সমাজকে একটি সুষম ভিত্তিতে ফিরিয়ে নিতে চাইলে অর্থনৈতিক অবিচার দূর করার একান্ত জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আমাকে দিতেই হবে। ছাত্রদের যে এগার-দফা কর্মসূচির প্রতি আমি সমর্থন ব্যক্ত করেছি, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রস্তাব সেখানে রয়েছে। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অর্জনের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা থেকে এই দাবিগুলো উৎসারিত।

অবশ্য আমি এখন সাংবিধানিক পরিবর্তনের বিষয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, মানুষে-মানুষে এবং অঞ্চলে-অঞ্চলে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অর্জনের জন্যে যা প্রয়োজনীয়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীকরণ বিরাজমান অর্থনৈতিক অবিচারকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলে তাকে সংকটের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। বাইশ পরিবারের বিষয়টি সম্পর্কে আমার বিশদভাবে বলার তেমন কোন প্রয়োজন নেই, ক্ষমতার বারান্দাগুলোতে তাদের অবাধ প্রবেশাধিকারের ফলে তাদের হাতে সম্পদের স্তূপ জমে যাওয়ায় দেশে-বিদেশে ইতোমধ্যেই তারা যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছে। একচেটিয়া পুঁজি এবং ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের সিন্ডিকেট তৈরি করা হয়েছে এবং একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হয়েছে, ফলে সুবিধেভোগী কতিপয় এবং শ্রমিক-কৃষকদের দুর্দশাভোগী বহুসংখ্যকের মধ্যকার ব্যবধান অনেক বেশি বেড়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোর ওপর মোটা দাগের অবিচার করা হয়েছে।

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের অসমতা সম্পর্কে সকলেই জানেন। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকেই প্ল্যানিং কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেব করে দেখান যে, দু-অঞ্চলের মধ্যে আয়ের এই অসমতার পরিমাণ ছিল ৬০।

জাজ্বল্যমান অবিচার

প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মধ্য পরিকল্পনার মেয়াদি পর্যালোচনা এবং অন্যান্য সাম্প্রতিক দলিল দেখাচ্ছে যে প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের অসমতা স্থিরভাবে বাড়ছে এবং এখন তা ষাটের চেয়ে অনেক বেশি। ওইরূপ অসমতার নিচে রয়েছে দু-অঞ্চলের সাধারণ অর্থনৈতিক কাঠামো এবং অবকাঠামোর অসমতা, চাকরি ক্ষেত্রে, শিক্ষার সুযোগে, চিকিৎসা এবং কল্যাণমূলক সেবায় অসমতা। মাত্র কয়েকটি উদাহরণ যদি দেই দেখব, পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ৫-৬ গুণ বেশি; ১৯৬৬ সনে পশ্চিম পাকিস্তানে হাসপাতাল শয্যার সংখ্যা ২৬,২০০, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬১-'৬৬ সময়পর্ব যা ৬,৯০০; পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে এগুলো স্থাপিত হয়েছে মাত্র ১৮টি। উপরন্তু, সম্পদের সামগ্রিক প্রাপ্তির অসমতা আরো অনেক বেশি। সকল বৈদেশিক সাহায্যের ৮০ ভাগ-এর বেশি ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো তো ছিলই। এর ফলে বিশ বছর সময়পর্বে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে তার নিজের রপ্তানি আয়ের মোট ১,৩৩৭ কোটি টাকার পাশাপাশি ৩,১০৯ কোটি টাকার পণ্য আমদানি সম্ভব হয়, যেক্ষেত্রে একই সময়ে

১,৬৫০ কোটি টাকার রপ্তানি আয় সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান আমদানি করতে পারে ১,২১০ কেটি টাকার পণ্য। এসব সত্যই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক অবিচারের ভিত্তি। সম্ভব সংক্ষিপ্ততম সময়ে প্রদেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক অসমতা দূর করার সাংবিধানিক দায় পূরণে ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। অসমতা বিষয়ক ১৯৬৮ সনের বার্ষিক রিপোর্ট জাতীয় সংসদের সামনে বিবরণ তুলে ধরেছে যে, অসমতা-বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

একটি সাহসী পরিকল্পনা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীভবন এভাবেই অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অর্জনের লক্ষ্য পূরণে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অঞ্চলে-অঞ্চলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের সাংবিধানিক দায় পূরণে তা ব্যর্থ। কেন্দ্রীকৃত আর্থিক ব্যবস্থাপনা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়াতে, এরূপ ব্যবস্থায় পড়ে থাকার পরিবর্তে এই দুরূহ সমস্যার একটি সাহসী এবং কল্পনাসমৃদ্ধ সমাধান আমাদের গ্রহণ করা উচিত। আমার মতে, ছয়-দফার ফেডারেল পরিকল্পনা তেমন একটি সাহসী এবং কল্পনাসমৃদ্ধ সমাধান।

বিশুদ্ধ সারাংশে, এটি হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অঞ্চলগুলোকে প্রদান। এ প্রস্তাব এই প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত যে শুধু এটাই পারে কার্যকরভাবে সেই সমস্যার সমাধান করতে, যা উত্তীর্ণ হতে কেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ। দেশটির অনন্য ভূগোল, যা শ্রম-চলাচলে বাধা, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্রীকরণ না-করা।

ছয়-দফা কর্মসূচিতে বিধৃত মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা এবং কর সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণ দায়িত্ব আঞ্চলিক সরকারকে প্রদানের লক্ষ্যেই প্রণীত। পুঁজির স্থানান্তরণ ঠেকাতেই মুদ্রা-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো প্রণীত, একই সঙ্গে অর্থসংক্রান্ত নীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যেও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং মুদ্রা সংক্রান্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন অঞ্চলের সম্পদ যেন সেখানেই থাকে, এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদ পাওয়া যায়। করারোপ-সম্পর্কিত প্রস্তাব আর্থিক নীতির ওপর আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রণীত, ফেডারেল সরকারকে তার প্রয়োজনীয় রাজস্ব থেকে বঞ্চিত না-করেই।

সারাংশ

এই প্রস্তাবগুলোর সারাংশ নিম্নরূপ :

ক. মুদ্রার ক্ষেত্রে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পুঁজির পাচার বন্ধ করা এবং আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক আর্থিক নীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিতে হবে। দুটো মুদ্রা গ্রহণ করে এটা করা যেতে পারে; কিংবা একক মুদ্রা রেখে এবং প্রতিটি অঞ্চলে একটি আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে, যা আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করবে, এবং নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। উল্লিখিত ব্যবস্থায় মুদ্রা হবে একটি ফেডারেল বিষয়।

খ. বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সাহায্য সংক্রান্ত বিষয়ে আঞ্চলিক সরকাগুলো দেশের পররাষ্ট্রনীতি কাঠামোর মধ্যে বাণিজ্য এবং সাহায্য নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি হবে পররাষ্ট্র-বিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

গ. প্রতিটি অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয় আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংকের একাউন্টে রক্ষিত হবে এবং আঞ্চলিক সরকারগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। একটি সম্মত অনুপাতের ভিত্তিতে দুটো আঞ্চলিক একাউন্ট থেকে গ্রহণ করে বৈদেশিক মুদ্রার ফেডারেল প্রয়োজন মেটানো হবে।

ঘ. কর-আরোপ বিষয়ে প্রস্তাব হচ্ছে যে, কর ধার্য এবং সংগ্রহ করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের কাছে থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক সরকারগুলোর নিকট থেকে সংগ্রহ করে ফেডারেল সরকারকে তার প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা দেওয়া হবে। পরিষ্কার বুঝতে হবে যে রাজস্ব প্রয়োজনের জন্যে ফেডারেল সরকারকে আঞ্চলিক সরকারগুলোর দয়ার ওপর নির্ভরশীল রাখার চিন্তা করা হচ্ছে না।

বিপুল প্রতিশ্রুতি

আমি গুরুত্বারোপ করেই বলব যে, ফেডারেল সরকারের রাজস্ব প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে আর্থিক নীতির ওপর আঞ্চলিক সরকারগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার বিষয়টির সংগতি রক্ষা করে যথাযথ সাংবিধানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা কঠিন হবে না। পরিকল্পনাটি এটাও বিবেচনা করছে যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিটি অংশ থেকে প্রতিরক্ষাসহ সকল ফেডারেল সংস্থায় মানুষের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

এই নীতিগুলো মেনে নেওয়া হলে উভয় পক্ষ থেকে মনোনীত বিশেষজ্ঞের একটি কমিটি খুঁটিনাটি ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে পারবে।

এই পরিকল্পনা পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে অর্থনৈতিক অবিচারের ক্ষয়রোগ দূর করার বিপুল সম্ভাবনা রাখে, একই সঙ্গে বহু বছরের কেন্দ্রীকৃত আর্থিক ব্যবস্থাপনা যে অবিশ্বাস এবং হতাশার জন্ম দিয়েছে, তা দূর করারও।

আমি বিশ্বাস রাখি যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ এ-পরিকল্পনায় সর্বান্তকরণে সমর্থন দেবে।

আবেদন

আমি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে খোলা মন এবং বড় হৃদয় নিয়ে ভ্রাতৃত্ব এবং জাতীয় সংহতির চেতনায় এগিয়ে আসার, এবং এখানে উপস্থাপিত ফেডারেল পরিকল্পনাটিকে দেশের সামনের সর্বাধিক দুরূহ সমস্যা ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার অর্জনের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে আহ্বান জানাই। অর্থনৈতিক অবিচারের বোধ বর্তমান সংকটের জন্যে সর্বাধিক দায়ী। এসব মৌল সমস্যা মোকাবিলাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন প্রয়াস আমাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে।

জাতীয় সংকটের এই সময়ে পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে এবং যা জাতীয় সংকটের সৃষ্টি করেছে সেই দুরূহ সমস্যার সাহসী সমাধান গ্রহণে ব্যর্থ হলে আল্লাহ কিংবা ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। আমাদের জাতীয় সমস্যাকে চৌকসভাবে মোকাবিলার এটি একটি মহৎ সুযোগ, যা আর একবার উপস্থিত নাও হতে পারে। আমাদের প্রিয় পাকিস্তান যে বিয়োগান্তক পরিস্থিতিতে নিপতিত, তা থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্যে এবং একটি বাস্তব, প্রাণবন্ত, ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্রের সাংবিধানিক ভিত্তি স্থাপন করার জন্যে আসুন, আমরা একযোগে সংগ্রাম করি, যা পাকিস্তানের জনগণকে একটি পূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রদান করবে। একমাত্র এভাবেই বলিষ্ঠ এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান প্রত্যাশা এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে ভবিষ্যতের মুখোমুখী হতে পারবে।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

ভাষান্তর : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্র : *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশের ইউপিএল প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৮ (*দি ডন*, করাচি, ১৪ মার্চ ১৯৬৯)

'স্বৈরাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম'

করাচির কোরাঙ্গীতে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিবের ঘোষণা

করাচি, পাকিস্তান, ৯ আগস্ট ১৯৬৯

ইত্তেফাকের করাচি অফিস হইতে : ৯ আগস্ট ১৯৬৯। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য এখানে বলেন যে, স্বৈরাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং সাধারণ মানুষের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হইবেন না।

গতকাল অপরাহ্নে কোরাঙ্গী উপশহরে একটি মসজিদের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, পাকিস্তানের জন্য তাঁহারা যে সংগ্রাম শুরু করিয়াছিলেন, বর্তমান সংগ্রাম তাহারই ক্রমবিকাশ। মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি কায়েমের ২২ বৎসর পরও এই সংগ্রাম অব্যাহত রহিয়াছে।

শেখ সাহেব বলেন, পাকিস্তান এই দেশের ১২ কোটি জনসাধারণের জন্যই কায়েম হইয়াছে, গুটিকয়েক লোকের জন্য নয়।

তিনি বলেন, বিরোধী দলে থাকার দরুন এক্ষণে তিনি শুধু এই ওয়াদাই করিতে পারেন যে, জনসাধারণের জন্যই তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত।

শেখ সাহেব বলেন, অবিচার ও স্বৈরাচারের সহিত তিনি কখনও আপস করেন নাই এবং অতীতে এই জন্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতেও তিনি নির্যাতন ভোগের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন।

তিনি বলেন, ঈমানই মুসলমানদের সেরা হাতিয়ার এবং মুসলমানদের একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। এই খোদা ভীরুতাই মুসলমানকে জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সহায়তা করে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তিনি বহুবার সুযোগ পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে সব সুযোগ তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কারণ, এইসব ক্ষেত্রে নীতির সহিত আপসের প্রশ্ন জড়িত ছিল।

শেখ সাহেব মসজিদ নির্মাণ তহবিলে তাঁহার এবং তাঁহার সহকর্মীদের তরফ হইতে ৫০১ টাকা দান করেন।

পূর্বাহ্নে আওয়ামী প্রধানকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, রবিবার, ১০ আগস্ট ১৯৬৯

পাকিস্তানের প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণের প্রতি সুবিচার করা হোক

এক ইউনিট, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সংখ্যানুপাত প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেশে গণভোট অনুষ্ঠানের আহবান

সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

করাচি, পাকিস্তান, ১০ আগস্ট ১৯৬৯

করাচি, ১০ আগস্ট ১৯৬৯। পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে এক ইউনিট, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেশব্যাপী গণভোট গ্রহণের আহ্বান জানান।

স্থানীয় একটি হোটেলে সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবর্ধনার উত্তরে শেখ সাহেব বলেন, যদি গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে শতকরা ৭০ ভাগ লোক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রদানের অনুকূলে এবং এক ইউনিট বিলোপের পক্ষে রায় প্রদান করিবে।

তিনি শ্রোতাদের বলেন, কোন লোকের পক্ষে জনসাধারণের উপর তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শাসনতন্ত্র চাপানো সম্ভব হইবে না। তিনি বলেন, পাকিস্তানের প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণের প্রতি সুবিচার করা হউক, ইহাই তাঁহার বিশ্বাসের অঙ্গ।

শেখ মুজিব বলেন, তিনি এমন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, যে সমাজতন্ত্র ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী নহে। তিনি আরও বলেন যে, পবিত্র কোরানে মানবতার কল্যাণের শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহাই সমাজতন্ত্র। তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। এই সমস্যা হইল দ্বিবিধ অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই সমস্যার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতেছে। তাহাদের এই সংগ্রামের লক্ষ্য কাহারো বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশ নহে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক অধিকারই দাবি করিতেছে। শেখ সাহেব বলেন, যখনই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই সমস্ত দাবি লইয়া সংগ্রাম করিতে চায়, তখনই তাহাদের আনুগত্যের উপর অপমানজনক সন্দেহ আরোপ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের এই সকল দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে আড়াইটি রাজধানী রহিয়াছে, কিন্তু এই রাজধানীর কোন সুযোগ সুবিধা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আদৌ পাইতেছে না। তাই, পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের যে দাবি উহা অবশ্যই ন্যায্য।

শেখ সাহেব বলেন, কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যয় ও মূলধন গঠনের শতকরা ১০ ভাগ মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানেই শুধু মূলধন গড়িয়া উঠিতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান একটি বাজার হিসাবে পরিগণিত হইতেছে।

তিনি বলেন, সাবেক সরকার ইসলামাবাদের উন্নয়নে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছে, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণে কিছুই করা হয় নাই। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত হইবে না।

শেখ মুজিব বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে বৃহত্তর ও বিরাট পরিমাণে জমি বন্টন করা হইয়াছে, অথচ দরিদ্র চাষিরা অনাহারে রহিয়াছে। তিনি ন্যায্যহারে ভূমি পুনর্বন্টনের আহ্বান জানান। – এ. পি. পি.

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোমবার, ১১ আগস্ট ১৯৬৯

আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে

শাসনতান্ত্রিক সমস্যার চির সমাধান করিতে হইবে

করাচি প্রেসক্লাবের সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

করাচি, পাকিস্তান, ১১ আগস্ট ১৯৬৯

করাচি, ১১ আগস্ট ১৯৬৯ । নিখিলপাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আজ দেশের শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বয়স্ক ভোটাধিকার এবং এক-ব্যক্তি এক-ভোটের ভিত্তিতে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়াছেন।

আজ বিকালে আওয়ামী লীগ প্রধানের সম্মানে করাচি প্রেসক্লাব কর্তৃক আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় তিনি বক্তৃতা দিতেছিলেন।

শেখ মুজিব বলেন, দেশ আজ সংকটের সম্মুখীন এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যাই সব চাইতে বড় সমস্যা।

তিনি উল্লেখ করেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য কিছু সময় দিতে হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, শাসনতন্ত্র তৈয়ার করা লইয়া অনেক "এক্সপেরিমেন্ট" চালানো হইয়াছে। অনেক শাসনতন্ত্রই পরীক্ষিত এবং তৎপর বর্জিত হইয়াছে; কিন্তু এগুলির একটিতেও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত ছিল না। আমাদিগকে এক্ষণে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার চূড়ান্ত ফয়সালা করিতে হইবে– সকল শ্রেণীর লোকের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে এমন একটি শাসতন্ত্র দেশকে দিতে হইবে।

শেখ মুজিব উল্লেখ করেন যে, অতীতে সরকারগুলি দেশকে রাজনৈতিক দিক দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে দুর্নীতিতে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। আজিকার অনেক সমস্যারই স্রষ্টা হইতেছে কায়েমী স্বার্থী মহল এবং প্রাক্তন "শাসক-জান্তা।"

শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকস্তানিদের দাবি-দাওয়া উল্লেখ প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, যখনই পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাহাদের প্রতি প্রদর্শিত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছে, পূর্ববর্তী সরকারগণ তখনই হিন্দু অনুপ্রবেশের ধুয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানিরা আপসের মনোভাব লইয়া সংখ্যা-সাম্য নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই নীতি কখনও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। যতই দিন যাইতেছে দেশের এই দুই অংশের মধ্যে ততই বৈষম্যের ব্যবধান বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

তিনি জানান যে, তাহার দল এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ নিরঙ্কুশভাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বাতিল এবং আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী। অতীতের সরকারগুলি জনসধারণের ভাবাবেগ লইয়া খেলা করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণ সেই একই খেলার পুনরাবৃত্তি দেখিতে আর রাজি নয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান পুনরায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের একটি লোকও দেশের বাকি অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না। "আমরা যাহা চাই তাহা হইতেছে ন্যায়বিচার, সমান অধিকার এবং উভয় অংশের জনসাধারণের জন্য কতিপয় সুযোগ সুবিধা।"

তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৭০ ভাগই আয় করিয়াছিল পূর্ব পাকিস্তান। এই পরিমাণ বর্তমানে শতকরা ৪৫ ভাগে হ্রাস পাইয়াছে। পরিকল্পনার ত্রুটির জন্যই এরূপ হইয়াছে। দেশের উভয় অংশের জন্যই ইহা অনিষ্টকর। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থীরা পূর্ব পাকিস্তানকে ঔপনিবেশিক বাজার হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে।

শেখ মুজিব জানান, পূর্ব পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। তিনি দাবি করেন, এ প্রদেশের শতকরা ৫০ ভাগ লোকের দিনে দুই বেলা আহারের সংস্থান

করার এবং অধিকাংশ লোকেরই পর্যাপ্ত পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহের সামর্থ নাই। পূর্ব পাকিস্তানিদের অন্যতম প্রধান অনুযোগ হইতেছে যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এখনও কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। মরহুম সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে একটি বিদেশি মিশন এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে সর্বনাশা বন্যায় প্রতি বৎসর ৫০ হইতে ১০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। দুঃখের বিষয় যে, অন্যান্য খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হইলেও পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথার্থ কিছু করা হয় নাই।

শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবি করেন এবং বলেন যে, গণতন্ত্রের উন্নয়নে ইহার প্রয়োজন অত্যাধিক। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতো মেহনতি সাংবাদিকগণ এবং জাতীয় সংবাদপত্রগুলিও সামগ্রিকভাবে পূর্ববর্তী সরকারের নিপীড়নের শিকারে পরিণত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে শেখ মুজিব মরহুম মানিক মিয়া এবং নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেসের কথা এবং বেসরকারি মালিকানা হইতে 'পাকিস্তান টাইমস' এবং 'ইমরোজ' পত্রিকার কর্তৃত্বভার নিয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, তাঁহার দল ক্ষমতায় আসিলে তিনি সংবাদপত্র এবং অন্যান্য শিল্পের একচেটিয়া সুবিধা ভোগের অবসান ঘটাইবেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এবং তাহাদের সমস্যার কথা কমই ছাপা হইয়া থাকে এবং অনেক সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণ সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টির জন্য ঘটনাবলীর ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

নিজেদের চক্ষে পূর্ব পাকিস্তানিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কার্যরত সাংবাদিকদের তিনি মাঝে মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

প্রশ্নোত্তর

আওয়ামী লীগ প্রধান সংবর্ধনা সভায় ভাষণদানের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পরিষদ রাখার সামর্থ্য এই গরিব দেশের নাই, কারণ, এই পদ্ধতিতে পিছনের দরজা দিয়া সংখ্যাসাম্য প্রবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জনাব ভুট্টোর পিপলস পার্টির সহিত তাহার দলের জোটভুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'দুঃখিত, আমরা আমাদের নিজেদের কর্মসূচি লইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি।'

শেখ মুজিব মাওলানা ভাসানীর ন্যাপের সহিত কোন সম্পর্কের কথাও অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, ক্ষমতায় আসিতে পারিলে তিনি ছয়-দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করিবেন।

প্রশ্ন : আপনি কি গ্যারান্টি দিতে পারেন যে, ক্ষমতায় আসিলে আপনি ছয়-দফা বাস্তবায়িত করিবেন? শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর তিনি সিয়াটো ও সেন্টো হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

উত্তর : ক্ষমতায় আসিতে পারিলে অবশ্যই আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করিব, আপনারা দেখিবেন। অতীতে জনাব সোহরাওয়ার্দীর সময় পরিষদে ৮০ জন সদস্যের মধ্যে আমাদের ছিল মাত্র ১২ জন। আমরা ক্ষমতায় থাকাকালে কোন নিরাপত্তা আইন ছিল না এবং কাহাকেও আমরা জেলে পাঠাই নাই।

প্রশ্ন : আপনি কি ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন– ইসলামী সমাজতন্ত্র, না সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন যে ধরনের সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা সেই ধরনের?

উত্তর : সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রই।

প্রশ্ন : ইহাতে কি বেসরকারি খাতকে জাতীয়করণের ব্যবস্থা থাকিবে?

উত্তর : আপনাদের তাহা জানা থাকা উচিত। – পি.পি.আই.

সূত্র : ইত্তেফাক, মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ১৯৬৯

দুনিয়ার কোন শক্তিই বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না –শেখ মুজিব

সোহরাওয়ার্দী-শের-এ বাংলার মাজার প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (শুক্রবার) ঢাকায় বলেন যে, স্বার্থবাদী মহল আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বানচালের যে চক্রান্ত চালাইতেছে, উহা প্রতিহত করিয়া ছয়-দফার সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ রায় ঘোষণা করিতে পারিলে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি ঠেকাইয়া রাখিতে পারে এমন সাধ্য পৃথিবীতে কাহারও নাই।

অবিসংবাদিত গণনায়ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল অপরাহ্নে সোহরাওয়ার্দী-শের-এ বাংলার মাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "বাংলার এই দুই কৃতী সন্তানের সমাধির পাশে দাঁড়াইয়া আজ আমরা আবার এই শপথই ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সত্যিকার পাকিস্তানি নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চাই– কাহারও গোলাম হইয়া থাকিতে চাই না।"

আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন, গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা স্বায়ত্তশাসনসহ সমুদয় জাতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে কর্মসূচি ঘোষিত হইয়াছে, নানা ছুতা-নাতা দেখাইয়া উহা বানচাল করার জন্য স্বার্থবাদী মহল চক্রান্ত শুরু করিয়াছে। জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এই চক্রান্ত রুখিয়া দাঁড়ান। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলুপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হইলে ভালো হইত। তবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে। তিনি বলেন, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা প্রতিহত করিতে হইবে। কোন কোন নেতা 'এক লোক এক ভোটের' অর্থ বুঝেন না বলিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ইহার একমাত্র অর্থ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব। এছাড়া অন্য কোন অর্থ বুঝিতে হইলে আমাদেরকে নতুন করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়িতে হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

দালালী যদি কাহারও করিয়া থাকি–

শেখ সাহেব বলেন, বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক দাবির প্রশ্ন তুলিলেই চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং তাঁর দোসররা আঁতকাইয়া উঠেন। এই 'অপরাধে' বাঙালিদের কমিউনিস্ট, হিন্দুস্থানের এজেন্ট, আমেরিকার দালাল হিসাবে অভিহিত হইতে হইয়াছে, শুধু তাই নয়, গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করার দরুনই কায়েমী স্বার্থবাদীদের তল্পিবাহকরা শের-এ বাংলাকে অন্তরীণাবদ্ধ কয়িাছে, শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে। অথচ আমরা কোন দিন পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঠকাইতে চাই নাই– শুধু ইনসাফ আর ন্যায্য পাওনা চাহিয়াছি। শেখ সাহেব বলেন, গণ-দুশমনরা যা কিছু খুশি বলুক– দালালী যদি কাহারও করিয়া থাকি, সে আমার দেশ ও দেশবাসীর।

যদি সেদিন–

শেখ মুজিব বলেন, আজ যারা বড় বড় কথা বলিয়া বাজিমাৎ করিতে চায়, কথায় কথায় বাঙালির দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে– বাংলার চরম দুর্দিনে সেই সব 'নেতা'কে বাঙালিরা পাশে পায় নাই। তিনি বলেন, ১৯৬৬ সালের ৭ জুন যখন ছয়-দফার দাবিতে সারা বাংলা জাগিয়া উঠিয়াছিল– যখন আমরা জেলে– ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক স্বৈরাচারী শক্তির বুলেটের আঘাতে রক্তাক্ত হইতেছিল, সেই সময় এইসব বিপ্লবী নেতার কেহবা ভয়ে ঘরে খিল

আটকাইয়াছে, কেহবা ছয়-দফা আন্দোলনে বহিঃশক্তির গন্ধ আবিষ্কারে লিপ্ত হইয়াছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, সেদিন যদি এইসব নেতা আন্দোলনকে আগাইয়া নিতেন, বহুপূর্বে আইয়ুবের পতন ঘটিত– স্বায়ত্তশাসনও আদায় হইত।

বেঈমানদের সমুচিত শিক্ষা দিন

জনগণের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব বলেন, অগণিত দেশপ্রেমিকের পাশাপাশি এই বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়াছে এক শ্রেণীর স্বার্থলোভী বেঈমান। ইহারাই ব্যক্তিগত লাভ-লোভের বিনিময়ে বার বার বাংলা আর বাঙালির স্বার্থ বিকাইয়া দিয়াছে। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, দেশব্যাপী প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থানের দিনে অগণিত ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতার রক্তপাতের মধ্যদিয়া আইয়ুবের পতন যখন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে সেই মুহূর্তেও সেই রক্তের দাগ না শুকাইতেই এ বেঈমানের দল মন্ত্রিত্বের জন্য আইয়ুবের দুয়ারে ধর্ণা দিয়াছে। তিনি বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে এই পেশাদার বেঈমানদের এমন শিক্ষা দিন যেন বাংলার পবিত্র মাটিতে দাঁড়াইয়া বাঙালির সঙ্গে বেঈমানী করার ধৃষ্টতা আর কাহারও না হয়।

রক্তে ঋণ শোধ করিবই

শেখ সাহেব বলেন, জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমি জেল খাটিয়াছি, জুলুম সহ্য করিয়াছি, ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছি। কিন্তু ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতা বুকের রক্ত দিয়া আমাকে আবার তাদের মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছে। তিনি বলেন, দেশবাসীর যে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমি পাইয়াছি উহার চাইতে বড় কিছুই আমার পাওয়ার নাই। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে শেখ সাহেব বলেন, দেশবাসীর রক্তের ঋণ আমি শোধ করিবই।

৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গে

শেখ সাহেব বলেন, কোন কোন মহল বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা না থাকায় এই শাসনতন্ত্র পাস হওয়ার সময় পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করার আগে নেতা যে বক্তৃতা দিয়াছেন উহা পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, তিনি ৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সমর্থন করেন নাই।

গ্রামবাসীদের গায়ে মাংস নাই

দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির এক করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন, ২২টি পরিবারের হতে রাষ্ট্রের সমুদয় সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে আর গ্রামবাংলা শ্মশানে পর্যবসিত হইয়াছে। রোগ-ব্যাধিতে অনাহার অর্ধাহারে ক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের গায়ে মাংস নাই। তিনি বলেন, ৫ বছর ধরিয়া শিল্পপতিদের ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হইয়াছে অথচ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা মওকুফ করা হয় নাই– শ্রমিকরা শিল্প-কারখানার শেয়ার পায় নাই। শেখ সাহেব বলেন, এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য

শেখ সাহেব বলেন, গণতন্ত্রই ছিল মরহুম নেতার সারা-জীবনের সাধনা। তিনি চাহিয়াছিলেন, দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধমে গণ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হউক। শেখ সাহেব বলেন, সোহরাওয়ার্দী আজ নাই– তাঁর অভীষ্ট গণতন্ত্র আজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে। যদি কুচক্রীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, যদি দেশের নিরন্ন-নিপীড়িত জনগণের মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলা যায়, তবে উহাই হইবে মরহুম নেতার প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সূত্র : ইত্তেফাক, শনিবার, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯

অতঃপর এ প্রদেশের নাম হইবে 'বাংলাদেশ' : বঙ্গবন্ধু

সোহরাওয়ার্দী ও শের-এ বাংলার মাজার প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ডিসেম্বর ('৬৯) ঢাকায় ঘোষণা করেন যে, এখন হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।

ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সোহরাওয়ার্দী ও শের-এ বাংলার মাজার প্রাঙ্গণে সোহরাওয়ার্দী স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন, এক সময় এ দেশের বুক হইতে মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি বলেন, একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে বাংলা কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বাংলা ও বাঙালির অবিসংবাদিত গণনায়ক শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শের-এ বাংলার প্রতিও আমার্জনীয় অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। বক্তৃতা মঞ্চের অনতিদূরে চিরনিদ্রায় শায়িত নেতৃদ্বয়ের মাজারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শেখ মুজিব বলেন, বাংলার এই দুই কৃতী সন্তান আজ অসহায়ের মতো আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। এই দুই নেতার মাজারের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি– "আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।"

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনি সহকারে নেতার এই ঘোষণার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯

আগামী নির্বাচনে প্রদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে, অতএব–

ছাত্রদের সোহরাওয়ার্দী-স্মৃতিসভায় শেখ মুজিবের আহ্বান

সোহরাওয়ার্দী ও শের-এ বাংলার মাজার প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯

নির্বাচন পিপাসু সচেতন জাতি গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী, জনগণের দাবি-দাওয়ার নির্ভীক মুখপাত্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক যুদ্ধের বীর সিপাহসালার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালনের তৃতীয় দিনে গতকাল (শনিবার) ঢাকাসহ শিল্পশহর টঙ্গি ও বন্দরনগরী নারায়ণগঞ্জে সোহরাওয়ার্দী জীবনাদর্শের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। ঢাকায় প্রাদেশিক ছাত্রলীগের উদ্যোগে, টঙ্গিতে থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এবং নারায়ণগঞ্জে ঢাকা জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে শহীদের অমর স্মৃতি তর্পণ করা হয়। সর্বস্থানেই সোহরাওয়ার্দী জীবনাদর্শের মূলমন্ত্র জনসমক্ষে তুলিয়া ধরা হয় এবং এই মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শহীদের আজীবনের স্বপ্ন গণতন্ত্রের বৈজয়ন্তী বিজয়দৃপ্তমুষ্ঠিতে সমুন্নত রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা আহ্বান জানাইয়াছেন।

ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে ছাত্রসমাজ সোহরাওয়ার্দী জীবনাদর্শের সফল বাস্তবায়নের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রয়াস পাওয়ার শপথ গ্রহণ করেন।

মাজার প্রাঙ্গণে ছাত্রলীগের স্মৃতিসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, "আগামী সাধারণ নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে। তাই, এই নির্বাচনকে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাঙালিদের ছয়-দফার সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ রায় দিতে হইবে। তিনি গতকাল (শনিবার, ৬ ডিসম্বের ১৯৬৬) সকালে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মরণে ঢাকায় তাঁহার মাজার প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিতেছিলেন।

ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য ড. আলীম-আল রাজী, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, রিকুইজিশনপন্থী প্রাদেশিক ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং জনাব সিরাজউদ্দিন হোসেন।

আলোচনাসভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব আরও বলেন যে, বাঙালিরা পাকিস্তানের সকল এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে ভাই হিসাবে সম-অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চায়– কাহারো কলোনি হইয়া, বাজার হইয়া থাকিতে চায় না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমার বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার– বাঙালিরা কাউকে ঠকাইতে চায় না, ঠকিতেও চায় না। তিনি বলেন, পাঞ্জাবের পাঞ্জাবি, সিন্ধুর সিন্ধি, বেলুচিস্তানের বেলুচ, সীমান্তের পাঠান আর বাংলাদেশের বাঙালিদের লইয়াই গড়িয়া উঠিবে সুখী সমৃদ্ধ পাকিস্তানি মহাজাতি।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আগামী ৫ অক্টোবর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন উহার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেই হইবে। বছরের পর বছর ধরিয়া বাংলাদেশের প্রতি যে অবিচার করা হইতেছে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র রচনারকালে উহার সমাপ্তি ঘটাইবার বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাই, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই বাংলার গণমানুষকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাইয়া দিতে হইবে তাহারা ছয়-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন চায় কি-না।

শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতাকালে আরও বলেন যে, এক শ্রেণীর নেতা প্রকাশ্যে বিপ্লবের বুলি আওড়াইয়াছেন আর তলে তলে 'আইয়ুব খাঁর দালালী' করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা যখন জেলে পচিতেছিলাম তখন এইসব নেতা রাত্রির অন্ধকারে স্বৈরাচারী আইয়ুবের সঙ্গে হাত মিলাইয়া 'বিপ্লব কায়েম' করার চেষ্টা করিয়াছে। জনগণের উপর আস্থা এবং জনসমর্থন না থাকার দরুনই ভীতসন্ত্রস্ত এই বিপ্লবী নেতারা এখন নির্বাচন নস্যাৎ করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালাইতেছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, ইহাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া দিতে হইবে।

ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব বলেন, সারা দেশ তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য নীতির প্রশ্নে অটল থাকিয়া তাহাদের নিরলস সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। শেখ সাহেব মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতাকালে তাঁহার নেতৃত্ব ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর আলোকপাত করেন।

সূত্র : ইত্তেফাক, রবিবার, ৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

ঢাকা, ২৮ অক্টোবর ১৯৭০

সার্বজননীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত 'রাজনৈতিক সম্প্রচার' শীর্ষক বক্তৃতামালায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বক্তা ছিলেন।

১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামন বেতার ও টিভিতে নিম্নলিখিত ভাষণ দেন। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্যে বাংলায় ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্যে ইংরেজিতে ভাষণ রেকর্ডিং করা হয়। বাংলা ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপ :

জনগণের মুক্তির জন্যে যেসব বীর শহীদান রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন সেসব বীর সন্তানদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচার, নির্যাতন উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন দিয়ে তারা আন্দোলনের পর আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অগণিত মানুষ সর্বপ্রকার নিষ্পেষণের মুখেও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত আন্দোলন গত বছরের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। সেই একটানা আন্দোলন জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বস্তুত, আমি আজ জাতীয় বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য পেশের যে সুযোগ পেয়েছি, তাকেও জনগণের সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ, আজ পর্যন্ত এ সুযোগ ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া ছিল।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ, আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনো আমরা পৌছাই নি। জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে। যে শক্তিশালী চক্র গত ২২ বছর ধরে পাকিস্তান শাসন করেছে, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য সকল প্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরা সেইসব গোষ্ঠী যারা সাধারণ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। এমন কি নির্বাচনের পরেও তারা শোষণের অবসান ঘটানোর প্রত্যেকটা প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্যে সক্রিয় থাকবে। এজন্যে প্রয়োজন হলে তারা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়োজিত করবে। তাদের অর্থ আছে, প্রভাব আছে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ মানুষ আপসহীনভাবে সাফল্যের সাথে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জনতার জয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা জনগণের পাশেপাশেই থাকবে, স্বৈরাচারী ও শোষকগোষ্ঠীর মোকাবিলার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। কোন জাতি কোনদিনই আত্মাহুতি না দিয়ে মুক্তি ও ন্যায়বিচার পায় নি। তাই, আজ আওয়ামী লীগ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে জানিয়ে দিতে চায় যে, পাকিস্তানের জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের মেকাবিলা আওয়ামী লীগ অবশ্যই করবে। গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা বিঘ্নিত করা হলে আওয়ামী লীগ সব শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম আর সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যেই আমাদের মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র

প্রতিষ্ঠার আপসহীন সংগ্রাম শুরু করি। আমাদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি। ক্ষমতাসীন চক্র সংগ্রামী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্যে হামলার পর হামলা চালিয়েছে, আঘাতের পর আঘাত হেনেছে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের একের পর এক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জীবনের সম্ভাবনাময় দিনগুলো তারা কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নকে আমরা পরাভূত করেছি, বিজয়ী হয়েছি। এই বিজয়ই আমাদেরকে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে।

যে সংকট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে, সে সংকটসমূহের অবসান ঘটাতেই হবে। আজকে জাতীয় সংকটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়ত, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত, এগুলো বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি।

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যান্সারের মতো যে দুর্নীতি বিস্তার করে আছে তাকে অবশ্যই নির্মূল করতে আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় শিল্প-সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ মাত্র দুডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাংকিং-সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা-সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগও দুডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাংকের লগ্নিকৃত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ আজ মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশে যে কর-প্রথা কায়েম রয়েছে তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যখন প্রত্যক্ষ করের মধ্যেমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ আদায় করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপরপক্ষে লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের মাধ্যমে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশি মুদ্রার ঋণ ও অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে। ছিটেফোটা ভূমি-সংস্কার সত্ত্বেও সামন্ত প্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে। তারা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। তাদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার দিনদিন অবনতি ঘটছে। কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয় বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প-শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর। মুদ্রা, মজুরি যা বাড়ছে তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ স্কুল-কলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী, বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, গত ২২ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫ শত কোটি টাকার মতো (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ

মাত্র) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৩ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্তু ৩ হাজার কোটি টাকার বিদেশি দ্রব্য তারা আমদানি করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিন গুণ বেশি বিদেশি দ্রব্য আমদানি করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশি মুদ্রার আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি ২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি দ্রব্য আমদানি করতে পেরেছে। তার কারণ, বাংলাদেশের অর্জিত ৫০০ কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরও সর্বপ্রকার বিদেশি সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করেছে।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানও একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার ২২ বছর গত হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বাঙালির সংখ্যা আজও শতকরা ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধু অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ১৫ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে, তার শিকারে পরিণত হতে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে যে ক্ষেত্রে প্রতি মণ মোটা চালের দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে সে চালের দাম গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের সরিষার তেলের দাম আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে সরিষার তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচিতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সে সোনার মূল্য ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকা। তার পরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে সোনো আনার ব্যাপারে কাস্টমসের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গত ২২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছে, এসব অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এ সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, অতীতের অন্যায়-অবিচার দূরীকরণে সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ চতুর্থ পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কর্মসূচি, যে কর্মসূচি এগার-দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে কর্মসূচি আঞ্চলিক অন্যায়-অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাঙালির প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলাদেশ ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তর ব্যয়বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে আওয়ামী লীগের ছয়-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। প্রস্তাবিত এই স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই দিতে হবে। এজন্যেই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশি অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দানের ব্যাপারে আমরা সবসময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি।

এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা ও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার উর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেল সরকারকে পররাষ্ট্র বিষয়, দেশরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক শর্তসাপেক্ষে মুদ্রাব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে এক ন্যায়সংগত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল সরকার কায়েম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকারের পরিকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকে ফেডারেল চাকরিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলো যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা মিলিটারি বাহিনী গঠন করে তবে তারা কার্যকরভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে চান বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পরিকল্পনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাবে। আমাদের বিশ্বাস শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব। অন্যান্য অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়াগ করবে, যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণী ও সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারব। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলোর মতো অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হতে হবে সরকারি অর্থাৎ জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারি পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এ সমর্থনের জন্যে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিততর করতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ যাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া-ব্যাপারীরা পাটচাষিদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাটব্যবস্থা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতি একই ধরনের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সেই জন্যে আমরা মনে করি, তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো

আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারে যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসল আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষিদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারি, জায়গীরদারি, সরদারি প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমিদখলের সর্বোচ্চসীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে। নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারি খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষিদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি-সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমি-রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমি-রাজস্ব প্রথা তুলে দেবার কথা ভাবছি। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বনজ সম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগির চাষ, সর্বপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি-সম্পদ গবেষণা এবং নৌ-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক মৌলিক ভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তম্ভ সেগুলোকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে একটি সুসংহত ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে বিজলী। বিপুলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যাপকভাবে বিজলী সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লি অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা পাঁচশত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে হবে।

তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদীর উপর এবং বুড়িগঙ্গা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষ্যার উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর এবং সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল-ব্যবস্থার উপরেও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছি। সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাবার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লাখেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকের বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে।

পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাতে বাংলা ও উর্দু ইংরেজির স্থান দখল করতে পারে সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব নিম্ন আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলো বিত্তবানদের জন্যে বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তুহারা ও বিত্তহীনের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথা কুটে ফিরছে। ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লি চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপনের দরকার। চিকিৎসা গ্রাজুয়েটদের জন্যে 'ন্যাশনাল সার্ভিস' প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লি এলাকার জন্যে বিপুল সংখ্যক প্যারা-মেডিকেল পার্সোনেলদের ট্রেনিং দেওয়া দরকার। শিল্প শ্রমিকরা গণআন্দোলনের মতোই অর্থনীতি ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের জন্যে বেঁচে থাকবার মতো মজুরি, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম আইন বাতিল করতে হবে। শিল্প-কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যাদানের মাধ্যমেই তাদের কাছ থেকে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্যে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনতে হবে। মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

ছয়-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে আমি শেষবারের মতো আহবান জানাচ্ছি। অঞ্চলে-অঞ্চলে এবং মানুষে-মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোন কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামী নীতির পরিপন্থী কোন আইনই এ দেশে পাস হতে পারে না, চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না।

পররাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আজ বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোন মতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এ জন্যে আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে

হবে। আমরা ইতিপূর্বে 'সিয়াটো-সেন্টো' ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবি জানিয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোন জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি।

কারুর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব–এই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী।

আমরা মনে করি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত। এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি।

ফারাক্কা বাঁধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ভয়ংকর ও স্থায়ী সর্বনাশ করা হচ্ছে, অনতিবিলম্বে সে সর্বনাশের মোকাবিলা করতে হবে। কালবিলম্ব না করে এ সমস্যার ন্যায়সংগত সমাধানের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচি ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ছয়-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট রূপে আমরা গ্রহণ করেছি। একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একটি শাসনতন্ত্র দিতে পারে, যে শাসনতন্ত্র জনগণের একত্রে বসবাসের স্থায়ী ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হবে। এই কারণেই আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ন্যায়সংগত নয়। আইনগত কাঠামো আদেশের বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত ধারাসমূহ বাতিলের জন্যে আমি পুনরায় প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করা কোন প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্রবাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে, আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবই। প্রকৃত ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে, যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে একত্রে বসবাস করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোন উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ছয়-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে-অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশের সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাআল্লাহ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। *(দৈনিক আজাদ,* ২৯ অক্টোবর ১৯৭০)

সূত্র : *বাঙালির কণ্ঠ*, মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৭ মার্চ ১৯৯৮।

বাংলার মানুষ কাহারো করুণা চাহে না, চায় ইনসাফ– চায় কেবল তাদের হক

আরমানিটোলার জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধানের ঘোষণা

'গুণ্ডামি ছাড়িয়া গণ-আদালতে আসুন, রায় পাইবেন দেশবাসী কি চায়'

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর ১৯৭০

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) দলীয় কর্মীদের প্রতি গোলযোগের উস্কানির মুখে সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয়দানের আহ্বান জানাইয়া বলেন, বাংলার স্বাধিকারকামী জনতার অগ্রযাত্রার মুখে নিজেদের পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া কায়েমী স্বার্থবাদী ও শোষক-কুলের ভাড়াটিয়া মহল নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে গোলযোগ সৃষ্টির উস্কানি দিতেছে।

সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আগুন লইয়া খেলা না করার আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন, "গুন্ডামি-পাণ্ডামির রাজনীতির দিন আর নাই। আর এ পথ যে সঠিক পথ নয় এ দেশের ইতিহাসই তার প্রমাণ। সুতরাং, বন্ধুভাবে আহ্বান জানাইতেছি, সত্যিকার রাজনীতি করিতে হইলে গুণ্ডামির রাস্তা ছাড়িয়া গণআদালতে আসুন, ৭ ডিসেম্বরেই রায় পাইবেন, দেশবাসী কাহাদের চায়।" এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব অভিযোগ করেন যে, আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি দলের লোকজন গত বৃহস্পতিবার রাত্রে লালবাগের আওয়ামী লীগ অফিসে অগ্নিসংযোগ ও দুইজন ছাত্রকর্মীকে ছুরিকাহত করিয়াছে। আজও (শুক্রবার) আবার তাহারা জিন্দাবাহার আওয়ামী লীগ অফিস আক্রমণ করিয়াছে এবং রাস্তা হইতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নিকট হইতে একটি মাইক ছিনাইয়া নিয়াছে। তিনি এই সমস্যার কঠোর নিন্দা করিয়া বলেন, আওয়ামী লীগ এ ধরনের সমস্যার সমুচিত জবাব দিতে সক্ষম– শতগুণ বেশি শক্তিতে আঘাতের পাল্টা আঘাত হানার ক্ষমতাও আওয়ামী লীগের আছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচন ও গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থেই গোলযোগ পরিহার করিতে চায়। শেখ সাহেব ঢাকার প্রবীণ সমাজপতি, মহল্লা প্রধান ও গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি শপথ রক্ষায় সাহায্য করার আহ্বান জানান।

প্রদেশবাসী জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়া শেখ সাহেব বলেন, স্বাধীনতার সময় হইতে সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার চাষি-মজুর-মধ্যবিত্ত-ব্যবসায়ীদের সমূলে ধ্বংস করার যে সুগভীর চক্রান্ত শুরু হইয়াছে, আজও উহা চলিতেছে। তাই, এবার বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হইয়াই স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সে ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান প্রদেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া বলেন, "আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ছয়-দফার পক্ষে আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কায় ভোট দিয়া সম্পদলোভী ২২ পরিবার, ষড়যন্ত্রকারী, শোষককুল ও বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিন যে, বাংলার মানুষের স্বাধিকারের দাবি স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার সাধ্য পৃথিবীতে কাহারও নাই।"

প্রতিপক্ষীয় সকল অপপ্রচারের জবাবে শেখ সাহেব উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগ সাফ সাফ জানাইয়া দিতে চায়, বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষ কাহারো করুণা চায় না, চায় ইনসাফ– চায় তাদের হক। তারা মানুষের পরিচয়েই বাঁচিতে চায়, কাহারো কলোনি হইয়া নয়। আর এই কারণেই আওয়ামী লীগের সংগ্রাম এদেশের মাটি হইতে শোষণ বঞ্চনার শেষ কলঙ্ক চিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলার সংগ্রাম।

শেখ সাহেব গতকাল (শুক্রবার) রাত্রে নিজের অন্যতম নির্বাচনী এলাকাভুক্ত পুরাতন ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। আওয়ামী লীগ

প্রধান দলীয় কর্মীদের উপর বিরুদ্ধবাদীদের হামলা ও গুণ্ডামির কঠোর নিন্দা করেন এবং সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি এই জঘন্য পথ পরিহারের আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব পুনরায় বুড়িগঙ্গার সেতু নির্মাণ, ঢাকা শহরের এক হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের হোল্ডিং-এর কর মওকুফ এবং বস্তিবাসীদের বাসোপযোগী কলোনি নির্মাণের দাবি জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার বক্তৃতায় ২৩ বছর ধরিয়া বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত শোষককুলের ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত, বাঙালির দুঃখের কাহিনী ও কারণ, দুই-প্রদেশের মধ্যকার পর্বত প্রমাণ বৈষম্যের খতিয়ান এবং শোষণ লুণ্ঠনের চারণক্ষেত্র বাংলাকে অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করার উপায় বর্ণনা করিতে থাকিলে জনতা পর্যায়ক্রমে বিক্ষোভ ও উল্লাসে ফাটিয়া পড়িতে থাকে। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বাংলার তেইশ বছরের ইতিহাস শোষণ-বঞ্চনা নির্যাতন-গুলির ইতিহাস– দুর্দশাগ্রস্ত বুভুক্ষু দুঃখী-দরিদ্রের অসহায় আর্তনাদের ইতিহাস। আসন্ন নির্বাচনে ছয়-দফার পক্ষে ভোট দিয়া দুই যুগের এই কলঙ্কজনক অধ্যায়কে বিস্মৃতির আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করিয়া নতুন এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ব্যাপারে সমর্থন জানানোর জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সমবেত জনতার গগনবিদারী শ্লোগান ও করতালি ধ্বনির মধ্যে শেখ মুজিব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, তেইশ বছর ধরিয়া যারা বাঙালির রক্তমাংস চিবাইয়া খাইয়াছে, যারা সোহরাওয়ার্দী-শের-এ বাংলাকে অপমান করিয়াছে, যারা বাংলার অগণিত ভাই-বোনকে হত্যা করিয়াছে, তাদের সাথে বাংলার তথা এদেশের মানুষের কোন আপস নাই।

জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক হামিদ সরফরাজ, সৈয়দ আহমদ রেজা প্রমুখও বক্তৃতা করেন। সভায় শেখ সাহেব রমনা-মিরপুর-মোহাম্মদপুর এলাকায় জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহিরুদ্দিন, রমনা-লালবাগ প্রাদেশিক পরিষদ আসনে দলীয় প্রার্থী কাজী গোলাম মোস্তফা, কোতোয়ালী-সুত্রাপুর প্রাদেশিক আসনে প্রার্থী জনাব সিরাজুল ইসলাম এবং তেজগাঁ প্রাদেশিক আসনে স্বীয় দলের প্রার্থী জনাব হেদায়েতুল ইসলামকে পরিচয় করাইয়া দেন। সভার শুরুতে শেখ সাহেবকে সোনা, রূপা ও কেকের নৌকার প্রতিকৃতি, টাকার মাল্য ইত্যাদি বহু উপহার দেওয়া হয়।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, শনিবার, ৩১ অক্টোবর ১৯৭০

শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর ১৯৭০

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আগামী ৭ই ডিসেম্বর (১৯৭০) দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ তেইশ বছরের অবিরাম আন্দোলনের পথ বেয়ে শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদান, শহীদের তাজা রক্ত আর হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর অশেষ নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পর পরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাঁদেরকে নির্ধারিত সময়ের

মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে। বস্তুত স্বাধীনতার তেইশ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার দেশবাসী,

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান বিশেষ করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও একনায়কত্ববাদের প্রতিভূরা দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার কাজে পদে পদে বাধা দেবে। ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহা সুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাংলার মুক্তিসনদ ছয়-দফা ও এগার-দফা বাস্তবায়িত করা যাবে। একমাত্র এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোটের দাবি তুলেছিলাম; আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী। এখন বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা যদি একই দলের কর্মসূচি ও আদর্শের সমর্থক হন অর্থাৎ সকল প্রশ্নে তাঁরা ঐক্যমতে থাকতে পারেন তবে আমরা অতীতে চাপিয়ে দেওয়া সকল অবিচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, আইন-কানুন এবং বে-ইনসাফী শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত দাবির মুখে দেশের অপর অংশের পরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিসনদ ছয়-দফা ও এগার-দফা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর কারণ, পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। আর যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের উপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধে হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যাহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।

আমার ভাইবোনেরা,

শের-এ বাংলা আজ পরলোকে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আমাদের মাঝে নেই। যাঁরা প্রবীণতার দাবি করছেন তাঁদের অধিকাংশই হয় ইতোমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর বাঙালি বিদ্বেষীদের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তল্পীবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, নয়ত নিষ্কর্মা, নির্জীব হয়ে পড়েছেন এবং অন্যের সলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ভাগ্য-বিপর্যস্ত মানুষের হয়ে আমাদেরই কথা বলতে হবে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার সার্থক রূপদানের দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে। এবং সে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার উপযোগী করেই আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কন্টকমুক্ত করতে পারি, আগামী দিনগুলোকে সকলের জন্য সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্যে যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলাম, সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি, তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষমতার চেয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবি আদায়ের দায়িত্ব যদি আমাদের উপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সে শক্তি হল পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। কারণ, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন–বাংলাদেশের সকল আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন।

সংগ্রামী প্রিয় দেশবাসী,

সবশেষে, আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন, ১৯৬৫ সালে ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালিরা কিরূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সাথে এবং দেশের কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় আমাদের সকল যোগাযোগ ও সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়েছিল। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবল আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটাচ্ছিল। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রশাসনযন্ত্র বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরি প্রয়োজনের দিনেও আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাই আমার নিজের জন্যে নয়, বাংলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্যে ১৯৬৬ সালে আমি ছয়-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবি হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবি; অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবি। এই দাবি তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি। একটার পর একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আমাকে হয়রানি করা হয়েছে। আমার ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরও একই অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র আশীর্বাদস্বরূপ আপনারাই কেবল আমার সাথে ছিলেন। কোন নেতা নয়, কোন দলপতি নয়, আপনারা–বাংলার বিপ্লবী ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙ্গে মনু মিয়া, আসাদ, মতিউর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারার মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলে-মেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাই নি, জীবনে কোনদিন ভুলব না, ভুলতে পারব না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানী করব না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুণ্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করব।

প্রিয় ভাইবোনেরা,

বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে দিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তেজগাঁর নাখালপাড়ায় মারা গেল, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়ল, বাংলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিল, বাংলার যে ছাত্র স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে রাজপথে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিল, বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দি শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো, বাংলার যে কৃষক ধান খেতের আলোর পাশে প্রাণ হারাল–তাঁদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে-ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ছয়-দফা ও এগার-দফার। আমি

তাঁদেরই ভাই। আমি জানি, ছয়-দফা ও এগার-দফা বাস্তবায়নের পরই তাদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা ॥ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ॥

নিবেদক—

আপনাদেরই

শেখ মুজিবুর রহমান

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী দপ্তর, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা হইতে আবদুল মতিন কর্তৃক প্রচারপত্র হিসেবে ১৯৭০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত ও পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮১ থেকে ৫৮৩।

আমার দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিবে– শেখ মুজিব

ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (রবিবার) দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন যে, জাতীয় পরিষদে তাঁর দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

এপিপি'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য তিনি অপর কোন দলের উপর নির্ভর করিবেন না। পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য তাঁহাকে অপর কোন দলের উপর নির্ভর করিতে হইবে কি-না এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, "আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করি এবং আমি কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করি না।"

ঘূর্ণিঝড়-দুর্গত অঞ্চলের যে ৯টি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখা হইয়াছে সেই সব আসনে তাঁর দলের অবস্থা সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, "৯টি আসনই আমার।" ৫০ বৎসর বয়স্ক আওয়ামী লীগ প্রধান গতকাল দলীয় সদর দপ্তরে নির্বাচনী স্ট্রাটেজি সম্পর্কে দলীয় লোকদের সর্বশেষ নির্দেশাবলী প্রদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিব ঢাকার তিনটি আসনের মধ্যে ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

আজ (সোমবার) যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে উহাতে পূর্ব পাকিস্তানের ১৫৩টি আসনের সব কয়টিতেই আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। যে ৯টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে না ঐ সকল আসনেও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রহিয়াছেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোমবার, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০

বিজয়ী নেতার শোকরিয়া

ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭০

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে তাঁহার দলের অভূতপূর্ব সাফল্যে পরম প্রশান্তির সহিত হাত তুলিয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরগায় শোকরিয়া আদায় করেন এবং সেইসাথে 'প্রিয় দেশাবাসী'র প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁহার দুই চক্ষুতে কৃতজ্ঞতার অশ্রু নামিয়া আসে। তিনি বলেন, আমি জানিতাম, আল্লাহ নেগাহবান আমাদের সঙ্গে আছেন। অধিকার বঞ্চিত মানুষের বুকে তিনিই শক্তি যোগাইয়াছেন। ৭ ডিসেম্বর (১৯৭০) তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। শেখ সাহেব নির্বাচনে তাঁহার নিজের ও তাঁহার দলের প্রার্থীদের সাফল্যে গতকাল সারা রাত্রি এবাদত-বন্দেগীতে কাটান। আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচনে এই বিজয়ে জনগণের নিকট হইতে প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তাঁহার ছয়-দফা দাবির ব্যাপারে ম্যান্ডেট পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। কেননা, এই ছয়-দফা দাবি উত্থাপন করার পরেই স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনেম খান তাঁহাকে ও তদীয় দলীয় কর্মী ও নেতাদের কারারুদ্ধ করেন এবং তাঁহার ও বাংলার অপরাপর কতিপয় সন্তানের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করেন।

অসংখ্য কর্মী, নেতা, ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী গতকাল সারাদিন আওয়ামী লীগ প্রধানকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য তাঁহার বাসভবন ও আওয়ামী লীগ অফিসে গেলে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে তিনি তাঁহাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরেন।

তিনি দলীয় কর্মীদের এবারে আরও অধিক মাত্রায় ঘূর্ণি দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

সূত্র : ইত্তেফাক, বুধবার, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

এই বিজয় বাংলার শোষিত জনগণেরই বিজয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭০

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরেকবার ভোট দিয়া আওয়ামী লীগের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের পরিচয়দান করায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবারের (১৭ ডিসেম্বর) প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভের পর শুক্রবার (১৮ ডিসেম্বর ১৯৭০) অভিনন্দন জ্ঞাপনার্থে তাঁহার বাসভবনে সমাগত সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে তিনি এই কৃতজ্ঞতার মনোভাব প্রকাশ করেন। জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের এই বিজয় আসলে বাংলাদেশের শোষিত জনগণেরই বিজয়।

সারাদিন ধরিয়া দলে দলে লোক শেখ সাহেবের বাসভবনে সমবেত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়। এদিকে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা গতকাল (১৮ ডিসেম্বর) ট্রাক শোভাযাত্রাসহকারে নেতার বাসভবনে সমবেত হয়। অভিনন্দন জ্ঞাপনকারীরা শেখ মুজিবকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে। ইহাছাড়া সারাদিন ধরিয়া অগণিত লোক টেলিগ্রাম ও টেলিফোনযোগে আওয়ামী লীগ প্রধানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। সন্ধ্যায় শেখ সাহেব আওয়ামী লীগ অফিসে আসিলে সেখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

সূত্র : ইত্তেফাক, শনিবার, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

সংগ্রাম শেষ হয় নাই – সংগ্রাম শুরু

রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিবের ঘোষণা

রমনা রেসকোর্স, ঢাকা, ৩ জানুয়ারি ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথগ্রহণ উপলক্ষে রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ:

রেসকোর্সের জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আজ বক্তৃতা শুরু করিবার পূর্বে স্মরণ করি— মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, বাষট্টির আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির ৭ই জুনের সংগ্রাম ও আটষট্টি-উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের কথা।" মুজিব বলেন, "আজ সকলকে সঙ্গে লইয়া এই গণসমাবেশে শপথ লইতেছি, শহীদানের রক্ত বৃথা যাইতে দিব না। যতদিন আকাশ বাতাস থাকিবে, বাংলাদেশ থাকিবে, বাংলার মাটি থাকিবে—ততদিন রক্তের কথা ভুলিব না। প্রয়োজন হইলে নিজের রক্ত দিয়া তাহাদের রক্তঋণ পরিশোধ করিব।" ঢাকার ইতিহাসের বৃহত্তম গণসমাবেশে আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব দৃঢ়তার সহিত বলেন, "সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই–সংগ্রামের সবেমাত্র শুরু"

শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমরা যাহা পাশ করিব, তাহাই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র। তাহা নস্যাৎ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যদি কেহ করেন, দেশব্যাপী প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণে তাহার জবাব দেওয়া হইবে।"

বঞ্চিত পূর্ববাংলার মানচিত্র অঙ্কিত "জয় বাংলা" পালের নিচে দাঁড়াইয়া দরদ গম্ভীর কণ্ঠে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, "বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার তোমার ঘুঘু বধিব পরাণ।"

লক্ষ লক্ষ হাতের মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করেন, "একটা বড় কথা বলিতে চাই, এদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অবশ্যই কায়েম করা হইবে। বড় লোককে আর বড়লোক হইতে দেওয়া হইবে না এবং গরিবকেও না খাইয়া মরিতে দেওয়া হইবে না। এই দেশ হইবে গরিব শ্রমিক-কৃষক সর্বহারা মেহনতি মানুষের।"

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "শুধু নির্বাচনে জয়লাভ করিলেই দাবি আদায় হয় না। দাবি আদায়ের জন্য চরম সংগ্রামেরও প্রয়োজন হইতে পারে। সাত কোটি বাঙালির সেই সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে। রক্তের ঋণ প্রয়োজন হইলে রক্তেই শোধ করিতে হইবে।"

শেখ মুজিব বলেন, "নির্বাচনে গণতন্ত্রের প্রাথমিক জয় সূচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জয় শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের জয় নয়; এই জয় সাত কোটি গরিব বাঙালির জয়।"

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা শুধু বাংলার নয়–সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হইয়াছি। সিন্দু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের গরিব জনগণের জন্য আমাদের সমান মমত্ববোধ রহিয়াছে। তাহাদের প্রতি ইনসাফই হইবে আমাদের মূল লক্ষ্য।"

শেখ মুজিব বলেন যে, "বঞ্চিত জনগণের এই জয়যাত্রাকে বানচাল কবিবার জন্য নির্বাচনের পূর্বে প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠী ইসলামের ব্যবসায় নামিয়াছিল।"

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "নির্বাচনের পর আপনাদের নামাজ পড়িতে কেহ নিষেধ করিয়াছে?"

তিনি বলেন, "ইসলামী আদর্শেই আমি বলিতেছি, এই দেশে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান সমান অধিকার নিয়াই থাকিবে।"

তিনি আরও বলেন, "ধর্মের বণিকদের ইসলামী বিচারে কোড়া মারার নির্দেশ রহিয়াছে।" শেখ মুজিব বলেন, "জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পিডিপি হইয়াছে, তিন মুসলিম লীগ এক হইয়াছে, ইসলামী ফ্রন্ট হইয়াছে, কিন্তু বাংলার মানুষ দালালদের হালাল করিয়া দিয়াছে, পরগাছা সাফ করিয়া দিয়াছে।"

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, "ছয়-দফা ও এগার-দফা জনগণের সম্পত্তি। ইহা পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের ক্ষমতা আওয়ামী লীগের নাই। শাসনতন্ত্র এই ছয়-দফা ও এগার-দফার ভিত্তিতেই প্রণীত হইবে। কেহ ঠেকাইতে পারিবে না।"

তবে, তিনি বলেন যে, "এই ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সহযোগিতা দরকার এবং সহযোগিতা চাই।" শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সহযোগিতায় শাসনতন্ত্র প্রণয়নে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নীতির প্রশ্নে কোন আপস নাই।"

বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি "বস্তি এলাকায় উন্নয়ন কাজ শুরু করার আহ্বান জানাইয়া আমলাদের হিসাব তৈরি করার নির্দেশ দেন।"

মোহাজেরদের উদ্দেশ্য করিয়া শেখ মুজিব আরও বলেন, "২৩ বৎসর পর আপনারা আর মোহাজের নহেন। এখন আপনারা এদেশের মাটির সহিত মিশিয়া যান।" তিনি বলেন, "আমরা এখনও মোহাজের কর দিয়া আসিতেছি। কিন্তু একটি পয়সাও ব্যয় হয় নাই। এবার তাহার হিসাব চাই–বাংলাদেশ এ পর্যন্ত কত মোহাজের কর দিয়াছে।" জনসমুদ্রে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, "গোলামীর শিক্ষা ব্যবস্থা অবিলম্বে পরিবর্তন করা হইবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি "শিক্ষকদের সম্মান বৃদ্ধির আশ্বাস দেন।" এক পর্যায়ে তিনি "কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবি করেন।"

মুনাফালোভীদের জিহ্বা এইবার কাটিয়া ফেলিব

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান মুনাফা শিকারীদের প্রতি কঠোরতম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, "মুনাফালোভীদের জিহ্বা এইবার কাটিয়া ফেলিব।"

তিনি বলেন, "জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া জনতার বিজয়কে বানচাল করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে। নির্বাচনের পরেই হুড় হুড় করিয়া সব কিছুর দাম বাড়িতে শুরু করিয়াছে।" শেখ মুজিব বলেন যে, "কাপড়ের দাম বাড়িয়াছে, তেলের দাম বাড়িয়াছে–প্রতিটি জিনিস সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।"

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কাহারা এই মূল্য বৃদ্ধি করিতেছে? আর ইহার উদ্দেশ্যই বা কী?" তিনি বলেন যে, "ক্ষমতায় যাইবার পরে যাহাতে আমরা কোন ভালো কাজ করিতে না পারি, অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে শোষকগোষ্ঠী এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়াছে।"

শেখ মুজিব বলেন, "শোষকগোষ্ঠী তোমাদের দিন শেষ হইয়াছে।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও গভর্নর আহসানকে উদ্দেশ্য করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "অবিলম্বে এই শোষকদের হটাও। যদি তিন-চার মাসের মধ্যে দ্রব্যমূল্য সমস্যার সমাধান না হয় তাহা হইলে জনগণকে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে নির্দেশ দিতে বাধ্য হইব।"

জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন, "এই প্রতিরোধ আন্দোলনের অর্থ কী, তাহা আপনারা নিজেরাই বুঝিয়া লাইবেন।"

মুনাফাখোরদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "তেল খাইতে খাইতে জিহ্বা বড় হইয়া গিয়াছে। দয়া করিয়া এইবার শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিন। বেশি লোভ করিলে জিহ্বা কাটা যাইবে।"

অন্ধকারে চোরের মতো ছোরা মারিয়া বিপ্লব হয় না

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্সের জনসমুদ্রে তথ্য প্রকাশ করেন যে, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এপর্যন্ত তাহার ওয়াদা পালন করিয়া আসিলেও জনতার এই বিজয়কে বানচাল করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ঢাকায় আমলাদের একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইসব আমলা ও পদস্থ সরকারি কর্মচারীরা জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে এখনও লিপ্ত রহিয়াছে।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাহার যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন, তাহার প্রতি মোবারকবাদ জানাইয়া শেখ মুজিব সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, "এইসব ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া '৩০৩' করিয়াছেন। আমরা '৩০৩' করিব না। আমরা আপনাদের কাছে বলিব–অমুক ভালো নয়। জনগণই উহার ব্যবস্থা করিবে।"

শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে, "ষড়যন্ত্র আজও বন্ধ হয় নাই। তাহার প্রমাণ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই পাবনায় আওয়ামী লীগের মনোনীত তরুণ এমপিএ জনাব আহমদ রফিককে ছুরকাঘাতে হত্যা, খুলনায় আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব মমতাজ উদ্দিনকে খুন ও চট্টগ্রামে মিছিলে গাড়ি ধাক্কা দিয়া ছাত্র হারুনুর রশীদকে নিহত করার ঘটনা।"

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "কাহার পরামর্শে জানিনা এক শ্রেণীর লোক রাত্রির অন্ধকারে সন্ত্রাসবাদী কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহারা বিপ্লব করিতে চায়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে চোরের মতো ছোরা মারাতে বিপ্লব হয় না।"

শেখ মুজিব "গ্রামে গ্রামে ও প্রতি মহল্লায় আওয়ামী লীগের দুর্গ গড়িয়া তোলার জন্য আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি আহ্বান জানান।" তিনি বলেন, "ঘরে ঘরে বাঁশ ও সুন্দর কাঠের লাঠি রাখিবেন। কিন্তু সাবধান আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত উহা ব্যবহার করিবেন না।"

তথাকথিত বিপ্লবীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া তিনি বলেন, "বাড়াবাড়ি করিবেন না-লাঠির আঘাতে প্রাণ হারাইতে হইবে।" তিনি বলেন, "আমি মুসলমান, খ্রিস্টান নই। একটি চোখ নিলে দুইটি তুলিয়া তাহার জবাব দিব। "

জনগণের ভালোবাসার নিকট আমি দুর্বল

বাংলার বরেণ্য নেতা শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্সের জনসমুদ্রে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, "আমি আইয়ুবের মেশিনগান, মোনেম খানের ভ্রূকুটি কিংবা আগারতলা মামলাকে ভয় করি নাই।" কিন্তু রেসকোর্সের জনসমুদ্রে আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, "বাংলার মানুষ আমাকে যে স্নেহ ও ভালোবাসা দেখাইয়াছে তাহাতে সত্যি আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।"

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা হইবে

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্সের জন-সমাবেশে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, "আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিবে।" তিনি বলেন, "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে আমরা বিশ্বাসী। আমরা প্রতিবেশীদের সহিত সম্মানজনক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে চাই।"

শেখ মুজিব বলেন, "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে আমরা ভারত, গণচীন, আফগানিস্তান, রাশিয়া, বার্মা, নেপাল, ইরান প্রভৃতি সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিব।"

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, "শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভারতের সহিত কাশ্মীর ও ফারাক্কা সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।"

অস্ত্র নয় ভালোবাসা

বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "শোভা পায় কিনা জানিনা, তবু আমি একটি কথা বলিতে চাই। আপনারা অস্ত্রের জন্য যত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার এক দশমাংশও যদি গরিবদের জন্য ব্যয় করেন তাহা হইলে বিশ্বে গরিব আর গরিব থাকিবে না।"

তিনি বলেন, "আমি বলিব মানুষ মারা কল বানানো বন্ধ করুন। আপনাদের সম্মান বাড়িবে।"

শেখ মুজিব বলেন, "অস্ত্রের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন ভালোবাসা আর মহব্বতের দিন। অস্ত্রই যদি সব করিতে পারিত, তাহা হইলে এতদিনে বিশ্ব আপনাদের পদানত হইত। কিন্তু হয় নাই।"

মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, "ইসরাইল অন্যায়ভাবে আরবদের যে ভূমি দখল করিয়াছ, তাহা মুক্ত করার জন্য পাকিস্তান সকল প্রকার সাহায্য দানে প্রস্তুত থাকিবে।"

মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্ধৃতি দিয়া শেখ মুজিব বলেন, "আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল আদর্শ হইতেছে, সকলের প্রতি মৈত্রী, কাহারও প্রতি দুশমনী নয়। আর সর্বপরি আমরা চাই বিশ্বশান্তি।"

সূত্র : *আজাদ*, সোমবার, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১

বাঙালির ইতিহাস নূতনভাবে রচনা করিতে হইবে : শেখ মুজিব

রমনা পার্ক, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ত্রয়োবিংশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকার রমনা পার্কে ১৯৭১ সালের ৪ জানুয়ারি আয়োজিত আলোচনা সভায় ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ :

বাংলার বরেণ্য নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, "বিশ্বে জাতি হিসাবে আত্মপরিচয় দানের জন্যই নূতনভাবে বাঙালির ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।"

তিনি বলেন, "আজও বাংলাদেশের ইতিহাস রচিত হয় নাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গৌরবময় ভূমিকার কথাকে চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা করা হইয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরদের স্মৃতিকে পর্যন্ত উপক্ষো প্রদর্শন করা হইয়াছে।"

সূর্যসেনের স্মৃতি

শেখ মুজিব বলেন যে, "বীর বাঙালি সন্তান সূর্যসেনের নেতৃত্বে প্রথম চট্টগ্রামে ইংরেজদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। সেইদিন সূর্যসেনের নেতৃত্বে যাহারা প্রাণদান করিয়াছেন, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক জালালাবাদ পাহাড়ে তাহাদের উদ্দেশ্যে স্মৃতি মিনার নির্মিত হইবে।"

রবীন্দ্র-নজরুলকে উপেক্ষা করা পাপ

শেখ মুজিবুর রহমান সভায় বলেন, "কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামকে উপেক্ষা করিয়া বাংলা সাহিত্যের কথা চিন্তা করাও পাপ। অথচ এদেশে রবীন্দ্রনাথকে অপাংক্তেয় ও নজরুল সাহিত্যকে 'মুসলমানী' করার নামে বিকৃতি করার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর বারবার আঘাত আসিয়াছে।"

তিনি "ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন।"

সূত্র : *আজাদ*, মঙ্গলবার, ৫ জানুয়ারি ১৯৭১

বাঙালির বিরুদ্ধে চক্রান্ত আগুন লইয়া খেলার শামিল

ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারি

ঢাকা, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১

ঢাকা জেলা হইতে নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সম্মানার্থে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় সোমবার ১৯৭১ সালের ৪ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ :

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণকে আরও বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাইয়াছেন।

তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা তাহাদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখিয়াছে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে জনসাধারণের রায়কে নস্যাৎ করার জন্য চেষ্টা চালানো হইতেছে।

নির্বাচনোত্তর কয়েকটি হত্যা ও আকস্মিকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা চক্রান্তকারীরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার প্রত্যাশী বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন যে, এইসব শোষক চক্রান্তকারী বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ বাংলাদেশকে নিদারুণভাবে শোষণ করিতেছে।

তিনি এক হুঁশিয়ারিতে এইসব শোষক ও চক্রান্তকারীকে তাহাদের দুরভিসন্ধী পরিহারের আহ্বান জানান।

আকস্মিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের ২৩ বৎসরের লুটেরা, শোষক ও স্বার্থবাদী মহল শেষ ছোবল হানার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাহাদের এই অপপ্রয়াস রোধের জন্য তিনি বাংলাদেশের প্রত্যেককে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গে

শেখ মুজিব শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রসঙ্গে বলেন যে, আওয়ামী লীগ একাই দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য দেশের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের রায় লাভ করিয়াছে। তথাপি এই প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ইচ্ছা করিলে তাঁহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারেন।

তিনি তাঁহার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন যে, নীতির প্রশ্নে কখনও তিনি কাহারও সঙ্গে আপস করিবেন না।

তিনি বলেন যে, দীর্ঘদিন যাবৎ শোষিত ও নির্যাতিত হওয়ার পর বাঙালিরা আজ নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ হইয়াছে। ইহারই ফলশ্রুতি স্বরূপ তাহাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

তিনি বলেন যে, জাগ্রত বাঙালির চোখে তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই তাহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা আগুন লইয়া খেলারই নামান্তর হইবে।

সূত্র : *আজাদ, বুধবার, ৬ জানুয়ারি ১৯৭১*

শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতি এগিয়ে আসবে : বঙ্গবন্ধু

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে, ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তান সংগীত শিল্পী সমাজ বঙ্গবন্ধুর সম্মানে ১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। শিল্পীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানপত্রে শিল্পী আবদুল আহাদ বঙ্গবন্ধুকে 'বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রদূত' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন বেগম লায়লা আর্জুমান্দ বানু। শিল্পীদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে সরোদ, সেতার, একতারা এবং জয় বাংলার রেকর্ড উপহার দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পরপরই আইয়ুব সরকার রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। কতিপয় বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের এই পদক্ষেপ সমর্থন করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী ও তাঁবেদার শিল্পী প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাদের এ ধরনের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করেন। বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো :

আজ ২৪ জানুয়ারি, এক অনন্যসাধারণ দিন। এই দিনে আমার মনে পড়ে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদদের কথা। আইয়ুব বিরোধী সেই গণআন্দোলনে আসাদ, মতিউর, আনোয়ারা, ড. জোহা, জহুরুল হকরা জীবন দিয়েছে। আর তাদের রক্তের বিনিময়েই স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে। তাদের জীবন এবং অগণিত দেশপ্রেমিকের সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়েই আজ দিগন্তে স্বাধিকারের সূর্যালোক ঝলমল করে উঠেছে। সেই বীর শহীদরা চিরস্মরণীয়। আমি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

দেশের গণমুখী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সংগীতে, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে প্রতিফলিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই, মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুপ্ত শক্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি।

আপনারা ভালোবাসা এবং শান্তির অনেক গান গেয়েছেন। আজ বস্তির নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের জন্য গান রচনার দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মতো বিপ্লবী গান গাইতে হবে। মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে হবে। যদি এতে বাধা আসে, সেই বাধা মুক্তির জন্যে ৭ কোটি বাঙালি এগিয়ে আসবে।

একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা। বাংলার মানুষ মুসলমান নয়, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নেই—এই ধরনের অভিযোগ দিয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে ২৩ বছর ধরে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। আর বাংলার মানুষও এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগাম চালিয়ে আসছে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন ছিল না, এই আন্দোলন ছিল বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন।

জনগণ যখন অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করছিল, তখন এক শ্রেণীর শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি গত ২৩ বছরে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশস্তি গেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গুছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তারা কি আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, তারা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন? কোন্ ৪০ জন ব্যক্তি রবীন্দ্রসংগীতের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন? কোন্

বিশেষ মহল তথাকথিত ইসলামের নামে নজরুলের গান ও কবিতার শব্দ বদলেছে? রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্বটা থাকে কোথায়? যে মৌলিক গণতন্ত্র ও ডিক্টেটরি শাসনের পতন ঘটাবার জন্যে বাংলার বীর ছাত্র-জনতা-শ্রমিক বুকের রক্ত দিয়েছে, তাদেরই গুণকীর্তন করে, প্রবন্ধ লিখে, বেতার কথিকা প্রচার করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ পয়সা রোজগার করেছেন। বিএনআর-এর অর্থানুকূল্যে বই প্রকাশ করেছেন।

'৪৭ সাল থেকে বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হতো কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন যে কেউ স্বাধীনভাবে বাংলাভাষায় কথা বলতে এবং নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা করতে পারেন। যদিও জনগণ প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছে, তবুও বিপদের আশঙ্কা এখনো দূরীভূত হয় নি। পথ এখনো কন্টকাকীর্ণ এবং অনিশ্চিত। সকল বিপদ ও অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করার জন্যে আমি কবি-সাহিত্যিকদের আহবান জানাচ্ছি।

স্বাধীনতা আন্দালনের বীর সন্তান সূর্যসেন। এই অগ্নি-পুরুষই সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের বুকে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি যদি আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন না করি তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের কখনো সম্মান করবে না। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি করতে পারে না। আমি যখন বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির কথা বলি তখন সিন্ধি, পাঞ্জাবি, বেলুচি, পশ্তু তথা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের সমান সমৃদ্ধি কামনা করি। কারণ, আঞ্চলিক পরিবেশ ও জনগণের ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। ধর্মের নামে ভাড়াটিয়া সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া মানুষের আত্মার স্পন্দনকে পিষে মারারই শামিল। আমি স্বীকার করি আমাদের কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা এখনো তাঁদের ন্যায্য মর্যাদা পাচ্ছেন না। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, যদি আমরা ছয় ও এগার-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন লাভে সক্ষম হই, তাহলে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সবকিছুই পাবেন।

সবকিছুই হবে তাঁদের। ছয়-দফা ও এগার-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের অর্থই হচ্ছে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক স্বাধিকার। জয় বাংলা স্লোগানেরও লক্ষ্য এই সামগ্রিক স্বাধিকার অর্জন। জনগণের সরকার কায়েম হলে বাংলার মাটিতে জাতীয় সংগীত প্রতিষ্ঠা ও একটি জাতীয় 'ললিতকলা একাডেমী' গঠন করতে হবে।

মনে রাখবেন, বিপদ আমাদের কাটে নাই। লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয় নাই। চরম সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেদিনের জন্যে প্রস্তুত হন। আপনাদের সমস্যা শুধু আপনাদেরই নয়, এ সমস্যা সারা জাতির। শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতিই এগিয়ে আসবে।

(দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক সংগ্রাম ও আজাদ, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭১)

সূত্র : *বাঙালির কণ্ঠ*, মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৭ মার্চ ১৯৯৭।

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল বাংলা একাডেমী : বঙ্গবন্ধু

বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। একাডেমীর সভাপতি সৈয়দ মুর্তাজা আলী এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত ভাষণ দেন একাডেমীর পরিচালক প্রফেসর কবীর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো :

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নয়, মূলত শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। এই দিনই বাংলাভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একমাত্র কুমিল্লার শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদ করেন এবং উর্দুর সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। কোন বাঙালি মুসলমান প্রতিবাদ করেন নি। এটা লজ্জাজনক ইতিহাস।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার আন্দোলন ছিল না; বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত ছিল।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস-আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করব না। কারণ, তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়ত কিছু কিছু ভুল হবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।

স্বাধীনতার পর আমাদের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে আচরণ করা হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দালাল বলা হয়েছে। এমন কি ভাষা আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানি করা হয়েছে বলা হতো। বাঙালি হিসেবে আমরা অনেক উদারতার পরিচয় দিয়েছি। তা না হলে আমরা বাংলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাতে পারতাম। কিন্তু সেদিন আমরা উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলাম।

বাঙালির স্বজাত্যবোধকে টুটি চেপে হত্যার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বারবার এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আঘাত হেনেছে, আর তাকে প্রাণ দিয়ে প্রতিহত করেছে এ দেশের তরুণরা। কিন্তু তাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ক'জন আছেন? বিবেকের কাছেই তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। আপনাদের লেখনী দিয়ে বের হয়ে আসা উচিত ছিল এ দেশের গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সন্তান সূর্যসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। তাঁর কথা বলতে আপনারা ভয় পান। কারণ, তিনি ছিলেন হিন্দু। এঁদের ইতিহাস লেখা এবং পাঠ করার জন্যে দেশবাসীর কাছে আহবান জানাই। একদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা যেত না। কিন্তু আজ এই জাতীয়তাবাদ সত্য। একে রোধ করতে পারে এমন কোন ক্ষমতা নাই। এই প্রথমবারের মতো বাঙালি জাতি একতাবদ্ধ হয়েছে। নিজেদের দাবিতে বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ।

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল এই বাংলা একাডেমী। ১৯৫২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই ভবনে বসেই ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলির আদেশ দিয়েছিলেন। তাই, যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালে ক্ষমতায় এসে এখানে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে। এই বাংলা একাডেমীকে কেন্দ্র করে স্বৈরাচারী সরকার কত খেলাই না খেলেছে, তা এ দেশের মানুষের জানা আছে। বাংলা একাডেমীর মতো একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে মাত্র ৩ লাখ টাকা সরকার বার্ষিক বরাদ্দ করেছে। এর জন্যে কাকে দোষ দেব! যারা এসব করছে, সে আমলারা তো এ দেশেরই

ছেলে। বাংলা একাডেমীর ভিতরের সব কথাই আমি জানি। লোক বদল করে নতুন নতুন লোক এনে বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণের যে চেষ্টা চালানো হয়েছে তাও জানি।

স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা একাডেমী যে সপ্তাহ পালন করছে সে সপ্তাহ বাংলাদেশের জীবনে এক কঠিন সপ্তাহ। ফেব্রুয়ারির এই দিনেই বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা, এই সপ্তাহেই কুর্মিটোলার বন্দিশিবিরে হত্যা করা হয়েছে সার্জেন্ট জহুরুল হককে, এই সপ্তাহেই শহীদ হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা, আর এই সপ্তাহেই কারফিউ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে আত্মাহুতি দিয়েছে এ দেশের অসংখ্য মায়ের অসংখ্য নাম না জানা সন্তান। স্বৈরাচারী চক্র সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে কোন কোন প্রফেসরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু কই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক তো সে স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে তখন পদত্যাগ করেন নাই। তখন অধ্যাপকরা একযোগে পদত্যাগ করলে আন্দোলনে এত রক্তক্ষয়ের প্রয়োজন হতো না।

মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।

আমরা জনগণের দাবি আদায়ের জন্যে রাজনীতি করি। তবে তার মানে এই না যে, আমরা ক্ষমতা চাই না। আমরা দাবি আদায়ের জন্যেই ক্ষমতায় যেতে চাই। ক্ষমতা পেলে আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করব। আমাদের 'জয় বাংলা' স্লোগানের মধ্যেই এ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিহিত আছে। তবে দাবি আদায় না হলে আমরা ক্ষমতা ছেড়ে চলে আসব।

জয় বাংলা!

(*দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ, সংগ্রাম*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)

সূত্র : *বঙ্গালির কণ্ঠ*, মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৭ মার্চ ১৯৯৮।

শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে শেখ মুজিবের দৃঢ়তা

মেশিনগানের মুখেও নীতির বিচ্যুতি ঘটিবে না

কারিগরি মিলনায়তন, ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

ঢাকার স্থানীয় কারিগরি মিলনায়তনে ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি পার্টির যুক্ত অধিবেশনে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ-এর অংশবিশেষ :

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সোমবার (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১) দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ছয়-দফা ও এগার-দফার ভিত্তিতেই প্রণীত হইবে। এমন কি মেশিনগানের মুখেও আওয়ামী লীগের এই নীতির বিচ্যুতি ঘটিবে না।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন শুরু করিয়াছে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বেই খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পন্ন হইবে।

তিনি বলেন যে, "গত ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে পার্টির জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ যে ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা হইতে পিছু হটিবার কোন উপায় নাই। আমরা ওয়াদার সহিত বেঈমানী করিতে পারি না।"

শেখ মুজিব বলেন, "১৯৬৬ সালে যখন ছয়-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করি, তখন ইহা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। পরে তাহা আওয়ামী লীগের সম্পত্তি হয়। এবার নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ছয়-দফার পক্ষে রায় দান করিয়াছে। এখন উহা জাতির সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। তাই আজ আর ইহার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের ক্ষমতা শেখ মুজিবুর রহমান বা আওয়ামী লীগের নাই।"

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, "ছয়-দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের সহিত পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের রহিয়াছে।" তিনি বলেন, "বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।"

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে সর্বজনের মতামত গ্রহণের পরামর্শ দানের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন, "জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইলেও আমরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সকলের সহযোগিতা চাই। অবশ্য গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী আমরাই শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা পাইয়াছি। আমরা শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিতেছি না। যাহারা এই কথা বলেন কিংবা প্রচার করেন, তাহারা মূলত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নহেন। একনায়কত্ব বা ফ্যাসীবাদী পন্থায় নহে– গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবে।"

আগামী ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, "বিলম্বে হইলেও পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

তিনি বলেন, "কিন্তু নূতন করিয়া ষড়যন্ত্রের খেলা শুরু হইয়াছে। আমি অনুরোধ করি, এই খেলা বন্ধ রাখুন। আগুন লইয়া খেলার পরিণাম কিছুতেই সুখের হইবে না। আমরা জনগণের জন্য রাজনীতি করি, অতএব, জানি কিভাবে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির মোকাবিলা করিতে হয়।"

শেখ মুজিব দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, "এদেশের মাটি হইতে চিরদিনের জন্য ষড়যন্ত্রের রাজনীতির মূলোচ্ছেদ করা হইবে। যত ষড়যন্ত্রই হোক না কেন, আওয়ামী লীগই দেশে সরকার গঠন করিবে। আর এই অধিকার আমরা রক্তের বিনিময়ে আদায় করিয়া লইয়াছি।"

অধিবেশনে যে সকল পশ্চিম পাকিস্তানি আওয়ামী লীগ নেতা যোগদান করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দলীয় প্রধান সমগ্র পাকিস্তানে দুঃখী-দরিদ্র জনগণের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিবার আহ্বান জনান। কোন ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি না করার জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবন্দকে অনুরোধ করেন।

বাঙালির চোখে-মুখে আজ যে স্ফুলিঙ্গ স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে, সেই স্ফুলিঙ্গের অর্থ অনুধাবন করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান কায়েমী স্বার্থবাদী ও ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি পরামর্শ দেন।

শেখ মুজিব ষড়যন্ত্রের মুখে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতিতে সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য দলীয় নেতা, কর্মী, সমর্থক ও জনতার প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

সূত্র : *আজাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

কোন শক্তি এখন আর বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না : বঙ্গবন্ধু

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

শহীদ দিবসের একটি অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, বাংলার ছাত্র-শ্রমিক-জনতা এখন প্রাণ বিসর্জন দিতে শিখেছে এবং কোন শক্তিই এখন আর বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

গত সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আমাদের শহীদদের রক্ত আমাদের ঐক্যবদ্ধ, আত্মবিশ্বাসী এবং আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ হতে শিখিয়েছে। প্রাণ বিসর্জন দিতে শেখেনি এমন কোন জাতি সফল হতে পারে না।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস স্মরণ করে শেখ মুজিব বলেন যে, এটা শুধু ভাষা আন্দোলন ছিল না। এদেশের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনি পুনরায় বলেন, বাঙালির এই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, বন্দুক দিয়েও কেউ একে রুখে দিতে পারবে না।

কখনও ভুলবনা

সংক্ষিপ্ত ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, বাঙালি যতদিন বেঁচে থাকবে, তার সংস্কৃতি ততদিন থাকবে। "আমি কখনোই একুশে ফেব্রুয়ারিকে ভুলব না।"

আওয়ামী লীগ প্রধান জনগণকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান, যাতে শহীদের রক্ত বৃথা না যায়।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং ঢাকায় উপস্থিত আওয়ামী লীগের এমএনএ এবং এমপিএগণ।

ভাষান্তর : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৪২ [*মর্নিং নিউজ*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

বাঙালি আর শহীদ হইবে না– গাজী হইবে : শেখ মুজিব

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি'র প্রথম প্রহর ১৯৭১

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান শনিবার (২০ ফেব্রুয়ারি '৭১) মধ্যরাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঘোষণা করেন যে, ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রদর্শিত রক্ত-পথেই এবার বাংলার মানুষকে গাজী হইতে হইবে।

মহান শহীদ দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিব বলেন যে, বাংলার ঘরে ঘরে আজ তাই দুর্গ তৈরি করিতে হইবে এবং সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য বাঙালিদের প্রস্তুতি লইতে হইবে। কারণ, ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয় নাই। আমাদের সম্মুখে আরও কঠিন দিন আসিতে পারে।

বাহান্নর শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে, যতদিন বাংলার আকাশ, বাতাস, নদী থাকিবে, ততদিন শহীদদের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া থাকিবে। আর বাংলার মানুষকে রক্তদানের মাধ্যমে শহীদদের রক্ত-ঋণ শোধ করিতে হইবে।

ইহার পূর্বে রাত্রি ১২-১ মিনিটে শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনের শহীদদের মাজার জেয়ারত করেন, মধ্যরাত্রিতে এই সময় আজিমপুর গোরস্থান হইতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মশালে আর মিছিলে এক অনন্যরূপ ধারণ করে।

সূত্র : *আজাদ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

আর উপনিবেশে বাস করিতে চাই না

সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ

আওয়ামী লীগ অফিস, ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) বুধবার বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ অফিসে অল্প সময়ের নোটিশে আহূত জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে যে ভাষণ দেন, নিম্নে তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল :

১২ কোটি লোকের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলা একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। গত এক সপ্তাহ যাবত যে ধরনের রাজনৈতিক অভিনয় চলিতেছে, বর্তমানে উহার অবসান প্রয়োজন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি সঙ্কট সৃষ্টি করা হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোকের প্রতিনিধিত্বকারী আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জনগণের প্রতি তাহাদের দায়িত্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তোলা হইতে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে নীরবতা পালন করিয়া আসিয়োছে।

গণতান্ত্রিক নীতিতে আস্থা রাখিয়া জাতীয় পরিষদে বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্বপ্রকার শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে।

এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই আওয়ামী লীগ অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের আহ্বান জানাইয়া আসিয়াছে। ইহা ছাড়া তাহারা প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও নেতার সহিত আলোচনায়ও প্রস্তুত ছিল।

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছয়-দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্রের জন্য তাহাদের ঐতিহাসিক রায় দিয়াছে। দলীয় নেতৃবৃন্দসহ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছয়-দফাভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক সূত্রের তাৎপর্য তাহাকে বুঝাইয়াছি। ইহার পর আমি পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড. এ. ভুট্টোর সহিত বৈঠকে মিলিত হইয়াছি এবং আমার সহকর্মীগণ তাঁহার সহকর্মীদের সহিত কয়েক দফা বৈঠকে বসিয়াছেন।

আমরা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেই যে, পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ ছয়-দফাভিত্তিক ফেডারেল পরিকল্পনার পক্ষে রায় দান করায় বর্তমানে বিষয়টি জনগণেরই সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। জনগণ আওয়ামী লীগের প্রতি ছয়-দফাভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার ম্যাণ্ডেট দান করিয়াছে এবং পার্টি এই ম্যান্ডেট কার্যকরী করিতে বাধ্য।

পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের বৈধ স্বার্থ কিংবা ফেডারেল সরকারের স্থায়িত্বের ব্যাপারে ছয়-দফার প্রভাব সম্পর্কে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের মনোভাব ব্যাখ্যার প্রস্তুতি জানাইয়াছি।

পশ্চিম পাকিস্তানে তাহাদের অন্যান্য সদস্যের সহিত আলাপ-আলোচনার পর তাঁহারা পুনরায় আওয়ামী লীগের সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া জানাইয়া পিপলস পার্টিই ছয়-দফা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ঠেকাইয়া রাখে।

আওয়ামী লীগ ছয়-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তাহারা ইতোমধ্যে দেশের জন্য একটি স্থিতিশীল শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া আমরা মারকাজি জমিয়তুল উলেমায়ে ইসলামের মওলানা নূরানী, নওয়াব আকবর খান বুগতি, মওলানা গোলাম গাউস হাজারভী এবং জমিয়তে উলেমায়ে ইসলামের মওলানা মুফতী মাহমুদ ও পশ্চিম পাকিস্তানের

অন্যান্য নেতার সহিত আলাপ-আলোচনা করি।

একই সঙ্গে আমরা জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনতিবিলম্বে আহ্বানের দাবি জানাইয়া আসিতেছি। কারণ, চূড়ান্তভাবে জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বানের পূর্ব পর্যন্ত দুইমাস অতিবাহিত হওয়ায় আমরা মনে করি যে, পরিষদের বৈঠক আহ্বানে অহেতুক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

শেষ পর্যন্ত যখন ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত করিয়া ঘোষণা প্রকাশিত হইল তখন মুহূর্তের জন্য মনে হইয়াছিল যে, ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিচারবুদ্ধির জয়লাভ হইয়াছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে যখনই জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আসিয়াছে তখনই পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রকারী মহলটি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই গণবিরোধী মহলটি ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার নির্বাচিত সরকারকে বাতিল করিয়া দিয়াছে। ১৯৫৫ সালে গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করিয়া সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে।

জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বানের তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর হইতে বিভিন্ন ঘটনা দৃষ্টে মনে হয়, এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী শক্তিগুলি পুনরায় আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। জনাব ভুট্টো ও তাহার দল অকস্মাৎ এমন সব ভাব এবং উক্তি করিতে শুরু করিল যে, উহাতে মনে হয় তাহারা জাতীয় পরিষদের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা প্রদান করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নস্যাৎ করিতে ইচ্ছুক। এইভাবেই জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজকে বানচাল করিয়া দেওয়া হইবে।

পিপলস পার্টির সেক্রেটারি জেনারেলের নিম্নলিখিত বিবৃতিটির উদ্ধৃতি দেওয়া হইল :

"ইহা কোন আহত ভাবাবেগ নহে, বরং একটি নির্মম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সত্য যে, পূর্ব পাকিস্তান বাস্তবিকই একটি উপনিবেশ।" (আউট লাইন অব এ ফেডারেল কনস্টিটিউশন ফর পাকিস্তান : জে এ রহিম।)

ছয়-দফা কর্মসূচির প্রশ্নে যে সকল আপত্তি তোলা হইয়াছে, ধীরস্থিরভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এই সকল আপত্তি বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার সুপরিকল্পিত পন্থা বিশেষ। বাংলাদেশের ৭ কোটি অধিবাসীর উপর ঔপনিবেশিক শোষণ এবং দেশের অপর অংশের কায়েমী স্বার্থের সুবিধার জন্য বাংলাদেশের সম্পদ হস্তান্তর প্রধানত কেন্দ্র কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য এবং বৈদেশিক মুদ্রানিয়ন্ত্রণের মারফতেই করা হইয়াছে। এইভাবেই বিদেশ হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগের অধিক পশ্চিম পাকিস্তানে কায়েমী স্বার্থবাদীদের কল্যাণেই ব্যবহার করা হইয়াছে। গত ২৩ বৎসরে মোট আমদানির দুই-তৃতীয়াংশরও অধিক পশ্চিম পাকিস্তানেই করা হইয়াছে। পাঁচ কোটি টাকার উপর বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় শিল্পপতির কল্যাণে ৭ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত বাংলাদেশকে একটি সংরক্ষিত বাজার হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই শিল্পপতিরা বাংলাদেশকে শোষণ করিয়া মুনাফার পাহাড় গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই নির্মম শোষণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আসন্ন ধ্বংসের মুখে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এবং জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন হইতে বঞ্চিত বাংলাদেশের মানুষ আজ চরম নিঃস্ব অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। কোনমতেই আমরা এই অবস্থা চলিতে দিতে পারি না।

কেন্দ্রের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য না থাকিলে অনুরূপ শোষণ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইত না। এই পটভূমিকায় কেন্দ্রের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য বজায় রাখার জেদ

হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, জাতীয় সংহতির স্বার্থ নিরাপদ করা নহে বরং বাংলাদেশের উপর ঔপনিবেশিক শোষণের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রধান হাতিয়ার কেন্দ্রের হাতে রাখা সুনিশ্চিত করাই উহার উদ্দেশ্য।

পিপলস পার্টির অপর একটি প্রস্তাবে এই মনোভাব অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। একটি দ্বিতীয় পরিষদের দাবির সমর্থনে সত্যিকার ফেডারেশনের নীতির (উহার অর্থ যাহাই হউক না কেন, কারণ কোন দুইটি ফেডারেশনই অভেদাত্মক নহে) প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে। এইমর্মে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, সকল ইউনিট হইতে সমপ্রতিনিধিত্ব উক্ত পরিষদে থাকিতে হইবে।

অপর কথায়, ধরা যাক ১০০ সদস্য বিশিষ্ট দ্বিতীয় পরিষদে মাত্র ২০ জন সদস্য বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করিবেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীর এই প্রদেশটি এইভাবে একটি অকিঞ্চিৎকর সংখ্যালঘু ইউনিটে পরিণত হইবে।

বস্তুতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলগণ ইতিপূর্বে এইমর্মে প্রস্তাব করিতে সাহসী হয় নাই যে, বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব শতকরা ২০ ভাগে নামাইয়া আনা হউক। পরন্তু তাহারা প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্যের আহ্বান জানাইয়া নিজেরাই সন্তুষ্ট ছিল।

ইউনিটগুলির সমপ্রতিনিধিত্বভিত্তিক দ্বিতীয় কক্ষের প্রস্তাব গৃহীত হইলে বাংলাদেশ অপর পরিষদ কক্ষে জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব লাভ করিলেও অসহায় সংখ্যালঘু প্রদেশে পরিণত হইবে। ইহার ফলে দেশের অপর অংশের সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে।

সুতরাং, এইভাবে গঠিত কেন্দ্রের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য ন্যস্ত করা হইলে ঔপনিবেশিক শোষণের অতীত ধারা স্বচ্ছন্দে স্থায়ী করা যাইবে। এই প্রস্তাবাবলির মধ্য দিয়া কেন্দ্রীয় আমলাদের সংকীর্ণ প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফলে তাহারা গত ২৩ বৎসর যাবৎ বিশ্বস্ততার সহিত যাহাদের সেবা করিয়া আসিয়াছে এখনও পশ্চিম পাকিস্তানের সেই কায়েমী স্বার্থবাদী প্রভুদের সেবা করিয়া যাইতে সক্ষম হইবে।

সুতরাং, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সমপ্রতিনিধিত্বভিত্তিক দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পরিষদের দাবি বাংলাদেশকে ঔপনিবেশিক শোষণ চালাইয়া যাওয়ারই একটি চাতুরী বই আর কিছু নহে। এই ছয়-দফা কর্মসূচি সম্পর্কে উত্থাপিত অন্যান্য আপত্তি বাধাধরা বিকৃতি বিশেষ। বাংলাদেশের অধিবাসী এবং দেশের পশ্চিমাঞ্চলের নিপীড়িত জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য। ছয়-দফা কর্মসূচি কোনমতেই ফেডারেল সরকারকে ফেডারেশনের অন্তর্গত ইউনিটসমূহের করুণার পাত্রে পরিণত করে না; যদিও অবস্থাকে এইভাবে চিত্রিত করা হইয়া থাকে। ছয়-দফায় একটি নির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কর ও বৈদেশিক অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে ফেডারেল সরকারকে যথেষ্ট ক্ষমতা দান করা হইয়াছে যাহার ফলে ফেডারেল সরকার ফেডারেটিং ইউনিটগুলির উপর ফেডারেল কর আরোপ করার ক্ষমতা লাভ করিবেন। ইউনিটগুলির সম্পদের উপর ধার্য্যকৃত এই কর ফেডারশনের আয়ের প্রধান উৎস হইবে।

ফেডারেটিং ইউনিটগুলির উপর বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হইলে ফেডারেল সরকারের পক্ষে বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইবে বলিয়া যে প্রচারণা চালানো হইতেছে উহা ঠিক নহে। কারণ, এ সম্পর্কে বহুবার নিশ্চয়তা দান করা হইয়াছে যে, ফেডারেটিং ইউনিটগুলি 'দেশের বৈদেশিক নীতির কাঠামোর মধ্যে' থাকিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য নিয়ন্ত্রণ করিবে।

বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্ধারিত জনসাধারণের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির কুমতলবে অত্যন্ত জোর প্রচেষ্টা চালান হইতেছে। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, বাঙালিদের কার্যত

'শত্রু' হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত প্রতিনিধিগণ বাঙালিদের মধ্যে নিজেদিগকে 'প্রতিভূ' বলিয়া মনে করেন। জাতীয় পরিষদকে 'কসাইখানা' আখ্যায়িত করিয়া বাঙালি জাতীয় পরিষদ সদস্যদের প্রতি অবাঞ্ছিতভাবে কটাক্ষ করিয়াছে। ঢাকায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের জন্যই তাহারা উপরোক্ত বল্গাহীন অভিযোগ করিয়াছেন।

এই ধরনের প্রতিক্রিয়া যেমন অশোভন তেমনই অযৌক্তিক। বিশেষভাবে গত ২৩ বৎসর যাবৎ বাঙালিরাই পশ্চিম পাকিস্তানে যাতায়াত করিয়াছেন। সেখানেই রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় সংস্থা অবস্থিত। যদি আবহাওয়া এইভাবে বিষাক্ত করিয়া তোলা হয় তবে কী বাঙালিরা ন্যায়সঙ্গতভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে না, তাহাদের পশ্চিম পাকিস্তানে যাইতে বলা উচিত হইবে কী?

কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে আরও কতিপয় বক্তব্য সে সম্পর্কে আলোকপাত করিবে। ১৯৭১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি 'পাকিস্তান টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে পিপলস্ পার্টির জনৈক সদস্য বলিয়াছেন :

"... জনগণকে, ... অবশ্যই ... দেশের সংহতির প্রশ্নে তাহাদের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইবে এবং মৌলিক প্রশ্নে যে কোন আপস প্রস্তাব অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। এবং একটি আসন্ন বিরাট ক্ষতির কবল হইতে সমগ্র দেশকে রক্ষা করার ক্ষমতা যখন তাহাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় তখন অন্তত দেশের যে অংশকে তাহারা রক্ষা করিতে পারে সেই অংশকে রক্ষার চেষ্টা তাহারা অবশ্যই করিবে। সঠিক রাজনৈতিক কর্মপন্থা হইতেছে, যাহাকে রক্ষা করা সম্ভব তাহাকেই রক্ষা করা এবং দেশের সংহতি বিনষ্টের চেষ্টা বা প্রস্তাব না করা। আমরা অবশ্যই আওয়ামী লীগকে ছয়-দফা হইতে সরিয়া আসিতে বলিব, যদি তাহারা তাহা না করে তাহা হইলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর ছয়-দফাকে চাপাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা যে কোন মূল্যে প্রতিহত করিবে।"

এখানে দুইটি তাৎপর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহার একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের উপর ছয়-দফা চাপাইয়া দিতে চায়। নীতিগতভাবে ছয়-দফা হইতেছে ফেডারেটিং ইউনিটগুলির স্বায়ত্তশাসনের রক্ষার একটি স্কিম। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেটিং ইউনিটগুলি বাংলাদেশের সমমাত্রায় স্বায়ত্তশাসন পাইতে না চাহে অথবা কেন্দ্রের উপর কতিপয় অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে চাহে অথবা কোন ধরনের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান গড়িতে চাহে, তবে ছয়-দফা কোন-ক্রমেই উহার প্রতিবন্ধক হইবে না। তদুপরি আওয়ামী লীগ কখনও এমন ভূমিকার কথাও প্রকাশ করে নাই যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেটিং ইউনিটগুলির উপর ছয়-দফা চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অপর যে দিকটি উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, উহা হইতেছে যে, বাংলাদেশকে যদি অতীতের শর্তে বা অপর অংশের সংখ্যালঘুদের নির্দেশিত অনুরূপ কোন শর্তে বাঁধিয়া রাখা না যায় অর্থাৎ কলোনি হিসাবে উহাকে রাখা না যায় এবং তৎপরিবর্তে বাংলাদেশ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসাবে যথার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানকে অবশ্যই 'রক্ষা' করিতে হইবে। কিন্তু 'কাহার নিকট হইতে' বা 'কাহার জন্য' উহাকে রক্ষা করিতে হইবে? স্পষ্টত বিবৃতির রচয়িতা উহাকে বাঙালিদের হাত হইতে রক্ষা করিতে চায়, যে বাঙালিরা গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল আছেন এবং উহা রক্ষা করা হইবে– পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের খাতিরে। অথচ গণতন্ত্রের অধীনে উহাদের (এই সমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদীদের) বাঁচার কোন পথ ছিল না। তাই, বাংলাদেশে তাহাদের 'অধিকার' যদি খতমও হইয়া যায়, তবুও পশ্চিম পাকিস্তানের লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষকে শোষণের নিশ্চয়তা যেন তাহাদের থাকে।

পাকিস্তানের সচেতন জনগণের কাছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, চক্রান্তকারীরা এবং কায়েমী স্বার্থবাদীগণ ও তাহাদের দালালরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও তাহাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত মরিয়া হইয়া ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে। নৈরাশ্য আজ তাহাদিগকে এতদূর লইয়া গিয়াছে যে, তাহারা পাকিস্তানের অস্তিত্ব লইয়া জুয়াখেলা শুরু করিতে প্রস্তুত। অথচ জাতীয় সংহতির জন্য তাহারা খুবই উদ্বিগ্ন বলিয়া সব সময় ভান করিয়া থাকে। পাকিস্তানের জনগণ যে সময় একত্রে বসবাস করার জন্য নিজেরা গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি ভিত্তি তৈরির সুযোগ পাইয়াছে, ঠিক সেই সময় তাহাদের এই শেষ সুযোগকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য তাহারা পাকিস্তানের সংহতিতে মরণ আঘাত হানিতে উদ্যত হইয়াছে। একত্রে বসবাসের এই ভিত্তিই হইতেছে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।

তবুও আমরা দেশবাসীকে স্থায়ী শাসনতন্ত্র দেওয়ার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদ ফোরামের মধ্যেই সকল রকম চেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। কারণ, জাতীয় পরিষদই এই প্রচেষ্টার একমাত্র উপযুক্ত ফোরাম। এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য আমরা পাকিস্তানের সকল অংশ হইতে জাতীয় পরিষদের সকল সদস্যকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগণ এবং বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র সকল শ্রেণীর সচেতন মানুষ দেশবাসীর এই বিজয়কে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত আছে।

যাহারা "সংখ্যাগরিষ্ঠের ডিক্টেটরশিপ" এবং "নির্বাচিতদের স্বৈরাচারিতা" চলিতে পারে বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের জওয়াব :

পাকিস্তানের জনগণ সংখ্যালঘুদের ডিক্টেটারশিপ বরদাশত করিবে না এবং কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা তাহারা ভীতও হইবে না– এই স্বেচ্ছাচারের মূলে সাহায্যের জন্য যতবড় শক্তির দুর্গই থাকুক না কেন।

জনগণের শক্তিকেই আমরা শুধু স্বীকার করি। দেশবাসী প্রত্যেক স্বৈরাচারী শাসককে পরাভূত করিয়াছে। জাগ্রত জনতার আক্রমণের মুখে তাহারা কখনও টিকিয়া থাকিতে পারে নাই–যত শক্তিই তাদের থাকুক না কেন। স্বৈরচারী শাসকদের ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন। আমরা চক্রান্তের কালকুটকে কোনরূপ হঠকারিতাপূর্ণ বা দুঃসাহসিক কার্যে লিপ্ত না হওয়ার জন্য কিংবা ১২ কোটি লোকের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলা শুরু না করার জন্য হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি। যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বাধা দেওয়া হয় বা বানচাল করার চক্রান্ত করা হয় তাহা হইলে উক্ত চক্রান্তকে প্রতিহত করাই হইবে বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্দু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের জাগ্রত জনগণের পবিত্র দায়িত্ব। আমি আমাদের দেশের ভূমি হইতে চক্রান্তকারীদের উৎখাতের জন্য এবং গণবিরোধী শক্তিকে যে কোন উপায়ে প্রতিহত করার জন্য বাংলাদেশের জাগ্রত জনগণের প্রতি প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাইতেছি।

আমরা আজ আবার এই শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যাহাতে উপনিবেশে বাস না করিয়া আত্মমর্যাদাসহ স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাস করিতে পারে তজন্য প্রয়োজন হইলে আমরা জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিব।

সূত্র : আজাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

ছয়-দফার ব্যাপারে আপসের প্রশ্ন উঠিতে পারেনা : শেখ মুজিব

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বুধবার (২৪ ফেব্রুয়ারি '৭১) আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবদান প্রসঙ্গে বলেন যে, ছয়-দফার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের আপসের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কেননা, নির্বাচনের পরে ছয়-দফা জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে।

তবে তিনি জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহ কী ধরনের স্বায়ত্তশাসন চায় তাহা ওই সব প্রদেশই নির্ধারণ করিবে এবং এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগেরও কোন আপত্তি থাকিবে না বরং আওয়ামী লীগ তাহাদের সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে।

প্রশ্ন : এই সহযোগিতার অর্থ কী শেষ পর্যন্ত আপসে রূপান্তরিত হইবে না?

উত্তর : কখনই নহে। ছয়-দফার প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দকে সুস্পষ্ট ধারণা দান করার জন্য আমরা তাহাদের সহিত কেবলমাত্র আলোচনা করিতে পারি।

প্রশ্ন : জাতীয় পরিষদের অধিবেশন নির্ধারিত সময়েই বসিবে কী?

উত্তর : আমি কোন খবর পাই নাই।

প্রশ্ন : যে কোন কারণেই হউক, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন একান্তই যদি না বসে তাহা হইলে আপনার বক্তব্য কী হইবে?

উত্তর : ৩ মার্চের পর এই সব প্রশ্নের জবাব দান করিব। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলিতে পারি জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বাঞ্চালের যে-কোন অপচেষ্টাকে যে-কোন মূল্যে প্রতিহত করা হইবে।

প্রশ্ন : জনাব ভুট্টো দেশের রাজনীতিতে অক্ষ-শক্তি সম্পর্কে যে সংজ্ঞা পেশ করিয়াছেন সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর : আমরা গণপ্রতিনিধি। কাজেই আমরা গণশক্তিতেই বিশ্বাসী কোন অক্ষ-শক্তি বা অনক্ষ-শক্তিতে বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন : আপনি কী পশ্চিম পাকিস্তানে সাব-ফেডারেশন গঠনের পক্ষপাতী।

উত্তর : আমরা কাহারও উপর জবরদস্তিমূলকভাবে কোন কিছু চাপাইয়া দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাস করি না। ইহা তাহাদের ব্যাপারে তাহারাই ভালো বোঝেন। তবে ছয়-দফার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানি প্রদেশসমূহকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্যও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রশ্ন : ছয়-দফার বিতর্কে পিপিপি নেতা জনাব ভুট্টো আপনার নিকট যে গোপন আশ্বাস কামনা করিয়াছেন আপনি কী উহা মঞ্জুর করিতে রাজি আছেন?

উত্তর : কোন কিছু বলার থাকিলে জাতীয় পরিষদই উপযুক্ত স্থান। কাজেই গোপন আশ্বাস প্রার্থনা করাটাই একটা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নহে।

প্রশ্ন : লাওসে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?

উত্তর : আমরা যে-কোন রাষ্ট্রের উপর যে-কোন ধরনের হামলার বিরোধী।

সূত্র : আজাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম : বঙ্গবন্ধু

রমনা রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল বীর বাঙালির বিশাল জনসমুদ্রে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

রমনা রেসকোর্স, ঢাকা, ৭ মার্চ ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্র। মুহুর্মুহু গর্জনে ফেটে পড়ছে জনসমুদ্র, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে একই আওয়াজ–স্বাধীনতার বজ্রশপথ। বাতাসে উড়ছে অসংখ্য পতাকা, সোনার বাংলার মানচিত্র আঁকা লাল সবুজের পতাকা, শ্লোগানের সাথে সাথে উত্থিত হচ্ছে আকাশের দিকে বাঙালির সংগ্রামের প্রতীক বাঁশের লাঠি, অসংখ্য লাঠি। মঞ্চে মাইক থেকে শ্লোগান দিচ্ছেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রলীগ নেতা আ স ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন; শ্লোগান দিচ্ছেন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান আবদুর রাজ্জাক, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ফিরে আসছে শ্লোগানের জবাব বজ্রনির্ঘোষে।

যেসব শ্লোগানে শ্লোগানে উদ্দীপ্ত হয় জনসমুদ্র— 'জয় বাংলা,' 'আপস না সংগ্রাম—সংগ্রাম সংগ্রাম', 'আমার দেশ তোমার দেশ—বাংলাদেশ বাংলাদেশ,' 'পরিষদ না রাজপথ—রাজপথ রাজপথ,' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর,' 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়—বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' বিকেল ৩.২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' শুরু করেন - সম্পাদনা পরিষদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলব, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস।

বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সনে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সনে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৬ সনে ছয়–দফার আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান

সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব, এমনকি আমি এ-ও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজন যদিও হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না। আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, ওদের সঙ্গে আলাপ করলাম : আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে দেশের গরিব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি না-কি স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আর.টি.সি.? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আর.টি.সি.তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেম্বলিতে বসতে

পারব কি পারব না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা-ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্মেন্ট দপ্তরগুলো-ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চলাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না। শোনেন–মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন-বেঙলি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।

সূত্র : *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যালবাম*, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, রাস্তা ৩২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১ আগস্ট ১৯৯৭।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

ঢাকা, ১৪ মার্চ ১৯৭১

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক অবস্থান একটি শক্তিশালী শাসনতান্ত্রিক বৈধভিত্তি লাভ করে। তিনি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হন। প্রথমেই তিনি ৩ জানুয়ারি ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দানে তাঁর দল থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন করেন। উক্ত শপথ বাক্যের মধ্যে তিনি পূর্ব বাংলার জনগণের আত্মত্যাগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি গণপ্রতিনিধিদের অঙ্গীকার স্পষ্ট করেন। পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করা, বিভিন্ন স্থানে গুলি চালানো, হত্যা ইত্যাদি কারণে বঙ্গবন্ধু এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেন। ইয়াহিয়া খান সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে অভিহিত করেও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে টালবাহানা করতে থাকেন। গোটা জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস ধরে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া প্রাসাদ ষড়যন্ত্র আটতে থাকেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৩ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ এক ভাষণে স্থগিত ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলায় দারুণ-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ২ মার্চ থেকে হরতাল, ধর্মঘট ও অসহযোগের কর্মসূচি শুরু হয়। এতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও কর্মসূচি কার্যকর হতে থাকে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুর আদেশ ও নির্দেশই সরকারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কার্যকর হতে থাকে। ১৪ মার্চ সুনির্দিষ্টভাবে বঙ্গবন্ধুর ৩৫টি নির্দেশ ঘোষিত হয়েছিল। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর আদেশ-নির্দেশেই মূলত তখন পূর্ব বাংলার সরকারি-বেসরকারি দপ্তর পরিচালিত হতো – সম্পাদনা পরিষদ

"জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। মুক্তিকামী মানুষ বিশ্বের সবখানে যারা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন মুক্তির জন্যে, আমাদের সংগ্রামকেও তাঁদের নিজেদের বলে গণ্য করা উচিত। শক্তির সাহায্যে যারা শাসনের চক্রান্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, আমাদের জনগণ তা প্রমাণ করেছে।"

আজ বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমন কি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। নগ্নভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে মানুষকে দলিত করার কথা চিন্তা করেছিল যারা, তারা নিশ্চিতই পরাভূত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ–সরকারি কর্মচারী, অফিস আর কল-কারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে, তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণ বরণ করতেই বদ্ধপরিকর।

রবিবার (১৪ মার্চ) শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন, এ বড় দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়েও কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এদেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাথা নত না করার দৃঢ়তায় একাট্টা। আমি তাই, সর্বশেষ নির্দেশ যাদের প্রতি জারি করা হয়েছে, তাঁদেরকে হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানাই। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের পেছনে রয়েছে। তাঁদের ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে এই যে চেষ্টা তা বাংলাদেশের মানুষকে রক্তচক্ষু দেখাবার অন্যান্য সাম্প্রতিক চেষ্টার মতো নস্যাৎ হতে বাধ্য।

"বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ, প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর আত্মমর্যাদার সাথে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত

আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আমি জনগণকে যে কোন ত্যাগের জন্য এবং সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে যে-কোন শক্তির মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই।"

অপর এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, জনগণের যে আন্দোলন গৌরবোজ্জ্বল দ্বিতীয় সপ্তাহ সমাপ্ত করেছে তা অব্যাহত থাকবে। গত দুসপ্তাহের মতো হরতাল অব্যাহত থাকবে। সেক্রেটারিয়েট, সমস্ত সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ থেকে যে নয়া কর্মসূচি শুরু হবে নির্দেশাবলির আকারে তা বিশদভাবে নিচে উল্লেখ করা হলো। নিম্নলিখিত নির্দেশাবলি কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ঘোষিত সকল নির্দেশ, অব্যাহতি ও ব্যাখ্যাসমূহ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

আগামী কর্মসূচি ঘোষণা

১ নং নির্দেশ

সরকারি সংস্থাসমূহ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্ট হরতাল পালন করবেন এবং নিম্নে বর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলি এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ছাড় ব্যাখ্যা দেওয়া হবে তা সবই মেনে চলবেন।

২ নং নির্দেশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

সমগ্র বাংলাদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩ নং নির্দেশ

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা

ক. ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের কোন দপ্তর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকরী বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন।

ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের এই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন।

খ. পুলিশ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন।

গ. জেলের দপ্তরে কাজ চলবে এবং জেল ওয়ার্ডারগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাবেন।

ঘ. আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪ নং নির্দেশ

বন্দর (অভ্যন্তরীণ বন্দরসহ)

বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলটেজসহ সকল কাজ করে যাবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই সব অফিস খোলা থাকবে যেগুলি বন্দরে জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠু আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সৈন্য চলাচলে কিংবা সমরাস্ত্র আনানোর ও বাংলাদেশের

মানুষকে নির্যাতনের জন্যে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা-নেওয়ার কাজে কোনভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য খাদ্যবাহী জাহাজসমূহের মাল খালাস ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক (পোর্ট ডিউজ) ও মাল খালাসের কর বা শুল্ক আদায় করবেন। অভ্যন্তরীণ বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক আদায় করবেন।

৫ নং নির্দেশ

আমদানি

আমদানিকৃত সকল মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এই কাজ সমাধানের জন্যে ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেডে ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ একাউন্ট খোলা হবে। কাস্টমস কালেক্টরগণ এই বিশেষ একাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবেন কাস্টমস কালেক্টরগণ তদনুযায়ী একাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোন মতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

৬ নং নির্দেশ

রেলওয়ে

রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই সব অফিসই খোলা থাকবে যেগুলি রেল চলাচলের জন্যে প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর জন্যে সৈন্যদের আনা-নেওয়া বা সমরাস্ত্র পরিবহণের কোন কাজে কোনভাবেই সাহায্য বা সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্যে রেলওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করবেন।

৭ নং নির্দেশ

সড়ক পরিবহণ

সারা বাংলাদেশে ইপিআরটিসি চালু থাকবে।

৮ নং নির্দেশ

অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলোর কাজ চালু রাখার জন্য ই পি এস সি অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ও আই ডব্লিউ টি এ-র প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণ-নির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেওয়ার ব্যাপারে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোন সহযোগিতা করতে পারবেন না ।

৯ নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মানি অর্ডার পৌছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করে যাবে। সরাসরি বিদেশে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যাবে। ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশ নেওয়ার ও দেওয়ার জন্য সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার শুধু অপরাহ্ন তিনটা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা আন্তঃঅঞ্চল টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ চালু থাকবে। ২৫ নং নির্দেশে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আন্তঃঅঞ্চল প্রেস টেলিগ্রাম চালু থাকবে। পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি কার্যরত থাকবে।

১০ নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে কেবল স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১১ নং নির্দেশ

বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলি কাজ চালিয়ে যাবেন। তারা গণ-আন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।

১২ নং নির্দেশ

জেলা হাসপাতাল, টিবি ক্লিনিক, কলেরা রিসার্চ ইনস্টিটিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও সেনিটেশান সার্ভিসগুলো যথারীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স কাজ করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেল্‌থ সেন্টারে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে।

১৩ নং নির্দেশ

বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের সাথে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের সাথে জড়িত ইপিওয়াপদার বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১৪ নং নির্দেশ

গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এইসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজও চালু থাকবে।

১৫ নং নির্দেশ

ব্রিক ফিল্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৬ নং নির্দেশ

আমদানি, বন্টন, গুদামজাতকরণ ও খাদ্যশস্যের চলাচল জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে। এই সবের প্রয়োজনে ওয়াগন, বার্জ, ট্রাক ও অন্যান্য সকল প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে চালু থাকবে।

১৭ নং নির্দেশ

ক. ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটপতঙ্গনাশক ঔষধ ক্রয়, চলাচল ও বন্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও চাল গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এর সকল প্রকল্প যথারীতি কাজ করবে।

খ. পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য কারিগরি যন্ত্রপাতির চলাচল, বন্টন, মাঠে চালু রাখা ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে। তা ছাড়া, তেল, জালানি, যন্ত্রপাতি ও এইসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে।

গ. নলকূপ খনন, খাল খনন ও এই জাতীয় পানি সেচ সম্পর্কিত সকল কাজ চালু থাকবে।

ঘ. পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলো থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলো থেকে কৃষি ঋণ দেওয়া অব্যাহত থাকবে।

ঙ. যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো তার কার্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে।

চ. কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক থেকে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ দেওয়া বলবৎ থাকবে।

ছ. আলু কিনে গুদামজাত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের তহবিল মওজুদ রাখতে হবে।

১৮ নং নির্দেশ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও আনা-নেওয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য জরুরি কাজ

সুচারুরূপে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারি এজেন্সি কিংবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

১৯ নং নির্দেশ

উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্য

বৈদেশিক সাহায্যে তৈরি রাস্তা ও পুল প্রকল্পগুলোসহ সকল প্রকার সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সি ও সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে ঠিকাদারদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেওয়া হবে। উক্ত সংস্থাগুলো থেকে যদি মালমসলা সরবরাহের চুক্তি থাকে তাহলে সেই চুক্তি মোতাবেক যথারীতি সরবরাহ করা হবে।

২০ নং নির্দেশ

সাহায্য ও পুনর্বাসন

ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার বাঁধ তৈরি ও উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দিবে।

২১ নং নির্দেশ

ইপিআইডিসি, ইপসিক ফ্যাক্টরি ও ইস্টার্ন রিফাইনারি

ইপিআইডিসি ও ইপসিকের সকল কারখানায় কাজ চলবে এবং যতদূর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এই সকল কারখানা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে ইপিআইডিসি ও ইপসিকের যে সকল শাখা খোলা রাখা প্রয়োজন হবে তা খুলে রাখতে হবে। ইস্টার্ন রিফাইনারির কাজ যথারীতি চালিয়ে যেতে হবে।

২২ নং নির্দেশ

বেতন দান

সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন–যাদের রোজ, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে, তাদের সেইভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকি বেতন দেওয়ার কথা তা দিয়ে দিতে হবে। বেতন বিল তৈরির জন্য সরকারি আধা-সরকারি বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো খোলা রাখতে হবে।

২৩ নং নির্দেশ

পেনসন

সামরিক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর পেনসন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

২৪ নং নির্দেশ

এ জি (ইপি) ও ট্রেজারি

এই নির্দেশে যে সকল সংস্থাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে তাদের টাকা-পয়সা দেওয়া-নেওয়া ও সরকারি কর্মচারীদের বিল তৈরির জন্য সামান্য সংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এ জি (ইপি) অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২৫ নং নির্দেশ

ব্যাংক

ক. ব্যাংকিং কার্য পরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪টা পর্যন্ত সকল ব্যাংক খোলা থাকবে (অবশ্য মাঝে টিফিনের ছুটি থাকবে)।

কিন্তু শুক্রবারে ও শনিবারে ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে ১১.৩০ মি. পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২.৩০ মি. পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালান্সসহ অন্য কার্যাবলি নিয়মিতভাবে চলবে।

খ. কয়েকটি বিধি-নিষেধ ছাড়া ব্যাংকগুলো যে কোন পরিমাণ জমা গ্রহণ, বাংলাদেশের ভিতর যেকোন পরিমাণ আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের ভিতর আন্তঃব্যাংক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টি টি বা মেইল ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ ড্র করাসহ তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবে। যেসব বিধিনিষেধ মানতে হবে সেগুলো হচ্ছে :

১. যদি চেকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধির বা বেতন রেজিস্টারের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে বেতন ও মজুরি পরিশোধ করা।

২. সপ্তাহে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রইংস।

৩. চিনিকলের জন্যে আখ ও পাটকলের জন্যে পাটসহ শিল্পের কাঁচামাল কেনার জন্যে অর্থদান।

৪. বাংলাদেশের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়সহ যেকোন বাণিজ্যিক খাতে সপ্তাহে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট। ওই অংক ক্যাশ অথবা ক্যাশড্রাফট্ মারফত উঠানো যাবে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত ৩ ও ৪ নম্বর শর্তে কোন অর্থ দেওয়ার পূর্বে অতীত রেকর্ড দেখে ব্যাংককে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, অর্থ গ্রহণকারী একজন বোনাফাইড শিল্প অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা অথবা ব্যবসায়ী এবং সে যে অর্থ উঠাচ্ছে তা তার গত এক বছরের সাপ্তাহিক গড় অর্থ উঠানোর চাইতে বেশি না হয়।

৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত তালিকাভুক্ত কন্ট্রাক্টরদের অর্থদান। তবে যে কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কাছ থেকে চেকে একটি সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, যে টাকাটা উঠাতে চাওয়া হচ্ছে তা উল্লিখিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয়।

গ. বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যে কোন একাউন্টে ক্রস চেক ও ক্রস ডিম্যান্ড ড্রাফট প্রদান করা ও জমা নেওয়া যাবে।

ঘ. স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক, ঢাকা থেকে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টি টি পাঠানো যাবে। যে সমস্ত ব্যাংকের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সেগুলো ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাওনা গ্রহণ করতে পারবে।

ঙ. অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এক ঘন্টা আন্তঃশাখা টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু থাকবে।

১. প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক সোমবার ও বুধবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি খবর পাঠাতে পারে।

২. প্রত্যেকটি ব্যাংক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে একটি খবর পেতে পারে ।

চ. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাংক পদ্ধতির জন্য টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসের কাজ অব্যাহত থাকবে।

ছ. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিল সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রস চেক বা ক্রস গ্রান্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে।

জ. অনুমোদিত ডিলারের সাহায্যে ফরেন ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙানো যাবে।

ঝ. কূটনীতিকগণ অবাধে তাদের এ্যাকাউন্টের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন এবং বিদেশি নাগরিকগণ বৈদেশিক মুদ্রা এ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।

ঞ. লকার্স পরিচালনার কাজ বন্ধ থাকবে।

ট. স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।

ঠ. বিদেশি রাষ্ট্র থেকে লাইসেন্সের মাধ্যমে দ্রব্যাদি আমদানির জন্য লেটার অব ক্রেডিট খোলা যাবে।

ড. পণ্য বিনিময়ের চুক্তি (যে সমস্ত দ্রব্য ইতোমধ্যেই পাঠানো হয়েছে) মোতাবেক প্রেরিত দ্রব্যাদি ছাড় করতে হবে।

ঢ. ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড-এর মারফত বকেয়া রপ্তানি বিল সংগ্রহ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ব্যাংকগুলোর প্রতি নির্দেশ মোতাবেক কাজ পরিচালিত হবে।

২৬ নং নির্দেশ

স্টেট ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের মতো কাজ করবে এবং সে একই অফিস সময়ে চলবে এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং পদ্ধতি কাজ করার জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরূপভাবে খোলা থাকবে। উল্লিখিত কাঠামো ও বিধিনিষেধ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 'পি' ফর্ম বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্য বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

২৭ নং নির্দেশ

বাংলাদেশের জন্য আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রপ্তানি কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

২৮ নং নির্দেশ

সকল ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশি বিমান পরিবহণ অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

২৯ নং নির্দেশ

বাংলাদেশে সকল অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩০ নং নির্দেশ

পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো, সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১ নং নির্দেশ

কোন খাজনা কর আদায় করা যাবে না।

ক. পুনঃনির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত

১. সকল ভূমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে

২. বাংলাদেশের কোথাও কোন লবণ কর আদায় করা যাবে না

৩. বাংলাদেশের কোথাও কোন তামাক কর আদায় হবে না

৪. তাঁতীরা আবগারি শুল্ক দান ব্যতিরেকেই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলারেরা তাদের কাছ থেকে কোন আবগারি শুল্ক আদায় করতে পারবেন না ।

খ. এ ছাড়া সকল প্রাদেশিক সরকারের কর–যেমন প্রমোদ কর, হাট, বাজার, পুল ও পুকুরের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের একাউন্টে জমা দিতে হবে।

গ. অক্ট্রয়সহ সকল স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

ঘ. কেন্দ্রীয় সরকারের সকল পরোক্ষ কর– যেমন আবগারি শুল্ক কর, বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে, তবে তা কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক অথবা ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশনে 'বিশেষ একাউন্ট' খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাংক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবেন। সকল আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেওয়া হবে, তা মানতে হবে।

ঙ. কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রত্যক্ষ কর, যেমন আয় কর আদায় ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩২ নং নির্দেশ

পাকিস্তান বীমা করপোরেশন চালু থাকবে এবং পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সসহ সকল বীমা কোম্পানি কাজ করবেন।

৩৩ নং নির্দেশ

সকল ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকান-পাট নিয়মিতভাবে চলবে।

৩৪ নং নির্দেশ

সকল বাড়ির শীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলিত হবে।

৩৫ নং নির্দেশ

সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩৮-৭৪৬ (*দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৫ মার্চ ১৯৭১)

আমরা ভারতের নিকট কৃতজ্ঞ

নয়াদিল্লির জনসভায় বঙ্গবন্ধু

প্যারেড ময়দান, ক্যান্টনমেন্ট, নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য নয়াদিল্লিতে বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত যে সহানুভূতি–সমর্থন জানাইয়াছে তাহার জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ভারতের নিকট কৃতজ্ঞ। লন্ডন হইতে নয়াদিল্লি আসিয়া পৌছিবার পর বঙ্গবন্ধু দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের প্যারেড ময়দানে এক বিরাট সমাবেশে ভাষণদানকালে ইহা উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন যে, বাংলাদেশ এবং ইহার জনগণ কখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সরকার, সশস্ত্র বাহিনী এবং সাধারণ মানুষকে কোনদিনই ভুলিতে পারিবে না। ইহাদের কথা বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে চির জাগরূক হইয়া থাকিবে। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ইহারা যে সহানুভূতি ও সর্বাত্মক সমর্থন করিয়াছে তাহা ভুলিবার নয়।

নয়াদিল্লি বিমানবন্দর হইতে তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সমভিব্যাহারে মোটরযোগে প্যারেড গ্রাউন্ডে আসিয়া পৌছেন। ইতিপূর্বে তাঁহাকে বিমানবন্দরে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ধূসর রং-এর স্যুট এবং গাঢ় ব্রাউন রঙ-এর কোট পরিহিত ছিলেন।

প্যারেড ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার পূর্বে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতা করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে ইংরেজিতে সম্বোধন করেন। কিন্তু সমাবেশের শ্রোতারা শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলায় ভাষণ দিতে অনুরোধ জানান। শেখ মুজিবুর রহমান এই সমাবেশে আবেগদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও মৈত্রী সম্পর্ক হইবে চিরস্থায়ী।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতের জনগণ আমাদের কুয়াশা-কঠিন অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে সাহায্য করিয়াছে এবং ইহা কোনদিনও ভুলিবার নয়।

বাংলাদেশের জনগণ ভারতের জনগণের নিকট কৃতজ্ঞ এবং ভারতের সরকারও আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্যোগের সময় সাহায্য করিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে বর্বরোচিত নিপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছে ইতিহাসে এ ধরনের নির্যাতনের কোন দৃষ্টান্তই নাই।

আবেগজড়িত কণ্ঠে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, বাংলাদেশ নরকের মধ্য দিয়া দিন কাটাইয়াছে।

তিনি বলেন যে, দশ লক্ষ লোক নিহত, এক কোটির অধিক লোক গৃহহারা হইয়া ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, বর্বর ইয়াহিয়াশাহীর সীমাহীন নির্যাতনেরও নজির নাই এবং এ নির্যাতনের শেষ ছিল না। মা ও ভগ্নীকে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের সম্মুখেই ধর্ষণ করা হইয়াছে। বাঙালিদের কী অপরাধ ছিল, বাঙালিরা সম্মানের সহিত জীবন নির্বাহ করিতে চাহিয়াছিল।

পশ্চিম পকিস্তানের নিকট বাঙালিদের ইহাই ছিল অপরাধ।

তিনি বলেন, বাঙালিরা ভালোভাবে বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল। ইহার প্রত্যুত্তরে তাঁহারা বুকে পাইয়াছেন বুলেট। বাংলাদেশ এশিয়ার বুকে এখন স্বাধীন সার্বোভৌম রাষ্ট্র। ভারত এবং বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর সম্পর্ক হইবে চিরস্থায়ী।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতের জনগণ, সরকার, নেতৃবৃন্দ এবং সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহা কোনদিন ভুলিবার নয়। আমি বিগত নয় মাস পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে কাটাইয়াছি। ভারতের মহান নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে যে প্রয়াস চালাইয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়। আমি আমার মুক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ।

বঙ্গবন্ধু আরও বলেন যে, আমি জানি ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নাই তবুও তাঁহারা খাদ্য ও আশ্রয় দিয়াছে। আমরা কোনদিন তাহা ভুলিব না।

নয়াদিল্লি হইতে বিএসএস ও পিটিআই পরিবেশিত অপর এক খবরে বলা হয় যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সময় ১১টা ১০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লি ত্যাগ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লিতে ১৬০ মিনিট অবস্থান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দিল্লি বিমানবন্দরে ভারতের প্রেসিডেন্ট শ্রী ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদও একই বিমানে ঢাকার উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লি ত্যাগ করেন।

সূত্র : সংবাদ, মঙ্গলবার,১১ জানুয়ারি ১৯৭২

ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা : বঙ্গবন্ধু

রমনা রেসকোর্স, ঢাকা, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমানবন্দর জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে যায়। বিমানবন্দর থেকে সারা পথ প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্য দিয়ে রমনা রেসকোর্স ময়দানের দিকে তিনি অগ্রসর হন। জাতির জনক একটি খোলা ট্রাকে তেজগাঁ বিমানবন্দর থেকে রমনা রেসকোর্সে অপেক্ষমাণ জনসমুদ্রে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় আড়াই ঘন্টা। রমনা রেসকোর্সে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো :

যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, যাঁরা বর্বর বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন, তাঁদের আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই।

ভাইয়েরা আমার, লক্ষ মানুষের প্রাণদানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম। তোমরা আমার সালাম নাও।

আমার বাংলায় আজ এক বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা। বাংলার এক কোটি লোক প্রাণভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের খাবার, বাসস্থান দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত। আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার ও ভারতবাসীকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দান ও সহযোগিতা দানের জন্য ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন জনগণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম, 'দুর্গ গড়ে তোল।' আজ আবার বলছি, 'আপনারা একতা বজায় রাখুন।' আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়ব।' বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরূপেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নাই।

গত ১০ মাসে সেনাবাহিনী বাংলাকে বিরান করেছে। বাংলার লাখো মানুষের আজ খাবার নাই, অসংখ্য লোক গৃহহারা। এদের জন্য মানবতার খাতিরে আমরা সাহায্য চাই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আমি সাহায্যের আবেদন জানাই। বিশ্বের সকল মুক্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছি–বাংলাকে স্বীকৃতি দিন। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি।'

কবিগুরুর এই আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। বাঙালি জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা মানুষ, তারা প্রাণ দিতে জানে, এমন কাজ তারা এবার করেছে যার নজির ইতিহাসে নাই।

আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি–আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে, পূর্ণ হবে না। আমাদের তাই এখন

অনেক কাজ করতে হবে। তোমরা, আমার ভাইয়েরা, গেরিলা হয়েছিলে দেশমাতার মুক্তির জন্যে। তোমরা রক্ত দিয়েছ। তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না।

তোমরা বাংলায় যারা কথা বল না, তারা এখন থেকে বাংলার মানুষ হও। ভাইরা, তাদের গায়ে হাত দিও না; তারাও আমাদের ভাই। বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই, বাঙালিরা কেবল স্বাধীনতার জন্যেই আত্মত্যাগ করতে পারে, তাই না, তারা শান্তিতেও বাস করতে পারে।

অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। ইয়াহিয়া সরকারের সাথে যারা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখুন।

ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরো বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌছে দিও।

মার্চের সেই রাতে আমাকে ছেড়ে যাবার সময় আমার সহকর্মী তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ও অন্যরা কাঁদছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, এখানে আমি মরতে চাই। তবুও মাথা নত করতে পারব না। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা নির্দেশমত সংগ্রাম চালিয়ো। তারা সে ওয়াদা পালন করেছে।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা আছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরাই সবাই রাস্তা তৈরি করতে শুরু করুন। যার যার কাজ করে যান।

পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা, আপনারা অসংখ্য বাঙালিকে হত্যা করেছেন, অসংখ্য বাঙালি মা-বোনের অসম্মান করেছেন, তবু আমি চাই আপনারা ভালো থাকুন।

আমি আজ বক্তৃতা দিতে পারব না। ওরা আমার লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে আগুন দেয় নাই, যেখানে মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে নাই। আজ বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সহকর্মীকে আমি দেখছি না। এত বেসামরিক লোককে হত্যা করার নজির আর নাই। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত বেসামরিক লোক মরে নাই।

সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে আমি চিনি। তাঁকে আমি জানাই আমার শ্রদ্ধা। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনি। তাঁর রক্তে মিশে রয়েছে রাজনীতি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আমার মুক্তির জন্যে আবেদন করেছেন। আমার সাথে দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধীর আলাপ হয়েছে। আমি যখনই বলব, ভারতীয় সেনাবাহিনী তখনই দেশে ফেরত যাবে। এখনই আস্তে আস্তে অনেককে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

প্রায় ১ কোটি লোক যাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকি যাঁরা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অংশগ্রহণকারী সকল শ্রেণীর জনতাকে আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে সালাম জানাই। আমি সালাম জানাই মুক্তিবাহিনীকে, গেরিলা বাহিনীকে, কর্মী বাহিনীকে। আমি সালাম জানাই সংগ্রামী শ্রেণীকে, কৃষককুলকে, বুদ্ধিজীবীদের। বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একটি লোককেও আর না খেয়ে মরতে দেওয়া হবে না। সকল রকমের ঘুষ লেনদেন বন্ধ করতে হবে।

আমি ফিরে আসার আগে ভুট্টো সাহেব অনুরোধ করেছেন, দুই অংশের মধ্যে বাঁধন সামান্য হলেও রাখা যায় কিনা। আমি তখন বলেছিলাম, আমি আমার মানুষের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। আজ আমি বলতে চাই–ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সাথে আর না। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে মুজিব সর্ব প্রথম তাঁর প্রাণ দেবে। বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারে না। আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আমরা স্বাধীন, এটা মেনে নিন। আপনারা স্বাধীনভাবে থাকুন।

গত ২৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাসে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। বিশ্ব এসব ঘটনার সামান্য কিছুমাত্র জানে। বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বর্বর পাকবাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। জাতিসংঘেরও উচিত অবিলম্বে বাংলাদেশকে আসন দিয়ে তার ন্যায়সংগত দাবি পূরণ করা।

জয় বাংলা! বাংলাদেশ-ভারত— ভাই ভাই।

সূত্র : *বাঙালির কণ্ঠ*, মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৭ মার্চ ১৯৯৮।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম বাণী

বঙ্গভবন, ঢাকা, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (বুধবার) বঙ্গভবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণের স্বল্পক্ষণ পরেই জাতির উদ্দেশে উচ্চারিত তাঁহার প্রথম বাণীতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার চরণ আবৃত্তি করেন।

গতকাল সন্ধ্যায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে বাংলাদেশ বার্তাসংস্থার প্রতিনিধির এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কবিগুরুর কবিতার নিম্নোক্ত স্তবকটি বাংলাদেশের জনগণকে উপহার দেন।

"স্যার, আজকের দিনে জাতিকে আপনি কি বাণী শুনাবেন"? বিএসএস প্রতিনিধির এই প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু তাঁর চোখে-মুখে স্বভাবসুলভ উদার হাসি মাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতে শুরু করেন,

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"...

বাংলাদেশ প্রমাণ করিবে

সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন যে, বাঙালি জাতি তাঁহার নৈতিক মূল্যবোধ ও গুণাবলীর দ্বারা বিশ্ববাসীর কাছে স্বীয় মহানুভবতা প্রমাণ করিবে। তিনি বলেন, যাবতীয় মূল্যবোধ ও আদর্শের ক্ষেত্রে একটি মহান জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠার জন্য আমাদের সকলকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

শীঘ্রই মন্ত্রীদের দপ্তর ঘোষণা করা হইবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল সাংবাদিকদের জানান যে, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের দপ্তর শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে। বার্তা প্রতিষ্ঠান 'এনা'র খবরে একথা বলা হইয়াছে।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, বৃহস্পতিবার, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই লক্ষ্য : যে কোন বিদেশি সাহায্য অবশ্যই শর্তহীন হইতে হইবে-মুজিবের ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী ভবন (বেলী রোডস্থ সাবেক প্রেসিডেন্ট ভবন), ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুক্রবার, ১৪ জানুয়ারি (১৯৭২) তাঁহার সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, শোষণমুক্ত দেশ তথা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাই তাঁহার চূড়ান্ত লক্ষ্য। বর্তমান মুহূর্তে পুনর্বাসন ও জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনই সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি সমগ্র বিশ্বের সাহায্য কামনা করেন এবং এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, আমরা যে কোন দেশের সাহায্যই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত — তবে সেই সাহায্য হইতে হইবে শর্তহীন। তিনি জানান যে, নয়া অর্থনীতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রী ভবনে (বেলী রোডস্থ সাবেক প্রেসিডেন্ট ভবন) আয়োজিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনটি ছিল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর প্রথম সংবাদ সম্মেলন। সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিসভার সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও টি ভি ক্যামেরাম্যানে সংবাদ সম্মেলনটি ছিল জনাকীর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের সরকার ও জনগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। একইভাবে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও উহার জনগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি পোল্যান্ড, গণপ্রজাতান্ত্রিক জার্মান, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, বার্মা এবং ভুটানের প্রশংসা করেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের যে সব সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী প্রমুখ আমাদের সমর্থন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদেরকেও ধন্যবাদ জানান।

গণচীনের গৌরবজনক মুক্তিসংগ্রামের উল্লেখ করিয়া তিনি বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মানিয়া লওয়ার জন্য গণচীনের প্রতি আহ্বান জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, মার্কিন জনগণ আমাদের বন্ধু কিন্তু মার্কিন সরকারের কোন কোন নীতির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু কিছু ক্ষোভ রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার মনোভাব পরিবর্তন করিলে সম্পর্ক স্বাভাবিক হইতে পারে। জনৈক প্রশ্নকারীর জবাবে তিনি

বলেন যে, আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রহিয়াছে এবং আমরাও হুঁশিয়ার আছি।

মার্কিন সাহায্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শর্তহীন যে কোন সাহায্যই আমরা লইব। সোভিয়েত সাহায্য সম্পর্কে তিনি বলেন যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্ত হয় নাই, চূড়ান্ত হইলেই জানা যাইবে।

সোভিয়েত স্বীকৃতি কবে নাগাদ পাওয়া যাইবে, ইহার জবাবে তিনি বলেন, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিতে পারি। ব্রিটেনের স্বীকৃতির প্রশ্নে তিনি বলেন যে, তাহাদের স্বীকৃতি যে কোন দিন আশা করিতেছি। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের ভূমিকার প্রশংসা করেন। কমনওয়েলথে যোগদান সম্পর্কে তিনি বলেন, বিষয়টি আমরা দেখিব।

দেশে কী পন্থায় তিনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চান, উহার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী। তাহাছাড়া, বিভিন্ন দেশের অবস্থা বিভিন্ন রকম। বাংলাদেশে বাংলাদেশের অবস্থা অনুযায়ী পন্থা নির্ধারিত হইবে।

জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র কয়েক দিন হইল। চূড়ান্ত পরিকল্পনা হইতে দিন, সব জানিতে পারিবেন। মালিকহীন শত্রু সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হইবে কি-না এই প্রশ্নের জবাবেও তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন।

বঙ্গবন্ধু সংবাদ সম্মেলনে যে লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন, উহার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :
"বাংলাদেশ এখন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব সমাজে স্থান করিয়া লইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সকল স্তরের মানুষ এক অবর্ণনীয় ত্যাগ ও চরম দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছেন। আমি সশ্রদ্ধভাবে জীবন উৎসর্গীকৃত লক্ষ লক্ষ শহীদের পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিতেছি এবং তরুণ, বৃদ্ধ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, সরকারি কর্মচারী, বিশেষত সশস্ত্র বাহিনীতে সম্মিলিতভাবে শত্রুকে প্রতিরোধকারী বাংলাদেশের বীর সন্তান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সাবেক ইপিআর, সাবেক আনসার, সাবেক মুজাহিদ, পুলিশ ও সকল মুক্তিবাহিনীকে অভিবাদন জানাইতেছি।

পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে তছনছ করিয়া দিয়াছে। সুপরিকল্পিত গণহত্যায় প্রায় ৩০ লক্ষ জীবন নষ্ট হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হইয়াছে। সমগ্র গ্রাম্যঞ্চল ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ রক্ষা ও তাহাদের মা-বোনের সম্মান রক্ষার জন্য বাড়িঘর ত্যাগ করিয়া শরণার্থী হইয়াছেন। যাহারা এখানে রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে।

ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা এক বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থনীতিকে পুনর্নির্মাণ ও গতিশীল করাই সবচাইতে জরুরি কর্তব্য। অর্থনীতিকে পুনরায় সচল করিয়া তুলিতে হইবে। খাদ্য, আশ্রয় ও পরিধানের বস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় চালু করা হইবে এবং সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ গড়িয়া তোলা হইবে। জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

ইয়াহিয়া খানের বর্বর বাহিনী কর্তৃক রাখিয়া যাওয়া ভস্মের ভিতর হইতে নূতন সমাজ ইহার ভিত্তি হইতেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাংলাদেশের জনগণ সর্বদাই এক শোষণমুক্ত সমাজ কামনা করিয়াছে। এই লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে বাঙালি জনগণকে বহু মূল্য দিতে হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমাদের জনসংখ্যা, সম্পদ ও মৌল অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হইবে।

অতিশয় যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরিকল্পনা বিভাগ নয়া অর্থনীতির ব্যাপক খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করিতেছে। এই ধরনের খসড়া পরিকল্পনা কৃষি, শিল্প ও অর্থক্ষেত্রে কাঠামোগত

পরিবর্তন সাধন করিবে। এই নয়া পরিবর্তনের ফলে আমাদের সমস্ত সম্পদ কাজে লাগানো হইবে।

অবিরামভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা ক্রমশ সংকুচিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন সর্বাধিক করার প্রচেষ্টা থাকিবে।

দ্রুতগতিতে এই ধরনের খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুতকালে জরুরি ভিত্তিতে কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করা হইবে। প্রথম দায়িত্ব হইতেছে সাহায্য ও পুনর্বাসন। এই ব্যাপারে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণীত হইয়াছে।

দেশের এবং বিদেশ হইতে প্রদত্ত সম্পদ আশু কাজে লাগানো হইবে।

এতদুদ্দেশ্যে আমাদের নিজস্ব সম্পদের সহিত বিদেশ হইতে সম্পদ পাওয়ার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। আমি সকল রাষ্ট্র, বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ ও আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলিকে জরুরি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করিয়া আমাদের সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে আগাইয়া আসার জন্য আবেদন জানাইতেছে।" (অসমাপ্ত)

ওই কথা ভুলিয়া যান

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্কের যে কোন সম্ভাবনার কথা ভুলিয়া যাওয়ার জন্য জনগণকে উপদেশ দিয়াছেন।

জনৈক বিদেশি সাংবাদিক বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন রকম একটি সম্পর্ক রক্ষার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি জনাব ভুট্টোর অনুরোধের কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গে তাঁহার মন্তব্য জানিতে চাইলে শেখ সাহেব বলেন, "দয়া করিয়া ওই কথা ভুলিয়া যান। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে যে কোন দেশের সহিত আমরা আমাদের সমস্যাবলি আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান বা যে নামেই আপনারা সম্বোধন করেন, সেই দেশের সহিত আমাদের কোনরূপ সম্পর্ক থাকিতে হইবে। ওই দেশের সহিত কোন রকম সম্পর্কের কোন প্রশ্নই উঠে না। এই ভূ-খণ্ড হইতে আমরা পাকিস্তানকে বিতাড়িত করিয়াছি।"

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার সংবাদ সম্মেলনে দেশে অবিলম্বে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা সংগ্রাম করিয়াছি।

তিনি বলেন, এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি লওয়া হইতেছে। শীঘ্রই হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট কাজ শুরু করিবে। তিনি জনগণকে আইন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার আহ্বান জানান এবং এইমর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দোষীদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হইবে।

মার্কিন ৭ম নৌ-বহরকে পরোয়া করি না

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌ-বহর বা বিংশতীতম নৌ-বহর যতই ঘুরুক না কেন, তিনি তাহা মোটেই গ্রাহ্য করেন না। বাংলাদেশের মানুষ অজেয়।

বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌ-বহরের উপস্থিতি সম্পর্কে জনৈক বিদেশি সাংবাদিক তাঁহার প্রতিক্রিয়া জানিতে চাহিলে তিনি ইহা উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন যে, তিনি ইহা মোটেই গ্রাহ্য করেন না। তাহারা আমাদের ভূমি দখল করিবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু আমাদের জনগণের হৃদয়কে নহে। আপনারা ইতিপূর্বে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

মুজিববাদ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁহার সংবাদ সম্মেলনে 'মুজিববাদ' সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বলা হইলে তিনি বলেন, "আমি এখন বলিতে পারিব না"।

সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের প্রশ্নটি ছিল : "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ৭ মার্চ আপনি বলিয়াছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জনগণ সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা আনিয়াছে। এখন তাহারা শ্লোগান দিতেছে : এবারের সংগ্রাম 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?"

জবাবে বঙ্গবন্ধু স্মীত হাস্যে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলেন, "আমি এখন বলিতে পারিব না"।

আমি বলিলেই মুক্তিবাহিনী অস্ত্র রাখিয়া দিবে

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, তিনি যখন বলিবেন, মুক্তিবাহিনী তখনই অস্ত্র রাখিয়া দিবে।

জনৈক বিদেশি সাংবাদিক জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, মুক্তিবাহিনী কবে নাগাদ অস্ত্র রাখিয়া দিবে।

খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রস্তুতি চলিতেছে

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রস্তুতি চলিতেছে।

তিনি আরও বলেন যে, গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার ব্যাপারে প্রয়োজন অপেক্ষা একদিনও অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা হইবে না।

অবাঙালিরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতেছে

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুক্রবার, ১৪ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ সম্মেলনে বলেন, অবাঙালি ব্যক্তিদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা হইয়াছে এবং তাহারা এখন স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত রাস্তায় ঘোরাফেরা করিতেছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি অস্থানীয় ব্যক্তিদের কেন্দ্র করিয়া কোন অপ্রীতিকর ঘটনার কথা এখনও শোনেন নাই। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ আশ্চর্যজনক সুব্যবহারের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তিনি তাঁহার দেশবাসীর প্রতি আরও ধৈর্যশীল হওয়ার এবং আইনকে উহার যোগ্য ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রদানের আবেদন জানান।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু অস্থানীয়দের প্রতি বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত একাত্ম হইয়া যাওয়ার উপদেশ দেন।

শেখ সাহেব বলেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রত্যেকেই বাঙালি। প্রধানমন্ত্রী জানান, অস্থানীয় ব্যক্তিরা যে কোথাও যাইতে চাহিলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কোন আপত্তি নাই।

পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালিদের দেশে ফিরাইয়া আনার জন্য সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন এইমর্মে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহাদের দেশে ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ হইতে সকল রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। তিনি বলেন, এই মর্মে তিনি অবগত হইয়াছেন যে, অনেক বাঙালি পাকিস্তানে অন্তরীণ রহিয়াছেন এবং তাঁহারা নির্যাতনের শিকারে পরিণত। তিনি উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানে তিনি নিজে যখন আটক ছিলেন তখন তিনি তাহাদের ভালোই দেখিয়াছেন।

যাহাহোক তিনি প্রশ্নকারীকে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, পাকিস্তান হইতে বাঙালিদের দেশে ফিরাইয়া আনার জন্য তাঁহার সরকার যথাসম্ভব করিবে এবং কোন আন্তর্জাতিক কমিশনের মাধ্যমে হইলে উহাও মানিয়া লইবেন।

সূত্র : সংবাদ, শনিবার, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২

বাংলাদেশ'কে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসাবে গঠন করিতে চাই : বঙ্গবন্ধু

প্রধানমন্ত্রী ভবন (বেলী রোডস্থ সাবেক প্রেসিডেন্ট ভবন), ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, তিনি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসাবে গঠন করিতে চাহেন।

তিনি পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে ভাষণদানকালে ইহা উল্লেখ করেন।

তিনি এই সংবাদ সম্মেলনে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। আমাদের নীতি হইতেছে সকলের সহিত বন্ধুত্ব। কাহারো সহিত বিদ্বেষপরায়ণতা নয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হইবে জোটনিরপেক্ষ।

ভারত আমাদের বন্ধু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জোরের সহিত বলেন যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র; ইহাই বাস্তব সত্য।

বাংলাদেশ ভারতের প্রভাবিত একটি রাষ্ট্র বলিয়া একটি বিশেষ মহল হইতে যে দোষারোপ করা হইতেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন যে, না, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

বঙ্গবন্ধু এই সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, যদি আজ হিটলার বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে বাংলাদেশের ঘটনাবলি ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞের জন্য সেও লজ্জিত হইত।

গণহত্যার বিচার হইবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ৩০ লক্ষ নিরীহ লোককে হত্যা করিয়াছে, গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও আমাদের নারীদের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করিয়াছে। ইহাছাড়া আমাদের বহু বুদ্ধিজীবীকে তাহারা হত্যা করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, হিটলার বাঁচিয়া থাকিলে বাংলাদেশের ঘটনাবলি ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞে লজ্জিত হইত।

শীঘ্রই কলকাতা যাইব

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার সংবাদ সম্মেলনে জানান যে, আগামী ১০ দিনের মধ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সফরে যাইবেন।

শেখ সাহেব বলেন, তাঁহার পশ্চিবঙ্গ সফরের জন্য সেখানের জনগণের দাবি সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানের বন্দিদশা হইতে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনকালে সময়ের অভাবে কলকাতা অবতরণ করিতে পারেন নাই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ সফরে আগমন করিবেন। তবে এই সফরের তারিখ এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

সূত্র : *সংবাদ*, শনিবার, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২

দেশের মুক্তির জন্য যে সকল যুবক সংগ্রাম করিয়াছেন তাহাদের সমাজে যোগ্য স্থান দেওয়া হইবে

আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে বঙ্গবন্ধু

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২

সরকার সকল স্বাধীনতা যোদ্ধাকে স্বল্পকালের মধ্যেই তাহাদের যোগ্য কাজ, চাকরি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন বলিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এখানে উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অদ্য সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখিতে যান।

তিনি বলেন যে, দেশের মুক্তির জন্য যে সকল যুবক সংগ্রাম করিয়াছেন তাহাদের সমাজে যোগ্য স্থান দেওয়া হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, সমাজ গঠনে এই সকল যুবকেরা যাহাতে নিজেদের আত্মনিয়োগ করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

বঙ্গবন্ধু প্রতিটি আহত মুক্তিযোদ্ধার শয্যার পাশে গিয়া দাঁড়ান। তিনি তাঁহাদের স্বাস্থ্যের খোজ-খবর নেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন যে, তাঁহারা যেন সকল আহত মুক্তিযোদ্ধার প্রতি যত্নবান হন।

সূত্র : সংবাদ, শনিবার, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২

মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদানের স্মরণে

রেসকোর্স ময়দানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হইবে : বঙ্গবন্ধু

আওয়ামী লীগ অফিস, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২

রবিবার, ১৬ জানুয়ারি সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রাক্কালে শনিবার ১৫ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, মাতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধে দেশ মাতৃকার যেসব কৃতী সন্তান শহীদ হইয়াছেন তাঁহাদের স্মরণে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হইবে।

প্রধানমন্ত্রী ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ অফিসে এক কর্মীসভায় ভাষণদান করিতে ছিলেন। নয় মাসাধিককাল কারাবাসের পর শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাংলায় ফিরিয়া তিনি প্রথমবারের মতো আওয়ামী লীগ অফিসে পদার্পণ করেন।

এই কর্মী সমাবেশে বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া হানাদার বাহিনীর গণহত্যাযজ্ঞ ও বর্বরতায় ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপকতা নির্ধারণ ও ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য দলের কর্মী এবং পরিষদ সদস্যদের প্রতি আহবান জানান। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাহারও আইনকে নিজের হাতে তুলিয়া নেওয়া উচিত নয়। দুষ্কৃতিকারীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের ভার সরকারের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, কোন জাতিই উদার মানসিকতার অধিকারী না হইয়া সমৃদ্ধি অর্জন করিতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য দলীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানাইয়া বঙ্গবন্ধু তাহাদের প্রতি দেশ গঠনের কাজে সহায়তা করার আহবান জানান।

তিনি বলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের বাহিরে থাকিয়া জনগণের কল্যাণার্থে গ্রাম হইতে গ্রামে ছুটিয়া যাওয়া। কিন্তু গণদুশমনদের চক্রান্তে সে বাসনা তাঁর বাস্তবায়িত হইতে পারে

নাই। বঙ্গবন্ধু বাংলার জনগণ ও সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের জনগণও এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ রহিয়াছে এবং কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করার জন্যই তাঁহাকে ক্ষমতার আসনে বসিতে হইয়াছে। তিনি প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, বাংলাদেশ হইবে ষড়যন্ত্রকারীদের গোরস্তান। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা সফরের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন, কলকাতা যাইবার উদ্দেশ্য হইতেছে পশ্চিম বাংলার মহান জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। তিনি বলেন, কলকাতা যাইবার আগে আমি আমার সোনার বাংলাকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া যাইতে চাই। তিনি ১৯টি জেলার সবকটিই সফরের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এখনও আওয়ামী লীগ প্রধান হিসাবে কার্যরত প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তিনি এক পাকিস্তানের স্মৃতিবাহী দলীয় পতাকা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে চিরতরে সম্পর্ক বিচ্ছেদের দরুন দলের পতাকা পরিবর্তিত হইবে। বঙ্গবন্ধু বলেন, শয়তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা যায় না—বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রশ্নই ওঠে না।

এই যে বেদনা এর কোন ভাষা আছে?

বাঙালি জাতির মুক্তির দিশারী গণসংগঠন আওয়ামী লীগের প্রধান এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শনিবার ১৫ জানুয়ারি (১৯৭২) সুদীর্ঘ পৌনে দশ মাস পরে দলীয় অফিসে পদার্পণ করিয়া এক কর্মীসভায় ভাষণ দানকালে এক পর্যায়ে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। আবেগে-কান্নায় বার বার তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। কান্নাভেজা কণ্ঠে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "সামান্য অবস্থা হইতে আমি এই দলকে গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি। অনেক সংগ্রাম-সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়া আওয়ামী লীগ আজ এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমার বহু সহকর্মী আজ আমার পাশে নাই। তাঁরা চিরতরে হারাইয়া গিয়াছে।" তিনি বলেন, "আমি তোমাদের নেতা নই, তোমরা আমার কর্মী নও– তোমরা আমার ভাই।" এই কথা কটি বলিতে বলিতে তিনি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন—তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, রবিবার, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা

'আমরা শান্তিতে বসবাস করিতে চাই'

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জোট নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যাকালে বলেন, "আমরা সকল দেশের সহিত শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমাদের দেশ একটি ছোট দেশ। আমরা কোন দেশের শত্রু হইতে চাই না এবং কোন দেশ আমাদের শত্রু হইয়া থাকুক উহাও আমরা চাই না।"

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয় নাই কেন জানিতে চাহিলে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তাহাদের নিজস্ব অসুবিধা আছে। আমি তাহাদেরকে দোষারোপ করি না। কিন্তু আশা করি যে, তাহারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের সর্বত্র জনমত আমাদের সংগ্রামের পক্ষে ছিল। তিনি আশা করেন যে, মার্কিন জনমত একদিন নিক্সন সরকারকে বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য করিবে।

সূত্র : *সংবাদ*, মঙ্গলবার, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২

১০ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২

আজ সোমবার ১৭ জানুয়ারি (১৯৭২) এক সরকারি হ্যান্ডআউটে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়।

সংগ্রামীদের প্রতি ধন্যবাদ

বাংলাদেশের জনতা ও আমার সরকারের পক্ষ হইতে আমি গণবাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল সংগ্রামী বাহিনীর সদস্যরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। আমাদের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে ত্যাগ স্বীকার এবং মুক্তিযুদ্ধকালে সংগ্রামে অবতীর্ণ সকল সংগ্রামীর রক্ত ও স্বেদ বৃথা যাইতে পারে না। আমরা এত দিন যে স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছিলাম, এখন আমাদিগকে সেই সোনার বাংলা গঠন করিতে হইবে।

দেশরক্ষা বাহিনীতে নেতৃত্ব গ্রহণ করুন

তাই, আমি ও আমার সরকার গণবাহিনীর সকল সদস্যকে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা ও এক নয়া সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে তাহাদের সকল শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করার আহ্বান জানাইতেছি। সরকার ঐকান্তিকতা সহকারে আশা করে, মুক্তিযুদ্ধের বীরেরা বাংলাদেশের নয়া সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীতে নেতৃত্বদানের জন্য আগাইয়া আসিবেন।

গণপুলিশ বাহিনীতে যোগদান করুন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি নয়া পুলিশ বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। ইহা হইবে একটি গণপুলিশ বাহিনী। অতীতের ন্যায় এ বাহিনী নির্যাতন ও যন্ত্রণা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না। একমাত্র আমাদের বীর গণবাহিনীর মধ্য হইতে লোক বাছাই করিয়াই যথাযথভাবে অনুরূপ একটি গণপুলিশ বাহিনীতে লোক ও অফিসার নিয়োগ করা সম্ভবপর। তাই, আমার সরকার গণবাহিনীর সদস্যদের মধ্য হইতে পুলিশ ও অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রহিয়াছে

আমাদের প্রিয় দেশটিকে সর্বাধিক দ্রুততার সাথে গড়িয়া তোলা এবং অতঃপর আমাদের জাতীয় অভীষ্টসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাপ্তব্য সমুদয় সম্পদ (বৈষয়িক ও জনশক্তি) কাজে লাগানোর জন্য আমাদিগকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ ঘটাইতে হইবে। পরিকল্পনা তৈরি ও প্রগতির নীল নকশা প্রণয়নের প্রয়োজনে আমাদের বিপুলসংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, প্রকৌশলী, স্থপতি, চিকিৎসক, কারিগর ও সকল ধরনের কুশলী জনশক্তির দরকার রহিয়াছে। হীন দুশমন আমাদের সমাজের সারাৎসার-প্রগতির পথে আমাগিদকে নেতৃত্বদানের যোগ্য বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ও দক্ষ জনশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা বহু অমূল্য জীবনকে হারাইয়াছি। আমাদিগকে শুধু এই ক্ষতি সামলাইয়া লওয়াই নহে, অধিকন্তু উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নূতনতর কুশলতা অর্জন করিতে হইবে। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, যেন আমরা অবিলম্বে আমাদের নূতন সমাজ গঠনের কাজ শুরু করিতে পারি।

বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত নেতৃত্ব চাই

আমি আন্তরিকভাবে অনুভব করি, দেশের পুনর্গঠন, দেশের অর্থনীতির মৌলিক কাঠামো পুনঃরচনা, সম্ভাব্য দ্রুততম গতিতে অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের উদ্দীপ্ত নূতন ধরনের নেতৃত্বদানের ব্যাপারে গণবাহিনী হইল প্রতিভাগুলির সর্বোত্তম উৎস। সরকারের অভিপ্রেত হইল, গণবাহিনীর সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করিয়া মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন পরিত্যাগকারী শিক্ষার্থীরা জাতীয় উন্নয়নের সকল অঙ্গনে দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটাইবেন। এসকল বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখিয়া দেশের যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ বিদ্যায়তনে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ পুনরারম্ভ করিতে ইচ্ছুক স্বাধীনতা সংগ্রামীদিগকে সরকার

সকল সুযোগ-সুবিধাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। যাহারা শিক্ষা সমাপন করিয়াছেন তাহাদিগকে অবিলম্বে উপযুক্ত পদে গ্রহণ করা হইবে।

উপরোল্লিখিত নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গণবাহিনীর সকল সদস্যকে জাতীয় মিলিশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

মিলিশিয়া শিবির খোলা হইয়াছে

একটি জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের বিস্তারিত কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। কর্মসূচি মোতাবেক সকল মহকুমা সদরে শিবির স্থাপন করা হইয়াছে। এসকল শিবিরে প্রয়োজনীয় বাসস্থান, আহার, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধার আয়োজন করা হইয়াছে। জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হইয়াছে এবং সরকার জাতীয় মিলিশিয়ার আওতায় সংগঠিত গণবাহিনীর সদস্যদের সমস্যাবলি সমাধানে সাহায্য করিতেছেন।

যোগ্যতানুসারে বাছাই করা হইবে

জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পশ্চাতে বিদ্যমান উদ্দেশ্যটি হইল গণবাহিনীর সদস্যদিগকে একটি সংগঠন ও একটি নিয়মানুবর্তিতার আওতায় আনয়ন করা। অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের যোগ্যতা, আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী জাতীয় পুনর্গঠন, উন্নয়ন, দেশরক্ষা এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিভিন্ন কাজের জন্য বাছাই করা হইবে।

দশদিনের মধ্যে অস্ত্রসমর্পণ করুন

জাতীয় মিলিশিয়া সংগঠনের এ কর্মসূচি সম্ভাব্য দ্রুততম গতিতে অবশ্যই বাস্তবায়ন করিত হইবে, যেন আমাদের গৌরবের ধন–ছেলেদের ক্ষমতা ও কর্মক্ষমতাকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি। গণবাহিনীর সদস্যদের সর্বান্তঃকরণ সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যতীত ইহা সম্পাদন করা সম্ভব হইবে না। তাই, আমার নির্দেশ হইল, গণবাহিনীর যে সকল সদস্য এখনও নিজ নিজ অস্ত্র লইয়া মহকুমা পর্যায়ের শিবির গুলিতে হাজির হন নাই, এই নির্দেশ প্রকাশের দিন হইতে দশ দিনের মধ্যে তাহাদিগকে অবশ্যই অস্ত্রসমেত শিবিরে হাজির হইতে হইবে। এ সময়ের মধ্যে গণবাহিনীর সকল সদস্যকে গোলাবারুদসহ অস্ত্রগুলি অবশ্যই মহকুমা হাকিমদের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে।

নতুবা জনগণ সন্দেহের চোখে দেখিবে

আমি এ ব্যাপারে আস্থাশীল যে, আমার 'বীর ভাইয়েরা' দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমার ডাকে সাড়া দিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী হাজিরা দান করিবেন। এ সময়ের পরও যাহারা অস্ত্র নিজেদের কাছে রাখিয়া দিবেন, দেশবাসী তাহাদিগকে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন। এ সময়ের পরে কেহ অস্ত্র হাতে রাখিলে তাহা অননুমোদিত ও বেআইনি বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে।

কুখ্যাত আলবদর সদস্যরা এখনও ঘুরিয়া ফিরিতেছে

এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ঘৃণ্য ও কুখ্যাত আল-বদর, আল-শামস ও রাজাকার বাহিনীর বহু সদস্য এখনও নিজদিগকে গণবাহিনীর সদস্য হিসাবে পরিচয় দিয়া চলিয়াছে এবং দেশের জনগণের জান–মালের উপর হুমকি সৃষ্টি করিতেছে।

অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে পারে

স্বভাবতঃই ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইহারা জাতীয় মিলিশিয়া শিবিরে যোগদান অথবা আমার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অস্ত্রসমর্পণে আগাইয়া আসিবে না। নির্ধারিত সময় পরে অননুমোদিত অস্ত্র বহনকারী লোকদিগকে আমার দেশবাসী তাই সঙ্গতভাবেই উক্ত কুখ্যাত বাহিনীগুলির সদস্য বলিয়া মনে করিতে পারেন এবং অনুরূপ ভ্রান্তির পরিণতিতে অপ্রীতিকর ঘটনাবলির সৃষ্টি হইতে পারে।

আসুন, সোনার বাংলা গড়ি

আসুন, আমরা সকলে এক নতুন সোনার বাংলা গড়িয়া তুলি।

"জয় বাংলা"

সূত্র : সংবাদ, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২

অস্ত্র গোপনকারীদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর কঠোর হুঁশিয়ারি

ঢাকা স্টেডিয়াম, ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২

গতকাল (৩০ জানুয়ারি) এখানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন আমার কাছে অস্ত্র জমা দিয়েছে। তাঁরা দেশ গঠনেও আমাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। দেশ গঠনে সবাই সুযোগ পাবে। কিন্তু যারা তলে তলে বিপ্লবী হতে চান এ বাংলায় তারা মাথা তুলতে পারবে না। অস্ত্র মাটির তলায় রেখে কোন লাভ নাই। তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। আমরা সে অস্ত্র বের করে ফেলব।

সোমবার ৩১ জানুয়ারি (১৯৭২) মুজিব বাহিনীর অস্ত্র জমাদানের জন্য ঢাকা স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপরোক্ত হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেন।

এর আগে অস্ত্র জমাদানকালে মুজিব বাহিনীর হাইকম্যান্ড থেকে জানানো হয় যে, মুজিব বাহিনী অস্ত্র জমাদানে বিশ্বাসী নয়। তাঁরা কোন পরাজিত বাহিনী নয়। তাই তাঁরা যাঁর নির্দেশে অস্ত্রগ্রহণ করেছে, সেই মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র হস্তান্তর করছেন। মুজিব বাহিনীর হাইকম্যান্ড আরো জানান, এ অনুষ্ঠানে তাঁরা মোট পঞ্চাশ হাজার অস্ত্র জমা দিচ্ছেন। আরো প্রায় ত্রিশ হাজার অস্ত্র জমা দানের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুজিব বাহিনীর সদস্যরা এখন ঢাকার পথে রয়েছেন। এছাড়া নিজ নিজ মহকুমা সদর দপ্তরেও তাঁরা অস্ত্র জমা দিচ্ছেন। সব মিলে প্রায় এক লাখ অস্ত্র মুজিব বাহিনী জমা দিবে।

তোমরা আমার ভালোবাসা গ্রহণ কর

বঙ্গবন্ধু অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের সকল আনুষঙ্গিকতাশেষে উন্মুক্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণ প্রদান করেন। শুরুতেই তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সকল নির্দেশকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালনের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আবেগবিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, "যাবার বেলায় আমি তোমাদের কিছুই দিয়ে যাবার পারি নাই। আমি বলেছিলাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। বলেছিলাম, আমি যদি হুকুম দিবার না পারি, তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর। তোমরা তাই করেছ। তোমাদের তাই ধন্যবাদের চেয়েও অনেক বেশি পাওনা। তোমরা আমার প্রাণঢালা ভালোবাসা গ্রহণ কর।"

তোমাদের শৃঙ্খলা আমার গর্ব

বঙ্গবন্ধু শহীদদের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "মানুষ যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে পাকিস্তানি সৈন্যরা তা দেখিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে তোমরা যে শৃঙ্খলা দেখিয়েছ–বাঙালি জাতি তা নিয়ে চিরদিন দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে থাকবে। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে তোমাদের এ ধৈর্য কোন দীনতা নয়–দুনিয়ার বুকে এ আমার গর্ব।"

ষড়যন্ত্রকারীরা হুঁশিয়ার

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা বিপন্নের ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, "ভাইরা আমার, স্বাধীনতা আদায় করতে যেমন কষ্ট—তা রক্ষাও কষ্টকর। এখনো ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু কী করবে ওরা? স্বাধীনতা বিপন্ন করবে? ভুলে যাও সে কথা। সাত কোটি মানুষ একে একে প্রাণ দিবে–স্বাধীনতা রক্ষা করবে।"

দালালদের প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, "ওদের বিচার করা হবে। ওদের ক্ষমা নেই। কেউ যদি ওদের সহায়তা করে তবে তাদেরও বিচার হবে।"

বঙ্গবন্ধু মুজিব বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "অস্ত্র আমি নিচ্ছি। ভুলে যেও না, যে মুহূর্তে প্রয়োজন হবে এ অস্ত্র তোমাদের কাছে ফিরে যাবে।"

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, "বাংলাদেশের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্র। এর মধ্যে কোন হাঙ্কি-বাঙ্কি নাই। এ বাংলায় শোষকদের মাথা তুলতে দেওয়া হবে না।"

দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ কর

বঙ্গবন্ধু মুজিব বাহিনীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সকল শাখার প্রতি আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার এবং এক বছরের জন্য দেশ গঠনে আত্মনিয়োগের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, "হানাদার পাকিস্তানি দস্যুরা এ দেশে কিছুই রেখে যায় নি। টাকা নাই, পয়সা নাই, ধন-সম্পদ কিছু নাই। আছে শুধু জনশক্তি। আজ এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে তোমরা দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করবে। আমার বিশ্বাস, আমি না থাকতে যখন তোমরা আমার নির্দেশ মেনেছ, আজও তা মানবে।"

বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয় মিলিশিয়া ও পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানান। তিনি শহীদদের পরিবারকে সাহায্য প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রেও মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আর যেন গুলির শব্দ না হয়

বঙ্গবন্ধু বলেন, "তোমরা অস্ত্র জমা দিয়েছ। কিন্তু যুদ্ধ তোমাদের শেষ হয় নি। এখন কাজ দেশ গঠনের। তোমাদের সকলকে তার জন্য সকল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কাল থেকে আর যেন একটাও গুলির শব্দ না হয়।"

সূত্র : *সংবাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

কলকাতায় বাংলাদেশের নেতাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণঢালা সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ও ভারতের মৈত্রী-বন্ধন চিরস্থায়ী : বঙ্গবন্ধু

ব্রিগেড প্যারেড ময়দান, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে বিশ্বের স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় ভাষণদানকালে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ ও ভারতের মৈত্রীবন্ধন চিরস্থায়ী, কোন ষড়যন্ত্রই একে নষ্যাৎ করতে পারবে না। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদের খেলার দিন শেষ হয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারতের মাটিতে আমরা সাম্রাজ্যবাদী খেলা চলতে দেব না। তিনি পুনরায় অভিযোগ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গণহত্যায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সাহায্য ও প্ররোচিত করেছে।

কলকাতা ব্রিগেড প্যারেডের বিশাল সমাবেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী, ভারতীয় জনগণ ও সেনাবাহিনীর প্রশংসা করে বলেন যে, আমাদের দুদেশের মৈত্রী বন্ধন চিরস্থায়ী। কেননা, আমরা উভয়েই গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র– এ চারটি মূলস্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের বন্ধুত্ব হৃদয়ের, প্রয়োজনের নয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর আশাবাদ প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, কেউ আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

'বাসস' পরিবেশিত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ এখানে প্রদত্ত হলো :

ভারতের মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আমার ভাই ও বোনেরা, আজ আমি ভারতের জনগণের জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের শুভেচ্ছার বাণী নিয়ে এসেছি। আমি কৃতজ্ঞতার বাণী নিয়ে এসেছি।

এ ঋণ শোধ করার নয়

আপনারা ভারতের জনগণ আমাদের মুক্তি সংগ্রামে এমনভাবে এবং এত পরিমাণে সাহায্য করেছেন যে, কোন কৃতজ্ঞতা দিয়েই সে ঋণ শোধ করার নয়। আপনারা জানেন, বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে যে অমানুষিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে অসহায়ের আর্তনাদ শোনা গেছে। ভারত আমাদের এক কোটি মানুষকে খাদ্য দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে সর্বরকমের সাহায্য করেছে। ভারতের জনগণকে সামান্য কৃতজ্ঞতা দিয়ে আমি ছোট করতে চাই না। আমি কল্পনাও করতে পারি না ভারত সাহায্য না করলে আমাদের জনগণের কী অবস্থা হতো। এই মহৎ দানের জন্য শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, আমি ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের জনগণকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমরা কোনদিন আপনাদের ঋণ শোধ করতে পারব না।

আপনারা জানেন, আমরা আমাদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আর কোন জাতিকেই তাদের স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত দিতে হয় নি। বর্বর শত্রুর হাতে না হলেও আমাদের তিরিশ লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, আমাদের মা-বোনেরা তাদের মানসম্ভ্রম হারিয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা চল্লিশটি বাড়ি-ঘর পুড়ে ছাই হয়েছে। শত্রুরা আমাদের বহু জ্ঞানী-গুণী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। আমাকে গ্রেপ্তার করার সময় জনগণকে আমি অস্ত্র দিয়ে যেতে পারি নি, কিন্তু আমার জনগণ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আমি জানতাম, আমার জনগণ ও সহকর্মীরা সংগ্রাম করবে এবং রক্ত দেবে। তারা তা করেছেন। তারা তাদের জীবন দিয়েছে।

ভারতের জনগণ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনী এগিয়ে না এলে আমরা আমাদের সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারতাম না। আমি আবারও আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের দেওয়ার কিছুই নেই আমার, আপনাদের জন্য আমার ভালোবাসা আছে, আমি আপনাদের তাই দিচ্ছি। আপনারা অবগত আছেন যে, পাকিস্তানি শাসকরা ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৫২ সালে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় বসাতে চাইলে আমাদের উপর হামলা চালায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম চালালে আবারও আমাদের উপর হামলা হয়। ১৯৫৮ সালে বাংলাদেশকে শোষণ করার জন্য আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ কোনদিন পশু শক্তির কাছে মাথা নত করে নি। আমার ভাইয়েরা তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে। তারা তাদের জীবন দিয়েছে এবং এখনও লড়াই করছে। আপনারা একাত্তরের ইতিহাস ভালভাবেই জানেন।

পাকিস্তানের ৩টি শ্লোগান

সবসময় পাকিস্তানের তিনটি শ্লোগান ছিল, "ইসলাম খতরা মে হ্যায় (ইসলাম বিপদাপন্ন), কাশ্মীর লে লেয়েঙ্গা (কাশ্মীর নিয়ে নেব) এবং হিন্দুস্তান হামারা দুশমন হ্যায় (হিন্দুস্তান আমাদের শত্রু)"। কিন্তু তারা সমস্যাজর্জরিত জনসাধারণের প্রতি নজর দেন নি। জনসাধারণ যে অনাহারে মরছে সেদিক নজর নেই।

পাকিস্তানি শাসকরা ভেবেছিল, বন্দুক দিয়েই বাঙালিদের দাবিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু দাবিয়ে রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে তারা নজীরবিহীন হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। তারা বাঙালি পুলিশ বাহিনীর শতকরা ষাট জনকে হত্যা করেছে। তারা অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে খুন করেছে। তারা খাদ্য গুদাম ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আমার জনগণ না খেয়ে লড়াই করেছে। অনেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য দিয়েছেন। কিন্তু আমার জনগণ স্বাধীনতা লাভ করেছে, তার মূল কারণ হলো, তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল। আমি বিশ্বাস করি, তারা তাদের দেশকে পুনর্গঠিত করতে পারবে।

আমি পাকিস্তানিদের সাবধান করে দিয়েছিলাম, বাংলাদেশ শুধুমাত্র উর্বর নরম পলিমাটির দেশই নয়; বাংলাদেশের এই নরম মাটিই চৈত্র মাসে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। এই

বাংলাদেশ তিতুমীরের বাংলাদেশ, সুভাষ বসুর বাংলাদেশ, ফজলুল হকের বাংলাদেশ, সোহরাওয়ার্দীর বাংলাদেশ, সূর্য সেনের বাংলাদেশ।

তারা ফাঁসি দিতে চেয়েছিল

আপনারা জানেন যে, তারা আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমার জীবন রক্ষার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মৃত্যুভয়ে আমি ভীত নই, কেননা মৃত্যু স্বাভাবিক, বরং বেঁচে থাকাটাই অস্বাভাবিক। দুনিয়ার যাঁরা আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে সমর্থন দিয়েছেন, আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন ও অপরাপর দেশের সরকার ও জনগণকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি মার্কিন জনগণ ও সাংবাদিকদের কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু মার্কিন সরকারকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি না। আমি বুঝতে পারি না বাংলাদেশের মানুষকে হত্যা করার জন্যে মার্কিন সরকার কীভাবে পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দেয়, আমি বুঝতে পারি না মার্কিন সরকার কীভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করার কারণে ভারতে সাহায্যদান বন্ধ করে দেয়।

আজকের দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী খেলা শেষ হয়ে গেছে। ভারত ও বাংলাদেশের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী খেলা আর চলবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। যদি এখনও কেউ মনে করেন বাংলাদেশ পাকিস্তানের অঙ্গ, তবে তার যোগ্য স্থান পাগলাগারদে।

বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন তোমরা কারা? আমি তোমাদের (পাকিস্তানিদের) বলে দিতে চাই, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতার একটিমাত্র মানুষ জীবিত থাকতেও বাংলাদেশের মাটিতে তোমরা পা দিতে পারবে না। আমি প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করি না। আমি বলি, পশ্চিম পাকিস্তান শান্তিতে থাক।

ইন্দিরার সাথে মিল কেন?

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন, শ্রীমতী গান্ধী তোমার জন্যে এতকিছু করছে কেন? ব্যাপার কী? আমার উত্তর অত্যন্ত সহজ।

আমাদের মিল আদর্শের মিল, নীতির মিল। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, আমিও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, আমিও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি, শ্রীমতী গান্ধীও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন। আমরা উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী।

ফাটল ধরাতে পারবে না

আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, পৃথিবীর কোন শক্তিই ভারত ও বাংলাদেশের অক্ষয় মৈত্রীতে ফাটল ধরাতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, ভারতে যেন সাম্প্রদায়িকতা না থাকে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নেই। অতীতে যখনই পূর্ববাংলা নিজেদের অধিকারের কথা বলেছে, তখনই সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হয়েছে। আমি ভারতের জনগণকে উপদেশ দিতে চাই না, আমি শুধু বলতে চাই, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে।

আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যাব।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার

আমি সোজা মানুষ, আমি যা বুঝি, আমি তাই করি। বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি আবারও বলছি যে, আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষয়।

জয় বাংলা, জয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, জয় হিন্দ, ভারত-বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

সূত্র : সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসুন

শহীদ স্মরণ সপ্তাহের শুরুতে বেতার ভাষণে দেশবাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর আহবান

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মঙ্গলবার ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৭২) শহীদ স্মরণ সপ্তাহের প্রথম দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর বেতার ভাষণে একুশের শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই মর্মে আহবান জানান, আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ি, একটা শোষণহীন সমাজ তৈরি করি। তিনি বলেন, স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, কিন্তু শোষণহীন সমাজ ছাড়া এর ফল ভোগ করা সম্ভব নয়। তিনি ছাত্র, যুবক ও মেহনতী জনতাকে এই লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহবান জানান। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

দেশবাসী ভাই ও বোনেরা আমার,

আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি আমরা স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকেই এ সংগ্রাম শুরু হয়। সেদিন আমরা গ্রেপ্তার হয়েছিলাম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। সেটা শুধু ভাষা আন্দোলনই ছিল না এবং কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনই সেদিন শুরু হয় নাই। এ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯৪৮ সাল থেকে আস্তে আস্তে এ সংগ্রাম শুরু হয়। '৫২ সালে এই সংগ্রাম চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সেদিন আমাদের দেশের ছেলেরা রক্ত দিয়েছিল, শহীদ হয়েছিল বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কিন্তু সেটা কী শুধু ভাষা আন্দোলনই ছিল।

সেটা কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনই ছিল না। ছেলেরা রক্ত দিয়েছিল কেবলমাত্র ভাষার জন্য নয়, এর সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক, স্বাধিকার আর মানুষের মতো বাঁচবার অধিকারের সংগ্রাম। সেদিন অনেকেই বুঝতে চেষ্টা করেন নি যে, বাংলার মানুষ জেগে উঠেছে, বাংলার মানুষকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। সেদিন থেকে শুরু হয়েছিল চরম সংগ্রামের প্রস্তুতি।

বছরের পর বছর এই দিনটি আমার দেশের ভাইবোনেরা পালন করছে শহীদ দিবস হিসেবে। কিন্তু শহীদ দিবস পালন করলেও বার বার এর উপর আঘাত এসেছে। এ দিনটি সত্যিকার অর্থে আমরা উদযাপন করতে পারি নি। কারণ, শোষকগোষ্ঠী এই দিনটিকে হিংসার চোখে দেখত এবং তারা এটাকে ধ্বংস করতে বার বার চেষ্টা করেছে। এমনকি যে সামান্য শহীদ মিনারটি গড়ে উঠেছিল তার উপরও বার বার এই ষড়যন্ত্রকারীরা এবং শোষক শ্রেণী আঘাত করেছে।

তারপর থেকে বছরের পর বছর অনেক ভাইবোন, দেশের জনসাধারণ জীবন দিয়েছেন। জীবন দিয়েছেন স্বাধিকারের আন্দোলনে, স্বাধীনতা আন্দোলনে। তারা বাঁচতে চেয়েছে মানুষের মতো। তারা চেয়েছে তাদের অধিকার, তারা চেয়েছে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তারা বাস করবে। কিন্তু পৈশাচিক শক্তি সেটা কিছুতেই মানতে চায় নি। হত্যা করেছে আমার ভাই-বোনদের। আঘাত করেছে আমাদের সংস্কৃতির উপর, আঘাত করেছে আমাদের অর্থনীতির উপর। নির্যাতন করেছে আমার মা-বোনদের। ভিখারি করেছে বাংলার সাধারণকে। কিন্তু বাঙালি এমন এক জাতি–যারা রক্ত দিতে জানে। যে জাতি মরতে শিখে, সে জাতিকে কেউ রুখতে পারে না–শোষকগোষ্ঠী বুঝে নাই। তাই, তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা আক্রমণ করে ছিল।

আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সত্য। কিন্তু তা অনেক রক্তের বিনিময়ে। এত রক্ত কোন দেশ কোন জাতি স্বাধীনতার জন্য দেয় নাই। কিন্তু এ রক্ত আমাদের বৃথা যাবে, এ স্বাধীনতা আমাদের বৃথা যাবে যদি এদেশের মানুষের মুখে আমরা হাসি ফোটাতে না পারি, যদি

এদেশের মানুষকে শোষণমুক্ত করতে না পারি, শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে না পারি। এবং তা যদি করতে হয়, তাহলে এদেশের মানুষকে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে। আমি আশা করি, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ এবারে এ শপথই নেবে।

আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু স্বাধীন হলেও আমরা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারব না, যদি শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে না পারি। সে জন্য জাতি, ধর্ম, দল, মত নির্বিশেষে ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক সকলকে অগ্রসর হতে হবে–এটাই আমরা আশা করি। এ দিনে আমাদের শপথ হবে, যে স্বাধীনতা আমরা এনেছি, যদি প্রয়োজন হয় রক্ত দিয়ে সে স্বাধীনতা রক্ষা করব। যদি প্রয়োজন হয় দেশ গড়ে তোলার জন্য আরও রক্ত দেব। আজ প্রতিজ্ঞা করতে হবে শহীদদের রক্তের কথা মনে করে। যাঁরা মরে গেছে, যাঁরা শহীদ হয়েছে, যাঁদের মায়ের বুক খালি হয়েছে, যে বোন বিধবা হয়েছে, যে কোটি কোটি মানুষ আজ গৃহহারা হয়েছে তাঁদের কথা স্মরণ করে শপথ নিতে হবে, বাংলার মাটিতে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করতে হবে। মানুষ যাতে আর দুঃখ, কষ্ট না পায় আর কোনদিন অত্যাচারিত, নিপীড়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজে অগ্রসর হতে হবে। তাই, আমি অনুরোধ করছি, বিশেষভাবে যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ, কৃষক-শ্রমিক ভাইদের সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে।

আমরা মহাবিপদের মধ্যে আছি। আমাদের কিছুই নাই। নতুন করে সবকিছু গড়তে হবে। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে গড়ে তুলি, একটি শোষণহীন সমাজ তৈরি করি।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক। জয় বাংলা।

সূত্র : সংবাদ, বুধবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

পরিবার পিছু একশত বিঘার বেশি জমি রাখা চলবে না : বঙ্গবন্ধু

শান্তিরহাট, ভোলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, পরিবার পিছু মাত্র ১০০ বিঘা জমি রাখতে দেওয়া হবে। প্রয়োজনে জমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা আরো হ্রাস করা যেতে পারে।

ভোলার জনসভায় বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে পরিবারগুলোর কাছ থেকে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গেলে তা সহ সরকারি খাস জমি অবিলম্বে দেশের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

লক্ষাধিক মানুষের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, নির্ভরশীল ব্যক্তিদের নামে জমি লিখে দেবার মতো অতীতে অনুসৃত কায়দায় অথবা অন্য কোনভাবে এ আদেশকে এড়িয়ে যেতে বা নস্যাৎ করতে দেওয়া হবে না। তিনি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীদের অবিলম্বে এ কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন এবং হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, এ আদেশ যথাযথভাবে পালন না করলে তাদের কারাদণ্ড ভোগ পর্যন্ত করতে হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী আত্মসাহায্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁর আহবান পুনরুল্লেখ করে বলেন, আপনার প্রতিবেশীকে অবশ্যই আপনার সাহায্য করতে হবে, প্রয়োজন হলে তার পুনর্বাসনে আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা পশুর চেয়েও অধম; কিন্তু আমরা যে মানুষ, কাজের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করতে হবে আমাদের। এ ক্ষেত্রে অন্যতম কাজ হবে আমাদের প্রতিবেশীকে সাহায্য করা।

দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং চুরি-ডাকাতির ন্যায় কোন ঘটনা যেন না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, অনুরূপ শৃঙ্খলাহীনতা চলতে থাকলে দেশ পুনর্গঠন করা যাবে না।

সূত্র : *সংবাদ*, সোমবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

বঙ্গবন্ধুর আবেদন

নির্যাতিত মা-বোনদের সমাজে টেনে নিন

নগরবাড়ি, পাবনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নগরবাড়িতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে পাক হানাদার কর্তৃক নির্যাতিতা মহিলাদের সমাজে যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

তিনি বলেন, এসব নির্যাতিতা মহিলা আমাদেরই মা ও বোন, তাঁরা আমাদেরই সন্তান। তাঁদের গৃহিণীর মর্যাদা দান করে আমাদের মহত্ত্বের ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, এসব নির্যাতিতা মহিলার একমাত্র দোষ ছিল তারা বাঙালি এবং তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসে।

বঙ্গবন্ধু এসব নির্যাতিতা মহিলার মাঝ থেকে স্ত্রী পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রস্তুত করবার জন্য আবেদন জানান।

সূত্র : *সংবাদ*, সোমবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

আমরা উভয়ই বিশ্বশান্তি চাই

লেনিনগ্রাদের সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু

লেনিনগ্রাদ, রাশিয়া, ৪ মার্চ ১৯৭২

সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১ থেকে ৫ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঁচ দিনব্যাপী সরকারি শুভেচ্ছা সফরকালে লেনিনগ্রাদের মেয়র-এর দেওয়া সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ভাষণ :

বাংলাদেশ ও সোভিয়েত জনগণ বিশ্বশান্তি চায়। শোষণ মুক্তির জন্য উভয় জনতা সমাজতন্ত্র কায়েমের সংগ্রাম করেছে। দুদেশের জনগণের মধ্যকার সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের উল্লেখ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একথা বলেন। লেনিনগ্রাদের মেয়র কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় মুজিব বলেন, কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ দুদেশের জনতা এগিয়ে এসেছে। ঘাতক দুশমনের কব্জা থেকে মুক্তির জন্য উভয় জনতা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছে।

মুজিব বলেন, দুদেশের জনতার মতামতের ক্ষেত্রে আরেকটি সাদৃশ্য হচ্ছে, তারা বিশ্বশান্তি কামনা করে। তিনি বলেন, মতামতের এই সাদৃশ্য আমাদের বন্ধুত্বকে করেছে জোরদার।

তিনি উল্লেখ করেন, দুদেশেরে মধ্যকার মৈত্রী একটি নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, লেনিনের নেতৃত্বে লেনিনগ্রাদে সোভিয়েত জনতা কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবী সংগ্রাম বাংলাদেশের জনগণকে সামরিক একনায়কতন্ত্রের কবল থেকে স্বদেশভূমিকে মুক্ত করার সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করেছে।

বঙ্গবন্ধু দৃঢ় আশা পোষণ করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ তার পঙ্গু অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করে নিতে সমর্থ হবে। তিনি বলেন, এ বিপুলায়তন পুনর্নির্মাণ কর্মধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অমূল্য অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েত সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকালে শেখ মুজিব বলেন, আমাকে আটক করার বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ ও সরকারের প্রতিবাদ পাকিস্তান সরকারকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, ফলে ফাঁসি মঞ্চে আমাকে ঝুলতে হয় নি।

বাংলাদেশের জনগণের বীরোচিত সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে লেনিনগ্রাদের মেয়র বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জনগণের সংহতি এবং পার্টি সংগঠনের উপর জনগণের আস্থার দরুন অনন্যসাধারণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মি. কোসিগিনও এ অভ্যর্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সূত্র : সংবাদ, রবিবার, ৫ মার্চ ১৯৭২

বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের মানুষ ভারতের জনগণের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিয়া যাইবে : বঙ্গবন্ধু

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা, ১৭ মার্চ ১৯৭২

বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহীয়সী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সফরে এলে তাঁর সম্মানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা উপলক্ষে নির্মিত সাম্পান আকৃতির মঞ্চ থেকে বাংলাদেশের জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ :

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুক্রবার ১৭ মার্চ (১৯৭২) শহীদ সোহরাওয়ার্দী ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়াইয়া তেজদৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের মানুষ ভারতের জনগণের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিয়া যাইবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহীয়সী নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ভাষণদান প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি শুধু ভারতের জনগণের মহান নেত্রী নহেন, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নির্যাতিত মানুষেরও নেত্রী।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সংবর্ধনা উপলক্ষে নির্মিত সাম্পান আকৃতির মঞ্চে দাঁড়াইয়া বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, যিনি এ দেশের মানুষের দুর্দিনে সাহায্য করিয়াছেন, ১ কোটি মানুষের অন্ন যোগাইয়াছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছেন, আজ আমাদের সৌভাগ্য যে, সেই মহান নেত্রীকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছি। বাংলাদেশের মাটিতে আজ আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি। আমাদের তেমন কিছু নাই, যাহা দিয়া আমরা তাঁহাকে সংবর্ধনা জানাইব। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের পক্ষ হইতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনন্দন জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়াছিল, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাহদের আশ্রয় দিয়াছেন, অন্ন যোগাইয়াছেন ও মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়াছে।

তিনি জানান, বাংলাদেশে আজ হাহাকার, বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের রাস্তাঘাট নষ্ট করিয়াছে, চাউলের গুদাম ধ্বংস করিয়াছে। বস্তুত, তাহারা আমাদের সবকিছুই ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, দেশের এমন পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহীয়সী নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আশায় বুক ভরিয়া গিয়াছে। (অসমাপ্ত)

সূত্র : *ইত্তেফাক*, শনিবার, ১৮ মার্চ ১৯৭২

সমাজতন্ত্রের পথে মুজিবের বাংলাদেশ

শোষণ ও অবিচারমুক্ত নতুন সমাজ আমরা গড়িব : ব্যাংক-বীমা-পাট-চিনি-পরিবহণ শিল্প জাতীয়করণ

ঢাকা, ২৬ মার্চ ১৯৭২

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ :

ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ ও অপরিমিত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলার বিঘোষিত সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করিয়া জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (রবিবার, ২৬ মার্চ ১৯৭২) ব্যাংক, বীমা, পাট, চা, চিনি, পরিবহন শিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি জাতির সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পথে অগ্রযাত্রার শুভ সূচনা করেন। দেশের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী স্বভাবসুলভ প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে জাতির জন্য সুখী-সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত এই শ্মশান বাংলার বুকেই আমরা সোনার বাংলা গড়িয়া তুলিব।

জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ :

"আমরা আজ স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করিতেছি। এই মহান দিনে স্বাধীনতা অর্জনের পথে যে লক্ষ লক্ষ বীর শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য গভীর বেদনাপ্লুত মনে আমার শোকাতুর দেশবাসীর সহিত পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরবারে মাগফেরাত কামনা করিতেছি। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে গৌরব উজ্জ্বল ও অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য আমি মুক্তিবাহিনীর সকল অঙ্গদল তথা বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যবৃন্দ, নির্ভীক যুবক, ছাত্র-কৃষক-মজদুর-বুদ্ধিজীবী আর আমার সংগ্রামী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও একনিষ্ঠ আত্মদান অনাগতকালের ভাবী বাঙালিদের জন্য প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত মুক্তিপাগল জনতার চেতনাকে উদ্ভাসিত করিবে।

বাংলার যেদিকে তাকাই

বিগত পঁচিশ বৎসর যাবৎ আপনারা ক্ষুধা, বঞ্চনা, অশিক্ষা এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষকেরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি নিকৃষ্টতম উপনিবেশে পরিণত করিয়াছিল। দুঃসহ ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমরা দিনযাপন করিতেছিলাম। পিষ্ট হইতেছিলাম শোষণের জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা পড়িয়া। দারিদ্র্যের ও অনাহারের বিষবাষ্পে যখন আমরা আকণ্ঠনিমজ্জিত, তখন তদানীন্তন পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের কষ্টার্জিত তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাদের পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়িয়া তোলার কাজে মত্ত ছিল। ন্যায়বিচার দাবি করায় মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ আমাদের উপর নামিয়া আসে। সমসাময়িককালে নিষ্ঠুরতম স্বাধীনতাযুদ্ধে আমাদের ত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, আর তিন কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এ সবকিছুই ঘটিয়াছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য। আজ আমি যখন আমার সোনার বাংলার দিকে তাকাই, তখন দেখিতে পাই যুদ্ধবিধ্বস্ত ধূসর পাণ্ডুর জমি, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী আর হতাশাগ্রস্ত পুরুষ। আমি শুনিতে পাই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ফরিয়াদ। আমাদের স্বাধীনতা যদি ইহাদের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ধার করিয়া মুখে হাসি ফুটাইতে না পারে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে তুলিয়া না দিতে পারে এক মুষ্টি অন্ন, মুছিয়া দিতে না পারে মায়ের অশ্রু ও বোনের বেদনা, তাহা হইলে সে স্বাধীনতা মিথ্যা, সে আত্মত্যাগ বৃথা। আমাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি উৎসবের লগ্নে দাঁড়াইয়া আসুন, আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি, বিধ্বস্ত মুক্ত বাংলাদেশকে আমরা গড়িয়া তুলিব। গুটি কয়েক সুবিধাবাদী নয়, সাড়ে সাত কোটি মানুষ তার সুফল ভোগ করিবে। আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী ও উন্নততর জীবনের প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

সমস্যা পর্বতপ্রমাণ

আজ আমাদের সামনে পর্বততুল্য সমস্যা উপস্থিত। আজ মহাসঙ্কটের ক্রান্তিলগ্নে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। বিদেশফেরত এক কোটি উদ্বাস্তু, স্বদেশের বুকে দুই কোটি গৃহহারা মানুষ, বিক্ষত কর্মহীন চালনা-চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়, নিশ্চল কারখানা, নির্বাপিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, অসংখ্য বেকার, অপরিমিত অরাজকতা, বিশৃঙ্খল বাণিজ্যিক সরবরাহ ব্যবস্থা, ভগ্ন সড়ক, সেতু ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং অকর্ষিত ভূমি–এ সবকিছুই আমরা উত্তরাধিকাসূত্রে পাইয়াছি। জনগণের গভীর ভালোবাসা, আস্থা, অদম্য সাহস ও অতুলনীয় ঐক্য–এগুলিকে সম্বল করিয়া আমার সরকার এই সঙ্কট কাটাইয়া উঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছে। আমি আশা করি, অতীতে আপনারা যেইভাবে দুর্জয় সাহসে বুক বাধিয়া ইয়াহিয়ার সামরিক অস্ত্রকে পরাভূত করিয়াছিলেন, গভীর প্রত্যয় ও সাহস নিয়া, তেমনই বর্তমান সঙ্কটের মোকাবিলা করিবেন। আমরা পুরাতন আমলের জীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিব।

ভাই ও বোনেরা,

আপনারা জানেন, হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের বাংলাদেশ রাইফেলস ও পুলিশের বিপুলসংখ্যক সদস্যকে হত্যা করিয়াছে। আইনের শাসন কায়েম ও শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠনের অভাব বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটা বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন নিযুক্তির মাধ্যমে আমরা পুলিশ বিভাগকে সংগঠিত করিয়াছি এবং ইতোমধ্যে যে সকল সমাজবিরোধী দুষ্কৃতিকারী স্বাধীনতা-উত্তর সুযোগ সুবিধাদির অপব্যবহারে লিপ্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের দমন করিয়া জনসাধারণের মনে নিরাপত্তাবোধ ফিরাইয়া আনার কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পাইয়াছিলাম স্বাধীন জাতির জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। ইহার কিছু কিছু আমলা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাঁহারা এখনও বনেদী

আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছে। আমরা তাঁদেরকে স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের জন্য উপদেশ দিতেছি, এবং আশা করিতেছি, তাঁহাদের পশ্চাদমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিবে। আমার সরকার নব রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করিয়া সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্রকে পুনর্গঠিত করিবে। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে। আমরা বাংলাদেশের সমস্ত মহকুমাগুলিকে জেলা পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা তৈরি করিতেছে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বিশেষজ্ঞরা নিয়োজিত

বিশেষজ্ঞরা খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং খসড়া শাসনতন্ত্র গণপরিষদের পূর্বেই প্রস্তুত হইয়া যাইবে। এই শাসনতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হইবে—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ৫৪টি বন্ধুরাষ্ট্র এ পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। বিপুলসংখ্যক বন্ধুরাষ্ট্রের এই স্বীকৃতিদান রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যকে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মানিয়া নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করিবে।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য আমরা বন্ধুরাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে উদার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করিতেছি। বিশেষ করিয়া ভারত আমাদের সুদিন ও দুর্দিনের প্রতিবেশী। সম্প্রতি মহান ভারতের মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফর করিয়া গিয়াছেন। এই শুভেচ্ছা সফরের প্রাক্কালে আমরা শান্তি, বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছি। এই চুক্তি দুই দেশের মহতী মানুষের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব এবং সংহতির বন্ধনকে মজবুত করিবে। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্যোগময় মুহূর্তে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি সোভিয়েত রাশিয়া সফর করিয়া আসিয়াছি, সেখানে তাঁহাদের অকৃত্রিম আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সোভিয়েত নেতৃবর্গ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজে সার্বিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমি পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলি এবং অন্য বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ যাঁহারা আমাদের দিকে সাহায্যের হাত নিয়া আগাইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি জোট বহির্ভূত ও সক্রিয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রচিত। বৃহৎ-শক্তির আন্তর্জাতিক সংঘাতের বাহিরে আমরা শান্তিকামী। আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী এবং প্রতিবেশীর সহিত সদ্ভাব সৃষ্টিতে আগ্রহী। দেশ গড়ার কাজে কেহ আমাদের সাহায্য করিতে চাহিলে তাহা আমরা গ্রহণ করিব। কিন্তু সে সাহায্য অবশ্যই হইতে হইবে নিষ্কন্টক ও শর্তহীন। আমরা জাতীয় সার্বভৌম ও সমস্ত জাতির সম-মর্যাদার নীতিতে আস্থাশীল। আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না, ইহাই আমাদের কামনা।

দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানের শাসকরা বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকৃতি প্রদান করিতেছে না। তাঁহারা পাঁচ লক্ষ নিরীহ বাঙালিকে সন্ত্রাস ও দুর্দশার মধ্যে আটক রাখিয়াছে। আমি বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন মানুষ ও বিশেষ করিয়া মি. ভুট্টোর নিকট আবেদন করিতেছি, তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হোক। এই ইস্যুকে কোনক্রমেই যুদ্ধবন্দিদের সহিত সমপর্যায়ে গণ্য করা চলিবে না। কারণ, যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে এমন অনেক আছে—যাহারা শতাব্দীর নৃশংসতম হত্যার অপরাধে অপরাধী। তাহারা মানবিকতাকে লঙ্ঘন করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালার ভিত্তিতে তাহাদের বিচার হইতে হইবে। পাকিস্তানের সংবেদনশীল সাধারণ মানুষের নিকট আমার আবেদন, নুরেমবার্গ মামলার আসামিদের হইতেও নিকৃষ্ট ধরনের এই অপরাধীদেরকে যেন তাহারা স্বজাতি বলিয়া ভাবিবেন না।

যাঁহারা উদ্বাস্তু হইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সাহায্য, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্য আমরা কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছি। বিনামূল্যে ও ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

ছিন্নমূল মানুষের মাথা গুজিবার ঠাঁই করিয়া দেওয়ার জন্য অস্থায়ী বাসগৃহ তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

বিধবা, অনাথ এবং নির্যাতিত মহিলাদের পুনর্বাসন পরিকল্পনাকে সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করিতেছেন। হানাদার পাকিস্তান বাহিনী যেভাবে বাংলাদেশকে ধ্বংস করিয়াছে, তাহাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করিতে দশ বৎসর সময় দরকার। আমাদের বিপ্লবী সরকার তিন বৎসরের মধ্যেই এই কাজ সমাপ্ত করিতে চান।

আমি অভ্যন্তরীণ বিপ্লবে বিশ্বাসী

আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। অবাস্তব তালিকা নয়, আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তবিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ গড়িতে হইবে। শোষণ ও অবিচারমুক্ত নূতন সমাজ আমরা গড়িয়া তুলিব এবং জাতির এই মহাক্রান্তিলগ্নে সম্পদের সামাজিকীরণের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচির শুভ সূচনা হিসাবে আমার সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জাতীয়করণ করিতেছে :

১. ব্যাংকসমূহ (বিদেশি ব্যাংকের শাখাগুলি ভিন্ন)।

২. সাধারণ ও জীবন বীমা কোম্পানিসমূহ (বিদেশি বীমা কোম্পানির শাখাসমূহ ভিন্ন)।

৩. সকল পাটকল।

৪. সকল বস্ত্র ও সুতাকল।

৫. সকল চিনিকল।

৬. আভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-যানের বৃহদাংশ।

৭. ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ও তদূর্ধ্ব সকল পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি।

৮. বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনকে সরকারি সংস্থা হিসাবে স্থাপন করা হইয়াছে।

৯. সমগ্র বহির্বাণিজ্যকে রাষ্ট্রীয়করণের লক্ষ্য নিয়া সাময়িকভাবে বহির্বাণিজ্যের বৃহদাংশকে এই মুহূর্তে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আনা হইয়াছে।

আপনারাও আগাইয়া আসুন

দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আমি দেশগড়ার কাজে আগাইয়া আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছি। সরকারি সেক্টরে কাজ করার জন্য তাঁহাদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে। শীঘ্রই যে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হইবে, তাহাতে এইসব ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইবে।

যেই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত বাঙালিদের মালিকানার স্বার্থ সরাসরি জড়িত, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাবেক মালিক অথবা প্রধান কর্মকর্তাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন অবশ্যই স্মরণ রাখেন, আমরা যে-সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছি, সেইগুলি সবদিক হইতে বিপ্লবাত্মক এবং জনসাধারণকে অবশ্যই এইসব ক্ষেত্রে তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বেসরকারি ক্ষেত্রে মাঝারি ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমাদের নীতির সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সরকারি নীতির কাঠামোর মধ্য হইতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজ ন্যায্যভাবে চালানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া হইবে।

কাহাকেও না খাইয়া মরিতে দিব না

বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ। কিন্তু আমি কাউকে না খাইয়া মরিতে দিতে চাহি না। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আমি দশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আনার চেষ্টা করিব এবং ডিসেম্বরের মধ্যে আরও বিশ লক্ষ টন আমদানি করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য ঘোর দুর্দিন।

আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী—আপনারা ধৈর্যধারণ করুন। উচ্চতম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্য ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হইবে। এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারী ও গুজব বিলাসীদের হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি। তাহারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়া ছিনিমিনি না খেলে–তাঁহাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হইবে।

শ্রমিক ভাইদের আমি বলি—

শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমানকাল ধরিয়া যেই পরস্পর বিরোধিতা রহিয়াছে তা আমাদের নূতন নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ হইতে অনেকখানি বিলুপ্ত হইবে। শ্রমিক-কর্মচারীকে আর সর্বদা মালিকের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত থাকিতে হইবে না। কেননা, বর্তমানে তাঁহাদের মালিক হইবে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ, যাঁহারা মালিক ও ম্যানেজারদের হাতে বিশ্বাস করিয়া নিজেদের সম্পত্তি জমা রাখিয়াছে।

আমি খুব শীঘ্রই শ্রমিক প্রতিনিধিদের একটি সভা করিতেছি। সেই সভায় শ্রমিক সংক্রান্ত সরকারি নীতি এবং আমাদের বিপ্লবী নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করিতে তাঁহাদের যে পূর্ণ সহযোগিতা লাগিবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। এই ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্য পৌঁছানোর পরে আমি আশা করিব যে, শ্রমিক নেতারা আমার সরকার ও আমার সঙ্গে একযোগে কাজ করিবেন এবং এই বিপ্লবী নীতিসমূহ সরাসরি শিল্প এলকায় কার্যকরী করিবেন। তদুপরি শ্রমিকদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ছাত্র ভাইয়েরা শোন—

আমার ছাত্র ভাইয়েরা যাঁহারা মুক্তিসংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল, তাঁহাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁহাদের কাজ করিয়া যাইতে থাকে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশসহ আমি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করিতে চলিয়াছি।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোমবার, ২৭ মার্চ ১৯৭২

আমলা নয় মানুষ সৃষ্টি করুন

চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবী সমাবেশে বঙ্গবন্ধু

চট্টগ্রাম, ৩০ মার্চ ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, গণশিক্ষা ছাড়া অর্থনৈতিক সমস্যার সফল সমাধান সম্ভব নয়, গণশিক্ষা ছাড়া সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়নও সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩০ মার্চ (১৯৭২) সকালে ঢাকা যাত্রার প্রাক্কালে চট্টগ্রাম গভর্মেন্ট হাউসে অনুষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশে ভাষণদান প্রসঙ্গে উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন।

বঙ্গবন্ধু তথ্য প্রকাশ করেন যে, দেশের শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীদের লইয়া একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হইতেছে। তিনি জানান যে, কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত করিতে তিনি চেষ্টা করিবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতিপূর্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনগুলি এক ধরনের ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

গণমুখী একটি শিক্ষাব্যবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা পোষণের কোন অবকাশ নাই।

তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, এতদিন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে মানুষ সৃষ্টি হয় নাই, এক ধরনের আমলাই কেবল সৃষ্টি হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলোকবর্তিকা পৌছাইয়া দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন, পল্লির জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার জন্য আমাদের শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময় গ্রাম অঞ্চলে গিয়া অতিবাহিত করা উচিত।

মুক্তিযুদ্ধকালে যেসব বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হইয়াছে তাদের কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্গবন্ধু গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকও জড়িত ছিলেন এবং এ ধরনের লোকদের কখনই ক্ষমা করা চলে না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, সান্ধ্য আইন জারি করিয়া বুদ্ধিজীবীদের তাঁহাদের বাড়ি হইতে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তারপর অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে তাঁহাদের খুন করা হইয়াছে।

মাটির পৃথিবীর বস্তুজগতে নামিয়া আসিয়া সাধারণ মানুষের জীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ করার জন্য জনতার নেতা বঙ্গবন্ধু সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান।

বাস্তবতার স্পর্শে যে সাহিত্য সমৃদ্ধ নয়, তা কৃত্রিম সাহিত্য। তেমন সাহিত্য সৃষ্টি করার দিন শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ছাত্ররাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করার জন্য বঙ্গবন্ধু শিক্ষক সমাজের প্রতি আহবান জানান। বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আমাকে ভুল বুঝিবেন না, আমি নিজে সুদীর্ঘকাল আন্দোলন ও সংগ্রামের পথ পার হইয়া আসিয়াছি বলিয়াই এমনভাবে কথা না বলিয়া পারিতেছি না।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, শুক্রবার, ৩১ মার্চ ১৯৭২

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান

দেশগড়ার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, ঢাকা, ৭ এপ্রিল ১৯৭২

জাতির জনক ও আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, বাংলার মাটি সোনার মাটি, বাংলার মানুষ সোনার মানুষ। ইহা হইতেই সোনার বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্বাধীনতা ও বিপ্লবোত্তর নূতন পরিবেশ ও পরিস্থিতির পটভূমিতে আহূত আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে গতকাল (শুক্রবার) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, অপরিমিত ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বিফল হইতে দেওয়া হইবে না।

যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে তাহার চেয়েও অধিক ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব লইয়া দেশগড়া ও মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্য আগাইয়া আসার জন্য বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তুমুল করতালি ও উল্লাসধ্বনির মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম দেশগড়ার সংগ্রাম, দেশবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম।

বিপ্লবোত্তর প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রায় ১৪ শত কাউন্সিলার, ২ হাজার ৬ শত ডেলিগেট ও বহুসংখ্যক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এতদুপলক্ষে কাকরাইলস্থ আওয়ামী লীগের নূতন অফিসের সম্মুখে বিরাট প্যাণ্ডেল তৈয়ার করা হয়। জাতীয়করণ, সামাজতান্ত্রিক আর্থনীতি ও দেশগড়ার কর্মসূচি ঘোষণার পটভূমিতে আহূত কাউন্সিল অধিবেশনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কালোবাজারী, দ্রব্যের উর্ধ্বগতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধবন্দি, আওয়ামী লীগ পুনর্গঠন ও অন্যান্য বিষয় বিস্তারিতভাবে খোলা মন লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহার বক্তৃতার মাঝে মাঝে তুমুল করতালি ও শ্লোগান উত্থিত হইতে থাকে।

সভার প্রারম্ভে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং স্বাধীনতার সংগ্রামে শহীদ ছাত্র, কর্মী, শ্রমিক, যুবক, নেতা ও কৃষকদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন ও ফাতেহা পাঠ করেন। পূবাহ্নে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদকের লিখিত রিপোর্ট পেশ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, এই সরকার আওয়ামী লীগের সরকার। ইহা সরকারের আওয়ামী লীগ নহে।

আওয়ামী লীগ প্রধান কর্মী-নেতা ও পরিষদ সদস্যদের সর্বপ্রকার লোভ ও লালসা ত্যাগ করিয়া দেশগড়া ও প্রতিষ্ঠানের কাজ করার উপদেশ দেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, প্রদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে হইবে। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য তিনি কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। দলীয় কর্মী ও নেতাদের আত্মকলহ ভুলিয়া গিয়া দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি উপদেশ দেন। কোন কোন পরিষদ সদস্যকেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সতর্ক করিয়া দেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তাঁহার সরকারের মূলনীতি ও স্তম্ভ হইল– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। এই নীতির ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালিত হইবে।

স্বাধীনতা সংগামে সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা দানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুজাফফর ন্যাপ, কংগ্রেস, শ্রমিক সংস্থা, ছাত্র সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও উহার নেতাদের ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

চোর-ডাকাত-রাজাকারদের ধরাইয়া দিন

চোর, ডাকাত ও রাজাকারদের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ইহাদের দমন করা হইবে। ইহাদের ধরাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি আওয়ামী লীগ কর্মী ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

পররাষ্ট্রনীতি

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, তাঁহার সরকারের পররাষ্ট্রনীতি হইল স্বাধীন, সক্রিয় নিরপেক্ষতা, সকলের সহিত বন্ধুত্ব, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ এবং যুদ্ধচুক্তি বিরোধী। বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সর্বদা সাহায্য করিবে বলিয়া বঙ্গবন্ধু জানান।

পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের বিষয় উল্লেখ করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আর তাহাদের আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন না। খুনি লুটেরা ও নারীধর্ষণকারী পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, তাহাদের বিচার করা হইবেই। বঙ্গবন্ধু জানান, তাহারা বাংলাদেশে যে জঘন্য ও অমানুষিক কাজ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের পাকিস্তানি বলিয়া দাবি না করার জন্য বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে পরামর্শ দেন। বিশ্ব আজ তাহাদের জঘন্য অপরাধের বিষয় জানিয়াছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, তাহার জন্য বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। ভুট্টো অনেক দূরে আছেন, তাই নিরাপদে আছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এবং ভারতের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর প্রতি উপদেশ দেন।

বাংলাদেশের সম্পদ এদেশের মানুষের সম্পদ

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিলার ও ডেলিগেটদের তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের সম্পদ এদেশের মানুষেরই সম্পদ। তিনি জানান, এদেশে কাহাকেও ১ শত বিঘার বেশি জমি রাখিতে দেওয়া হইবে না। এই সিদ্ধান্তের দরুন কাহাবো কাহারো অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, জনসাধারণের নিকট প্রদত্ত আওয়ামী লীগের সকল প্রতিশ্রুতি পালন করা হইবে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, জাতীয়তাবাদ আমাদের আদর্শ। তিনি বলেন, ইহা স্বাধীন আন্দোলনের মূলমন্ত্র এবং এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কেউ কেউ উহাকে চরম উগ্র জাতীয়তাবাদ বলিতে পারেন। কিন্তু আমাদের এই জাতীয়তাবোধ জিয়াইয়া রাখিতে হইবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক আরও বলেন, জাতীয়তাবোধ ছাড়া বিশ্বের কোন জাতিই স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে নাই।

"গণতন্ত্র আমরা দিবই"

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার সরকারের নীতির উল্লেখ করিয়া বলেন, আমরা মানুষকে গণতন্ত্র দিবই। তাঁহারা পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করিতে পারিবেন। শেখ মুজিবর রহমান জানান, গণতন্ত্রের অর্থ যা খুশি তাই করা নয়। তিনি আরও জানান, গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করিয়া কেহ যদি কোন বিদেশি রাষ্ট্রের এজেন্ট হিসাবে দেশের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন, তাঁহাকে সেই লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারে না।

প্রত্যেক ইউনিয়নে সমবায় দোকান খোলা হইবে

কালোবাজারী ও দ্রব্যের উচ্চমূল্যের উল্লেখ করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ইহারা দেশের মায়ায় জনগণের পাশে দাঁড়াইতে বা সাড়া দিতে পারে নাই। তিনি জানান, সরকার দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া ন্যায্যমূল্যের সমবায় দোকান খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত এইসব দোকান হইতে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে। বঙ্গবন্ধু বলেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস না করা হইলে সকল পাইকারি বিক্রেতার লাইসেন্স বাতিল করা হইবে।

দখল করা গাড়ি-বাড়ি ফেরত দিতে হইবে

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বে-আইনীভাবে দখল করা মোটর গাড়ি ও বাড়ির উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহা তাহাদের ফেরত দিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের জেলে যাইতে হইবে বলিয়া বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলারদের জানান ।

প্রত্যেক মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হইবে

আওয়ামী লীগ প্রধান কাউন্সিলারদের আরও জানান, প্রত্যেক মহকুমাকে ভবিষ্যতে জেলায় উন্নীত করা হইবে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন মহকুমাকে পুনর্গঠন করা হইবে।

আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করিতে হইবে।

দেশের আমলাতন্ত্রীদের সাবধান করিয়া জাতির পিতা বলেন, তাহাদের মানসিকতার পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি জানান, আমলাতন্ত্রীদের মনোভাব পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া মানসিকতা পরিবর্তন পূর্বক এদেশের মানুষের সেবক হিসাবে কাজ করিতে ব্যর্থ হইলে হুক্কার খোল-কলিকা সবই বদলাইতে হইবে।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, শনিবার, ৮ এপ্রিল ১৯৭২

বাংলাদেশ গণপরিষদের ঐতিহাসিক অধিবেশন শুরু

শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন

শাসনতন্ত্রে গণঅধিকার স্বীকৃত হবে : বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা

বাংলাদেশ গণপরিষদ, ঢাকা, ১০ এপ্রিল ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জন্যে একটি সত্যিকারের গণমুখী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে দলমত নির্বিশেষে সকলের সাথেই আলোচনা করা হবে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা হবে।

সোমবার (১০ এপ্রিল ১৯৭২) বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনাকালে তিনি বলেন, দেশে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, আর তার জন্যে এমন সংবিধান রচনা করতে চাই যাতে জনগণের অধিকার স্বীকৃত হবে এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকবে।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

স্বাধীনতা সংগ্রামের ৩০ লাখ শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, এঁদের রক্ত যাতে বৃথা না যায় তার জন্যে এঁদের কথা স্মরণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, যে চারটি আদর্শের জন্যে এই বীর শহীদেরা আত্মত্যাগ করেছেন, সেই চারটি আদর্শ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদই হবে আমাদের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি।

বঙ্গবন্ধু বলেন, এই ৩০ লাখ শহীদ তাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের দেশকে এই পরিষদে বসার সুযোগ দিয়ে গেছে। তিনি বলেন, এই শহীদদের মধ্যে কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ এমন কি সরকারি কর্মচারীরা পর্যন্ত রয়েছেন।

পাক সেনাদের বর্বরতা

বঙ্গবন্ধু প্রায় ২০ মিনিট বক্তৃতা করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর হামলার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্বর ইয়াহিয়ার কাপুরুষ খান সেনারা অতর্কিতে এ দেশের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করেছিল। তারা এমনকি মায়েরকোলের শিশুদের পর্যন্ত রেহাই দেয় নি।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশে বর্বর খান সেনারা যে পাশবিক ও নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে তা নজিরবিহীন। তিনি বলেন, এমন সব ইতিহাস আমাদের হাতে এসেছে যাতে রীতিমত শিউরে উঠতে হয়। একজন পাকিস্তানি জেনারেল সবুজ বাংলাদেশকে লাল করে দিতে বলেছিল।

ব্যাপক ধ্বংসের নির্দেশ

এমন দলিলও হাতে এসেছে যাতে দেখা গেছে পাকিস্তানি সৈন্যদের এ দেশে বেপরোয়া হত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, যুদ্ধ ঘোষণার যে সব প্রচলিত রীতি আছে ইয়াহিয়া সেগুলিও মানে নি। কোনরকম হুঁশিয়ারি দেবারও তারা প্রয়োজন মনে করে নি। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

স্বাধীনতা ঘোষণার নির্দেশ

বঙ্গবন্ধু বলেন, হানাদারদের ঝাঁপিয়ে পড়ার খবর পেয়েই তিনি চট্টগ্রামে দলীয় বন্ধুদের কাছে টেলিফোন করে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাটে-বাজারে, শহরে-

বন্দরে সর্বত্র হানাদারদের প্রতিরোধের জন্যে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তিনি এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি যদি বেঁচে নাও থাকেন তবুও বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। স্বাধীনতার ঘোষণা সর্বত্র প্রাচারিত না হলে সবখান থেকেই একযোগে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হতে পারত না বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ দেশের মানুষ এই দুর্যোগ ও দুঃসময়কে যেভাবে মোকাবিলা করেছে তার জন্যে তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান।

পরিষদের দায়িত্ব

পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, এত রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে যে গণপরিষদে আজ আমরা মিলিত হয়েছি সে পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। দেশের জন্যে একটি শাসনতন্ত্র ও ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে এই পরিষদকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

যাঁদের স্মরণ করি

শোক প্রস্তাবের ওপর বক্তৃতার এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মরহুম শের-এ বাংলা এ কে ফজলুল হক, মরহুম তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তিনি বলেন, এঁরা ছিলেন গণতন্ত্রের পূজারী এবং গণতন্ত্রের জন্যেই জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সাল থেকে সংগ্রাম করে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের সবারই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, সঠিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এই ইতিহাস সঠিকভাবে লেখা না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এসব কথা কোনদিনই জানতে পারবে না।

বাংলাদেশ কলোনিতে পরিণত হয়েছিল

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর যে স্বাধীনতা এসেছিল তাতে পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি থাকা সত্ত্বেও তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল এবং বাংলাদেশকে একটি কলোনিতে পরিণত করা হয়েছিল। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নেতারা এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং ধাপে ধাপে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

শোক প্রস্তাব

পরিষদের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিষদে শোক প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে তিনি বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর পরলোকগত ও পাকবাহিনীর হাতে নিহত পরিষদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

প্রস্তাবে তিনি পরলোকগত দশজন সদস্যের নাম উল্লেখ করেন। এঁদের মধ্যে আট জন বর্বর পাকবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন। এঁরা হচ্ছেন যশোরের জনাব মশিউর রহমান, রংপুরের ডা. জিকরুল হক, পাবনার জনাব আমিনউদ্দিন ও জনাব আমজাদ হোসেন, সিলেটের জনাব আবদুল হক, নোয়াখালীর জনাব এফ কে সফদর, রাজশাহীর জনাব নজমুল হক সরকার ও যশোরের জনাব আতর আলী। অপর দুজন চট্টগ্রামের জনাব এম এ আজীজ নির্বাচনের কিছুদিন পরই ইন্তেকাল করেন এবং পাবনার জনাব আহমদ রফিক আততায়ীর হাতে নিহত হন।

বঙ্গবন্ধুর পেশ করা এই শোক প্রস্তাবটি পরিষদে গৃহীত হয় এবং শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে এক মিনিট নীরবতা পালন ও তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতি সমর্থন প্রস্তাব

এরপর পরিষদের সহকারী নেতা শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতি সমর্থন সূচক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন।

এই প্রস্তাবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, ছাত্র, যুবক, সাবেক ইপিআর, পুলিশ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগরে যা সমর্থিত ও অনুমোদিত হয় এই পরিষদ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে। প্রস্তাবে বলা হয়, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তিতে এই পরিষদ একটি উপযুক্ত সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করছে।

বন্ধু রাষ্ট্রগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্যে বন্ধু রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল ১৯৭২

বাংলাদেশে ঘোড়দৌড় থাকবে না : বঙ্গবন্ধু

ঢাকা, ১৬ এপ্রিল ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, ঘোড়দৌড় ও মদ খাওয়া জাতি ও দেশের কোন কল্যাণ সাধন করে না, এ কারণে বাংলাদেশে এ সব চলবে না।

প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সম্মুখে ঢাকা ঘোড়দৌড় শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, তথাকথিত ইসলামী শাসনামলে পাকিস্তানে উপনিবেশবাদীরা ঘোড়দৌড় ও মদ খাওয়া চরমভাবে চালিয়ে গেছে এবং এই সব দুষ্কর্ম অগণিত পরিবারে অশান্তি ডেকে এনেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ওই সব অপকর্ম চলতে দেওয়া হবে না বলে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন।

ঢাকা ঘোড়দৌড় শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা তাদের দাবি-দাওয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করলে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, তাদেরকে কল, কারখানা ও পার্কে বিভিন্ন ধরনের চাকরিতে নিয়োগ করে তাদের বেকারত্ব দূর করা হবে। দেশে চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার সম্ভাব্য সব রকম পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন।

সূত্র : *সংবাদ*, সোমবার, ১৭ এপ্রিল ১৯৭২

ঢাকায় নবী দিবসের অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশে ধর্মের নামে শোষণ চলিবে না

বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ২৭এপ্রিল ১৯৭২

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় বলেন, মহান ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.) সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। সত্য-নিষ্ঠার জন্যই তিনি আল আমীন নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, মহানবীর জীবনাদর্শ ও মহান শিক্ষা বিশ্বের মানুষের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

গত বৃহস্পতিবার (২৭ এপ্রিল ১৯৭২) বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপরোক্ত উক্তি করেন।

বঙ্গবন্ধু মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ ও মহান শিক্ষা অনুসরণ করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ জন লোক মুসলমান। তাহাদের ধর্মচর্চার ব্যাপারে কোন বাধানিষেধ নাই। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সহিত বলেন, বাংলাদেশে কাহাকেও ধর্মের নামে রাজনীতি, ব্যবসায়, সম্পদ অর্জন ও জনসাধারণকে শোষণ করিতে দেওয়া হইবে না।

প্রধানমন্ত্রী সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, কেহ সেই পুরাতন ধর্মীয় খেলা শুরু করিলে তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে না। মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

রাষ্ট্রীয়নীতির উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমান সরকারের নীতি। তিনি আরও বলেন, ইহার অর্থ এই নয় যে, কাহাকেও ধর্মীয় চর্চা করিতে দেওয়া হইবে না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা ইসলামের নীতি নহে। কোরান ও হাদিস হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার এই যুক্তি প্রমাণ করেন।

আলোচনায় বিশিষ্ট মাওলানাসহ বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বলেন, মহানবীর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ অনুসরণ করিলে জাতি ইহার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিতে সক্ষম হইবে। মহানবীর লক্ষ্য ছিল শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করা।

বঙ্গবন্ধু জানান, মহানবী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসিতেন এবং ধর্মের নামে সকল শোষণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য উপদেশ দিতেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতিপয় ঘটনা ও বদরযুদ্ধের উদ্ধৃতিদান করিয়া বলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য মহানবী অমুসলমানসহ মদিনা বাসীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তাই, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে অনৈসলামিক কিছু আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

শেখ মুজিবুর রহমান বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ, নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলেন, ইহারা ইসলামের নামে যে অত্যাচার, নৃশংসতা, হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতা চালাইয়াছে, বিশ্ব-মানবতার ইতিহাসে ইহার কোন নজির নাই। তাহারা কি করিয়া নিজেদের মুসলমান বলিয়া দাবি করে তাহা তিনি ভাবিয়া পান না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, ইসলাম কখনই ধর্ষণ ও গণহত্যা অনুমোদন করে নাই। বর্বর পাকিস্তানিরা ২ মাসের শিশুকেও নির্মমভাবে হত্যা করিতে ছাড়ে নাই। প্রধানমন্ত্রী জানান যে, পাকিস্তানি পশু ও বর্বররা বাংলাদেশে কমপক্ষে ২ লক্ষ মহিলার ইজ্জতহানি করিয়াছে। তাহাদের নিন্দা করার কোন ভাষা নাই।

প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র। ইন্দোনেশিয়া বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং ইহারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করিয়াছে।

তিনি জানান, সৌদী আরব মহানবীর জন্মভূমি। সেখানে বহু বাঙালি মুসলমান অবস্থান করিতেছেন। তিনি বাঙালিদের দেশে পাঠাইবার জন্য সৌদী আরব সরকারের প্রতি আবেদন জানান। সৌদী আরব সরকার তাহাদের পাকিস্তানে পাঠাইতেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি ভাবিয়া পান না, কি করিয়া সৌদী আরব সরকার ইহা করিতেছেন।

পাক সৈন্যদের কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না

সামরিক বিভাগের কর্মচারীসহ পাকিস্তানে আটক সমস্ত বাঙালি অবশ্যই দেশে ফিরিয়া আসিবে। গত বৃহস্পতিবার সিরাতুননবী জলসায় ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কথা বলেন। ভুট্টোকে সতর্ক করিয়া তিনি বলেন, নিরীহ বাঙালিদিগকে আটকাইয়া রাখিবার কোন অধিকার তাহার নাই। দৃঢ়আশা পোষণ করিয়া তিনি বলেন, "ইনশাল্লাহ আমার লোক ফিরিয়া আসিবে।"

পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে যে জঘন্যতম অপরাধ করিয়াছে বাঙালি সেনাবাহিনীর লোক ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারী সেইখানে তেমন কিছুই অপরাধ করে নাই। তবু কেন বাঙালিদিগকে আটক রাখা হইল, কেনইবা তাহাদিগকে দেশে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না? তার সঠিক জবাব দিবার জন্য বঙ্গবন্ধু ভুট্টোকে প্রশ্ন করেন। হতভাগ্য বাঙালিদের দেশে ফিরাইয়া আনিতে ভারত সরকার পরিবহনের সুযোগ দিতে পর্যন্ত রাজি হইয়াছিলেন, কিন্তু তবু পাক সরকার তাহাতে রাজি হয় নাই।

বাংলার মাটিতে যাহারা বর্বর হামলা চালাইয়াছিল, বাঙালিদিগকে সেই নরপশুদের সহিত তুলনা করিয়া পাকিস্তানে আটক রাখা হইয়াছে বলিয়া বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধু সুনিশ্চিত করিয়া বলেন যে, বাঙালিরা ফিরিয়া আসিবে। তিনি বলেন, মনুষ্য-কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্বর পাক সৈন্যদের ফিরাইয়া নিবার দাবি ভুট্টো কিছুতেই করিতে পারে না; কারণ, এরা এত জঘন্য অপরাধে অপরাধী যে, তাহাদেরকে মানবসন্তান বলিয়া ধারণা করা যায় না। একটি ১২/১৩ বৎসরের বালিকার উপর কিরূপে ৩ মাস ধরিয়া জনৈক ক্যাপ্টেন ও তাহার ২৫জন সহগামী ঢাকা সেনানিবাসে দৈহিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, তার এক করুণ বর্ণনা দিয়া তিনি বলেন, এই নর পশুদের কি ক্ষমা করা যায়? তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, এই ধরনের বহু হতভাগ্য মেয়ের সর্বনাশ ঘটাইয়াছে তথাকথিত ইসলামদরদী দল– জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রসংঘ, আল-বদর প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকের দল। -বাসস

সূত্র : ইত্তেফাক, শনিবার, ২৯ এপ্রিল ১৯৭২

শ্রমিকের নয়া ভূমিকা নিতে হবে

নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য এডহক রিলিফ মে দিবসে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা

ঢাকা, ১ মে ১৯৭২

জাতির উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক মে দিবসে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত বেতার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

স্বাধীন বাংলার মুক্ত মাটিতে এবারই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলার মেহনতি মানুষ শৃঙ্খলামুক্ত পরিবেশে এই দিনটিকে শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করার অধিকার অর্জন করেছে, এজন্য দেশ ও জাতি আজ গর্বিত। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার

আদায়ের এক জলন্ত প্রতীক। সারাবিশ্বের শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের জন্য আজকের এ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার মেহনতি মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জুলুম এবং ঔপনিবেশিক জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখে গেলেন, তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন ভুলবে না। তাঁরা আর কোনদিন আমাদের কাছে কোন দাবি-দাওয়া নিয়ে আসবেন না। কিন্তু এই লাখো লাখো শহীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এদেশের ইতিহাসে। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মানুষ দেশ গড়ার সংগামে তাঁদের কাছ থেকে পাবে প্রেরণা। তাই, আজকের এই মহান দিনে আমার দেশের শ্রমজীবী মানুষদেরকে আমি শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকায় নেমে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমার প্রাণ প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা অতীতে বারবার আমার ডাকে সাড়া দিয়ে নির্ভীক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমার বিশ্বাস, এবারও আপনারা আমার আহ্বানে মনে-প্রাণে এগিয়ে আসবেন। অতীতে আমরা একটি মর্মান্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। গুটি কয়েক সুবিধাবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জাতীয় সম্পদ ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। দেশ আজ স্বাধীন। সম্পদের মালিক জনগণ। তাই, কোন শ্রেণীবিশেষের ভোগ লালসার জন্য এবং লোভ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এই সম্পদকে অপচয় করতে দেওয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক-শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করা হবে। যদিও বাধা অনেক, সমস্যার শেষ নেই। তবুও লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন, আমাদের বর্তমান জাতীয় উৎপাদন সাড়ে সাত কোটি দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। শত শত বছর ধরে আমরা একটা নিকৃষ্ট উপনিবেশ এবং বিদেশিদের বাজার হিসেবে লুণ্ঠিত হয়েছি। বিদেশিরা দেশের অর্থনীতিকে জনগণের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলেনি। এর পরে ইয়াহিয়ার বর্বর সৈন্যরা আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এ দেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাব মোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমত আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদককে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ষোল কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষিদের দশ কোটি টাকার তাকাভি ঋণ, এক লাখ নব্বই হাজার টন সার, দুলাখ মন বীজ ধান দেওয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত স্কুলঘর পুনর্নির্মাণ ও ছাত্র শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য প্রায় দশকোটি টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুক্তিসংগ্রামের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৭টি রেল সেতুর মধ্যে ২৬২টির এবং ২৭৪টি সড়ক সেতুর মধ্যে ১৭০টির মেরামতের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ করা হয়েছে। বাকিগুলোর কাজ বর্ষার আগে শেষ করার জন্য আমাদের ইঞ্জিনিয়ার অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ব্যাংক, বীমা এবং শিল্প ব্যবসায়ে চরম অরাজকতা বিরাজ করছিল। কারখানার উৎপাদন প্রায় থেমে গিয়েছিল। দক্ষ পরিচালকের অভাব, খুচরা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের টানাটানি শিল্প-জীবনে নিশ্চলতা এনে দিয়েছিল। শূন্য হাতে সরকার ব্যাংক, বীমা, পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা এবং শিল্পকারখানাগুলোকে সক্রিয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতীতে কতিপয়

সুবিধাভোগী দেশের সমুদয় সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করত। বর্তমান ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকেরা উপকৃত হবেন। এ জন্যই সরকারের উপর অত্যন্ত গুরুভার সত্ত্বেও আমরা চলতি বৎসরের ছাব্বিশে মার্চ আমাদের অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন ব্যাংক, বীমা, সমগ্র পাট, বস্ত্র এবং চিনি শিল্প, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যসহ শিল্প-কারখানার একটা বিরাট অংশ জাতীয়করণ করেছি। পুরাতন পুঁজিবাদীর পদ্ধতির স্থলে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি কায়েমের পথে এটা একটা সুস্পষ্ট দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে গড়ে তোলার কাজ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। এখানেই শ্রমজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এই নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমে শ্রমিকদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হলে, তাদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। আমরা এখন আর পুঁজিপতি প্রভুদের ভোগের জন্য সম্পদ উৎপাদন করতে যাচ্ছি না। এখন যা উৎপাদন হবে তা শ্রমিক-কৃষক এবং বাংলাদেশের সব মানুষের কল্যাণে লাগবে। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এই লক্ষ্য অর্জনে বাধা এবং জাতীয়করণ কর্মসূচির কাফেলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়। শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে এক যোগে কাজ করে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এটা করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গীর ও আচরণের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। তাঁদের অবশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, শিল্পোৎপাদনের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষি ভাইদের ভোগ করতে দিতে হবে। সুতরাং, জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল দাবি-দাওয়া পেশের মনোভাব ত্যাগ করা দরকার। এক কথায়, সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা সম্ভব নয়।

বন্ধুগণ,

শ্রমিকরা যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য আমি ইতোমধ্যেই শ্রমিক নেতাদের সাথে শিল্পকারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি স্কিম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছি। নতুন ভূমিকা পালনের জন্য শ্রমিকদের যেমন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হচ্ছে তেমনি সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য সরকারি কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, সরকারের উচ্চ ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা কমিয়ে আনার জন্য বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করার উদ্দেশ্যে একটি "জাতীয় বেতন কমিশন" গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি চাকরির এই নয়া কাঠামোতে কর্মচারীরা জাতীয় পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে জনসাধারণ যে সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেকারত্ব ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের দুর্মূল্য আমদেরকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছি এবং পরিকল্পিত উপায়ে এ সমস্যার মোকাবিলার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি।

জনগণের জানা আছে, আমদানি কমে যাওয়ায় এবং উৎপাদন ব্যহত হওয়ায় বাজারে জিনিসপত্রের অভাব হয়েছে। যুদ্ধে বন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কারখানাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিছু সংখ্যক এজেন্ট, অসৎ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারীরা পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করে বেশ খানিকটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্ট করেছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে খাদ্যশস্যের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে প্রায় দুলক্ষ চল্লিশ হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। মে মাস নাগাদ আরো তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার টন খাদ্যশস্য আসছে। আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র

ভারত সাড়ে সাত লক্ষ টন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য ও বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ আমাদের প্রায় সাত লক্ষ টন খাদ্যশস্য দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। এর ফলে খাদ্যশস্যের দাম ক্রমান্বয়ে কমে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। খাবার তেল, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই জিনিসপত্রের দাম আরো কমে যাবে।

আমার ভাই ও বোনেরা,

আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বন্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতোমধ্যে বেসরকারি ডিলার-এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স, পারমিট বাতিল করে দেওয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে নায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বন্টনের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক সুযোগে যুক্তিহীন মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার সাথে সাথে কম বেতনের লোকদের জন্য আমরা কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করছি। আপনারা জানেন, জিনিসপত্রের দাম না কমিয়ে কেবল বেতন বাড়িয়ে দিলেই জনসাধারণের অসুবিধা দূর হয় না। কাজেই মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা ইতিপূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছি। সেই সাথে আমরা মনে করি, এই দুর্মূল্যের বাজারে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত নিম্ন আয়ের মানুষদের কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়া দরকার। আপনাদের সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেশের গরিব সরকারি কর্মচারীদের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। স্বায়ত্তশাসিত ও অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, জাতীয় রক্ষী বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, দেশরক্ষা বাহিনী, রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকার পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও শ্রমিকরা এই বাড়তি সাহায্য পাবেন। আজ থেকে এটা কার্যকরী হবে এবং আগামী পহেলা জুনের বেতনের সাথে আপনারা এই বাড়তি টাকা পেয়ে যাবেন। যে সকল সরকারি কর্মচারী প্রতি মাসে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত মূল বেতন পান তাঁদের সাময়িক ভিত্তিতে সরকার এই হারে সাহায্যদান মঞ্জুর করেছে :

১. মাসিক বেতন ১২৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ২৫ টাকা।

২. মাসিক বেতন ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ২০ টাকা। এই শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন।

৩. মাসিক বেতন ২২৬ টাকা থেকে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ১৫ টাকা :

ক. এই শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন।

খ. যে সকল কর্মচারী মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাঁদের জন্য মার্জিনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হবে।

যে সকল বেসামরিক কর্মচারী প্রতিরক্ষা বরাদ্দ হতে বেতন পান বা যাঁরা ওয়ার্ক চার্জড এবং কনটিনজেন্ট কর্মচারী, তাদের বেলায়ও এই আদেশ প্রযোজ্য হবে। এই সাময়িক সুবিধার কোন অংশই বেতন হিসেবে গণ্য হবে না।

যে সকল শ্রমিক সরকারি মালিকানাধীন করপোরেশন, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি তত্ত্বাবধানের অধীন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছেন ও মাসে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন, তাঁদের সাময়িক ভিত্তিতে এই হারে সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে :

১. মাসিক মজুরি ১২৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ২৫ টকা।

২. মাসিক মজুরি ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ২০ টাকা। এই শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন।

৩. মাসিক মজুরি ২২৫ টাকা থেকে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত–মাসিক ১৫ টাকা :

ক. এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন।

খ. যে সকল ব্যক্তি মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত মজুরি পান, তাঁদের জন্য মার্জিনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হবে।

এ সুবিধা স্থায়ী, অস্থায়ী, বদলি ও ওয়ার্ক চার্জড শ্রমিকরাও পাবেন। সরকারের মালিকানাধীন বা তত্ত্বাবধানাধীন চা বাগানের শ্রমিকরা এই হারে এসব সাময়িক সুবিধা ভোগ করবেন :

ক. দুই সদস্যবিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ২০ টাকা পাবেন।

খ. এক সদস্যবিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ১০ টাকা পাবেন।

আমার দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আমি বিশ্বাস করি, এ পদক্ষেপগুলো আপনাদের দুর্দশার কিছুটা লাঘব করবে। অবশ্য জনগণের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃত মান উন্নয়ন এ বেতন বৃদ্ধির উপর কোনক্রমেই নির্ভরশীল নয়। সেটা তখনি সম্ভব হয়ে উঠবে, যখন আমাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত এবং কারখানাগুলো পুরোমাত্রায় চালু হবে। আমরা এ পর্যন্ত কোন নতুন কর, খাজনা ধার্য করি নি। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, আপনাদের এ বেতন বাড়াবার জন্য সরকারের প্রতিবছর অতিরিক্ত ৩০ থেকে ৩৫ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। কৃষকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে সুবিধা দেবার জন্য ইতিপূর্বে প্রায় ৭০ কোটি টাকার বকেয়া সুদ-খাজনা ও কর মাফ করে দেওয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা এই ঘাটতি পূরণ করতে পারি।

আমার গরিব শ্রমিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উপযোগী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন। আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সফল হবো। আজকের এ মে দিবসে আসুন, আমরা এই শপথ গ্রহণ করি যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য আমরা অবিরাম সংগ্রাম করে যাব। এ দেশের চাষি, তাঁতী, কামার-কুমার, শ্রমিক ও মজলুম জনতার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাজ করব। আমার পার্টির সহকর্মীগণ এবং সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ যে, দুঃখের মধ্য দিয়ে আপনাদের দিন কাটছে। ঘরে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথা গুঁজবার জন্য নেই এতটুকু ঠাঁই। ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা আপনাদের সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে গেছে। তবে আপনারা সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে, এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করব।

ইতোমধ্যে কিছুসংখ্যক বিদেশি এজেন্ট ও দুষ্কৃতিকারী স্বার্থান্বেষী মহল মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ নিয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করছে। এদের অতীতের কার্যকলাপ আপনারা জানেন। আমার অনুরোধ আপনারা এই সম্রাজ্যবাদী দালালদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। কিছু কিছু দুষ্কৃতিকারী জায়গায় জায়গায় শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করেছে। আপনারা তাদের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখবেন। সরকার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ভায়েরা আমার,

আমি আপনাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেব না। আপনারা জানেন, আমি একবার কোন অঙ্গীকার করলে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও সেটা পালন করতে চেষ্টা করি। আমি বিগত দিনে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলো পালনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি আলাদিনের আশ্চার্য প্রদীপ হাতে নিয়ে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করি নি যে, রাতারাতি সবকিছু ঠিকঠাক করে দেব। সমৃদ্ধির পথে কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা আমার নেই। শতাব্দীর শোষণের পুঞ্জীভূত সমস্যা আমাদের সামনে জড়ো হয়ে রয়েছে। এগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম ও আরও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তা হলেই আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ভিত্তি গড়ে যেতে পারব। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে সেখানে বসবাস করতে পারবে। খোদা আমাদের সহায় আছেন। জয় বাংলা

সূত্র : সংবাদ, বুধবার, ৩ মে ১৯৭২

ভারত ও সোভিয়েত বিরোধীরা হুঁশিয়ার

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু : অতি প্রতিক্রিয়াশীল ও অতি প্রগতিশীলরা একযোগে চলছে– একই প্লাটফরম থেকে সমাজতন্ত্রের স্লোগান ও সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দেওয়া হচ্ছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৬ মে ১৯৭২

১৯৭২ সালের ৬ মে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ 'ডাকসু'র আজীবন সদস্যপদ প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ :

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যারা অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি প্রদান করে বলেন যে, কিছু কিছু লোক সাম্রাজ্যবাদের টাকা খেয়ে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শনিবার (৬ মে ১৯৭২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ কর্তৃক তাঁকে (বঙ্গবন্ধুকে) আজীবন সদস্যপদ প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন যে, অতি প্রতিক্রিয়াশীল ও অতি প্রগতিশীল চক্র একসাথে মিলে গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। একই প্লাটফরম থেকে সমাজতন্ত্রের জন্য স্লোগান ও সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যারা সাম্রাজ্যবাদের পয়সা খেয়ে গোলমাল করছে তাদের উৎখাত করার জন্য প্রয়োজন হলে আমি আবার ৭ই মার্চের মতো ডাক দেব।"

তিনি বলেন, "বাংলার মাটিতে সাম্রাজ্যবাদের দাবা খেলা চলতে দেওয়া হবে না।"

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাকসুর সভাপতি ও উপাচার্য ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে মানপত্র পাঠ করেন ও বক্তৃতা করেন ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন।

ভারত ও সোভিয়েত বন্ধুত্ব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সাহায্য করেছে তা ভুলে গেলে চলবে না। ভারত এক কোটি ছিন্নমূল মানুষকে আহার ও আশ্রয় দিয়ে যে সাহায্য করছে তার নজির ইতিহাসে নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বাধীনতার চরম মুহূর্তে যদি তিনবার ভেটো প্রদান না করত তা হলে ঢাকার ও বাংলাদেশের জনগণকে এখনও 'দুঃস্বপ্নের' মধ্যে বাস করতে হতো। বর্তমানে কিছু সংখ্যক লোকের ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে অপপ্রচার একটা ফ্যাসনে দাঁড়িয়েছে। কিছু সরকারি আমলাও এসব লোকের সাথে জড়িত আছে ।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের যে সকল রাষ্ট্র ও জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কৃষক রাজ-শ্রমিক রাজ

যারা নিজেদের কৃষক রাজ-শ্রমিক রাজের দাবিদার বলে প্রচার করেন তারা আমাদের দেশে গণহত্যার সময় শত্রুকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে।

তারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে পারে না।

রাতারাতি হয় না

রাতারাতি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সমাজতন্ত্রের বিরোধী ঘাঁটিকে ধ্বংস করে দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে আগাতে হয়।

শোষকের যন্ত্র কেড়ে নিয়েছি

শোষকের যন্ত্র আমরা কেড়ে নিয়েছি। শোষণের চাবিকাঠি বন্ধ করে দিয়েছি। এখন থেকে সকল কলকারখানা জনগণের সম্পদ।

হতাশ হয়ে পড়েছে

যারা মনে করেছিলেন স্বাধীনতার পরে আদমজির মিল আর ব্যাংকের মালিক হবেন, তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন।

গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি

আমি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। গণতন্ত্র সামাজতন্ত্রের পাশে থাকবে।

পৃথক পতাকা

গণতন্ত্র মানে যা খুশি তা করা নয়, যা খুশি তা কাগজে লেখা নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, লুটতরাজ করা নয়।

কোন নেতা গণতন্ত্রের সুযোগে পৃথক পতাকা উড়ানোর কথা বলছে।

জনগণ প্রতিহত করবে

৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে যে পতাকা উড়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু করলে জনগণ তা প্রতিহত করবে।

আইন-শৃঙ্খলা

প্রধানমন্ত্রী দেশের আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, দু-একটা ছোটখাট ঘটনা ছাড়া দেশের অবস্থা অত্যন্ত স্বাভাবিক। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীর কোন দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসে নি।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পর স্বাভাবিক অবস্থা আসতে ৫ বছর সময় লেগেছিল।

শ্রমিকদের প্রতি

প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সমাজতন্ত্রের পথ সুগম করার আহ্বান জানান।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার দর কষাকষির স্থান নেই। সকল কলকারখানার মালিক শ্রমিক শ্রেণী ও দেশের জনগণ।

ছাত্রদের প্রতি

বঙ্গবন্ধু লেখাপড়ায় মন দেওয়ার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আবেদন জানান।

দখলদার বাহিনী আমাদের বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞদের খতম করে দিয়েছে। ছাত্র সমাজকে তাড়াতাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে সে অভাব পূরণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলার ও আদব কায়দার দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানান।

দাবি-দাওয়া

ছাত্রদের দাবি-দাওয়া ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তিনি অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ আছেন।

"আমি দেশের বর্তমান অবস্থায় কিছু দেওয়ার ওয়াদা করতে পারব না। আমি বলেছি ৩ বছর কিছু দিতে পারব না এবং জনগণ তা মেনে নিয়েছে।"

আমার ক্ষমতা হলে আমি দাবি-দাওয়া ছাড়াই সবকিছু দেব।

তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকার ইতোমধ্যে ১০০ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফ ও তাকাভি ঋণ দিয়েছে, ৩৫ কোটি টাকা কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেছে ও ৭০ কোটি টাকার খাজনা ও কর মওকুফ করেছেন।

স্বাধীনতার ইতিহাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এ সংগ্রাম বহু দিন থেকেই শুরু হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা বিগত সংগ্রামে রূপায়িত হয়েছে।

তিনি বলেন যে, জাতীয়তাবাদই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল উৎস।

ইসলামের নামে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিগত ২৫ বছরের শোষণের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইসলামের নামে তারা নিরীহ জনগণ ও মা বোনদের ওপর যে অত্যাচার করেছে বিশ্বে তার নজির নেই।

উপাচার্য্য

উপাচার্য ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের আজীবন সদস্যপদ গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শুরুতে বঙ্গবন্ধুকে বরণ করে নেওয়া উপলক্ষে মানপত্র পাঠ করেন ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন।

তারপর বঙ্গবন্ধু আজীবন সদস্যপদ বই-এ স্বাক্ষর প্রদান করেন।

সূত্র : সংবাদ, রবিবার, ৭ মে ১৯৭২

সিলেটের বন্যার্তদের জন্য আরো ৩০ লাখ টাকা মঞ্জুর : প্রধানমন্ত্রীর উপদ্রুত এলাকা পরিদের্শন

বন্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে : বঙ্গবন্ধু

সিলেট, ২৭ জুন ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুনামগঞ্জে এক বিরাট জনসভায় বলেছেন, চিরস্থায়ীভাবে বন্যা সমস্যার সমাধান করা হবে। কারণ, এ সমস্যার সমাধানের উপর জাতির প্রগতি নির্ভর করে। ২৪ বছরে পাকিস্তানিরা শুধু শোষণই করেছে। বন্যানিয়ন্ত্রণের কোন ফলপ্রসূ কর্মসূচি নেয় নি।

বঙ্গবন্ধু মঙ্গলবার হেলিকপ্টারযোগে সাত ঘন্টা ধরে সিলেট জেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন। গত সপ্তাহের এই বন্যায় ৫০ ব্যক্তির প্রাণহানী, ৯ জন নিখোঁজ এবং ২২টি থানার ১৮৭টি ইউনিয়নের ক্ষেতের ফসল ও ঘর বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। বাসস এ খবর দিয়েছে।

প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করে বঙ্গবন্ধু ত্রাণ ও সাহায্য বাবদ নতুন করে অতিরিক্ত ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছেন। প্রয়োজনবোধে আরো সাহায্য দেওয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন।

কপ্টারযোগে দুর্গত এলাকা পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধুর সাথে মন্ত্রিসভার দুজন সদস্য জনাব আবদুস সামাদ ও জেনারেল এমএজি ওসমানী, রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ এবং আওয়ামী লীগ সেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান জনাব আবদুর রাজ্জাকও ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সুনামগঞ্জ, কানাইঘাট, মৌলবীবাজার এবং হবিগঞ্জের জনসভাতেও বক্তৃতা করেন।

তিনি সিলেটে হযরত শাহ জালালের মাজার জিয়ারত করেন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতদের রুহের মাফফেরাত কামনা করেন।

এসব জনসভায় বঙ্গবন্ধু জনগণকে কঠোর পরিশ্রমের, সম্মিলিতভাবে কৃষি বিপ্লব সাধনের এবং সব ধরনের দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যেভাবে আপনারা খানসেনাদের প্রতিরোধ করেছিলেন। সেই একই উদ্যম নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজবিরোধীদেরও মোকাবিলা করুন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বন্যাদুর্গত মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য সরকার সাধ্যমত কাজ করবে। তিনি বলেন, সরকার ত্রাণ বাবদ এ পর্যন্ত ১০৭ কোটি টাকা খরচ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, একটা ধ্বংসের চেহারা নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সরকার অনেকগুলো বিপ্লবী ব্যবস্থা নিয়েছেন। খাজনা মওকুফ করেছেন। বেতন বাড়িয়েছেন। এখন দেশের অর্থনীতির সংকট কাটানোর জন্য সবারই কঠোর পরিশ্রম করা উচিত।

বঙ্গবন্ধু বলেন, প্রতি বছরই বন্যা আসে। এটাই পাকিস্তানি শোষণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমস্যাটিকে মারাত্মকভাবে অবহেলা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি কার্যকর বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়াস নেওয়া হবে। অর্থাভাব এবং জনগণকে অনাহার থেকে রক্ষার জন্য আশু খরচের দরুণ বন্যানিয়ন্ত্রণে সময় নেবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসনে বন্যা সমস্যার সমাধানের কোন ফলপ্রসূ কর্মসূচি নেওয়া হয় নি। এখন চিরস্থায়ীভাবে বন্যা সমস্যার সমাধান করা হবে।

যুবসমাজের প্রতি

তিনি যুবসমাজকে লেখাপড়ায় মনোনিবেশের মাধ্যমে আগামী দিনের জন্য নিজেদের গড়ে তোলার আহবান জানান। তিনি তাদের শ্লোগান চর্চা থেকে বিরত হতে বলেন। ছুটির সময় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে হতভাগ্য নিরক্ষর মানুষকে জ্ঞানের আলো দানের জন্য তিনি তাদের উপদেশ দেন।

শোষকের স্থান নেই

সুনামগঞ্জের জনসভায় বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা হবে নিরর্থক।

তিনি বলেন, শোষক ও সমাজবিরোধীদের স্থান বাংলাদেশে নেই। সব ধরনের নির্যাতন, অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। যারা এগুলো বহাল রাখতে চাইবে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, কিছু লোক বন্ধুদেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে ফাটল ধরানোর জন্য প্রচার চালাচ্ছে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে এসব প্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশে ভারতের সাহায্যের বর্ননা দেন। তিনি বলেন, এই সাহায্য না পেলে আমাদের কি হতো সে কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না।

কানাইঘাট

কানাইঘাটের জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, কৃষক না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। জনগণ ক্ষেতে খামারে কলে-কারখানায় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কাজ করবে বলে তিনি আশা করেন।

মৌলবীবাজার

মৌলবীবাজারে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশ টিকে থাকবে। কোন শক্তি বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে পারবে না। কারণ, বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা এসেছে, তিনি চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ ব্যাখ্যা করেন।

হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আরো কয়েক বছর কষ্ট করার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। এর কারণ ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর ধ্বংসলীলা এত ব্যাপক ও ভয়াবহ যে, এর কবল থেকে মুক্ত হতে সময় নেবে।

বৃষ্টিতে ভিজে

তাদের প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য সেই শেষ রাত থেকে সিলেটের মানুষ বৃষ্টিতে ভিজে কর্দমাক্ত মাঠের মধ্যে অপেক্ষা করছিল। স্বাধীনতার পর সিলেটে বঙ্গবন্ধুর এটাই ছিল প্রথম সফর। তারা যে ধ্বংসাত্মক বন্যাকে সাহসের সাথেই গ্রহণ করেছে তার প্রমাণ যে তারা বঙ্গবন্ধুর কাছে কোন দাবি করে নি। তারা তাদের দুঃখের দিনে জাতির পিতাকে তাদের মধ্যে চেয়েছেন– পেয়েছেন। এতেই তারা খুশি।

হবিগঞ্জে যখন বঙ্গবন্ধু কপ্টার থেকে নামলেন তখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল।

কানাইঘাটে থানা উন্নয়ন কেন্দ্রের যে ক্ষুদ্র শুকনো ভূখণ্ডটিতে সভা হয় সেই স্থানটি আগের দিন শনিবারও পানির নিচে ছিল।

সীমান্তবর্তী গ্রাম কোরমা গ্রামের বুড় পানাউল্লাহ, আহমদুল্লাহ এবং অপর তিন ব্যক্তি এ জন্য খুশি যে, স্বাভাবিক অবস্থায় বঙ্গবন্ধু সিলেট স্টেডিয়ামে আসতেন– তাদের দেখার সুযোগ হতো না। কারণ, তারা যেখানে থাকেন বঙ্গবন্ধু সেখানে কোনদিন আসতেন না।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, বুধবার, ২৮ জুন ১৯৭২

স্বাধীনতা রক্ষায় সুশৃঙ্খল ও সজাগ থাকুন

ময়নামতি সেনানিবাসের মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বীর সৈনিকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আহ্বান

ময়নামতি, কুমিল্লা সেনানিবাস, ৫ জুলাই ১৯৭২

ময়নামতি (কুমিল্লা), ৫ জুলাই (বাসস)। আজ কুমিল্লা সেনানিবাসে জওয়ানদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু তাদেরকে বাংলাদেশের মহান বীর সৈনিকদের প্রতি তাঁর আস্থার কথা জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় চরম আত্মত্যাগের জন্য তারা সদাপ্রস্তুত থাকবে। স্বাধীনতা নস্যাতের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সদাসজাগ থাকার জন্যেও তিনি জওয়ানদের প্রতি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সশস্ত্রবাহিনীকে সর্বদা জনগণের পাশে থাকার আহ্বান জানান। সশস্ত্রবাহিনী জনগণের সাথে থেকেই স্বাধীনতার গৌরবময় যুদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ চার রাষ্ট্রীয়নীতির প্রতি আস্থা রেখে তারা জনগণের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে, জনগণের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রশাসন কর্তৃপক্ষের প্রতিও তারা অনুগত থাকবে। তিনি সশস্ত্রবাহিনীর লোকদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, রাষ্ট্রের সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী হলো জনগণ।

বঙ্গবন্ধু ময়নামতি সেনানিবাসে ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কুচকাওয়াজে ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এটাই প্রথম।

এখন পর্যন্তও 'বহুশক্তি আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে চায়' বলে বঙ্গবন্ধু এ ব্যাপারে জওয়ানদের সতর্ক থাকতে বলেন।

দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকলে আর সশস্ত্র বাহিনী আত্মত্যাগের জন্য তৈরি থাকলে এসব দুশমনিতে কোন ফল হবে না বলে বঙ্গবন্ধু গভীর আস্থা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, আত্মত্যাগ ছাড়া কোন জাতিই সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না, আর বিরাট আত্মত্যাগের মাধ্যমেই জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের। তাই, তিনি বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর কেউই বানচাল করতে পারবে না। টিকে থাকার জন্যই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে বলেও তিনি জানান।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সেনাবাহিনী জাতির প্রতি ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের যে মহান ঐতিহ্য স্থাপন করেছে তা থেকে তারা বিচ্যুত হবে না বলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর গভীর আস্থার কথা প্রকাশ করেন। এ সময়ে জওয়ানরা প্রচণ্ডভাবে হাততালি দিয়ে 'বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ' ও 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু সৈনিকদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া বিশেষ কোন জাতিই তাদের মহত্ত্ব অর্জন করতে পারে নি। বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া জাতির ঐক্য-সংহতি বিপন্ন হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাঙালিদের বীরত্ব ও যুদ্ধ করার দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, মুক্তিবাহিনী, পুলিশ ও জনগণের অবদান, আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি তাদের বলেন, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করত আর বাঙালি জাতিকে দাস হিসাবে ব্যবহার করত।

১৮৫৮ সালে যে বাঙালিরা ব্যারাকপুরে প্রথম বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন, সেই যোদ্ধা বাঙালিদের সম্পর্কে ভীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শতশত বছর আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখে। আর পুরাতন প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসারী ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি চক্রের অবস্থাও দাঁড়ায় তাদের প্রভুদেরই মতো। বাঙালিরা যোদ্ধা জাতি নয়, এ ভাঁওতা তুলে তারা উভয়েই বাঙালিদের সোনাবাহিনী হতে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু গত যুদ্ধে সে ভাঁওতা চিরদিনের মতো নির্মূল হয়ে গেছে। তাই, তিনি চান যে, এখন থেকে সশস্ত্রবাহিনী জনগণকে সেবা করার ঐতিহ্য গড়ে তুলবে।

বর্তমান সেনাবাহিনীর সাজসরঞ্জাম ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা আশানুরূপ নয়, একথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, বর্তমান মুহূর্তে এছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ, দেশের আর্থিক সঙ্গতি বর্তমানে বিরাট বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তিনি সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তাদের একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যে গ্রাম থেকে তারা এসেছে, সে গ্রামেই তাদের পিতা-মাতারা রয়েছেন। তারা সেখানে এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছেন। প্রথমে তাদের সে অবস্থার প্রতিকার করতে হবে।

অতপর, প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে চারটি রাষ্ট্রীয়নীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান করেন।

বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন, পাকিস্তানিরা চেয়েছিল, বাঙালিরা আগামী ২৫ বছরের মধ্যেও নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবে না। গত ছয় মাসকালেই তাদের এ গর্ব যে শুধু ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তাই নয়, পাকিস্তানের অবস্থাই বরং তদ্রুপ দাঁড়িয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইতিপূর্বে বঙ্গবন্ধু সেনানিবাসের নিকট কোটরীতে বাংলাদেশ বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন, তাদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু চোরাচালান বন্ধের জন্য সীমান্তে কড়া প্রহরার আহ্বান জানান।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, বৃহস্পতিবার, ৬ জুলাই ১৯৭২

সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে : নীতিমালা মেনে পত্রিকাগুলোকে দায়িত্বশীল হতে হবে

বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে : বঙ্গবন্ধু

জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা, ১৬ জুলাই ১৯৭২

জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত স্বাধীন বাংলার মাটিতে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণ দেন জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

মাননীয় সভাপতি, সুধীবৃন্দ ও সাংবাদিক ভাইয়েরা,

আপনারা জানেন, আমি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। আপনাদের অনেক সহকর্মী শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। আমি অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে জেলখানায় কাটিয়েছি। এবারের সংগ্রামে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নাই। তেমনি নাই ৩০ লক্ষ লোক, যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য। তাঁদের কথা চিরদিন আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এবং যে-আদর্শের জন্য তাঁরা জীবন দিয়েছেন, সে-আদর্শে যদি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, তাহলে তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে।

স্বাধীনতার পটভূমি

সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার কয়েকটা স্পষ্ট আরজ আছে। আপনারা জানেন, বিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছে এবং সে-বিপ্লব ছিল রক্তক্ষয়ী। এমন বিপ্লবের পরে কোন দেশ কোন যুগে এতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই, যা আমরা করছি। আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়ও বিশ্বাস করি। এজন্য আপনাদের কোন কাজে কখনো কোনরকম হস্তক্ষেপ করি নাই। যদিও নতুন বাংলাদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ। বিপ্লবের পূর্বেকার সরকার একটা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মতো ছিল। আর যাঁরা এদেশে ছিলেন, জাতীয় সরকার কী করে চালাতে হয় সে-বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল না। আমাদের তাই নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। শুধু মুক্তিবাহিনীর ভায়েরাই অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করে নাই। জনগণকেও লড়তে হয়েছে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে। হানাদারবাহিনী যাওয়ার সময় আমাদের স্বাধীনতার শত্রুদের হাতে অস্ত্র দিয়ে গেছে। আমাদের কাছে এর দলিল আছে। শত্রুদের বিচারের সময় আপনারা সেসব দলিল দেখতে পাবেন।

সাংবাদিকতার আদর্শ

আপনারা খবরের কাগজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা-এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি এবং এইসব আদর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, এটাও আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। আমরা এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতেই দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাই। কিন্তু গণতন্ত্রেও একটা মূলনীতি আছে। গণতন্ত্রের অর্থ পরের ধন চুরি, খুন-জখম, লুটতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমনই একটা নীতিমালা আছে। আমরা জানি, সাংবাদিকের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, যাঁরা সামরিক চক্রের হীনকাজে সহায়তা করেছেন। তাঁরাই ধরিয়ে দিয়েছেন সেই সাংবাদিকদের, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। এই তথাকথিত সাংবাদিকদের একজন কোন

দৈনিক কাগজে সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করতেন। তিনি আলবদরের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড ছিলেন। এমন সাংবাদিকও আছেন, যাঁদের এই ধৃষ্টতামূলক কাজের নজির আমাদের কাছে আছে। তাঁরা হানাদারবাহিনীকে সংবাদ সরবরাহ করতেন। কিছু কিছু সাংবাদিক নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করতেন। কিন্তু তারা স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে খবর সরবরাহ করেছেন। আপনারা কি বলবেন যে, তাদের গায়ে হাত দিলে গণতন্ত্র এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার উপর আঘাত করা হবে?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

যিনি একদিন দৈনিক 'পয়গাম' চালাতেন, তিনি যদি আয়-উপার্জনহীন কোন ব্যক্তির আশ্রয় নিয়ে রাতারাতি একখানি দৈনিক কাগজ বের করেন, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাঁর এই মালিকের টাকা কোত্থেকে এলো? এরপর আবার এই রাতারাতি গজিয়ে ওঠা মালিক-সাংবাদিক সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখতে আরম্ভ করলেন। আপনারা দাবি করেছিলেন, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় যেন কোনদিন হস্তক্ষেপ না করি। কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে, সেগুলো মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? রাতারাতি একটা কাগজ বের করে, বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কেউ যদি বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবেন না। কারণ, তা আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করবে। 'ওভারসিজ পাকিস্তান' নামে কোন সংস্থা যদি এখন থেকে খবরের কাগজ প্রকাশ করে, তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আপনারা সামান্য কিছু লোকের স্বার্থ দেখবেন, না সাড়ে সাত কোটি লোকের স্বার্থ, যে ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে, তাঁদের স্বার্থ দেখবেন? বিপ্লবের পরে সংবাদপত্র যে-স্বাধীনতা পেয়েছে, তা এদেশে আর কখনো ছিল না। এই জন্যই রাতারাতি খবরের কাগজ বের করেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ ছাপানো হয়, "এক লক্ষ বামপন্থী হত্যা", "বিমানবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ" ইত্যাদি। কিন্তু এসব কি লেখা উচিত? এবং এসব কার স্বার্থে ছাপানো হয়?

সংবাদপত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন। আমিও বলি। কিন্তু কোন কোন খবরের কাগজে এমন কথাও লেখা হয়, যা সাম্প্রদায়িকতার চরম। অথচ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চব্বিশটি বছর প্রগতিশীল সাংবাদিকগণ সংগ্রাম করেছেন। আমরা সংগ্রাম করেছি, বাংলার মানুষ সংগ্রাম করেছে। আমাদের ছেলেরা, কর্মীরা জান দিয়েছে, জেল খেটেছে। সে নীতির বিরুদ্ধে যদি কোন সাংবাদিক লেখেন, তাহলে আপনারা কী করবেন? এটাও আপনাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

একখানা কাগজে লেখা হয়েছে, "গণহত্যা চলছে"। গণহত্যার কথাই যদি বলেন, তবে আমি আপনাদের বলব যে, এ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় বহু আওয়ামী লীগ কর্মী আর প্রগতিশীল কর্মী মারা গেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে গণতহ্যা হয় নাই। এজন্যে দুনিয়ার কাছে বাংলাদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এত বড় বিপ্লবের পরে, হানাদারদের দ্বারা সঙ্ঘটিত এত বড় হত্যাকাণ্ডের পরেও যে আর একটা হত্যাকাণ্ড হয় নাই, তার জন্য বাংলার মানুষ ও প্রগতিশীল কর্মীদের আপনারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাবেন।

ভারতীয় চক্রান্ত?

অনেকে ভারতীয় চক্রান্তের কথা বলে থাকেন। যারা আমাদের দুর্দিনে সাহায্য করেছে, তারা নাকি আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পকেটে ফেলে রাখবার চেষ্টা করছে। এধরনের কথা বলা কি সাংবাদিকতার স্বাধীনতা? এর নাম কি গণতন্ত্র?

যদি কেউ অনাহারে মরে থাকে, আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন। তার জন্য আমিও দায়ী হবো। আমি চেষ্টা করছি, যাতে কেউ অনাহারে না মরে। যদিও দেশে খাবার নাই। আমাদের খাদ্য

ঘাটতির পরিমাণ ৩০ লক্ষ টন। আমি বিদেশ থেকে ১৭ লক্ষ টন এনেছি। ভারত ৭ লক্ষ টন খাবার দিয়েছে। এছাড়া "আনরড" এবং ইউএসএ, কানাডা ও রাশিয়া থেকেও খাবার পাওয়া গেছে। সাধ্যমত সবাই আমাদের সাহায্য করছে। এর ভিতর ভারতীয় চক্রান্ত কোথায়? অথচ কোন কোন খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে "৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাঁচার", "আমরা কি সত্যিই সার্বভৌম" ইত্যাদি।

দালাল সাংবাদিক

অনেক কাগজের শিরোনামা আমার কাছে আছে। এই কাগজগুলো ফরমান আলী খানের দয়ায় ঢাকায় বসে নয় মাস কাজ করেছে, কিন্তু তাদের আজও ছোঁয়া হয় নাই। অনেক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। অনেক সাংবাদিক মা-বোন-বউ ঘরে ফেলে অকূল পাথারে ভেসে বেড়িয়েছেন। কিন্তু ফরমান আলীর অনুগ্রহভাজনরা এখানে বসে আরামে খবরের কাগজ চালান এবং হানাদারদের সাথে সহযোগিতা করেন। এরপর স্বাধীনতা পেয়ে তাঁরা রাতারাতি বিপ্লবী হয়ে গেলেন। তাঁরা এখন সরকারের বিরুদ্ধে লেখেন। তাঁদের সরকার ক্ষমা করতে পারে, জনগণ ক্ষমা করবে কি-না সন্দেহ আছে।

সরকারের যেমন স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আছে, তেমনি নীতি পালনের দায়িত্ব আছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও আছে।

আমরা গণতন্ত্র চাই, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা চাই না, কারও বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতেও চাই না। অথচ কোন কাগজে লেখা হয়েছে, "মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ হও"। যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমার দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, এখানে বসে কেউ যদি তার বীজ বপন করতে চান, তাহলে তা কি আপনারা সহ্য করবেন? আপনাদের যে-কোন কথা বলবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আপনাদের একটা নীতিমালাও রয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের সংকট

স্বাধীন দেশে যথেচ্ছাচার চলতে দেওয়া যেতে পারে না। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার তারই আছে, যে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে জানে। আপনাদের অনেক দাবি ছিল সেসব দাবি আমরা সব সময়ই সমর্থন করেছি। আর গত ছয় মাসে কোন দাবিই পূরণ করা হয় নাই, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। আমাদের পোর্ট বন্ধ। আমাদের রাস্তা নাই। গুদামে চাল নাই। এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রা নাই। রাজস্ব আদায় নাই।

তবু আমাদের সরকার চালাতে হয়েছে। আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হয়েছে। এর মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ৮০টা দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। আমরা জাতিসংঘের এবং অন্যান্য সংস্থার সদস্যও হতে যাচ্ছি। আমাদের বলতে পারবেন না, স্বাধীনতা লাভের সময় আমাদের হাতে কী ছিল? তখন পররাষ্ট্রদপ্তর বলতে কিছুই ছিল না। বাংলাদেশে দেশরক্ষাদপ্তরও ছিল না। অর্থদপ্তরটিও একটি নেজারাতের মতো ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। স্কুল-কলেজের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। মোট কথা স্কুল-কলেজ ভাঙা ছিল। আমাদের সবকিছুই ছিল বিধ্বস্ত। এমন দেশ নেই যেখানে বিপ্লবের পরে দুই চারবার দুর্ভিক্ষ হয় নাই। কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত খাবার দিতে না-পারলেও বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের প্রতিটিতেই কিছু না কিছু খাবার পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা অনেকগুলো কমিশন গঠন করেছি এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করবার জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোন দেশ চলতে পারে না। আমরা যে-সমস্ত কমিশন গঠন করেছি, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা কমিশন, বেতন কমিশন। শ্রীঘ্রই বেতন বোর্ড, চাকরি পুনর্বিন্যাস কমিশনও গঠন করা হবে।

স্ক্রিনিং

সরকারি কর্মচারীদের স্ক্রিনিং করার জন্য স্ক্রিনিং কমিটি করা হয়েছে। যারা দালালি করেছে, তাদের বিষয় স্ক্রিনিং কমিটিতে আসবে এবং কমিটির বিচার-বিবেচনার ফলাফল খবরের কাগজে দেওয়া হবে। যাঁদের ওপর আপনাদের আস্থা আছে সে-সমস্ত লোক নিয়েই কমিটি গঠিত হয়েছে। তাঁদের ভিতর হাইকোর্টের জজও রাখা হয়েছে। যাতে কেউ বলতে না পারেন, রাজনৈতিক কারণে আমি আওয়ামী লীগ ও তার বন্ধু দলগুলোকে বাদ দিয়ে কেবল অন্য দলের লোকদের স্ক্রিনিং করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়েও স্ক্রিনিং চলছে। তবে, তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। এজন্য স্ক্রিনিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত তাঁরাই নেবেন। আমাকে বলা হয়েছে, সিন্ডিকেট প্রস্তাব পাস করেছে, সরকার যে হাইকোর্টের জজ দিয়ে স্ক্রিনিং কমিটি করেছে তাঁর কাছেই তাঁরা রিপোর্ট পেশ করবেন। আপনারা সরকারি কর্মচারীদের স্ক্রিনিং চান, শিক্ষকদের স্ক্রিনিং চান, বেতারের স্ক্রিনিং চান। অনুগ্রহ করে একটু নিজেদের স্ক্রিনিং করুন। একটু বলুন এই লোকগুলো এই কাজ করেছে। আমরা তা মেনে নেব। আর যদি নিজেরা কিছু না করেন আমাকে বলবেন। আমি করব। আমাকে করতেই হবে। কারণ, পাকিস্তানের নামে পয়সা নিয়ে এসে যদি কেউ রাতারাতি খবরের কাগজ বের করে, আর মানুষের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে আমাদের সব নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে, বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবার চেষ্টা করে, এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াবার চেষ্টা করে, জাতির আদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে সেটাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। সে স্বাধীনতা কোন সরকার, কোন জনগণ, কোন প্রগতিশীল দল কোন দিন সমর্থন করতে পারে না।

ধর্মঘট

আপনারা যেসব দাবি করেছেন সেগুলো ন্যায্য। সেগুলোর জন্য আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। আমরা যতদূর সম্ভব দাবিগুলো পূরণের চেষ্টা করছি।

আপনারা বলেছেন, ধর্মঘট বন্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আমি তো ধর্মঘট বন্ধ করি নাই। তবে সমাজতন্ত্রের একটা নীতি আছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে শ্রমিকদের কর্তব্য কী সেটাও বুঝতে হবে এবং শ্রমিকরাই সমাজতন্ত্র চায় বেশি। কিন্তু যখন সরকারের আয় নাই, তখন ২৫ টাকা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির পরও যদি এটা-ওটা নিয়ে ঘেরাও জবরদস্তি চলে, তাহলে কী হয়? এটা কোন ধরনের সমাজতন্ত্র?

আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, যারা সত্যিকার শ্রমিক, তারা এসব করছে না। কিছু কিছু লোক করছে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যই ধর্মঘট বন্ধ করা হয়েছে। তাও মাত্র ছ-মাসের জন্যে। আপনারা বিশ্বাস করুন, কারো অধিকার কেউ নষ্ট করুক এ আমি কখনোই চাই না। আমি জীবনভর আন্দোলন করেছি এবং আন্দোলনের ভিতর দিয়েই আমি এতদূরে এগিয়ে এসেছি। সেজন্য আমি কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। এ সরকারও কারো ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট করতে চায় না। যেখানে কাজ জানা লোক নাই, ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা নাই, সমাজতন্ত্রের জ্ঞান নাই, সেখানে ব্যাংক এবং ইনস্যুরেন্স কোম্পানিসহ সমস্ত মূলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে যদি কেউ পয়সার জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে, তবে সেখানে আমি বাধা না-দিয়ে কী করতে পারি? আমি কি বলতে পারি যে, সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করুক?

শহীদদের পরিবারের জন্যে সাহায্য

যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে সাধ্যমত সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া চাঁদা তুলে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল গঠন করে শহীদদের প্রত্যেক পরিবারকে ২ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। শহীদ সরকারি কর্মচারীদের পরিবার-পরিজনকে পেনসন এবং

প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং মালিকহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে তাঁরাও জীবনভর একটা কিছু করে খেতে পারেন। যাঁরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করে পঙ্গু হয়েছেন। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকেও এসবের একটা অংশ দেওয়ার জন্য একটা বোর্ড গঠন করা হচ্ছে। কেউ বাদ পড়বেন না। সবাই সেখান থেকে কিছুটা সাহায্য-সহানুভূতি পাবেন।

সাংবাদিকদের কাছে দাবি

আপনাদের দাবিদাওয়ার উত্তরে আমিও দাবি জানাচ্ছি। আমি চাই আপনারাও স্ক্রিনিং করুন। যারা ন-মাস এখানে ছিল, তাদের কারো কারো সম্পর্কে দলিলপত্র আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের গায়ে যদি আমি হাত দেই আশা করি, আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি সরকারি কর্মচারীকে জেলে দিয়েছি, হাইকোর্টের জজকে জেলে দিয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে জেলে দিয়েছি, এদেশের রাজনৈতিক কর্মীদের এবং আওয়ামী লীগের এমসিএ-কেও জেলে দিয়েছি। আপনাদের মধ্যে যাদের অপরাধী পাব, তাদের নিশ্চয়ই ধরতে হবে। কোন সরকারি কর্মচারী বাড়াবাড়ি করলেও আপনারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে, দালাল আইনে-হাকিম আছে, কোর্ট আছে, বিচার হচ্ছে। সরকার যদি আসামির বিরুদ্ধে দলিলপত্র দাখিল করতে না পারে, তাহলে সে খালাস হয়ে যাবে।

সরকারের সমালোচনা

স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, তা রক্ষা করা তার চেয়েও কষ্টকর। স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। তবুও বিপ্লবের পরে ছ-মাসের মধ্যে আপনারা যতখানি স্বাধীনতা পেয়েছেন, ততখানি স্বাধীনতা এদেশে এর পূর্বে কেউ পায় নাই। কিন্তু অনেকেই তার সুযোগ নিয়ে দুষ্কর্মে মেতে উঠেছে। তার জন্যে আমাকে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যেমন কারফিউ দিয়ে তল্লাশি চালনো। এতে কিছু সৎ লোকের অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু এই অসুবিধা এড়ানোর উপায় নাই। আর অসৎ লোকের তো আমি আগেই সতর্ক হওয়ার সময় দিয়েছিলাম।

কোন কোন কাগজে সমালোচনা করে বলা হয়, এখনকার অবস্থা আইয়ুব ও ইয়াহিয়া সরকারের আমলের চেয়েও খারাপ। ১৯৫৮ সালে যখন মার্শাল-ল' জারি হয়েছিল এবং আমাকে বন্দি করা হয়েছিল, তখন এরা কিছুই লেখেন নাই। আবার এরাই এখন লেখেন, "চালের মণ একশ বিশ টাকা"। চাল থাকতেও আমি দিচ্ছি না। কিন্তু আমি তো তা বলি নাই। আমি শুধু চেষ্টা করছি এবং কিছু কিছু দিচ্ছি। চালের দাম মিথ্যা করে বাড়িয়ে বলার অর্থ অন্য জায়গায় আতঙ্কের সৃষ্টি করা। এসব কথা যারা লেখে, তারা মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করে। এর নাম কি সাংবাদিকের স্বাধীনতা?

সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও আপনারা লেখেন। আপনারা জানেন যে, সরকারি কর্মচারীদের জবাব দেওয়ার অধিকার নাই। যদি কেউ কারো নাম করে কিছু লেখেন এবং সে যদি কোন প্রতিবাদ করে তাহলে সেটা প্রকাশ করাও সাংবাদিকদের দায়িত্ব। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেক সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধেই তো মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু কারও প্রতিবাদই খবরের কাগজে ছাপা হয় নি। এটা সাংবাদিকতার কোন্ নীতিমালায় আছে?

ভীতি প্রদর্শন (ব্ল্যাক মেইলিং)

আমি আরও একটা প্রবণতা লক্ষ্য করছি। এটা বাংলাদেশে আগে ছিল না। আমি এটা দেখেছি করাচিতে আর দেখেছি পিন্ডিতে। এটা হলো ভীতি প্রদর্শন। কোন সাপ্তাহিক বা সান্ধ্য দৈনিকে কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখে তাকে বলা হতো, টাকা দাও, নইলে আবার তোমার বিরুদ্ধে

লেখা হবে। তখন সত্যি সত্যিই টাকা দিয়ে সে কাগজের মুখ বন্ধ করা হতো। আমি লক্ষ্য করছি এখানেও এই ধরনের একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

আরও দেখা যাচ্ছে, যার আয়ের কোন প্রকাশ্য উৎস নাই, সেও দৈনিক কাগজ বের করছে। রাতারাতি কাগজটা বের হয় কোথা থেকে? পয়সা দেয় কে? আমি শিল্পপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি। এর জন্য তারা কেঁদে মরে। তাদের পয়সা আসে কোত্থেকে? আমি যদি খবর পাই যে, বিদেশিরা তাদের সাহায্য করছে এবং তখন যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহলেও কি আপনারা বলবেন, সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকদের উপর অন্যায় হামলা করা হয়েছে?

আপনারা জানেন, আমি ঢাকা শহরে সাইকেল নিয়ে রাজনীতি করেছি। কিন্তু এখন কিছু কিছু লোক রাতে হাইজ্যাকের গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর দিনের বেলায় বিপ্লব করে। তারা দুষ্কৃতকারী। তাদের আয়ের কোন প্রকাশ্য উৎস নাই। অথচ প্রচুর টাকা খরচ করে। এ টাকা আসে কোত্থেকে? কে দেয়? আমি যদি এসবের তদন্ত করি, তবে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবেন না আশা করি। এটাও আইন।

আদর্শের রূপায়ণ

আমি জানি, আমার মতো আপনারাও চারটি আদর্শ সমর্থন করেন। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা দেশকে বাঁচাতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুনিয়ায় দেখা গেছে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের খাতিরে বাধা দূর করবার জন্য রূঢ় হতে হয়েছে। সেটা আমি করতে চাই না। এজন্য যে, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, আমি চেষ্টা করে দেখছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমার আন্দোলন। সেই জাতীয়তাবাদ না-থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব নষ্ট হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাও আমাদের আদর্শ। এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। রাজাকার, আলবদররা এখন কিছু কিছু বড় বড় প্রগতিশীল নেতার আশ্রয় নিয়ে "প্রগতিশীল" বনে গেছে। আসলে তারা খুনের মামলার আসামি। তাদের নামে হুলিয়া রয়েছে। এখন তাদের কেউ বলে, আমি ওমুক নেতার সেক্রেটারি, কেউ বলে আমি সম্পাদক। এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কী, আপনারাই বলুন?

সাংবাদিকদের স্বার্থ

আপনারা সাংবাদিক। আপনাদের স্বার্থরক্ষা করতে হলে আপনারা নিজেরাও আত্মসমালোচনা করুন। আপনারা শিক্ষিত, আপনারা লেখক, আপনারা ভালো মানুষ। আপনারাই বলুন, কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ। আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে সহযোগিতা করব।

আপনাদের দাবিদাওয়ার কথা আমি আগেই বলেছি। আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আমি বড় খুশি হয়েছি। আমি সারাজীবন আপনাদের সঙ্গে সংগ্রামে ছিলাম, এখনো আমি সংগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনাদের ন্যায্য পাওনা যা আছে, তা নিশ্চয়ই আপনারা পাবেন। কিন্তু তার বেশি চাইলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি পারব না। বাংলাদেশের মানুষকে আমি বলেছি, তিনবছর কিছুই দিতে পারব না। তারা তা মেনে নিয়েছে। আশা করি, আমার সাংবাদিক ভাইয়েরাও বলবেন, তিনবছর কিছুই চাই না। কারণ, আপনারা কোন পৃথক জাত নন। আপনারা সাত কোটি লোকের একটা অংশ। তাছাড়া, গণতন্ত্রের একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও একটা নীতিমালা আছে। এ দুটো মনে রাখলে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারব।

জয় বাংলা।

সূত্র : *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী ও বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকা, বর্ধিত সংস্করণ ১৫ আগস্ট ২০০০।

এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্তে লেখা : বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ গণপরিষদ, ঢাকা, শনিবার, ৪ নভেম্বর ১৯৭২, সকাল ১০.৪০ মিনিট

স্পিকার জনাব মুহম্মদউল্লাহর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ গণপরিষদ-এ অনুষ্ঠিত সংবিধান বিল (গৃহীত)-এর উপর প্রধানমন্ত্রী ও গণপরিষদ নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ :

জনাব স্পিকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে এসে তাঁদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র দিচ্ছেন।

আজ আমাকে স্মরণ করতে হয়, আমাকে অনেকদিনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। তদানীন্তন ভারতবর্ষ, বাংলাদেশে যাকে আমরা Sub-continent বলতাম, সেখানে সে যুগে যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম হয়েছে, তার হিসাব করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীরাই রক্তদান বেশি করেছে। তার স্বাক্ষর আছে চট্টগ্রামের জালালাবাদে, স্বাক্ষর আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মা-বোনদের কাছে।

বাংলার এমন কোন জেলা, মহকুমা ছিল না, যেখানে ইংরেজ-আমল থেকে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে, সিপাহি বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল।

তারপর, বাংলাদেশের অফিসাররা বহু যুদ্ধ করে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে বার বার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তারা জেল ভোগ করেছে অনেক। তাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু দুঃখ, বাঙালির জীবনে সুখ কোনদিন আসে নি। বাংলার সম্বন্ধে ঠাট্টা করে আমাকে একজন বলেছিল, তোমার বাংলার উর্বর জমিই তোমার দুঃখের কারণ। তাই বারবার দেখা গেছে, শকুনিরা এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কারণ, তারা এ দেশের অর্থ-সম্পদের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল।

জনাব স্পিকার সাহেব,

সমস্ত দুনিয়া এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষে যারা শোষক ছিল, তারা বাংলার অর্থ, বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে বাংলার মাটি থেকে। গৃহহারা, সর্বহারা কৃষক, মজুর, দুঃখী বাঙালি, যারা সারা জীবন পরিশ্রম করেছে, খাবার পায় নাই। তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার বন্দর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে বোম্বের বন্দর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে মাদ্রাজ, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে করাচি, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে ইসলামাবাদ, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে লাহোর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে ডান্ডি গ্রেট ব্রিটেন। এই বাংলার সম্পদ বাঙালির দুঃখের কারণ ছিল।

সংগ্রামী বাঙালিরা বার বার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তিতুমীর, যুদ্ধ করেছে হাজী শরীয়তউল্লাহ। তাদের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। কারণ, বাঙালি আজ শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে।

স্মরণ করতে হয় শের-এ বাংলা ফজলুল হকের কথা। স্মরণ করতে হয় মরহুম সোহরাওয়ার্দীর কথা। আরও স্মরণ করতে হয় মানিক মিয়ার কথা, যিনি তাঁর কলম দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করতে হয় সেইসব সহকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যারা জীবন দিয়েছেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামে।

স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেবল নয় মাসই হয় নাই, স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। তারপর, ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে। সে সংগ্রামের একটা ইতিহাস আছে। তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিতে হয়। একদিনে সে সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌছে নাই। নয় মাস আমরা যে চরম সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রাম শুরু করেছি বহুদিন থেকে।

১৯৪৭ সালে ভাগ করে সংখ্যায় 'মেজরিটি' থাকা সত্ত্বেও বাঙালিরা সব কিছু হারিয়ে ফেলল। জনাব জিন্নাহ্ সাহেব, যাকে অনেকে তখন নেতা বলে মানতাম, বাঙালিকে এক শকুনির হাত থেকে আর এক শকুনির হাতে ফেলে দিয়ে করাচিতে রাজধানী কায়েম করলেন। এমন কি, জিন্নাহ্ সাহেব মরার সময় যে deed দিয়েছিলেন, সেই deed-এর ভাগ পেয়েছিল পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পেয়েছিল বোম্বের হাসপাতাল এবং করাচির স্কুলকেও দান করেছিলেন; কিন্তু বাংলার কোন মানুষের জন্য এক পয়সাও দান করে যান নাই।

বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুগে মেতে পরের ছেলেকে বড় করে দেখি, এই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার কোন দেশে 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোন শব্দ পাই না বাংলাদেশ ছাড়া। বাঙালি জাতি আমরা পরশ্রীকাতর এত বেশি। ইংরেজি ভাষায়, রুশ ভাষায়, ফরাসি ভাষায়, চীনা ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোন শব্দ নাই, একমাত্র বাংলা ভাষা ছাড়া।

এই কারণে বাঙালিদের যেমন ত্যাগ, সাধনা করার শক্তি ছিল, বাঙালিদের মধ্যে তেমনি পরশ্রীকাতরতার মনোভাব দেখা দেয়। বাংলাদেশের যে সকল নেতা সংগ্রাম করেছেন, আমরা তাঁদের বুঝতে পারি নাই। আমরা বুঝেছি, আমাদের নেতা বুঝি চলে এসেছেন সেই বোম্বে থেকে মিস্টার জিন্নাহ্।

যা হোক, সে ইতিহাস এবং ১৯৪৭ সালের পরবর্তী করুণ ইতিহাস অনেকেই জানেন।

জনাব স্পিকার সাহেব,

১৯৫২ সালে আপনি যখন আমার কাছে অফিসে এসে বসেন, তখন একখানা ভাঙা চেয়ার, একটা ভাঙা টাইপরাইটার মেশিন আর একজন কর্মী নিয়ে আমরা বসেছিলাম। সে কথা বোধ হয় আপনার মনে আছে, স্পিকার সাহেব। তখন আমি আড়াই বৎসর পর জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

১৯৪৭ সাল থেকে বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল বাংলাদেশের মানুষকে একটা কলোনি করে রাখার জন্য। বহু আগেই পশ্চিমের শক্তিকে এ দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে একদল লোক ছিল, যারা স্বার্থের লোভে, পদের লোভে, অর্থের লোভে তাদের সঙ্গে বার বার হাত মিলিয়েছে, আর বার বার চরম আঘাত করেছে আমাদের উপর। আঘাত করেছে ১৯৪৮ সালে, আঘাত করেছে ১৯৫২ সালে, আঘাত করেছে ১৯৫৪ সালে। এমনকি, যখন ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র হয়, তখন বাঙালিরা পরিষদ থেকে 'ওয়াকআউট' করে। তখনও বাঙালির মধ্যে কিছু লোক বেঈমানি করে পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মেলায় মন্ত্রিত্বের লোভে।

১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' বাংলার উপর আসে বাঙালিকে শোষণ করার জন্য। তারা যখন দেখেছে, বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তখন তারা বাংলার মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগ করেছে। তাদের শক্তি ছিল একটা। সেই শক্তি ছিল তাদের সামরিক বাহিনী।

ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করতে পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকাকে বেছে নিয়েছিল, যেখান থেকে সামরিক বাহিনীতে লোক 'রিক্রুট' করা হতো। বাঙালিকে বিশ্বাস করা হতো না। বাঙালিকে সামরিক বাহিনীতে নেওয়া হতো না। কারণ, বাঙালিরা বিদ্রোহ করে–এই হচ্ছে তাদের দোষ।

১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি ছিল, বুদ্ধিতে বাঙালিরা ভালো ছিল, লেখাপড়া বাঙালিরা ভালো জানত, আক্কেল তাদের বেশি ছিল। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বাঙালিদের ছিল, যার জন্য বার বার বাঙালি মার খেয়ে গেল। যদিও আমাদের অনেক সহকর্মী চেষ্টা করেছিলেন। সেটা ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি।

সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি তার অধিকার আদায় করতে পারে নাই। যখনই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে, তখনই এসেছে চরম আঘাত। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারার বলে শের-

এ বাংলা ফজলুল হক ঘরের মধ্যে অন্তরীণ। আমিসহ ৫০ জন সহকর্মী, যারা তদানীন্তন এমএলএ ছিলেন, এবং প্রায় ৫ হাজার কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে চলে যায়।

সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। সে কথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি। তখন মানুষ একটু স্থান দিত না, কারও বাড়িতে জায়গা পেতাম না, আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত ভয় করত, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করত না।

সে যুগে, ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ্ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যারা এদেশে বিরোধী-দল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিল তাদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় করা হবে। তাদের কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আরও স্মরণ করি তাদের কথা, এই ২৫ বৎসর বাংলাদেশের পথ-ঘাট, রাস্তা-রাজপথ বাংলার যেসমস্ত ছেলের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ, মা-বোন জীবন দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ শেষ হয়ে গেছে। কত মা আজ পুত্রহারা। কত বোন আজ স্বামীহারা। কত পিতা আজ সন্তানহারা। কত সংসার আজ ছারখার হয়ে গেছে, তার সীমা নেই। শেষ পর্যন্ত কত খেলা খেলে গেল। উড়ে এসে এক এক-জন জুড়ে বসত।

জনাব স্পিকার সাহেব,

আমি গত নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে বলেছিলাম, যে জাতি রক্ত দিতে শিখেছে, সেই জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না, সেই জাতিকে কখনও কেউ পদানত করতে পারে না, সে কথা অক্ষরে অক্ষরে আজ প্রমাণ হয়ে গেছে।

অনেকে দালালি করেছেন প্রগতির নামে। এহিয়া খানের দালালি করেছেন, আইয়ুব খানের দালালি করেছেন।

অনেকের তখন জন্ম হয় নাই রাজনৈতিক জীবনে, তাঁরাও অনেক সময় সমালোচনা করেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলে সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছি। সমালোচনা করুন। কোন সত্য কথা বলতে ভয় না পাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

গত সংগ্রামের সময়, ২৫শে মার্চ তারিখে আক্রমণ চলে এবং যখন আমার বাড়িতে মেশিনগান মেরে আমাকে গ্রেপ্তার করে, তখন আমার সহকর্মীদের আমি হুকুম দিয়েছিলাম, যাও, চলে যাও যার যার এলাকাতে, গিয়ে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোল এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাও!

২৫শে মার্চ তারিখে যে আক্রমণ চলে, সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাবাহিনীর উপর, বাঙালি ইপিআর-এর উপর, বাঙালি পুলিশের উপর, বাঙালি রক্ষীবাহিনীর উপর, আর বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর। আর যারা এ দেশের দুঃখী মানুষ, তাদের বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায়, ঢাকা শহর থেকে আরম্ভ করে সেদিন সেই অত্যাচার শুরু হয় এবং মেশিনগান চলে ২৫ তারিখ রাত্রে।

যখন আমি বুঝতে পারলাম, আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তখন আমার মনে হলো, এই বুঝি আমার শেষ। তখন আমি চেষ্টা করেছিলাম, কেমন করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌছিয়ে দেই এবং তা আমি পৌছিয়ে দিয়েছিলাম তাদের কাছে। সেদিন আমি লাশ দেখেছি, রক্ত আমি দেখেছি। সেই রক্তের উপর দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই রক্তাক্ত মানুষের লাশের পাশ দিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। [এই পর্যায়ে তিনি কেঁদে ফেলেন]

সে আগুন আমি দেখেছি। শুধু বলেছিলাম, তোমরা আমাকে হত্যা কর, আমার মানুষকে মের না। তারা আমার কথা শোনে নাই। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার সহকর্মীদের হত্যা করেছে। এই গণপরিষদের আমার বহু কর্মীকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে।

মানুষ যে এত পশু হতে পারে, জনাব স্পিকার সাহেব, দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না। হালাকু খাঁর গল্প পড়েছি, চেঙ্গিশ খাঁর গল্প পড়েছি, হিটলারের গল্প পড়েছি, মুসোলিনীর গল্প পড়েছি, কিন্তু মানুষ যে এত পশু হতে পারে, তা দেখি নি। দুই বৎসরের দুধের বাচ্চাকে হত্যা করে, তার বুকে লিখে দিয়ে 'বল জয় বাংলা' গাছের সঙ্গে টাঙিয়ে রেখেছে। মানুষ কেমন করে এত পশু হতে পারে! ৭০ বৎসরের বৃদ্ধার উপর পাশবিক অত্যাচার করতে পারে কেমন করে! লাখ লাখ দুধের বাচ্চাকে তারা হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তারা আমার লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। সে রক্ত আমরা ভুলতে পারি না। তাদের কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়।

আওয়ামী লীগ, আমি বা সহকর্মীরা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করতে চাই না। ক্ষমতা চাইলে বহু ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। সারা দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা বাংলার মন্ত্রিত্ব করতে পারত। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে ওয়াদা করেছিলাম, বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, বাংলার সম্পদ বাঙালিরা ভোগ করবে। সেই জন্য এই সংগ্রাম করেছিলাম।

জনাব স্পিকার সাহেব,

বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছি। আমি অনেক সময় ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমার সহকর্মীরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল সবাই। এই অ্যাসেম্বলির এমন কোন মেম্বার নাই, যার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নাই, আত্মীয়স্বজন হত্যা করা হয় নাই।

অনেকে অনেক কথা বলে, বলাটা স্বাভাবিক। কার বিরুদ্ধে মানুষ বলে? যে কাজ করে, তারই বিরুদ্ধে মানুষ বলে। যে কাজ করে না, তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না।

আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য, আমার কর্মী ভাই-বোন আছে, যাদের ঘর-বাড়ি এমনকি সর্বস্ব চলে গেছে, তবু তারা ক্ষমতা চায় নি। সর্বস্বান্ত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। আমার সহকর্মীরা বুঝতে পারছে না, কী করবে। সেদিন আমি তাদের কাছে নেই। আমি ঘোষণা করে বলে দিয়েছি, সমস্ত জেলায়, মহকুমায় একসঙ্গে প্রতিরোধ-আন্দোলন শুরু হোক এবং হয়েছিলও তাই। আমার সহকর্মীরা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে, স্বাধীন সরকার গঠন করে, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল।

সেদিন অনেকেই এগিয়ে আসেন নি, শুধু আরাম করে খেয়েছেন। এই সংগ্রামের কথা চিন্তাও করেন নি। সেই ভাঙ্গাচোরা দল নিয়ে, অন্য যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে, দুনিয়ার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে তুলে ধরে তারপর তারা পুরোদমে সংগ্রাম করেছিল।

নির্ভীক বাংলার সৈনিক, নির্ভীক মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ, নির্ভীক সাবেক ইপিআর, নির্ভীক বাংলার ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারীদের এক অংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই নমরুদের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম হয়েছিল চরম সংগ্রাম। অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল তাদের হাত থেকে। তখন তারা অস্ত্র পায় নি অন্যান্য জায়গা থেকে। দেশের মধ্যে থেকে অস্ত্র যোগাড় করে নিয়ে তারা সে সংগ্রাম করেছিল। সেই ভাবেই এক মাস, দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী ভালো ভালো অস্ত্র পেয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পদানত হয় নি বাঙালি।

সেই জন্য আমি স্মরণ করি সেই ৩০ লক্ষ লোককে, যারা রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। আমি আরও স্মরণ করি আমার সেই পঙ্গু ভাইদের কথা, যাঁরা বসে আছেন পঙ্গু হয়ে। তাঁদের জন্য কর্তব্য করতে চেষ্টা করেছি। পঙ্গু ভাইদের জন্য 'ট্রাস্ট' করে দিয়েছি চার কোটি টাকা ব্যয় করে। সেখানে তাঁরা পেনশন পাবেন সারা জীবন।

স্মরণ করি আমার নির্যাতিত মা-বোনদের কথা। দুই লক্ষ নির্যাতিতা, মা-বোন আজও ক্যাম্পে ক্যাম্পে আছে, যাদের ইজ্জত নষ্ট করে দিয়েছে পাকিস্তানি দস্যুরা—যারা ইসলামের নাম নিয়ে

চিৎকার করে, 'মুসলিম বাংলা' বলে চিৎকার করে। লজ্জা করে না। দুই লক্ষ মা-বোনের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে।

যাক, আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি রক্তের বিনিময়ে। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা। কোন দেশে কোন যুগে আজ পর্যন্ত এত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। দেশের কী অবস্থা ছিল, জনসাধারণ জানে। কয় পাউন্ড বৈদেশিক মুদ্রা ছিল, সকলেরই জানা আছে। রাস্তা-ঘাটের কী অবস্থা ছিল, সবই আপনারা জানেন। চাউলের গুদামে কত চাউল ছিল, এ সবই আপনাদের জানা আছে।

মানুষের ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশ একটি কলোনি-মাত্র ছিল। শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানি মাল বিক্রি করে তার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। সবকিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যায় এবং যাবার বেলায় গর্ব করে বলে যায় যে, স্বাধীনতা পেল বাঙালি, কিন্তু এমন করে দিয়ে গেলাম যে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরবে এবং আর মাজা সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ বাংলার মানুষ মাজা টান করে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক স্পিকার সাহেব, নয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেওয়া সহজ কথা নয়। মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার কারণ হলো, আমরা জনগণের উপর বিশ্বাসী। জনগণের উপর আস্থা রেখেই আমরা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আগেই বলেছি, জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালোবাসি।

সেই জন্য আপনার মাধ্যমে আমি আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। তাঁরা রাতদিন ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ বৎসর আমরা চালাতে পারতাম। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের কাছে গণভোটে গিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে, বাংলার মানুষ কাদের ভালোবাসে। কিন্তু তা আমরা চাই নি, জনাব স্পিকার সাহেব, চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্যই সংগ্রাম করেছিলাম এবং এই জন্যই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীদের একজনও আপত্তি করে বলেন নাই যে, আমরা অ্যাসেম্বলি dissolve করব না। এ জন্য আমি গর্বিত। আমার দলের সহকর্মীদের জন্য, মেম্বারদের জন্য আমি গর্বিত।

যারা এই অ্যাসেম্বলির মেম্বার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যাঁরা এই গণপরিষদ-সদস্য, তাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন যে, ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করব। কারও কিছু বলার অধিকার ছিল না। কেননা, কনভেনশনে তাই রয়েছে, রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করি নাই। আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতার লোভী নয়, তার আর একটি প্রমাণ, আজ তারা শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং তারা নির্বাচনে যাবে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে। আমার সহকর্মী সকলেই প্রায় বক্তৃতা করেছেন। যিনি একজন 'অপজিশনে' ছিলেন, বা দুইজন স্বতন্ত্র ছিলেন, তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আসতে পারলে আরও সুযোগ পাবেন, তাতে আমার আপত্তি নাই। আর যদি না আসতে পারেন, তাতেও আমার আপত্তি নাই। জনগণই ঠিক করে দেবে। আমাদের ভালোবাসা রয়েছে—জনগণের।

নয় মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে, এটা হলো আর একটি নতুন সৃষ্টি। আমি আগেই বলেছি, শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিবিহীন নৌকার মতো। তাই মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি, জনগণ এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবেন এবং করেছেন। কারণ, আমরা জনগণের প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এসেছি। কেউ আমাদের পকেট থেকে বের করে দেন নাই। আর, আমরা আসমান থেকে পড়ি নাই বা কেউ এসে আমাদের মার্শাল ল' জারি করে বসিয়ে দেন নাই।

মার্শাল ল' জারি আমরাও করতে পারতাম। যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তাঁরা বলতে পারতেন, Emergency! No Democracy! No talk for three years! এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করতেন। কোন সমালোচনা চলবে না! কোন কথা বলা চলবে না! কোন মিছিল হবে না! কোন পার্টির কাম চলবে না! কারণ, দেশের যা অবস্থা ছিল, তাতে এটা করা যেত। সব দেশে, সব যুগে, বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই। শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ।

কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, তাহলে আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে, শক্তির উৎস হলো জনগণ।

জনাব স্পিকার সাহেব,

চারটা স্তম্ভের উপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর উপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ড. কামাল হোসেনও অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। অন্য সদস্যরাও এর উপর বক্তৃতা করেছেন।

এই যে চারটা স্তম্ভের উপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো, এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকার হচ্ছে একটা মূলবিধি। মূল চারটা স্তম্ভ–জনগণ ভোটের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নয়, ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে, রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

হ্যাঁ, অধিকার আছে অনেক কথা বলার।

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ-সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং, এ সম্বন্ধে আমি আর নতুন সংজ্ঞা না-ই দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি, আমি বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি।

এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন–সকল কিছুর সঙ্গে একটা জিনিস রয়েছে। সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে, তাহলে কোন জাতি বড় হতে পারে না। এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, যারা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক-জাতি হয়েছে। অনেক দেশে আছে, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু নিয়ে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে–তারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর।

সে জন্য আজ বাঙালি জাতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি, যার উপর ভিত্তি করে আমরা সংগ্রাম করেছি, সেই অনুভূতি আছে বলেই আজকে আমি বাঙালি, আমার বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এর মধ্যে যদি কেউ আজকে দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন তুলতে চান, তাহলে তাকে আমি অনুরোধ করব, মেহেরবানী করে আগুন নিয়ে খেলবেন না।

দ্বিতীয় কথা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে।

মানুষের একটা ধারণা এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যে সব দেশে চলেছে দেখা যায় সে সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের protection দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সেই গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না।

আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো, আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে, তাতে যে সব provision করা হয়েছে, যাতে এ দেশের দুঃখী মানুষ protection পায়, তার জন্য বন্দোবস্ত আছে–ঐ শোষকরা যাতে protection পায়, তার

ব্যবস্থা নাই। সে জন্য আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক schedule-এ রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারও সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং, নিশ্চয়ই আমরা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, কাপড়ের কল, জুট মিল, সুগার ইন্ডাস্ট্রি-সব কিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি, তার মানে হলো, শোষকগোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সে জন্যই এখানের গণতন্ত্রের, আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অন্য অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।

তৃতীয়ত, Socialism বা সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা এগুলি জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না, তাদের আগে বোঝা উচিত, সমাজতন্ত্র কী।

সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্র বুঝতে পারে নাই। সমাজতন্ত্র গাছের ফল না–অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুরও হয়। সেই পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌছানো যায়।

সে জন্য পহেলা step, যাকে প্রথম step বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি–শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ, এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমাজতন্ত্রের মূলকথা হলো, শোষণহীন সামজ। সেই দেশের কী climate, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সব কিছু বিবেচনা করে step by step এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে।

রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করে নাই, সে অন্যদিকে চলেছে। রাশিয়ার পার্শ্বে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া তাদের দেশের environment নিয়ে, তাদের জাতির background নিয়ে, সমাজতন্ত্রের অন্য পথে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান–ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার মিসর অন্যদিকে চলেছে।

বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনদিন সমাজতন্ত্র হয় না, তা যাঁরা করছেন, তাঁরা কোনদিন সমাজতন্ত্র করতে পারেন নাই। কারণ– লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র হয় না, যেমন আন্দোলন হয় না।

সে জন্য দেশের environment, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের 'কাস্টম', তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সব কিছু দেখে step by step এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা নয় মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয়, দুনিয়ার কোন দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে Socialism করেছে, তারাও আজ পর্যন্ত তা করতে পারে নাই–আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোন কিছু করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তারপরে আসছে ধর্মনিরপেক্ষতা। জনাব স্পিকার সাহেব, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না।

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারও নাই। হিন্দু তাদের ধর্ম পালন করবে, কারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধাদান করতে পারবে না।

খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না।

২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, ধর্মের নামে খুন, ধর্মের নামে ব্যভিচার–এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে।

ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।

যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয় নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।

কেউ যদি বলে, গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে।

কোন কোন বন্ধু বলেছেন, schedule-এ এ জিনিস নাই, ও জিনিস নাই। জনাব স্পিকার সাহেব, কেবল শাসনতন্ত্র পাস করলেই দেশের মুক্তি হয় না, আইন পাস করলেই দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না, ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ জনসাধারণ কেমন করে, কীভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে, তারই উপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের success, কার্যকারিতা। আমরা চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি।

কেউ কেউ বলেছেন যে, সরকারি কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তারা অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রও পড়ুন। সরকারি কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তারা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তারা কোন different class নয়।

ইংরেজ-আমলে ICS, IPS-দের protection দেওয়া হতো। সেই protection পাকিস্তান-আমলেও দেওয়া হতো। আমলাতন্ত্রের সেই protection-এর উপর আঘাত করেছি, অন্য জায়গায় আঘাত করি নি। এই class রাখতে চাই না। কারণ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, classless society প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

আইনের চক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। মজদুর, কৃষকদের টাকা দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের মাইনে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং, মজদুর, কৃষকদের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তারা পেতে পারে না।

সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তারা শাসক নন—তারা সেবক।

Some people came to me and wanted protection form me. I told them, "My people want protection from you, gentlemen."

আমি তাঁদেরকে তাঁদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন করতে বলেছি।

কেউ কেউ শাসনতন্ত্রের নবম ভাগের সমালোচনা করেছেন। গত নয় মাসে কয়জন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়েছে? মাত্র কয়েকজনের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আরও বেশি কর্মচারীর বিরুদ্ধে action নিতে হতে পারে।

আজ যে কাজ করবে, লোকে তাকে কত ভালোবাসে, তার উপর নির্ভর করবে তার promotion। promotion-এর ব্যাপারে গরিব, অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের অধিকার থাকবে। গরিব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আজীবন সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আজও বলছি ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকব। তারা গরিব, আমি জানি। তাদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানে।

আমরা Services Reorganisation Committee করেছি। সেই কমিটির মেম্বারদের বলেছি,

ড. কামাল হোসেনও বলেছেন, Central Govenment-এর 125 step বা Provincial Government -এর 33 step আমরা রাখব না। এই 125 এবং 33 step-এর মধ্যে যে কত ফাঁক ছিল, যার সুবিধা নিয়ে অনেক promotion হতো। সাত আসমান। এর বেশি step সরকারি চাকরিতে থাকবে না। মাত্র 7 step থাকবে।

এতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু লোক গোপনে গোপনে ফুসফাস করছে এবং MCA-দের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছে।

বহু ক্ষমা করা হয়েছে। আমরা রক্তের আন্দোলনের মাধ্যমে পয়দা হয়েছি। আমরা এহিয়া খান, আইয়ুব খানের 'তমগা' নিয়ে বেড়াই নি। আমরা চোঙা ফুঁকে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে জনসমর্থন নিয়ে এখানে এসেছি।

কিন্তু আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, এহিয়া খান, আইয়ুব খানের সেই protection পাবেন তাহলে ভুল করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

যারা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের খতম কর, action নিলে তারাই আবার মিটিং করে উল্টো প্রস্তাব পাস করেন। নীতি এক হওয়া উচিত।

কেউ কেউ বলেন, সরকারকে ধ্বংস করার জন্য অফিস collaborator-এ ভরে গিয়েছে। Collaborator আছে। যাদের সম্বন্ধে definite খবর পাই, তাদের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়।

তারপর, কাজ না করে চেয়ার-টেবিলে বসে থাকা, এটা একটা স্টাইল হয়েছে। Mentality must be changed । ঐ CSP, PSP বাংলাদেশে থাকবে না। সরকারি চাকরিতে 7 step থাকবে। Services Reorganisation Committee করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সব কিছু করা হবে। যাঁরা নির্বাচিত হয়ে পরিষদে আসবেন, তাঁরা আইন পাস করবেন, তখন সব হবে। এখন অর্ডিন্যান্স পাস করে কাজ করা হচ্ছে।

Scrutiny Committee করা হয়েছে, সেটা থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে।

Pay Commission করা হয়েছে। সেটাকে বন্ধ করার জন্য চেষ্টা হয়েছে। বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ ৭৫ টাকা পাবে, কেউ ২ হাজার পাবে, তা হতে পারে না। সকলের বাঁচবার মতো অধিকার থাকতে হবে। একজন সব কিছু পাবে, আর একজন পাবে না, তা হতে পারে না। Pay Commission সরকারি কর্মচারীদের highest and lowest pay ঠিক করে দেবেন। সম্পদ ভাগ করে খেতে হবে। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে।

বিরোধী দলের নাম শুনতে পাই। এ রকম কোন পার্টি আছে কিনা জানি না। নির্বাচনের আগে এ রকম কোন পার্টি ছিল না। অনেকেই ভোট না পেয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিল। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যদি তারা ভোট না পায়, তাহলে সে দোষ আমাদের হবে না। ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুক, আমরা বিরোধী দল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায় নি, তারা বলে, আমরা বিরোধী দল। ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুক, আমরা বিরোধী দল। তা না হলে বলুক, এই আমাদের দাবি।

গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ব্যবহার করতে হবে। তার জন্য ethics মানতে হয়। খবরের কাগজে journalism করতে হলে ethics মানতে হবে। তা না হলে ethics impose করা হয়। গণতন্ত্রের যে অধিকার, তা কেবল চেঁচিয়ে বেড়ালে পালন করা হয় না, বক্তৃতা করলে হয় না।

আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ২৪ লক্ষ টন খাবার বিদেশ থেকে এনে ৬৫ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। রেল-সেতু নাই, কাঠ নাই, বাঁশ নাই। ৬৫ হাজার গ্রামে খবর পৌঁছে দিয়েছি।

যাঁরা opposition করছেন, যান না রিলিফ কমিটি করে, চাঁদা তুলে একটা গ্রামের কিছু লোককে যদি খাওয়াতে পারেন, পাঁচটা লোককে যদি খাওয়াতে পারেন, তাহলেও বুঝি। শুধু খবরের কাগজে নাম উঠাবার জন্য বক্তৃতা করে 'গণতন্ত্র চাই' বললে কী হবে!

গণতন্ত্রে যেমন অধিকার আছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও রয়েছে। সেইজন্য শাসনতন্ত্র করার সময় আমরা চারটি স্তম্ভ ঠিক রেখেছি।

আমি শাসনতন্ত্রের উপর clause by clause বলতে চাই না। আমার সহকর্মীরা clause by clause আলোচনা করেছেন। সেইজন্য জনাব স্পিকার সাহেব, গণতন্ত্রের কথা আমরা যেমন শাসনতন্ত্রে বলেছি, তেমনি সেখানে কর্তব্যের কথাও রয়েছে।

জনগণের দাবির মধ্যে আছে ভোটের দাবি। গত বৎসর পর্যন্ত ভোটারের সর্বনিম্ন বয়সসীমা ছিল ২১ বৎসর, আমরা শাসনতন্ত্রে সেটা ১৮ বৎসর করেছি। এটাও জনগণের দাবির মধ্যে একটা।

আমরা শাসনতন্ত্র এনেছি। এর উপর আইন পাস হবে, যার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। আমার ভাইয়েরা ভুল করছেন, শাসনতন্ত্রের অর্থ আইন নয়। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইন হয়। আইন যে কোন সময় পরিবর্তন করা যায়। শাসনতন্ত্র এমন একটা জিনিস, যার মধ্যে একটা আদর্শ, নীতি থাকে। সেই শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আইন করতে হয়।

অনেকে ভুল করছেন, ভুল করে যাচ্ছেন। বলেছেন, শাসনতন্ত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন নাই বা বুঝতে পারেন না বা বুঝবার মতো আক্কেল নাই, তাই বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না। কারও আবার মগজ নাই।

শাসনতন্ত্রের একটা মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করে আইন হয়। সেই fundamental-এর উপর ভবিষ্যৎ অ্যাসেম্বলিতে আইন পাস হবে। এই মৌলিক আইনের বিরোধী কোন আইন হতে পারবে না।

শাসনতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী মানুষকে, মেহনতী মানুষকে যেন কেউ exploit করতে না পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী, সেইসব শোষককে curtail করা হবে।

শোষকদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় নাই বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার দাবিও আছে। আমার দেশে ফিরে আসার আগে দেশের লোক তাদের যে মেরে ফেলে নাই, সেজন্য তাদের শোকর করা উচিত। আমরা এমন শাসন ব্যবস্থা কায়েম করব, যেখানে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা থাকবে।

সাধারণভাবে যারা দোষী, যারা collaboration করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারির কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে, তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে জেলে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছি। আইনের শাসন আমরা মানি। যারা নিরপরাধ তারা নিশ্চয় মুক্তি পাবে।

যারা দোষী, যারা জনসাধারণের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, তাদের তারা নাগরিক-অধিকার দিতে চায় না। তাদের নাগরিক-অধিকার পাওয়া উচিতও নয়। কারণ, প্রকাশ্যে গাড়ি দিয়ে, ঘোড়া দিয়ে তারা পাক মিলিটারিকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ধরে, আমাদের ছেলেদের ধরে মিলিটারির কাছে দিয়েছে। নানাভাবে তারা collaboration করেছে।

জনাব স্পিকার সাহেব,

এই অ্যাসেম্বলির যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন, তার আশপাশে এবং এই অ্যাসেম্বলির এমন কোন দেয়াল নাই, যেখানে আমাদের ছেলেদের রক্তের দাগ ছিল না। এই আইনসভার সেই সব দাগ আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আইন পরিষদ দেশের শ্রেষ্ঠ স্থান। সেখানে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে কত লোককে ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে। আপনি দেয়ালের সেই সব দাগ

দেখেছেন কিনা, জানি না। এই পরিষদের যাঁরা কর্মচারী আছেন, তারা নিশ্চয় বলবেন, এখানকার ঘরে ঘরে, কামরায় কামরায়, দেয়ালে দেয়ালে রক্তের দাগ ছিল। অনেকে নিজের রক্ত দিয়ে দেয়ালের গায়ে জয় বাংলা লিখে গিয়েছে। এই অ্যাসেম্বলির হলের মধ্যে collaborator-দের সাহায্যে বহু মানুষকে ধরে এনে জুলুম করেছে।

নিরপরাধ যাঁরা থাকবেন, তাঁদের খালাস দেওয়া হবে। কিন্তু যারা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তাদের seat খালি করিয়ে, আচকান গায়ে দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, এহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাদের বাংলাদেশের নাগরিক-অধিকার দেওয়াতেও জনগণ আপত্তি করেছিল। জনগণ বাইরে পেলে তাদের কেটে ফেলত, তাদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি।

যাই হোক, আমরা সংবিধানের schedule-এ যা রেখেছি, তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বের শাসনকালের কিছু কিছু আইনকে আমরা protcetion দিয়েছি। সব দেশেই এটা করা হয়ে থাকে। তা না হলে litigation করে সব শেষ করে ফেলবে। দেশের প্রয়োজনেই এগুলিকে protection দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কতকগুলি আইন পাস করতে হলে আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ majority-র প্রয়োজন হবে। কতকগুলি শুধু majority-তেই পরিবর্তন করা যাবে। এই প্রকার difference না রাখলে অসুবিধা হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব,

আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র বলবৎ হবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি, সেই দিন, যেদিন জল্লাদবাহিনী রেসকোর্স-ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্রের মিত্র বাহিনীর যৌথ কম্যান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই তারিখ, সেই ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পিকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা রাখতে চাই ।

আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনি ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদ মুলতবি করতে পারেন। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সদস্যরা এসে আপনার সামনে original সংবিধানে দস্তখত করবেন। শাসনতন্ত্র বাংলায় হাতে লেখা হচ্ছে। তাতে সদস্যরা আপনার সামনে দস্তখত করবেন।

১৪ এবং ১৫ তারিখের পর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হবে। চালু হবে বাংলার মানুষের নতুন ইতিহাস।

স্পিকার সাহেব,

আপনার কাছে আজ আর একটা জিনিস ঘোষণা করতে চাই। আমি ইলেকশন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি। সরকারের সমস্ত সাহায্য তাঁকে দেব। আমি আশা করি, তিনি তা গ্রহণ করবেন। আমি উল্লেখ করছি যে, নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট করা হোক ঐ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে। কারণ, সেই দিন, সেই ৭ই মার্চে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করেছিলাম : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেই দিন, সেই ৭ই মার্চ তারিখে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চাই এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন বলে আমি চিফ ইলেকশন কমিশনারকে আবেদন করব।

জনাব স্পিকার সাহেব,

আপনার ধৈর্য নষ্ট করতে চাই না। আপনি গত রাত্রে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করেছেন। আমিও কিছু সময় ছিলাম। আপনাকেসহ কর্মচারীদের ধন্যবাদ, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ধন্যবাদ,

অ্যাসেম্বলির কর্মচারীদের—যাঁরা এই কষ্টের ভিতর বাইরে ডিউটি করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, তারা কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি খবরের কাগজকে কিছু না বলি, তাহলে আবার মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাই বলি, আপনারা এত কষ্ট করেছেন, এত কষ্টের মধ্যে বসেছেন, জায়গা আপনাদের ভালোভাবে দিতে পারি নাই। বসবার জন্য, এই কষ্টের মধ্যেও যে, এত ভালোভাবে অ্যাসেম্বলি থেকে শাসনতন্ত্রের প্রসিডিংয়ের রিপোর্ট করেছেন, তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, জানাই মোবারকবাদ আপনাদের। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও কয়েক বছর কষ্ট করবেন। কারণ, নতুন অ্যাসেম্বলিতে না যাওয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্টের সীমা নাই, আমাদেরও নাই। আর, দেশবাসী যখন কষ্ট করছে, তখন তার কিছু ভাগ নেওয়া উচিত।

জনাব স্পিকার সাহেব,

এই হাউসের পক্ষ থেকে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই। জনাব ডেপুটি স্পিকার পিছনে বসে আছেন, তাঁকে ধন্যবাদ না জানালে অন্যায় হবে।

তারপর, যাঁরা প্রেসে কাজ করেছেন এবং রাত জেগে এই সংবিধানের জন্য দু-তিন বার কাজ করতে হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ দেই।

ধন্যবাদ দেই ৩৪ জন মেম্বারকে, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ১১ এপ্রিল তারিখ থেকে। সেদিন এই সংবিধান-কমিটি আমরা করি।

তখন দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, দল-মত নির্বিশেষে আপনাদের যে কোন পরামর্শ, যে কোন মতামত থাকলে মেহেরবানি করে কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। যদিও দু একটি কেউ কেউ দিয়েছেন, কিন্তু যাঁরা খবরের কাগজে বক্তৃতা করেন, তাঁরা একখানাও দেন নাই। তাঁদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, অন্য কর্মীদের কাছ থেকে, অন্য মানুষের কাছ থেকে, প্রফেসরের কাছ থেকে আরও অনেক পেয়েছি। তাতে অনেক সাহায্য হয়েছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র যাঁরা মানেন না, যাঁরা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, তাঁরা মেহেরবানি করে এক কলম লিখে পাঠান নি। এটা আমাদের অভ্যাস, এটা স্বাভাবিক। জাত যায় না মলে, খাসলত যায় না ধুলে।

জনাব স্পিকার সাহেব,

আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের সেই বিপদের কথা, যে সব থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি। তার চেয়ে বড় কথা আমার জীবনের আজকের সবচেয়ে আনন্দের দিন, সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না ।

এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে, আমার দল যে ওয়াদা করেছিল, তার এক অংশ পালিত হলো। এটা জনতার শাসনতন্ত্র। যে কোন ভালো জিনিস না দেখলে, না গ্রহণ করলে, না ব্যবহার করলে হয় না, তার ফল বোঝা যায় না ।

ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে, শহীদের রক্তদান সার্থক হবে।

আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, জনাব স্পিকার। আজকে বিদায় নেওয়া হচ্ছে। তবে সদস্যরা আবার সংবিধানে স্বাক্ষর করতে আসবেন। তারপর, যাঁরা পাঁচ বছরের জন্য এসেছিলেন, তাঁরা সেই পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ না হতেই চলে যাবেন। এইভাবে তাঁরা যে ত্যাগের প্রমাণ দিলেন, উদারতা দেখালেন, সেটা পার্লামেন্টের ইতিহাসে বিরল। এর জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ! জয় বাংলা!

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

সুপ্রিমকোর্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু

সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাসী

বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট, ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, তাঁহার সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাসী। তিনি বলেন যে, আইনের শাসন কায়েমের জন্যই জাতিকে এত তাড়াহুড়া করিয়া একটি সংবিধান প্রদান করা হইয়াছে।

গতকল্য (সোমবার) অপরাহ্নে বাংলাদেশের সুপ্রিমকোর্টের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু এই ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সায়েম, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, হাইকোর্ট ও জজকোর্টের বিচারপতিবৃন্দ, আইনজীবীগণ, বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ ও সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁহার ২০ মিনিটকাল স্থায়ী ভাষণে বলেন, "আমরা আইনের শাসন বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করিয়াছি এবং বাংলাদেশের স্বাধীন মাটিতে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।" তিনি বলেন যে, "সুপ্রিমকোর্ট ব্যতীত জাতি চলিতে পারে না।"

বঙ্গবন্ধু আরও বলেন যে, মৌলিক মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা ও আইনের শাসন ব্যতীত কোন জাতিই পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে না। সংবিধান প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, সংবিধান প্রণয়ন ও নির্বাচন ছাড়াই তাঁহার দল আরও অনেক দিন ক্ষমতায় থাকিতে পারিত; কিন্তু তাহা করা হয় নাই। তিনি বলেন, "এইভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে আমরা চাহি নাই, কারণ, আইনের শাসনে আমরা বিশ্বাস করি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা এতদিন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি।"

বঙ্গবন্ধু বলেন, "ক্ষমতা দখলের জন্য আমরা রাজনীতি করি না।"

তবে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন যে, বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ অর্থে ইহা প্রশাসনযন্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ 'একঘরে' উহা বুঝায় না। কারণ, এক বিভাগ আরেক বিভাগের পরিপূরক।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, একে অন্যের হস্তক্ষেপ ছাড়াও রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ- প্রশাসন, বিচার ও আইন রাষ্ট্রের ৪টি মূলনীতির ভিত্তিতে একে অন্যের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, রাষ্ট্রের ৪টি মূলনীতি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রহিয়াছে। তিনি বলেন, "আমরা বিচারবিভাগে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না- তবে আমরা আশা করিব যে, আপনারা দেশের বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুসারে কাজ করিয়া যাইবেন।"

পূর্বাহ্নে সুপ্রিমকার্টের প্রধান বিচারপতি জনাব সায়েম প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ভাষণ দান করেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সুপ্রিমকোর্টকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, বাংলাভাষায় কোর্টের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবেন। ইহা ছাড়া কোর্টের কাজের জন্য সম্ভাব্য সংখ্যক বাংলা টাইপ রাইটার প্রদানের ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়তা দান করেন।

সূত্র : ইত্তেফাক, মঙ্গলবার, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭২

মেহনতি মানুষের জন্য ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে

স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়িবে : বঙ্গবন্ধু

শের-এ বাংলা নগর, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকায় প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, "গরিব ও মেহনতি মানুষের আত্মত্যাগেই স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে। আমি মেহনতি মানুষের সহিত বেইমানী করিতে পারি না। যদি আমি আমার গরিব মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি দেখিয়া যাইতে পারি, যদি দেখিয়া যাইতে পারি আমার মানুষ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান পাইয়াছে, তবেই আমি শান্তিতে মরিতে পারিব।"

মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সরকারের অধীনস্থ সরকারি কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে গতকাল বিকালে শের-এ বাংলা নগরস্থ সাবেক এমএনএ হোস্টেলে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় তিনি ভাষণ দিতেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য জনাব মনসুর আলী, জনাব এএইচএম কামরুজ্জামান, সাবেক তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত জনাব আবদুল মান্নান এমএনএ, মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানীসহ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, সাবেক মুজিবনগর সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান এবং বর্তমান শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাষ্ট্রীয় সফরে মস্কোতে গমন করায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি এই উপলক্ষে একটি বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি খোন্দকার আসাদুজ্জামান।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার ভাষণে বলেন, এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমার গরিব মানুষ, রিকশাওয়ালা, দিনমজুর, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতি মানুষ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, জীবন দিয়াছেন। সাদা পোশাকের সাহেবরা দুর্দিন-দুঃসময়ে সর্বদাই দূরে সরিয়া রহিয়াছে। আমি এই গরিব মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না।

বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন অর্থ হয় না। মেহনতি মানুষের মৌলিক অভাবসমূহ পূরণ না হইলে বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

তিনি বলেন, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যই স্বাধীনতা সংগ্রাম হইয়াছিল। গরিব মানুষকে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নিঃশেষিত হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান অবশ্যই ঘুচাইতে হইবে। তিনি বলেন, জনগণের স্বার্থের পশ্নে আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে কোনদিন আপস করি নাই।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চরম অসুবিধার মধ্য দিয়াও সরকারি দায়িত্ব পালন করায় মুজিবনগরের কর্মচারীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, স্বাধীনতার পর মুজিবনগরের কর্মচারীদের প্রতি সুবিচার করিতে পারি নাই। তাঁহাদের কষ্টে ও ত্যাগে স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে ইহাই তাঁহাদের বড় সান্ত্বনা। তিনি বলেন, মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত সরকারের কর্মচারিগণ তাঁহদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা জানিয়া এবং স্বাধীনতা অর্জিত হইবে কি-না সেই ব্যাপারে নিশ্চিত না হইয়াও তাঁহাদের আত্মীয় প্রিয়জনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে রাখিয়া মুজিবনগর চলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেদিন তাঁহাদের উপর সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির ভাগ্য নির্ভর করিয়াছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপর দিকে যেসব অফিসার মুজিবনগরে যায় নাই, তাঁহারা দখলদার বাহিনীর আমলে ৯ মাস সংগ্রামের সময় পুরাপুরি সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়াছেন এবং বেতন পাইয়াছেন। তিনি দুঃখ সহকারে আরও বলেন, আশা করা গিয়াছিল স্বাধীনতার পর তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিবে। কিন্তু তাঁহাদের যাহা পাওয়া উচিত ছিল তাহার চেয়ে বেশি পাওয়া

সত্ত্বেও তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয় নাই। তিনি আরও বলেন, ইহা বিপ্লবী সরকারের মহানুভবতা যে, এইসব অফিসারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

প্রধানমন্ত্রী দখলদার বাহিনী আমলের এইসব পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নেয়া কর্মচারীদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ প্রসঙ্গে তাহাদিগকে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের আহ্বান জানান। যদি এখনও তাঁহারা দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন না করেন তাহা হইলে ইহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বজ্রকঠোর কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, আমি একবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে তাহা হইতে আর পিছপা হই না।

তিনি সরকারি কর্মচারিগণকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং গণবিরোধী কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার উপদেশ দিয়া তিনি বলেন, আমি তাঁহাদিগকে জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে টাকা বানাইবার লালসা সামলাইবার জন্য বার বার সতর্ক করিয়াছি। তিনি আরও বলেন, দেশ দুর্নীতিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সমাজ হইতে দুর্নীতি দমনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জাতীয় চরিত্র পরিবর্তন করিতে হইবে

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় চরিত্র পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, সুস্থ জাতীয় চরিত্র ছাড়া কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না। আমরা সোনার বাংলা গঠন করিতে চাহিলে আমাদিগকে যে কোন মূল্যে চরিত্রবান হইতে হইবে।

আমি ৩০ লক্ষ শহীদ এবং স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহাদের জাতির পিতা। কিন্তু আমি দুর্নীতিবাজ ও দেশদ্রোহী ব্যক্তিদের জাতির পিতা হইতে ঘৃণা করি।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, বুধবার, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭২

শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ুন

বঙ্গবন্ধু স্মৃতিসৌধের ফলক উন্মোচনকালে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান
মিরপুর, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ এবং দেশকে গড়ে তোলার জন্যে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শুক্রবার ২২ ডিসেম্বর (১৯৭২) বিকেলে মিরপুরে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্দেশে আল-বদরের হাতে নিহত শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধের ফলক উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবার-পরিজন, বিদেশি কূটনীতিবিদ, মন্ত্রিসভার সদস্য, আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, আওয়ামী যুবলীগের নেতৃবৃন্দ এবং বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মিরপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আগত বিপুল সংখ্যক নরনারী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বুদ্ধিজীবীরা যে আদর্শের জন্যে জীবন দিয়ে গেছেন, সে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে না। যতদিন বাংলার মানুষ পেট পুরে খেতে না পারবে, দেশ থেকে অত্যাচার অবিচার দূর না হবে, আর শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম না হবে, ততদিন শহীদদের আত্মা তৃপ্তি পাবে না।

তিনি বলেন, মানুষ আজ না খেয়ে আছে। তাদের পরনে কাপড় নেই। দুর্বৃত্তরা তাদের সব ছিনিয়ে নিয়েছে। আসুন, আমরা সবাই মিলে শহীদদের আদর্শে দেশকে গড়ে তোলার জন্যে আত্মনিয়োগ করি। দেশ থেকে ঘুষ, দুর্নীতি দূর করার জন্য চেষ্টা করি। তবেই শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি আজো আমর মনে পড়ে। তাঁদের চেহারা আমার চোখের সামনে ভাসে। তাঁদের অনেকের সাথে আমি পড়েছি। অনেকের সাথে আমি দীর্ঘদিন কারাগারে ছিলাম। তাঁদের লেখা আমি পড়তাম। রাজনীতিতে অনেকে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁদের লেখনী দিয়ে তাঁরা বাংলার মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি দস্যুদের কারাগার থেকে বেরিয়ে আমি আর তাঁদেরকে দেখতে পাইনি।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, বুদ্ধিজীবী ভায়েরা শহীদ হয়েছেন। সুপরিকল্পিতভাবে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল ঠাণ্ডা মাথায়। আল-বদর, রাজাকার ও আল-সামস্-এর লোকেরা বাড়ি থেকে বের করে এনে তাঁদেরকে হত্যা করেছে। এদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও প্রকৌশলী। এদেরকে শুধু হত্যা করা হয় নি। চক্ষু উপড়ে ফেলা হয়েছে। হৃৎপিণ্ড বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের হার্ট তুলে ফেলা হয়েছে।

বিজ্ঞানীর মাথার মগজ তুলে নেওয়া হয়েছিল। দুনিয়ার ইতিহাসে এমন নির্মম হত্যাকাণ্ডের নজির নেই।

বঙ্গবন্ধু বলেন, এমন অমানবিক হত্যাকাণ্ডের পরও তাদেরকে নাকি ক্ষমা করতে হবে। তাদের নাকি বিচার করব না! কী জবাব দেব আমি শহীদদের মা-বাবার কাছে, তাঁদের ছেলেমেয়ে আর সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কাছে? তিনি বলেন, আমাদের মনে কারো প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই। প্রতিহিংসায় আমরা বিশ্বাস করি না। তবে আমরা ইনসাফে বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধু বলেন, পাকিস্তানি হানাদার দস্যুরা মনে করেছিল তারা আর বাংলার মাটিতে থাকতে পারবে না। তাই, আত্মসমর্পণের আগেই শুরু করেছিল বুদ্ধিজীবীদের নিধন। তারা মনে করেছিল অত্যাচার করলে আমরা আত্মসমর্পণ করব। কিন্তু তারা জানে না বাংলার ইতিহাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লড়াই সর্বপ্রথম শুরু হয় বাংলাদেশে। স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে গেছেন বাংলার তীতুমীর, সূর্যসেন আর হাজী শরিয়তউল্লাহ। সিপাহি বিদ্রোহও শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, মিরপুরে স্মৃতিসৌধ করা হয়েছে। এই জন্যে যে এখানেই একত্রে বহু বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া মিরপুরে গর্ত খুড়লে এখনও অনেক হাড় পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের অন্য কোন জায়গায় একত্রে এত লোককে হত্যা করা হয় নি।

স্মৃতিফলক উন্মোচনের পর বঙ্গবন্ধু শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তারপর আওয়ামী লীগ, ভারতীয় হাইকমিশনার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস, আওয়ামী যুবলীগ, ছাত্রলীগ, পুলিশবাহিনী, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নসহ বহু সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, শনিবার, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭২

এই শোষিত দুর্ভাগা দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই আমার স্বপ্ন : বঙ্গবন্ধু

গোপালগঞ্জ, ৬ জানুয়ারি ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ গোপালগঞ্জে ঘোষণা করেন যে, জনগণের অপরিসীম প্রীতি, আশীর্বাদ এবং সহযোগিতার জোরে তাঁহার দল ও সরকার যাহারা বিদেশে দেশের মান-মর্যাদাকে হেয় করার জন্য এবং বিদেশি সাহায্য লাভের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া দেশের অগ্রগতি প্রতিহত করিতে তৎপর রহিয়াছে, সেই সব চক্রান্তকারীকে নির্মূল করিয়া দিবে। তিনি বলেন যে, এইসব দুষ্কৃতিকারী বিদেশি স্বার্থে ও সাহায্যে প্ররোচিত হইতেছে।

অদ্যকার এই সভা গোপালগঞ্জের ইতিহাসে নজিরবিহীন অনন্য। এতবড় সমাবেশ এখানে আর কখনো হয় নাই।

জনগণের শক্তি ও ভালোবাসায় প্রধানমন্ত্রী পুনরায় তাঁহার দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি গণমানুষই তাঁহার অস্ত্র, তাঁহার শক্তি। দেশের বিপজ্জনক দুশমনদের সম্পর্কে সাবধান থাকার জন্য তিনি জনসাধারণকে পরামর্শ দেন এবং তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য আবেদন জানান।

গণবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রাষ্ট্র ও সমাজবিরোধীদের উৎখাত করার জন্য এবং দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য তিনি পুনরায় জনগণের প্রতি আহ্বান জনান। এই ধরনের লোকজনকে পাকড়াও করিয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ করার জন্যও তিনি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু শ্রোতাদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, জনগণের সহযোগিতা ছাড়া সমাজবিরোধীদের নির্মূল করা সম্ভব নয়।

বঙ্গবন্ধুও তাঁহার আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে তাঁহার জন্মস্থান গোপালগঞ্জের স্মৃতিচারণ করেন।

অশ্রুসজল নয়নে আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন যে, তিনি ক্ষমতা, মর্যাদা বা পদের জন্য রাজনীতি করিতেছেন না, বাংলার জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্যই তিনি রাজনীতির ময়দানে নামিয়াছেন।

তিনি বলেন, এই দুর্ভাগা, বঞ্চিত ও শোষিত ভূখণ্ডকে সত্যিকার সোনার বাংলায় পরিণত করাই আমার একমাত্র স্বপ্ন-সাধ।

বঙ্গবন্ধু তাঁহার কণ্ঠের সমগ্র জোর দিয়া ঘোষণা করেন যে, গণহত্যা, লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতনে যাহারা বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগিতা করিয়াছে, আইনের দরবারে তাহাদের অবশ্যই বিচার হইবে।

দেশের খাদ্য সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন যে, দেশের ঘাটতি পূরণের জন্য তাঁহার সরকার বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানি করিয়াছে। আগামী দিনগুলিতে যাহাতে দেশে কোন খাদ্য ঘাটতি দেখা না দেয় তজ্জন্য সরকার আরও খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, অবশ্য দেশ এইভাবে চলিতে পারে না। খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য জাতি পরনির্ভর হইয়া থাকিতে পারে না। আমাদের অবশ্যই যথাসম্ভব শীঘ্র খাদ্যে স্বনির্ভর হইতে হইবে।

স্বজনের সান্নিধ্যে

গোপালগঞ্জের অধিবাসীরা আজ অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধুকে এক বীরোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।

বঙ্গবন্ধুকে শুধু এক নজর দেখার জন্য নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে হাজার হাজার লোক এই ছোট শহরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। পুত্র শেখ কামাল ও রাসেলসহ তিনি হেলিকপ্টারযোগে এখানে অবতরণ করিলে জনতা মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে তাঁহাকে স্বাগত জানায়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতারা তাঁহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করেন।

স্থানীয় স্টেডিয়ামে পুলিশ বাহিনীর একটি দল তাঁহাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরে তিনি অপেক্ষমাণ স্থানীয় নেতাদের সহিত করমর্দন করেন।

হেলিবন্দর হইতে তিনি নিকটবর্তী একটি ছোট ঘরে যাইয়া উপস্থিত হন, এখানে তাঁহার শৈশব কাটিয়াছিল। ঘুরিয়া-ফিরিয়া তিনি বাল্যের স্মৃতিচারণ করেন।

সেখান হইতে তিনি ময়দানের জনসভায় গমন করেন।

সূত্র : ইত্তেফাক, ৭ জানুয়ারি ১৯৭৩

স্বাধীনতার সূর্যসৈনিক মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আহ্বান

"ষড়যন্ত্রকারী ও সমাজবিরোধীদের রুখিয়া দাঁড়াও"

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুইদিনব্যাপী মুক্তিযোদ্ধা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ :

দেশমাতৃকার দাসত্বের বন্ধন মোচনে যে দুর্জয় শপথ লইয়া মুক্তিযোদ্ধারা মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই একই মনোভাব লইয়া ষড়যন্ত্রকারী ও সমাজবিরোধদের রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধা যোগদান করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, প্রাক্তন গণপরিষদ সদস্যবৃন্দ, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ, মোজাফফর ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান শ্রী মণি সিং এবং বিদেশি দূতাবাসের কূটনীতিবিদগণও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি জনাব মাহমুদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনের সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধকালের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবদুল আজিজ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব নজরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, সম্মেলনে ভাষণদানের আগে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম গ্রহণ করেন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সহস্র সহস্র মুক্তিযোদ্ধা "বঙ্গবন্ধু যেখানে আমরা আছি সেখানে" ধ্বনি ও করতালি দিয়া বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানায়।

বঙ্গবন্ধু ৩৫ মিনিটকাল স্থায়ী তাঁহার ভাষণে বলেন, "এই ময়দান হইতেই আমি একদিন তোমাদের নিকট স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়াছিলাম। তোমাদের যার যা আছে তাই লইয়া বর্বর পাকিস্তানি হানাদার শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলে। বহু ত্যাগ আর লক্ষ লক্ষ মা-বোনের অশ্রুতে বাংলা স্বাধীন হইয়াছে। বর্বর শক্তি বাংলার মাটি হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও তাহাদের অনুচরেরা-শোষকশ্রেণী গা ঢাকা দিয়া রহিয়াছে। বাংলার অমূল্য স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করার জন্য তাহারা গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইয়া যাইতেছে। বিদেশি শক্তির এজেন্ট হইয়া তাহারা দেশকে অন্ধকারের আবর্তে ঠেলিয়া দিতে চাহিতেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আবার আমি আহ্বান জানাইতেছি, এই চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য তোমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।"

মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, "আপন শক্তি দিয়াই বাংলাদেশ তাহার সার্বভৌমত্বকে বিশ্বের বুকে চিরদিন অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিবে।"

সম্মেলনে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "বাংলাদেশ যতদিন আছে, বাংলার ইতিহাস যতদিন থাকিবে, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের ইতিহাস ততদিন অবিস্মরণীয় গাথা হইয়া বিরাজ করিবে।"

তিনি বলেন, বাংলার মুক্তিসংগ্রাম বহু আগে হইতে শুরু হইয়াছিল। বাংলার মানুষের পক্ষে আমি কথা বলিতাম বলিয়া আমাকে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী আখ্যা দিয়া ঘৃণা করিত, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজাইয়া আমার কণ্ঠরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। জনতার জোয়ারে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র ভাসিয়া গিয়া বিশ্বের বুকে বাঙালি জাতি মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, জাতির জন্য দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই সংবিধান রচনা করা হইয়াছে। সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকারের সুনিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে সুখী-সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করা দুই-ই কষ্টকর। বাংলার স্বাধীনতার শত্রুরা এখনো চক্রান্ত করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের উৎখাত না করা পর্যন্ত মানুষ শান্তিতে ঘুমাইতে পারে না।

তিনি বলেন, ভুয়া মুক্তিবাহিনীর সার্টিফিকেট দেখাইয়া বহু দুষ্কৃতিকারী কুমতলব হাসিল করার চেষ্টা চালাইতেছে। প্রত্যেক থানায়, ইউনিয়নে ইউনিয়নে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান চালাইয়া এই সব ভুয়া সার্টিফিকেটধারীদের শাস্তি দিতে হইবে।

প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নিকট নাম রেজিস্ট্রি করার আহ্বান জানান।

তোমরা আমার লালঘোড়া

বঙ্গবন্ধু বলেন, কিছুদিন আগে এই ময়দানেই আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম নির্বাচনে যদি জনগণ আমার উপর আস্থা স্থাপন করেন। সমাজবিরোধীদের উৎখাত করার জন্য আমি লালঘোড়া দাবড়াইয়া দিব। আমার এই কথার প্রকৃত অর্থ কেহ কেহ বুঝিতে না পারিয়া নানা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। যে কথা সেদিন বলি নাই, সমাজবিরোধীদের আমি জানাইয়া দিতে চাই, মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা তোমরাই আমার 'লালঘোড়া'। বাংলার স্বাধীনতা অর্জনে তোমরা যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ, আশাকরি, আমি হুকুম দিলে তোমরা সমাজবিরোধী গাড়ি-বাড়ি হাইজ্যাককারী, চোর-ডাকাতদের নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে।

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত কর

বঙ্গবন্ধু বলেন, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা অন্যায়কে কখনো প্রশয় দিতে পারে না এ বিশ্বাস আমার রহিয়াছে। সহস্র সহস্র মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে যদি দুই-একজন নীতিভ্রষ্ট হয়, ইহার জন্য সম্পূর্ণ মুক্তিযোদ্ধাদের উপর দোষ চাপাইয়া দেওয়া যায় না। বহু রাজাকার, আলবদর ও সমাজবিরোধী ব্যক্তি ভুয়া মুক্তিবাহিনী সাজিয়া গ্রামে গ্রামে ত্রাস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া লুণ্ঠন-পর্ব চালাইয়াছে, খুন-জখম-রাহাজানিতে শান্তিপ্রিয় মানুষের ঘুম কাড়িয়া লইয়াছে। তাহাদের দুষ্কর্ম প্রতিহত করার দায়িত্ব তোমাদেরও গ্রহণ করিতে হইবে।

মুক্তিযোদ্ধারা তুমুল করতালিতে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানায়।

বাংলার মানুষ শান্তি চায়

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলার মানুষ শান্তি চায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাকে পুনর্গঠনের কঠোর দায়িত্ব আমাদের পালন করিতে হইবে। দেশব্যাপী খাদ্য ঘাটতি। বিদেশ হইতে খাদ্য আনিতে হইবে। প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করিতে হইবে। '৭০-এর ঘূর্ণিঝড়, '৭১-এর মুক্তিসংগ্রাম, '৭২-এর অনাবৃষ্টি দেশব্যাপী করুণ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। চোর-ডাকাতের দল মানুষের চোখের ঘুম কাড়িয়া লইয়াছে। ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়া সমস্ত জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাদের করিতে হইবে। আমাদের সাহায্য দিয়া ভারত, রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্র যে সহায়তা করিয়াছে, উহাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া মানুষের শান্তি বিধান করার জন্য সকলের সহযোগিতা আমি কামনা করি।

নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হইবে

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, নির্বাচন অবাধ ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হইবে।

তিনি বলেন, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। জনতার রায়ের উপর অন্য কিছুকে স্থান দিতে পারি না। তাই ক্ষমতা আকড়াইয়া না থাকিয়া নির্বাচন ঘোষণা করিয়াছি।

বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার অঙ্গীকারমত জাতিকে গণতন্ত্র দিয়াছি, গণতন্ত্র রক্ষা করিতে হইলে উহার নীতিমালা অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে। গণতান্ত্রিক অধিকারকে অমর্যাদা করিয়া যাহারা অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র চালায়, তাহাদেরকে বাংলার মানুষ ক্ষমা করিবে না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বিদেশি শক্তির এজেন্টরা নির্বাচন বানচাল করার চক্রান্ত করিতেছে। তাহাদের সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।

তিনি বলেন, জনগণই ক্ষমতার উৎস। নির্বাচনে জনগণ যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আমি সসম্মানে আসন ত্যাগ করিয়া জনতার কাতারে গিয়া দাঁড়াইব। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিয়া রাখা যায় না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার সকলেরই রহিয়াছে। তবে নির্বাচন বানচাল করার অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। চক্রান্তকারীরা বাংলার জনগণের শত্রু বলিয়া চিহ্নিত হইবে এবং বাংলার জনগণও শত্রুর মোকাবিলা করার শক্তি রাখে!

বাংলাদেশ বিদেশি শক্তির উপনিবেশ হইবে না

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মেলনে ভাষণদানকালে বলেন যে, বাংলাদেশ কোন বিদেশি শক্তির উপনিবেশে পরিণত হইবে না। বাংলাদেশ সর্বদা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতিতে আমরা বিশ্বাসী। ভারত আমাদের মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাহায্য করিয়াছে এবং আমাদের বর্তমান অবস্থায় খাদ্য ও নানাভাবে সাহায্য দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে।

তিনি বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলা কোন কোন মহলের 'ফ্যাসন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্দিনের বন্ধুকে আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি না। আর এই কথাও সত্য, পারস্পরিক বন্ধুত্বের স্বার্থেই ভারতের সাহায্য আমরা গ্রহণ করিব, আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ভারতের কিছু বলার নাই।

তিনি বলেন, কোন বিদেশি শক্তির আশ্রয়ও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি আমাদের আদর্শ। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সহিত আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি, তবে আমাদেরকে কেহ পকেটে ভরিতে চাহিলে উহা আমরা বরদাশত করিব না।

চীনের জনগণের সহিত কোন শত্রুতা নাই

বঙ্গবন্ধু বলেন, সাম্রাজ্যবাদের শত্রু নির্যাতিত মানুষের বন্ধুর দাবিদার চীন-সরকার বাংলার নির্যাতিত মানুষের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সমর্থন জোগাইয়াছে। স্বাধীন বাংলার সার্বভৌমত্ব সারা বিশ্বে স্বীকৃত হইয়াছে। বাংলাদেশ তাহার অধিকার লইয়া জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য আবেদন জানাইলে চীন পাকিস্তানের সমর্থনে বিশ্ববিবেককে উপেক্ষা করিয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করিয়াছে।

তিনি বলেন, জাতিসংঘের সদস্য হোক বা না হোক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার মতো শক্তি পৃথিবীতে কাহারও নাই।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বন্ধুত্বের নীতিতে আমরা বিশ্বাসী। চীন সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ রহিয়াছে, চীনদেশের জনগণের সহিত আমাদের কোন শত্রুতা নাই।

তিনি বলেন, স্বাধীন হওয়ার পরও চীন দীর্ঘদিন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করিতে পারে নাই। আমি চীনকে সেই সত্য পুনরোপলব্ধি করার জন্য আহ্বান জানাই। বাংলার অধিকারও চীন দীর্ঘদিন ধরিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

সূত্র : ইত্তেফাক, ২২ জানুয়ারি ১৯৭৩

এ বিজয় জনগণের : বঙ্গবন্ধু

গণভবন, ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৭৩

নির্বাচনে এই বিজয় আমার নয়, আমার দলেরও নয়, এই বিজয় বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের যাঁহারা রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৃহস্পতিবার ৮ মার্চ (১৯৭৩) বিকালে গণভবনের সবুজ চত্বরে বিপুল সংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সহিত এক ঘরোয়া অথচ অন্তরঙ্গ পরিবেশে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তাঁহার দলের ঐতিহাসিক বিজয় সম্পর্কে আলোচনাকালে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এই সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন শিল্পমন্ত্রী জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সমবায়মন্ত্রী জনাব শামসুল হক, বন, মৎস্য এবং পশুপালনমন্ত্রী জনাব সোহরাব হোসেন, ডাক ও তার এবং যোগাযোগমন্ত্রী জনাব মোল্লা জালাল উদ্দিন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, রমনা-লালবাগ হইতে সদ্য নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য গাজী গোলাম মোস্তফা এবং ঢাকা নগরের বহু সংখ্যক বিশিষ্ট আওয়ামী লীগের কর্মী। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির উপর কালো মুজিব কোট পরিহিত ও হাতে পাইপ লইয়া নির্ধারিত সময়ে সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাতের জন্য গণভবনের নিচতলায় তাঁহার বৈঠকখানা হইতে স্মিতহাস্যে বাহির হওয়ার সময় প্রতীক্ষায় উন্মুখ সাংবাদিকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরেন। এক প্রত্যয়দৃঢ় সহাস্য কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসি এবং তাঁহারা আমাকে ভালোবাসেন—অতীতের মতো এবারের নির্বাচনেও তাহা আবার প্রমাণ হইয়া গেল। আমার সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে নীতি গ্রহণ করিবে জনগণ তাহার প্রতি তাঁহাদের সমর্থন ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, জনগণ ৪টি রাষ্ট্রীয় নীতি, সংবিধান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির প্রশ্নে তাঁহাদের রায় ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার সরকারের নির্বাচনোত্তর কর্মসূচি কি হইবে জানিতে চাহিলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষুধা হইতে মানুষকে মুক্ত করাই হইবে প্রথম কাজ। তিনি বলেন, পাকিস্তানি শাসকেরা যেসব সমস্যা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেশকে মুক্ত করিতে হইবে। তিনি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার আয়ত্তে আনয়নের ব্যাপারে সরকারের সহিত সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিরোধী দল প্রসঙ্গে

নির্বাচনে বিরোধী দলসমূহের পরাজয় সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন, জনগণের আস্থা অর্জন করিতে হইলে তাহাদের জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। জনগণের পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাদের জন্য কাজ করিতে হয়। হঠাৎ করিয়া জনগণের সমর্থন পাওয় যায় না।

তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হইয়াছে এবং নির্বাচন উপলক্ষে কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই।

তিনি আরও বলেন যে, সকল দলই তাঁহাদের বক্তব্য যথাযথভাবে জনগণের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন। এমন কি, স্বাধীনতার পর পরই গণতন্ত্র চালু এবং সরকারের নীতির সমালোচনা করার অধিকার দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই সরকার। ইহার পরও যদি তাঁহারা ভোট না পান তবে আমি কি করিতে পারি? তবে কি আমাকে ভোট দিতে বলেন?

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে

পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সুদৃঢ় কণ্ঠে বলেন যে, খুব শীঘ্রই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলাদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

জনৈক বিদেশি সাংবাদিক দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন : আপনাদিগকে তো পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে শুনি না। তিনি বলেন, কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা তো আটক বাঙালিদের দেখাশোনা করে না। আটক বাঙালিগণ বন্দি শিবিরে অনাহারে-অনিদ্রায় এক দুঃসহ জীবনযাপন করিতেছে। অথচ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী অবাঙালিদের আন্তর্জাতিক রেডক্রস সমিতি যথাযথভাবে দেখাশোনা করিতেছে।

সূত্র : ইত্তেফাক, ৯ মার্চ ১৯৭৩

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু :

শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে আর কেরানি চাই না- চাই দেশগড়ার কারিগর দেশকে ভিক্ষুকের রাষ্ট্র করতে চাই না

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৫ মার্চ ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার জন্য বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ১৫ মার্চ (১৯৭৩) সকালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক উৎসব মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদান প্রসঙ্গে একথা বলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম এ নাসের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে বক্তৃতা করেন প্রকৌশল বিশ্ববিদালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব আবদুল মতিন পাটোয়ারী, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব আবুল কাশেম ও ড. জহুরুল হক প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আমাদের দেশে এমন ধরনের গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, যে শিক্ষায় সত্যিকার মানুষ গড়ার মাধ্যমে জাতিকে নতুন করে সংগঠিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন যে, একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাই দ্রুত দেশগড়ার কাজে সহায়ক হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, গত দু শ' বছরের ব্রিটিশ শাসনে এবং পঁচিশ বছরের পাকিস্তানি শাসনে এ দেশে কেরানি পায়দার শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থার যদি আমূল পরিবর্তন না হয়; বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি আমরা ভেঙ্গে-চুরে নতুন করে ঢেলে সাজাতে না পারি তাহলে এ দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা কমিশনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, অতিসত্বর শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রদানের জন্য তিনি কমিশনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে, দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, দেশ ও জাতির চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে কমিশন এমন একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন যার ফলশ্রুতি হিসেবে সমাজতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করবে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়নের ব্যাপারে কোন অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিলে তা দূর করার জন্য তিনি সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য সরকার আজ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে, এই রিপোর্ট প্রণয়ন ত্বরান্বিত করার কাজে কমিশন কোন প্রচেষ্টারই ত্রুটি রাখবেন না।

প্রধানমন্ত্রী বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের অপরিসীম ত্যাগের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ দাবি-দাওয়া প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষকে দেশের পাহাড় প্রমাণ সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, সরকার আজ হাজারো সমস্যার সম্মুখীন। গত দু শ' বছরের ব্রিটিশ শাসন আর পঁচিশ বছরের পাকিস্তানি কুশাসনের ফলশ্রুতি হিসেবে সমস্ত সমস্যার বোঝা আজ বর্তমান সরকারের ঘাড়ে বর্তেছে।

প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, খাদ্য, ওষুধ ও কাপড় থেকে শুরু করে আজ প্রতিটি জিনিস বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। তিনি বলেন যে, খাদ্য সমস্যার মোকাবিলার জন্য চলতি মৌসুমে ১১৪ থেকে ১২৫ কোটি টাকার খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করা হবে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু কোন দাবি-দাওয়া উত্থাপনের আগে সমস্যা জর্জরিত দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, এই সীমিত সম্পদের মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান করা হবে। তিনি বলেন যে, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আমাদের দেশগড়ার কাজে সহায়ক হবে– সেখানে কার্পণ্য করা চলবে না। আমি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাব।

আর কেরানি চাই না– চাই দেশগড়ার কারিগর

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সরকার সাধারণ শিক্ষার চেয়ে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার উপর অনেক বেশি জোর দেবে। তিনি বলেন, কারণ, সাধারণ শিক্ষা শুধুমাত্র কেরানিরই জন্ম দিতে পারে। দেশের বর্তমান মুহূর্তে আমার কেরানির প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত দেশ গড়ার কারিগর।

শিক্ষা কমিশন সবার মতামত নেবে

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, তাঁর সরকার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণয়ন সম্পর্কে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি স্তরের জনগণের মতামত অবশ্যই নেবে। এই প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, জনগণের দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্রের ওপরও মতামত আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু দু'একটি চিঠি ছাড়া আমরা আর কোন মতামত পাই নাই।

দেশকে ভিক্ষুকের রাষ্ট্র করতে চাই না

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, বাংলাদেশকে ভিক্ষুকের রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই না।

দেশের বর্তমান সমস্যা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, বিদেশি সাহায্যের আমার প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দিয়ে নয়, আত্মসম্মানের বিনিময়ে সাহায্য চাই না। বন্ধুত্বের বিনিময়ে যে সাহায্য তা আমরা অবশ্যই গ্রহণ করব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে নয়, নিজের সমস্যা নিজে সমাধানের উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য আমাদের সর্বদাই সচেষ্ট থাকতে হবে। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন যে, যদি আজ আমরা নিজেরা দেশকে গড়ে তুলতে পারি তাহলেই সত্যিকার শান্তি ও সমৃদ্ধি আমাদের আসবে। এই প্রসঙ্গে তিনি পারতঃপক্ষে বিদেশি শক্তি ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা প্রসঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, অত্যধিক পরনির্ভরতা জাতির জন্য শুধু ধ্বংসই ডেকে আনতে পারে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫ জন শিক্ষক গ্রহণের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ১৮৫ জন শিক্ষক গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্বল্পতা সংক্রান্ত একটি দাবির প্রেক্ষিতেই বঙ্গবন্ধু এই নির্দেশদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি কম্পিউটার সংক্রান্ত দাবির প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, তাঁর সরকার অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এই কম্পিউটারদানের দাবিটি বিবেচনা করবে। অবশ্য এতে কিছু সময় লাগতে পারে বলে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন।

বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় উৎসব মেলার উদ্বোধন করেছেন

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৃহস্পতিবার ১৫ মার্চ (১৯৭৩) সকাল সাড়ে ন'টায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তাহব্যাপী উৎসব মেলার শুভ উদ্বোধন করেছেন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই উৎসব মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে "জয় বাংলা", "জয় মুজিববাদ" ধ্বনিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে সমবেত দেশি ও বিদেশি অতিথিবৃন্দ দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এই উৎসব মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে মাল্যভূষিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দসহ বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রকৌশলী ও স্থপতিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দসহ আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলী, শ্রমমন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরী, ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েল আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ভারতীয় প্রকৌশলী প্রতিনিধি দল এই উৎসব মেলায় অংশ গ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম এ নাসের বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে আয়োজিত বিভিন্ন প্রদর্শনী ঘুরে ঘুরে দেখান। উল্লেখযোগ্য যে, উৎসব মেলা উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যোগে নানা ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। বঙ্গবন্ধু এই প্রদর্শনী দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সূত্র : বাংলার বাণী, ১৬ মার্চ ১৯৭৩

বিশ্বের সকল শান্তিকামী শক্তি সুসংহত হউন : বঙ্গবন্ধু

শের-এ বাংলা নগর , ঢাকা, ২৩ মে ১৯৭৩

২৩ মে ১৯৭৩ 'জুলিও কুরি' পদকে সম্মানিত হওয়ার পর এশীয় শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা "বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক এবং সকল শান্তিকামী শক্তি সুসংহত হউক—ইহাই আমরা চাই।"

ঢাকার শের-এ বাংলা নগরে (বুধবার, ২৩ মে ১৯৭৩) এশীয় শান্তি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত হওয়ার পর ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু এই উক্তি করেন।

বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, আরব রাষ্ট্রসমূহ, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্থার প্রায় দেড়শত প্রতিনিধি যোগদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্বে বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল শ্রী রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করেন এবং ভাষণদান করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁহার ভাষণে বলেন, বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষভাবে আগ্রাসীনীতি অনুসারী কতিপয় মহাশক্তির অস্ত্রসজ্জা তথা অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে আজ এক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন, আমরা চাই অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত অর্থ দুনিয়ার দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করা হউক।

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সহকর্মী প্রতিনিধিরা আমাকে 'জুলিও কুরি' শান্তিপদকে ভূষিত করিয়া যে সম্মান দিয়াছেন, আমি একান্তভাবে অনুভব করি যে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, ইহা বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের।

বঙ্গবন্ধু বলেন, এই সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহীদদের, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের। তিনি বলেন, 'জুলিও কুরি' শান্তিপদক সমগ্র বাঙালি জাতির।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্বশান্তি পরিষদের কার্যকলাপ কৃতজ্ঞতার সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বশান্তি পরিষদ প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা যাঁহারা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বিশ্বশান্তি পরিষদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় বলিয়া প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, বিশ্বশান্তিই তাঁহার জীবনদর্শনের অন্যতম মূলনীতি। তিনি বলেন, নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত, শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ, সে বিশ্বের যে কোন স্থানেই হোক না কেন, তাঁহাদের সাথে আমি রহিয়াছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সকলের সহিত বন্ধুত্ব, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নয়—শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এই নীতিতে আমরা আস্থাশীল।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, মুক্তিকামী মানুষের ন্যায়সংগত সংগ্রাম অস্ত্রের জোরে স্তব্ধ করা যায় না। সেই জন্যই ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, অ্যাংগোলা, মোজাম্বিকসহ দুনিয়ার সকল উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশ অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছে বলিয়া বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার ভাষণে দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের সকল স্থানের বর্ণভেদবাদী নীতির তীব্র নিন্দা করেন। বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানের একগুঁয়ে নীতি উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দিকে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সর্বশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তির সৈনিকদের অভ্যর্থনা জানাইয়া ও সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া এই মহান সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, বৃহস্পতিবার, ২৪ মে ১৯৭৩

পার্বত্য জনগণ সমান সুবিধা ভোগ করবে : বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা, ৬ জুন ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল বুধবার বলেন, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ দেশের অন্য অঞ্চলের জনগণের মতোই সমান সুযোগ সুবিধে ভোগ করবেন।

গতকাল বুধবার বাসস পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়, রাঙামাটির জাতীয় সংসদ সদস্যা শ্রীমতী সুদীপ্তা দেওয়ান গতকাল সংসদ ভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার চেম্বারে দেখা করলে বঙ্গবন্ধু একথা বলেন।

শ্রীমতী দেওয়ান পার্বত্য অঞ্চলের কিছু সমস্যার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর কাছে কিছু প্রস্তাবও পেশ করেন।

শ্রীমতী দেওয়ান প্রস্তাব করেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাবলীর বিশেষ করে উন্নয়ন, যোগাযোগ ও শিক্ষা সমস্যার সমাধানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

প্রধানমন্ত্রী ধৈর্য সহকারে শ্রীমতী দেওয়ানের বক্তব্য শুনে বলেন, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী যে পার্বত্য অঞ্চলকে অনুন্নত রেখেছিল সে ব্যাপারে তিনি সজাগ।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন, চিকিৎসা ও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের মতো কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পার্বত্য অঞ্চলের ছাত্রদের জন্যে কিছু আসন সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাবটি তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, বৃহস্পতিবার, ৭ জুন ১৯৭৩

আমাদের শান্তির প্রতিশ্রুতি সর্বাত্মক : বঙ্গবন্ধু

অটোয়া, কানাডা, ৩ আগস্ট ১৯৭৩

কানাডার রাজধানী অটোয়ায় ১৯৭৩ সালের ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণ :

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, "আমরা শান্তির জন্য সর্বাত্মকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "মাত্র সেদিন আমরা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দুর্ভোগ পোহাইয়াছি এবং জনগণের ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের জন্য বর্বর শক্তির ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। সুতরাং, শান্তির জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি সর্বাত্মক।"

তিনি বলেন যে, "এই জন্যই আমরা স্থায়ী শান্তি অর্জনের স্বার্থে উপমহাদেশের দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য কোন চেষ্টাই বাকি রাখি নাই।"

তিনি বলেন, "আমরা সব সময় এই কথাই বলিয়াছি যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে একসঙ্গে বসিলে সমস্ত অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধান করা সম্ভব।

দুর্ভাগ্যবশত বাস্তবতা স্বীকারে পাকিস্তানের ব্যর্থতা, সমস্যা সমাধান ও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, পাকিস্তানে, প্রায় ৩ লক্ষ বাঙালিকে আটক রাখার ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হইয়াছে। তিনি বলেন যে, দুর্ভাগ্য লোকদের চাকরি হইতে অপসারণ করিয়া চরম দুরবস্থার মধ্যে বন্দি শিবিরে পাঠানো হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তানের সংবিধানের এক ধারায় বাংলাদেশের সমগ্র ভূখণ্ডের উপর দাবি পর্যন্ত সন্নিবেশিত করা

হইয়াছে, যাহার অর্থ দাঁড়ায় আগ্রাসী নীতি। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের সংবিধানে এ ধারা এমন এক সময় সন্নিবেশিত হইয়াছে যখন ৯৫টিরও বেশি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাইয়াছে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, "এইসব উস্কানি সত্ত্বেও মানবিক সমস্যাবলি সমাধানের জন্য গত এপ্রিল মাসে আমরা ভারতের সঙ্গে একত্রে একটি বড় রকমের পদক্ষেপ গ্রহণের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। স্বীকৃতির প্রশ্ন আলাদা রাখিয়াও আমরা একযোগে পাকিস্তানে আটক সমস্ত বাঙালি, বাংলাদেশে অবস্থানরত সমস্ত পাকিস্তানি এবং যাহাদের বিরুদ্ধে জঘন্যতম যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ রহিয়াছে এইরকম ১ শত ৯৫ জন ব্যতীত ৯২ হাজার যুদ্ধবন্দি ও আটক অসামরিক ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণের জন্য আমাদের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করি।"

তিনি বলেন যে, সমগ্র বিশ্ব এই যুক্ত ঘোষণাকে অভিনন্দন জানায়। যে সমস্ত কমনওয়েলথ দেশ এই ঘোষণাকে সমর্থন জানাইয়াছে তিনি তাহাদের ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বাংলাদেশ ও ভারতের এই প্রয়াসের ফলে যুক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে গত সপ্তাহে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আন্তরিক আশা প্রকাশ করেন যে, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী বৈঠকে সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন যে, ইহাতে শুধু পাঁচ লক্ষের মতো লোকেরই দুঃখ-দুর্দশার পরিসমাপ্তি হইবে না বরং শান্তির পথও সুগম হইবে।

জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে কোন প্রয়াসকে আন্তরিক সহযোগিতা দান করিব। সংঘর্ষ-সংঘাতমুক্ত ও পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন পরিবেশকে স্বাগত জানাইয়া তিনি বলেন যে, আমরা স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইন্দোচীন প্রসঙ্গে

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাইয়া বঙ্গবন্ধু বলেন যে, প্যারিস শান্তি চুক্তির ধারাগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় ও কম্বোডিয়ার বোমাবর্ষণ বন্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শান্তি স্থাপন সুদূরপরাহত।

ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে

বঙ্গবন্ধু ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমস্ত সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি মোজাম্বিকে গণহত্যা ও আফ্রিকার অন্যত্র বর্ণবৈষম্যের নিন্দা করেন এবং মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা ও আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলসহ বিশ্বের সর্বত্র স্বাধীনতাকামীদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি আরব ভূখণ্ডে অবৈধ ইসরাইলি দখল ও তজ্জনিত শান্তির প্রতি হুমকির অবসান কামনা করেন।

কমনওয়েলথ প্রসঙ্গে

কমনওয়েলথ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, এই রাষ্ট্রসংঘে উন্নত ও উন্নয়নগামী দেশসমূহের প্রতিনিধিত্ব রহিয়াছে। তিনি অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে উন্নত দেশগুলির ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, উন্নয়নগামী দেশগুলির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উন্নত দেশগুলি তাহাদের নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান জানাইয়া বঙ্গবন্ধু বলেন যে, অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান ও পারমাণবিক পরীক্ষা দ্বারা আবহাওয়া দূষিত করার বিরুদ্ধে কমনওয়েলথের উচিত জনমত গড়িয়া তোলা।

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ভয়াবহ দিনগুলিতে কমনওয়েলথ হইতে আমরা প্রেরণা লাভ করিয়াছি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের সময়ও আমরা উপলব্ধি করিতেছি যে, আমরা নিঃসঙ্গ নই।

সূত্র : ইত্তেফাক, শনিবার, ৪ আগস্ট ১৯৭৩

জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের ধারণা নস্যাৎ করে বিস্ময় বিমুগ্ধ নেতৃবৃন্দের মাঝে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা

আমরা বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সংহতির এবং নির্যাতিত জনগণ ও তাহাদের ন্যায়ের সংগ্রামের সমর্থকদের সপক্ষে

আলজিয়ার্স, আলজেরিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে ১৯৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

জোটনিরপেক্ষ জাতিগোষ্ঠীতে আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য এখানে উপস্থিত সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

এই গোষ্ঠীতে শান্তি ও প্রগতির প্রতিনিধিত্বমূলক শক্তির পার্শ্বে নিজের স্থান করিয়া নিতে সক্ষম হওয়া বাংলাদেশের পক্ষে প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করিবে।

যে তিন জন মহান রাষ্ট্রনীতিবিদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হয়, তাঁহাদের আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি। এই তিন মহাননেতা হইতেছে প্রেসিডেন্ট টিটো, প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের এবং পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু। আমরা যদিও প্রেসিডেন্ট নাসের ও পণ্ডিত নেহেরুকে হারাইয়াছি, সৌভাগ্যক্রমে প্রেসিডেন্ট টিটো ও পণ্ডিত নেহেরুর সুযোগ্যা কন্যা মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে আমাদের মাঝে পাইয়াছি।

জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা জীবন বিসর্জন দিয়াছেন, আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম তথা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের সেইসব বীর শহীদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমি শহীদদের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় মুক্তিসংগ্রামরত মানুষের পিছনে বাংলাদেশ সর্বদাই থাকিবে।

আলজেরিয়ার বীর জনগণ এবং সাহসী নেতৃবৃন্দ যাঁহারা ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামকে গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের পথে পরিচালিত করিয়া সারা বিশ্বে মুক্তিসংগ্রামীদের প্রেরণার উৎসহ হইয়া রহিয়াছেন, তাহাদিগকে আমি সালাম জানাই। এই সম্মেলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে সব রকম প্রয়াসী হওয়ার জন্য সম্মেলনের চেয়ারম্যান স্বাধীনতার মহান সংগ্রামী নেতা প্রেসিডেন্ট বুমেদীন ও আলজেরিয়ার সরকার ও জনগণকে আমি অভিনন্দন জানাই।

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পদার্পণের মুহূর্তে জোটনিরপেক্ষতার নীতির সমর্থনে যে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন দেখা দিয়াছে উহা অর্থহীন নহে। এই শতাব্দী ইতিহাসের নৃশংসতম ও সবচাইতে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের শিকার হইয়াছে। এই শতাব্দী মেহনতী মানুষের জাগরণও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আমরা যেভাবে বুঝি, জোটনিরপেক্ষতার নীতিতে সাধারণ মানষের সবচাইতে মৌলিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

এই জন্যই আমরা আমাদের সংবিধানে এই সব নীতিকে সন্নিবেশ করিয়াছি এবং সংবিধান অনুযায়ী আমরা সারা বিশ্বের উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষের ন্যায়ের সংগ্রামে সমর্থনদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি এ কথা জোর দিয়ে বলা প্রয়োজনবোধ করিতেছি যে, সারা বিশ্ব যে নির্যাতনকারী ও নির্যাতিত, নির্যাতনের সহায়ক সমর্থক ও নির্যাতিতদের সহায়ক সমর্থকদের মধ্যে বিভক্ত, 'তৃতীয় বিশ্ব' কথাটি এই মৌলিক বাস্তবতাকে কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

আমি এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া দিতে চাই যে, আমরা বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সংহতির এবং নির্যাতিত জনগণ ও তাহাদের ন্যায়ের সংগ্রামের সমর্থকদের সপক্ষে।

বিভিন্ন জাতি যেমন নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে, শোষণ ও আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহে, বিশ্বের সর্বত্র নারী ও পুরুষ শান্তি কামনা করে, তাহারা মর্যাদার সঙ্গে স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে চাহে। এই আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য জনগণকে শোষণের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। এ লড়াই ছিল অত্যন্ত কঠিন। উপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছে। আমাদের এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, পূর্বেকার সম্মেলনগুলিতে গৃহীত বীরত্বব্যঞ্জক ও আবেগময় কথাগুলি শুধু ফাঁকা কথাই থাকিয়া যাইত, যদি সেগুলি এমন সব লোকের রক্তে লেখা না হইত, যাহারা উহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। আজকে আমরা যখন জোটনিরপেক্ষ নীতির জন্য 'কার্যকর কর্মসূচি'র কথা বলি, তখন আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইহার অর্থ আমাদের পক্ষ হইতে সর্বাত্মক প্রতিশ্রুতি এবং মানবতার বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ অত্যাবশ্যক। যে পরিবেশে এখনও পর্যন্ত জাতীয় মুক্তিসংগ্রামরত জনগণ তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে, যে পরিবেশে প্রতিটি রাষ্ট্র স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে ও নিজস্ব সম্পদের উপর সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করিতে পারে এবং সুন্দর জীবনের মৌলিক শর্তাবলি পূরণ করিতে পারে—আমরা এখন সেই শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

কিন্তু অনুরূপ শান্তি এখনও পর্যন্ত অর্জিত হয় নাই। আরব ভূমি এখনও পর্যন্ত ইসরাইলের অবৈধ দখলে। প্যালেস্টাইনের জনগণ এখনও পর্যন্ত তাহাদের মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত। অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, গিনি বিসাউ, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিসহ বিশ্বের অন্যত্র জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম অব্যাহত রহিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের ভাইরা এখনও পর্যন্ত বর্ণবাদের শিকার। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওসের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনও পর্যন্ত হয় নাই। এইসব সমস্যার সমাধান যে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয় শর্ত ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় যাহারা জাতীয় মুক্তি ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহাদের সম্মেলনের পূর্ণ সমর্থন দান করা উচিত।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমি নিবেদন করিতে চাই যে, আজকের প্রয়োজন হইতেছে শুধু মৌলিক লক্ষ্য ও নীতি ঘোষণার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ ও কাজের বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সংবলিত ব্যাপক স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন।

এই স্ট্র্যাটেজির প্রয়োজনীয়তা 'শান্তির এলাকা' সৃষ্টির জন্য 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরপেক্ষীকরণ', 'স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা' ও ভারত মহাসাগর এলাকাকে 'শান্তির এলাকা' হিসাবে ঘোষণার প্রস্তাবিত পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। অনুরূপ পরিকল্পনার প্রতি আমরা আমাদের সমর্থনের কথা প্রকাশ করিয়াছি। অবশ্য আমাদের মতে, অনুরূপ পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের খুঁটিনাটি এখনও পর্যন্ত প্রস্তুত করা হয় নাই। এ ব্যাপারে আরও ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়োজন। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক হইতেছে ওই সমস্ত পরিকল্পনাকে অর্থবহ বাস্তবতায় পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা। আমাদের এ সত্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমস্ত পরিকল্পনার ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ ও বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান। সুতরাং, অনুরূপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে কতিপয় শুভ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে আমরা সবাই উহাকে স্বাগত জানাইতে পারি।

বিশ্বের কতিপয় অঞ্চলে সমঝোতার দিকে পদক্ষেপ, যেমন প্যারিস শান্তি চুক্তি, কম্বোডিয়ার বোমাবর্ষণ বন্ধ উল্লেখযোগ্য। আমাদের উপমহাদেশে আমাদের সম্মুখীন জরুরি মানবিক

সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার ক্ষেত্রে সফল হইয়াছি। আমরা ইহাকে উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ মনে করি বলিয়া চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভবপর করার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে যথেষ্ট আপস মনোভাবের পরিচয় দিয়াছি।

শান্তির স্ট্র্যাটেজিতে অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি এবং সর্বাত্মক ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। মানবজাতিকে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধাস্ত্রের বিষাক্ততা ও সম্পদের ব্যাপক অপচয়ের নির্বুদ্ধিতা হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই মূল্যবান সম্পদরাজিকে জরুরি মানবিক প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগানো উচিত।

শান্তির স্ট্র্যাটেজির একটা অত্যাবশ্যক অর্থনৈতিক দিকও আছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ধনী দেশগুলি সম্মিলিত ও সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে, অনেক সময় দরিদ্র দেশগুলির ভাগ্যের বিনিময়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছে। অপর পক্ষে আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলি বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি, রপ্তানিতে অচলাবস্থা, খাদ্য ঘাটতির ফলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি। আমাদের সামনে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, ব্যাধি ও বেকারত্বের পর্বত প্রমাণ সমস্যা। এই পরিস্থিতিজনিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আমাদের করিতেই হইবে। কারণ, আমাদের অস্তিত্বই এখন বিপন্ন। জনগণই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনগণ কীভাবে আপাত অলঙ্ঘনীয় বাধার বিরুদ্ধেও কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে, আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের দেশগুলির মেধা-সম্পদকে একত্রে সংহত করিতে হইবে। নয়া কলা-কৌশল উদ্ভাবন করিতে হইবে। দুর্গত মানবতার সেবার জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইতে হইবে এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধাস্ত্র তৈরির নিন্দা যেন আমরা অর্জন না করি।

উপনিবেশবাদের ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব ও মূল্যবোধের পরিবর্তে সামাজিক বিপ্লবের উপযোগী মনোভাব গড়িয়া উঠিলে তবেই ঔপনিবেশিকতা হইতে মুক্তির কাজ যথার্থভাবে সম্পন্ন হইবে।

আমার বিশ্বাস, লুসাকা ও জর্জ টাউন সম্মেলনে 'স্বনির্ভরশীলতা ও বর্তমান জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে কার্যকর অর্থনৈতিক সহযোগিতা'–এই দুই মৌলিক নীতিভিত্তিক 'অ্যাকশন প্রোগ্রাম' এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে পারে। অবশ্য ইহার জন্য প্রয়োজন জনগণকে সংগঠিত করিয়া পূর্ণভাবে কাজে লাগানো, প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও যথার্থ সামাজিক বিপ্লবের জন্য বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো।

ইহার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে সামাজিক বিপ্লব আনয়নের জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সাধারণ দৃঢ়সংকল্প।

আমাদের সম্পদ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করিতে হইবে। আমাদের প্রচেষ্টাকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। এই মুহূর্তে যে ক্ষেত্রে অনুরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন তাহা হইতেছে খাদ্য। আমার বিশ্বাস, জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা যাইতে পারে। আমাদের সামনের কাজ সম্পাদন সহজ নহে, কারণ, ভিতরে ও বাহিরে কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে। কিন্তু এ লড়াই অবশ্যম্ভাবী। শান্তি, স্বাধীনতা ও শোষণ হইতে মুক্তিলাভ করিতেই হইবে। সুতরাং, উপসংহারে আমি শুধু সাধারণ ভাষায় লক্ষ্য ও নীতির দৃঢ় ঘোষণাই নহে, বরং আমরা যাহাতে আমাদের সাধারণ সমস্যাবলির সমাধান করিতে পারি, তজ্জন্য বাস্তব ও গঠনমূলক তৎপরতার জন্য ব্যাপক স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়াসী হওয়ার আহ্বান জানাইতেছি।

সূত্র : ইত্তেফাক, মঙ্গলবার, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

টোকিওর ভোজসভায় বঙ্গবন্ধু

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মিলিত প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান

টোকিও, জাপান, ১৮ অক্টোবর ১৯৭৩

জাপানের টোকিওতে জাপান-বাংলাদেশ সমিতি কর্তৃক ১৯৭৩ সালের ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় তাঁর সম্মানে দেওয়া ভোজসভায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ :

আমার দেশ এবং আমার উদ্দেশ্যে আপনারা যে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন এজন্য আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আপনাদের অতুলনীয় আতিথেয়তায় আমি অভিভূত। আমার জাপান অবস্থানের প্রথম সন্ধ্যাতেই বাংলাদেশের এত শুভাকাঙ্ক্ষী এবং এত সম্মানিত বন্ধুদের মধ্যে নিজেকে পেয়ে আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি। মি. প্রেসিডেন্ট, আমার জাপানি বন্ধুরা, বাংলাদেশের জন্য আপনারা যা কিছু করেছেন, আজ এখানে আমার সরকার এবং দেশের পক্ষ থেকে তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে আপনারা যে সাহায্য এবং সহায়তা দিয়েছেন, তা ছিল আমাদের শক্তির উৎস। আপনাদের দেওয়া সেই সাহায্য সহানুভূতি, বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের জনগণ এবং তার সমস্যা সম্পর্কে জাপানের জনগণ ভালোভাবেই জানেন। তাই, স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আপনারা সমবেতভাবে বিভিন্ন মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আপনাদের এসব মহান কার্যক্রম দুদেশের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়েছে। আর এই বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই হচ্ছে আমাদের দুদেশের সম্পর্কের মূল বৈশিষ্ট্য।

মি. প্রেসিডেন্ট, গত বছর বাংলাদেশ সফরে গিয়ে আপনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সম্মানিত করেছেন। স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যে আপনি স্বচক্ষে আমার দেশের মানুষের অবস্থা জানতে গিয়েছেন। এতে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আপনার সহানুভূতি কত গভীর তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি এবং আমার দলের সদস্যরা এতদিন ধরে আপনাদের এই মনোরম দেশ দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কারণ, এর মাধ্যমে আমরা মহামান্য সম্রাটের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারব এবং একই সঙ্গে মহাসম্মানিত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে পারব। একই সঙ্গে দেখতে পারব অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাপানের জনগণের অভূতপূর্ব সাফল্য। তাঁদের প্রতি জানাতে পারব আমাদের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা।

জাপান এবং জাপানের জনগণের সম্পর্কে জানতে আমরা খুবই আগ্রহী। দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে দুদেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হোক আমরা তা চাই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং জাপানের অবস্থিতি হচ্ছে বিপরীত দুই প্রান্তে। আপনাদের দেশ যখন আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি তখন আমার দেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম উন্নত। তবু বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের ঐক্য রয়েছে। আমরা দুদেশই এশীয়। এশিয়াতে শান্তি, প্রগতি এবং স্থিতিশীলতার প্রশ্নে আমাদের দু'দেশের লক্ষ্যও এক। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে জাপানের মতোই আমরা সমন্বিত নিয়ম-শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। আবার ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতিগত উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে জাপানের জনগণের মতোই আমরা ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। জনগণের মধ্যে এই ঐক্যবোধ আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণের জন্যও আমরা উদগ্রীব। এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুদেশের এত সাদৃশ্যের জন্যই আমরা আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাপানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাই।

আমার দেশের মানুষের কী অবস্থা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পরই তা আপনি নিজে দেখে এসেছেন। আপনি দেখেছেন পাকিস্তানি শাসকদের চব্বিশ বছরের নির্দয় ঔপনিবেশিক শোষণ-বঞ্চনা আর অনাচারের ফলে এবং দুশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমার দেশের মানুষ কী দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আপনি দেখেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী বিপর্যয় এবং ধ্বংস নেমে এসেছে। আপনি এও দেখেছেন আমার দেশের মানুষ নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কীভাবে বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। চেষ্টা করছে শতাব্দীর পুরনো দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, ব্যাধি এবং বেকারত্বের অভিশাপ দূর করতে। এতসব সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়েও আমরা সব সময়েই একটা কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি যে, আমাদের জনগণের আন্তরিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে আমাদেরকে প্রথমে এ ধরনের একটি রাজনৈতিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। এটা নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ চ্যালেঞ্জ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছি। আমরা একটি সংবিধান রচনা করেছি এবং স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই সেই সংবিধান গ্রহণ করেছি। একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ শুরু করার জন্য সংবিধান অনুযায়ী নতুন করে নির্বাচন সম্পন্ন করেছি। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেন সামাজিক ন্যায়বিচারকে জলাঞ্জলি দিতে না হয় আমরা তার নিশ্চয়তার ব্যবস্থাও করেছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই সংযুক্তি সম্পর্কে আমাদের জনগণের নৈতিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাজকে আরো জটিল এবং কঠিন করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের মতো বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের সরকার এবং সেসব দেশের জনসাধারণ যখন আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের এ ধরনের কঠিন কাজ সম্পন্ন করার কাজে উত্তরোত্তর গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন আমরা উৎসাহ বোধ করি।

আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্বের ধনী এবং দরিদ্র দেশগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুধা, ব্যাধি ও দারিদ্র্যকে জয় করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে এক মাত্র তখনই শুধু একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা এবং শান্তির জন্য স্থায়ী একটি কাঠামো সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা দূরীকরণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস, এই ক্ষেত্রে জাপান মহৎ এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আপনারা যাঁরা বাংলাদেশের মতো দেশের জনগণের কল্যাণার্থে মহৎ ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁরা সময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উন্নত দেশগুলোর নীতি পরিবর্তনের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

মি. প্রেসিডেন্ট, শেষ করার আগে, জাপান এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সমঝোতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব সম্প্রসারণের জন্য আপনি এবং আপনার সমিতি যে মূল্যবান পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি সৌহার্দ্য দেখিয়েছেন তার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দুদেশের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করার জন্য আপনি আরো সার্থক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মি. প্রেসিডেন্ট, মান্যবরবৃন্দ, ভদ্র মহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ! মহামান্য সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীর স্বাস্থ্য সুখ, দীর্ঘায়ু ও জাপানের জনগণের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ এবং বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে উত্তরোত্তর গভীর সৌহার্দ্য কামনা করে আপনাদের স্বাস্থ্যপানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, ২০ অক্টোবর ১৯৭৩

আত্মসমালোচনা আত্মসংযম আত্মশুদ্ধি চাই : বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি শুক্রবার ঢাকার কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ :

সহকর্মী ভাই ও বোনেরা,
বিদেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দ এবং
আওয়ামী লীগের কর্মী ভাইয়েরা,

আপনারা আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর এবারই নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য হিসাবে প্রথম আপনারা সম্মেলনে যোগদান করেছেন। কর্মী ভাইয়েরা, আওয়ামী লীগের ইতিহাস আপনারা জানেন– হাসি-কান্নার ইতিহাস, রক্তের ইতিহাস, অত্যাচারের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস, জয়ের ইতিহাস। আপনাদের সঙ্গে থেকে প্রথমে আমি যোগদান করি যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে। তিপ্পান্ন সাল থেকে এ পর্যন্ত সভাপতি হিসাবে। গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হলে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সম্পাদক কিংবা কর্মকর্তা হওয়া যায় না। তবু গতবার আপনারা আমাকে কিছুদিনের জন্য দায়িত্বভার দিয়েছিলেন আপনাদের সভাপতি হিসাবে কাজ করার জন্য আজ আপনাদের নতুন করে প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে হবে।

ফাঁকির স্বাধীনতা

আপনারা জানেন কীভাবে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। আমরা বাংলাদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলাম। দুই'শ বছর ইংরেজ এদেশকে শাসন করে। দুই শ' বছর পরে ১৯৪৭ সালে এক ফাঁকির স্বাধীনতা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমরা বাংলাদেশের জনগণ সংখ্যাগুরু ছিলাম। কিন্তু বাংলার মানুষকে শোষণের পর শোষণ করার জন্য সামরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত পাকিস্তানের সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে নতুন করে বাংলাকে পরাধীন করে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের কলোনিতে পরিণত হয়। বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী গড়ে তোলে তাদের দেশকে। কিন্তু বাংলার মানুষ চুপ করে থাকে না।

এসব শাসন শোষণ ও সংগ্রামের অনেক ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। কারণ, অনেক আন্দোলনের মধ্য থেকে আপনাদের জন্ম। অনেক রক্ত দিয়ে আপনাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। আপনাদের বারবার মোকাবিলা করতে হয়েছে শোষকশ্রেণীকে, মোকাবিলা করতে হয়েছে একদল মীরজাফরকে। বাংলাদেশের একদল শোষক যদি হাতে হাত না মিলাত তাহলে পঁচিশ বছর পাকিস্তানিরা বাংলাকে শোষণ করতে পারত না। যতবার আমরা সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছি ততবারই এই বাংলার মাটিতে একদল লোক সেই শোষকদের হাতিয়ার হিসাবে আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। বারবার আমরা এদের মোকাবিলা করেছি। বারবার আমরা মার খেয়েছি। অবশেষে আমরাও চরম আঘাত হেনেছি, যে-আঘাতে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

সহকর্মী ভাইয়েরা ও বোনেরা,

১৯৪৭ সালের পূর্বে আমরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলাম তখন আমাদের স্বপ্ন ছিল, আমরা স্বাধীন হবো। কিন্তু সাতচল্লিশ সালেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমরা নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছি। এর মধ্য থেকেই আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। জনগণ তখন বুঝতে পারে নাই। শোষকগোষ্ঠীর নায়করা এখানে শক্তিশালী সরকার গঠন করে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে। এই অবস্থায় আমরা কিছুসংখ্যক দেশপ্রেমিক তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করি।

আমার মনে আছে, ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আমরা ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ লীগ নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি! উদ্দেশ্য শোষকগোষ্ঠীর মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু আমরা এগুতে পারলাম না। অনেক সময় থিওরি ও প্রাকটিসে গণ্ডগোল হয়ে যায়। থিওরি খুব ভালো। কাগজে-কলামে লেখা থিওরি অনেক মূল্যবান। পড়ে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকটিক্যাল কাজের সঙ্গে মিল না থাকলে থিওরি কাগজে-কলমে পড়ে থাকে, কাজে পরিণত হয় না।

তখনকার দিনে একদল লোক এ ধরনের থিওরির অনুসারী ছিল। এসময় ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন রণদিভে। তিনি পিসি যোশীকে তাড়িয়ে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। তিনি বলেন, এখনই অস্ত্রের সাহায্যে মোকাবিলা করা দরকার। পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু সরকারকে উৎখাত করতে হবে। তাঁরা এদিক-ওদিক আঘাত হানলেন। আমাদের এখানেও কিছুসংখক কর্মী বুঝতে না পেরে সেই পন্থা অবলম্বন করতে গেলেন। আমাদের সঙ্গে তাদের মতের অমিল হলো। আমরা বললাম, দেশের মানুষকে না গড়ে তুলে, দেশের মানুষকে মোবিলাইজ না করে এবং পরিষ্কার আদর্শ না নিয়ে চলা যায় না। তাঁরা বুঝতে পারলেন না। ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ লীগ ভেঙ্গে গেল।

ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের জন্ম

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন শোষণ করতে চায় তখন তারা আঘাত করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর, ভাষার ওপর। তাকে ধ্বংস করতে না পারলে শোষণ করা সহজ হয়ে ওঠে না। তাই, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী বাংলাভাষার ওপর আঘাত হানল। সংখ্যাগুরু লোকের ভাষার ওপর আঘাত করে আমাদের ওপর উর্দুভাষা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলো। তখন একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম লীগ। জিন্নাহ্ সাহেব তখনো বেঁচে আছেন এবং তাঁর দলের লোকেরাই বাংলাদেশে শাসন চালিয়েছিল। তাদের শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল, অর্থ ছিল। বিদেশি শক্তিও তাদের পিছনে ছিল। আমরা ভাষার ওপর আঘাত সহ্য করতে পারলাম না। তারই ফলশ্রুতিতে আটচল্লিশ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের জন্ম হয়। ১১ মার্চ তারিখে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন শুরু করি। ঐ তারিখেই অন্যান্য কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে আমরা শোষকগোষ্ঠীর আঘাতের মোকাবিলা করি।

আজ মনে পড়ে, আমার বন্ধু ও সহকর্মী শামসুল হকের কথা, যার সঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি। তিনি আর ইহজগতে নাই। তিনি আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কথা যদি আজ আমি স্মরণ না করি, অন্যায় করা হবে। মরহুম শামসুল হক আর আমি এক সঙ্গে গ্রেপ্তার হই। তারপরেই আমাদের আন্দোলন শুরু হয়। আমরা বুঝতে পারলাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। তা না হলে আন্দোলন করা যাবে না, তাই, আমরা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আমাদের সহকর্মীদের মোবিলাইজ করতে শুরু করলাম।

আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। আমার সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হলো। আমরা সেখানে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান করব বলে ঠিক করলাম। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আমি যখন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি তখন আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায়ই তাঁরা আমাকে যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত করেন।

বায়ান্ন সালের আন্দোলন

অনেকে ইতিহাস ভুল করে থাকেন। ১৯৫২ সালের আন্দোলনের তথা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস আপনাদের জানা দরকার। আমি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বন্দি অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সেখানেই আমরা স্থির করি যে, রাষ্ট্রভাষার ওপর ও আমার দেশের ওপর যে আঘাত হয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তার মোকাবিলা করতে হবে। সেখানেই গোপন বৈঠকে সব স্থির হয়। এ কথা আজ বলতে পারি; কারণ, আজ পুলিশ কর্মচারীর চাকরি যাবে না। সরকারি কর্মচারীর চাকরি যাবে না। কথা হয়, ১৬ ফেব্রুয়ারি

আমি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করব, আর ২১ তারিখে আন্দোলন শুরু হবে। জেলে দেখা হয় বরিশালের মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে। তাঁকে বললাম, আমরা এই প্রোগ্রাম নিয়েছি। তিনি বললেন, আমিও অনশন ধর্মঘট করব। ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমরা অনশন ধর্মঘট করলাম। এর দরুণ আমাদের ট্রান্সফার করা হলো ফরিদপুর জেলে। সূচনা হয় ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের।

তারা চরম আঘাত করল ভাষার ওপর, কৃষ্টির ওপর। চরম আঘাত হানল আমাদের উপর। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্মের পর থেকেই গ্রেপ্তার অভিযান শুরু হয়। আওয়ামী লীগের কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হলো। আওয়ামী লীগের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হলো। আওয়ামী লীগ কর্মীদের পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এভাবেই আমাদের দিন কাটতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাই। একদিনে সংগ্রাম হয় না। একদিনে দেশ জয় হয় না। একদিনে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

সহকর্মী ভাইয়েরা,

আজ এসব কথা কেন বলছি? এজন্যে বলছি যে, এতকাল পর্যন্ত আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে, সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি কাজ চালিয়েছি। আজ আমার বিদায় নেওয়ার পালা। আজ আমি আপনাদের প্রেসিডেন্ট থাকতে পারি না। আজ আপনাদের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে। কারণ, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এটাই আমার সভাপতির শেষ ভাষণ। এই জন্যই আপনাদের কাছে আমার কিছু বলা দরকার। এজন্যই আজ সংক্ষেপে আওয়ামী লীগের কিছু ইতিহাস বলছি। এই প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করলেই বক্তৃতা আমি দেবার পারি না। কত চেহারা ভেসে ওঠে আমার সামনে। কতত্যাগী কর্মী কারাবরণ করেছে। কতভাই, কতসহকর্মী শহীদ হয়েছে। এদের সঙ্গে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠে দিন কাটিয়েছি। কতদিন আন্দোলন করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। তাদের কথা আমি স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে। কারণ, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু তারা আমাদের মধ্যে নাই।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রচম আঘাত আসে আওয়ামী লীগের ওপর। শোষকগোষ্ঠী আমাদের ভাষা ও কৃষ্টির ওপর হামলা চালায়। অত্যাচার চালায় বাংলার মানুষের উপর। কিন্তু আমরাও বসে থাকি নাই। বাংলার জনগণ, বাংলার ছাত্রসমাজ, বাংলার যুবসমাজ, বাংলার প্রগতিশীল কর্মীরা এই হামলার মোকাবিলা করতে থাকে বারবার। কিন্তু অপর পক্ষ ছিল বড় শক্তিশালী। তাদের হাতে ছিল অস্ত্র, মেশিনগান। তাদের কাছে ছিল অর্থ, ছিল ধোঁকাবাজি। তারা বিশেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত ধর্মের নাম। আমার বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। তাই, ধর্মের নামে ধোঁকা দেওয়া যত সহজ অন্যকিছুতে ততটা সহজ নয়। তাই, ধর্মকে তারা ব্যবহার করল বাংলার মানুষকে শোষণ করার অস্ত্র হিসাবে।

শোষকের নয়া ষড়যন্ত্র

১৯৫২ সালের আন্দোলনের পরে শোষকগোষ্ঠী দেখল যে, বাংলাভাষাকে এভাবে দাবানো যাবে না। তাই, তারা ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে এবং আমাদের আন্দোলনকে বানচালের চেষ্টা করতে আরম্ভ করে।

ভাই ও বোনেরা,

১৯৫৪ সালের ইতিহাস আপনারা জানেন। আমরা বায়ান্ন সালে জেল থেকে বের হয়ে আসি। তিপ্পান্ন সালেও আমাদের অনেক কর্মী গ্রেপ্তার হয়। ১৯৫৪ সালে একটা নির্বাচন দেওয়া হলো। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই যুক্তফ্রন্ট। বাংলার মানুষ একতাবদ্ধ হয়। শের-এ বাংলা ফজলুল হক তখন চিফ মিনিস্টার হন। কিন্তু পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী আঁতকে ওঠে। তারা বাংলার মানুষকে একতাবদ্ধ হতে দেবে না। তাই, আবার তারা আঘাত হানার চেষ্টা করে।

যেদিন আমি মন্ত্রী হিসাবে শের-এ বাংলার কেবিনেটে শপথ নিয়েছি সেদিনের কথা আমার মনে আছে। ঠিক সেই সময় এক ঘন্টার মধ্যে আদমজীতে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হলো। তারা ষড়যন্ত্র করল এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। তাই, সৃষ্টি করল তাদের দালালদের দিয়ে এই দাঙ্গা। মানুষের জন্য তাদের কোন দরদ ছিল না। মানুষকে তারা ভালোবাসত না। ক্ষমতাকেই তারা বড় করে দেখত। তাই, চুয়ান্ন সালে তারা দাঙ্গা বাধালো আদমজীর পাটকলে। আমার মনে আছে, পাঁচ শ'রও বেশি লোক সেখানে মারা যায়। শপথ নিয়েই সেখানে আমরা দৌড়ে যাই। উপস্থিত হই। মোকাবিলা করি। মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করি।

১৯৫১ সালেও তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে বাংলার মাটিতে। এতে এদেশের অনেক নিরীহ লোক জীবন দেয়। এই দাঙ্গা তারা সৃষ্টি করে বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করার জন্য। কারণ, বাংলাদেশে যদি বিভেদ সৃষ্টি করা না যায় তাহলে তারা শাসন ও শোষণ চালাতে পারবে না। এমনি করে তারা চালায় তাদের ষড়যন্ত্র। আমার মনে আছে, তদানীন্তন প্রদেশিক পরিষদের ৫০ জনের মতো সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমাদের কয়েক হাজার কর্মী গ্রেপ্তার হয়। বাংলার মানুষের উপরে অত্যাচারের স্টিমরোলার চলে। কিন্তু আমরা নিরুৎসাহ হই নাই। আমরা আরও সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করার চেষ্টা করি। আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। আওয়ামী লীগের পরিষ্কার আদর্শ আমাদের সামনে ছিল। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ছিল। তাদের কর্মী ছিল, তাদের প্রতিষ্ঠান ছিল।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি স্তম্ভ

সহকর্মী ভাইয়েরা,

আমাদের রাষ্ট্রের চারটি আদর্শ আছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও তেমনি চারটি স্তম্ভ থাকা প্রয়োজন। এই চারটি স্তম্ভ ছাড়া কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। আমি গর্বিত যে, পঁচিশ বছরে আওয়ামী লীগ সেই স্তম্ভগুলি প্রতিষ্ঠিত করেছে। পঁচিশ বছরের আওয়ামী লীগ কর্মীদের জন্য আমি গর্বিত। বারবার জনগণের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বের। সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে। নেতারা চেষ্টা করেছেন সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। নেতৃত্বের সঙ্গে প্রয়োজন আদর্শের, যাকে অপর কথায় বলা যায় ম্যানিফেস্টো। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী- আদর্শ কী– এটা থাকতেই হবে। নেতৃত্ব ও আদর্শের পরে প্রয়োজন নিঃস্বার্থ কর্মীর। নিঃস্বার্থ কর্মী ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বড় হতে পারে না, কোন সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। এরপরে প্রয়োজন সংগঠনের। সংগঠন ছাড়াও কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাজ সফল হতে পারে না।

সেইজন্য বলছিলাম, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি জিনিসের প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে নেতৃত্ব, ম্যানিফেস্টো বা আদর্শ, নিস্বার্থ কর্মী এবং সংগঠন। আমি আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে, আওয়ামী লীগের ১৯৪৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নেতৃত্ব ছিল, আদর্শ ছিল, নিঃস্বার্থ কর্মী ছিল এবং সংগঠন ছিল। এই ভিত্তির ওপরই সংগ্রামে এগিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছে।

আইয়ুবের সামরিক শাসন

১৯৫৪ সালের পর অনেক ইতিহাস। আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাই। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তারপর পূর্ণ স্বয়ত্তশাসনের আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলে। কিন্তু শোষকগোষ্ঠী দেখল যে, এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। তাই, ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন।

বাংলাদেশ আরও বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে, কারণ, সামরিকবাহিনীর শতকরা ৯৫ জন ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের। তারা বাংলাদেশেরও সরকার দখল করল। মার্শাল ল' জারি

করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে শোষণ করা। আমরা গ্রেপ্তার হলাম। সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হলো। আওয়ামী লীগ পার্টি ব্যান্ড হলো। আওয়ামী লীগ কর্মীরা গ্রেপ্তার হলো। তাদের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা মামলা জারি করা হলো। কিন্তু তারা চুপ করে বসে রইল না। ব্যান্ড হয়ে গেলেও আওয়ামী লীগের কাজ চলল।

আমরা সংখ্যাগুরু। তারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও বন্দুকের জোরে বাংলার মানুষের উপর মিলিটারি শাসন আরম্ভ করল। দুই'শ বছরে ইংরেজ যা করে নাই পঁচিশ বছরে পাকিস্তানিরা বাংলার মাটিতে তাই করল। সম্পদ অর্থ যা কিছু সেখানে জড়ো করল। সেখানে রাজধানী, সেখানে সামরিকবাহিনীর হেডকোয়ার্টার, ইনভেস্টমেন্টের হেডকোয়ার্টার, এসেম্বলি সবকিছু প্রতিষ্ঠিত হলো ।

পনের'শ মাইল দূরের দুটি অংশ নিয়ে কোন সময় কোন একটি রাষ্ট্র হয়েছে বলে আমার জানা নাই। কিন্তু আমরা ধর্মভীরু মানুষ, তাই, পাকিস্তানিরা ধর্মের নামে এক রাষ্ট্রের দোহাই দিতে আরম্ভ করল। আমরা যারা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম তারা সংগ্রাম করেছি। যারা বুঝতে চেষ্টা করে নাই তারা তাদের দালালি করেছে।

বাষট্টি সালের আন্দোলন

১৯৬২ সালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব গ্রেপ্তার হন। ছাত্ররা আন্দোলন শুর করে। আওয়ামী লীগ পার্টি তখন ব্যান্ড। অন্যান্য পার্টিও ব্যান্ড ছিল। আমরা জেল থেকে চেষ্টা কলাম, কী করে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যায়। আমরা আওয়ামী লীগকে বাঁচিয়ে রাখলাম। আওয়ামী লীগ কর্মীরা যে যেখানে ছিল বিপদের সম্মুখীন হয়েও নীতি পরিবর্তন না করে, আদর্শ পরিবর্তন না করে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

আমরা চিন্তা করে দেখলাম এদের সঙ্গে আর আমাদের চলবে না। যেখানে আদর্শের মিল নাই, যেখানে মতের মিল নাই, যেখানে ভাষার মিল নাই, যেখানে চিন্তার মিল নাই সেখানে এক রাষ্ট্র চলতে পারে না। আজ কোথায় পাকিস্তান, কোথায় বাংলাদেশ। পনের'শ মাইলের ব্যবধানে তার সঙ্গে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। এক রাষ্ট্র করা হয়েছিল– বাংলাদেশকে শোষণ করবার জন্য, কলোনি করার জন্য। তারা সাড়ে সাত কোটি লোকের বাংলাদেশকে তাদের শিল্প-পণ্যের বাজারে পরিণত করে। তাদের কল-কারখানার শিল্পদ্রব্য বাংলাদেশে বিক্রয় করে এখানকার অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। আমাদের কিছু কিছু লোক ছিল তারা মন্ত্রী হলে খুশি হতেন, পার্লামেন্টের সদস্য হলে খুশি হতেন, সামান্য ব্যবসায়ী হলেও খুশি হতেন। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষের কথা তাঁরা চিন্তা করতেন না।

আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন

১৯৬৪ সালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এন্তেকাল করলেন। আওয়ামী লীগকে আমরা রিভাইব করলাম। আবার আমরা আওয়ামী লীগকে অর্গানাইজ করার উদ্যোগী হলাম। এই সময় কিছু কিছু লোক আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে চলে গেল। ভালোই হলো। আবর্জনা যতই যায় ততই মঙ্গল। কয়েকবারই এ রকম হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি হয় না। যাদের আদর্শ নাই, যাদের নীতি নাই, যারা দুর্নীতিবাজ, যারা দেশকে ভালোবাসে না, তারা যদি প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে যায় তাতে প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয় না, প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হয়। তাই, ভবিষ্যতেও এ ধরনের লোকদের প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়ে আওয়ামী লীগকে আপনাদের আরো শক্তিশালী করতে হতে পারে।

পরিষ্কার রাস্তা : ছয়-দফা

ভাইয়েরা ও বোনেরা,

আমরা আমাদের সহকর্মীদের নিয়ে সুনির্দিষ্ট পথে যাওয়ার স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপর অনেক ভাঙ্গাগড়া হলো। ১৯৬৬ সালে আমার দেশবাসী জানতে চায়, পরিষ্কার রাস্তা কোথায়? বাঙালি চায় কী? তাদের সামনে কী আছে? তখন ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল নামে একটা

পদার্থ ছিল। ফান্ডামেন্টাল রাইটস ছিল না, আইয়ুবী শাসন চলছিল তখন বাংলার মাটিতে। অত্যাচারের স্টিমরোলার চলছিল বাংলার মাটিতে– আমাদের চোখের সামনে। আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে বসলাম– পরিষ্কার পন্থা দিতে হবে। বাংলার মানুষকে আর আমরা এভাবে শোষিত হতে দিতে পারি না। মানুষের একদিন মরতে হয়। আমরা বহু অত্যাচার সহ্য করেছি। দরকার হলে আরো অত্যাচার সহ্য করব। কিন্তু পরিষ্কার রাস্তা দেখাতে হবে। ওদের সঙ্গে আমরা থাকতে পারি না। আমার বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে। বাংলার মানুষকে রক্ষা করতে হবে। বাংলার অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। শোষণহীনসমাজ গড়ে তুলতে হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে থেকে বাংলার মানুষ তা কোনদিন করতে পারবে না। এর উপায় কী?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই, যাঁরা মনে করেন রাতের অন্ধকারে গুলি করে কিংবা একটা রেললাইন তুলে দিয়ে টেরোরিজম করে বিপ্লব হয়, তাঁরা কোথায় আছেন, তাঁরা জানেন না, এই পন্থা বহু পুরনো পন্থা। এই পন্থা দুনিয়ায় কোনদিন কোন কাজে লাগে নাই। এ পন্থা দিয়ে দেশের মানুষের কোন মঙ্গল করা যায় না। একটা রাস্তা ভেঙে দিয়েও একজন লোককে অন্ধকারে হত্যা করে শুধু শুধু মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। এই টেরোরিজম দিয়ে দেশের বিপ্লব হয় না, হয় নাই, হতে পারে না। জনগণকে ছাড়া, জনগণকে সংঘবদ্ধ না করে, জনগণকে আন্দোলনমুখী না করে এবং পরিষ্কার আদর্শ সামনে না রেখে কোনরকম গণ-আন্দোলন হতে পারে না এবং সেখানে কোন বিপ্লব হতে পারে না। দুঃখের বিষয়, অনেকে এখনো টেরোরিজম-এ বিশ্বাস করেন। যাই হোক, ভবিষ্যতে তাদের ভুল ভাঙবে। সময় থাকতে না ভাঙলে তাদের ক্ষতি বেশি হবে। জনগণের ক্ষতি তো হবেই, কিন্তু তাদেরও ক্ষতি হবে।

পরিষ্কার রাস্তা হিসাবে ১৯৬৬ সালে ছয়-দফা দেওয়া হলো। আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করবেন বলে হুমকি দিলেন। আইয়ুব খান বোকা ছিলেন না। আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন, ছয়-দফা আওয়ামী লীগ কেন দিয়েছে? এর পিছনে উদ্দেশ্য কী? পাকিস্তানিরা বুঝতে পেরেছে, এর উদ্দেশ্য কী? এবং আমরা জানতাম আমাদের উদ্দেশ্য কী ও কোথায় আমরা যাবার চাই। কী আমরা বোঝাতে চাই।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

ছয়-দফা বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ। আমরা মুক্তিসনদ কেন দিলাম, আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন। তাই, তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করলেন আমাদের বিরুদ্ধে– সামরিক বাহিনীর কিছু বাঙালি ছেলে, বাঙালি সরকারি কর্মচারী ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। তাঁরা আমাদের কারাগারে বন্দি করলেন। আওয়ামী লীগকে ব্যান্ড করলেন না, কিন্তু তাঁরা বন্দি করলেন অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকে। আওয়ামী লীগ ভাঙার জন্য পাকিস্তান থেকে কিছু নেতা এসে তখন চেষ্টা করলেন। ভাঙলেন কিছুটা। কিছু কিছু আওয়ামী লীগ নেতা বুঝতে না-পেরে যোগদান করলেন তাদের সাথে। আমি তখন কারাগারে বন্দি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, শামসুল হক, জালাল, জহুর ও চিটাগাং-এর আজিজসহ আমার বহু সহকর্মীও বন্দি হয়। যারা বাইরে রইল, তারা ছয়-দফাকে আঁকড়ে ধরল। তারা মোকাবিলা করল, নেতৃত্ব দিল। নজরুল ছিলেন অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট। এই অবস্থায়ই তারা শুরু করল। শাসকরা পারল না আওয়ামী লীগকে দাবাতে।

গণ-অভ্যুত্থান

বাংলার ছাত্র-জনতা রুখে দাঁড়াল এর বিরুদ্ধে। গণআন্দোলন শুরু হলো। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্যান্য সব প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করল। তারা আওয়ামী লীগকে সক্রিয় সমর্থন দিল এবং তাদের সঙ্গে যোগদান করল। আইয়ুব খানের আসন নড়ে উঠল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উইথড্র হয়ে গেল। আমরা খালাস পেলাম।

আবার একটা ফন্দি করা হলো। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল একটা কনস্টিটিউশন প্রবলেম সল্‌ভ করা। আমি আমার সহকর্মী ছাড়াও কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গেলাম আমার সঙ্গে। কারণ, আমাদের বুঝতে হবে, এটা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স, না ধোঁকা।

আসলে এটা ছিল বাংলাকে শোষণ করার আরেকটা ষড়যন্ত্র। তাই, আপনাদের পক্ষ থেকে আমি তা রিজেক্ট করলাম। বলে দিলাম সংগ্রাম করে বাংলার মানুষ তাদের দাবি আদায় করবে, রাউন্ড টেবিলে বসে নয়।

ইয়াহিয়ার আবির্ভাব

আইয়ুব খান বিদায় নিলেন। ইয়াহিয়া খানকে বসিয়ে দেওয়া হলো। প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে পড়লেন আর এক জেনারেল সাহেব। তিনি বললেন, নির্বাচন দিবেন। নির্বাচন দেওয়া হলো। আমাদের অনেকে বুঝতে পারলেন না। তাঁরা বড় বড় বক্তৃতা করলেন। প্রশ্ন করলেন, কেন আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি? বাংলার মানুষ যে একতাবদ্ধ, এক; বাংলার মানুষ-যে বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ-যে মুক্তি চায়; তার জন্য আমাদের নির্বাচনে যাওয়া প্রয়োজন। তাঁরা এ-কথা বুঝতে পারেন নাই। বুঝতে পারেন নাই, শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য কী!

আমরা নির্বাচনে গেলাম। আমরা ১৬৯টি সিটের মধ্যে ১৬৭টি সিট ক্যাপচার করলাম। দুনিয়া দেখল, বাংলার মানুষ একতাবদ্ধ। এই প্রথম একতাবদ্ধ। বাংলার মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স ফিরে আসল। ইয়াহিয়া খান আঁতকে উঠলেন। শোষকগোষ্ঠী আঁতকে উঠল। তারা আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হলো। আমরা জনগণকে আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলাম। আমরা শপথ গ্রহণ করলাম যে, নীতির সঙ্গে কোন আপস নাই। জনগণ যে ম্যান্ডেট দিয়েছে, তা থেকে আমরা সরতে পারি না।

তার পরের ইতিহাস চরম ইতিহাস। ধাপে ধাপে বাংলার মানুষকে এগিয়ে নিতে হয়েছে। ধাপে ধাপে বাংলার মানুষকে আন্দোলন করতে হয়েছে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অনেকে বক্তৃতা করে, বড় বড় তেজি বক্তৃতা; কিন্তু তারা জানে না ১৯৪৭-৪৮ সাল কি ছিল। ১৯৫০, ১৯৫২-৫৪ সাল কী ছিল। ওরা জানে না ১৯৫৭-৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৮-৬৯ ও ৭০ সাল কী ছিল। ওদের কারো কারো সেদিন জন্ম হয় নাই। অনেকে আন্দোলন দেখে নাই। আন্দোলন কাকে বলে জানে না। কোনদিন জীবনে জেলের দরজা দেখে নাই। অবিচারের সামনে পড়ে নাই। আন্দোলন গাছের ফল নয়। আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হয়। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। আন্দোলনের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মী থাকতে হয়। ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার। আর সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার।

অসহযোগ আন্দোলন

তারা ভুলে যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগের ইতিহাস ভুলে যায়, কীভাবে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এককভাবে এদেশে নন-কোঅপারেশন মুভমেন্ট করে। ছাত্র, জনতা, ধর্ম, শ্রেণী ও পেশা নির্বিশেষে তাতে যোগদান করেছিল। দেশের মানুষ সংঘবদ্ধ ছিল, শোষকগোষ্ঠী আঁতকে উঠেছিল। শোষকরা জানত এবং আমরাও জানতাম যে, আওয়ামী লীগ তাদের দাবি থেকে একচুলও নড়বে না। কারণ, আওয়ামী লীগ কোনদিন ওয়াদা ভঙ্গ করে নাই। তারা ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে না। বাংলার মানুষ যা বলেছে তাই হবে। এর পিছনে সরার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাই, আমি সেদিন বলেছিলাম, ছয়-দফা জনগণের সম্পদ; আওয়ামী লীগের আর শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পদ

নয়। ওটার সঙ্গে আপস হয় না। অনেকে গোপনে আপসের প্রপাগাণ্ডা করতেন। কিন্তু আমরা জনতাম যে, ইয়াহিয়া খান সৈন্য সমাবেশ করছেন।

আজ সকলের জানা দরকার, আমরাও বসে ছিলাম না। আমরা যদি বসে থাকতাম, একই সময় একই মুহূর্তে বাংলাদেশের ৫৮টা মহকুমায় সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয় না। রেসিস্ট্যান্ট মুভমেন্ট শুরু হতো না। শুরু হয়েছিল এজন্য যে, তখন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

২৫ মার্চ তারিখে আমি তখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম, আমি যখন বাংলার মানুষকে ডাক দিলাম– তখন আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার সহকর্মীরা আমার অনুপস্থিতিতেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংগ্রাম উপরের থেকে পড়ে নাই। নজরুল তখন অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আমাকে করে। তাজউদ্দিন প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিল। তারা দেশের এই সংগ্রাম চালায়। অবশ্য আমাদের সহযোগী দু-একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আমাদের সমর্থন দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি দিয়েছিল। আমাদের মোজাফ্ফর ন্যাপও দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন প্রতিষ্ঠান ছিল কার? নেতৃত্ব ছিল কার? আজ যারা বড় বড় কথা বলে, কোথায় ছিল তারা? কোথা থেকে তারা এসেছে? কে তদের কথা শুনত?

প্রতিরোধ সংগ্রাম

আজকে তারা সংগ্রাম করে গভর্নমেন্ট গঠন করতে চায়। ২৫ মার্চ তারিখে কার উপরে আক্রমণ শুরু হয়? আক্রমণ শুরু হয় আওয়ামী লীগের উপরে, আওয়ামী লীগের কর্মীদের উপরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপরে, রাজারবাগে আমার পুলিশের উপরে, আমার সামরিক বাহিনীর বাঙালি ছেলেদের উপরে, আর আমার বিডিআর-এর উপরে।

এরপর রেসিস্ট্যান্স মুভমেন্ট আরম্ভ হয়। এরোপ্লেন, জাহাজ না থাকলে তারা কিছুই করতে পারত না। আমাদের অস্ত্র ছিল না। সামান্য যা জোগাড় করতে পেরেছিলাম সেগুলির সমস্ত জায়গায় বাংলাদেশের মহকুমায় মহকুমায় পাঠানো হয়েছিল। প্রত্যেক মহকুমায় মহকুমায় আমাদের কম্যান্ডার ঠিক করা ছিল। প্রত্যেক জেলায় জেলায় আমাদের কম্যান্ডার ঠিক করা ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন একদিনে হয় নাই। স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়েছে ২৫ বছর আগে থেকে। আওয়ামী লীগের জন্ম, সংগামের জন্ম। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের আজ যদি মৃত্যু হয়, তবে আমি দেখতে চাই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যেন মৃত্যু হয়।

কর্মী ভাইয়েরা,

আজ তোমাদের সামনে আমার অনেক কথা বলার আছে। কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে বাংলার স্বাধীনতার জন্য। লক্ষ লক্ষ মা-বোনের আর্তনাদ আজও মোছে নাই, আজও থামে নাই। আজও তাদের চোখের পানি যায় নাই। সেই সংগ্রামে আওয়ামী লীগের এমন কোন কর্মী নাই যার বাড়িঘর জ্বালাইয়ে দেওয়া হয় নাই। গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগারদের বাড়ি কোন্‌টা, আওয়ামী লীগের কর্মীর বাড়ি কোন্‌টা, আওয়ামী লীগের বাপ-মা কে– সেইগুলি বেছে বেছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ কর্মীকে ধরতে পারলে এক মুহূর্তও দেরি করে নাই, গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার ঘোষণা

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবক, লক্ষ লক্ষ কৃষক, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রক্ত দিয়েছে। আর কারো কথায় নয়, শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকেই তারা জীবন দিয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাস কোনদিন মিথ্যা করতে নাই। আমার সহকর্মীরা যারা এখানে ছিল তারা সকলে জানত যে, ২৫ তারিখ রাত্রে কী ঘটবে। তাদের বলেছিলাম, আমি মরি আর বাঁচি সংগ্রাম চালিয়ে যেও। বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে। ৭ মার্চ কি স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা বাকি ছিল? প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চই স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিন পরিষ্কার বলা হয়েছিল, "এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।"

সহকর্মী ভাইয়েরা,
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আপনারা জানেন, আমি আর বলতে চাই না। ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী কি করেছে আপনারা জানেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, রাস্তা-ঘাটের অবস্থা, পোর্টের অবস্থা সবই আপনারা জানেন।

১০ জানুয়ারি তারিখে আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম– আজ আমি বেঁচে আছি, অথচ আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। এ দুবছর আমার লাইফের এক্সটেনশন হলো। ৫৭ বছর চাকরি হয়ে গেলে সরকারি চাকরির যেমন এক্সটেনশন হয়, তেমনি আমার লাইফেরও এক্সটেনশন হয়েছে। কিন্তু কয় বছর এক্সটেনশন হয়েছে তা আমার জানা নাই। কারণ, ওটা খোদার হাতে। তবে, দুই বছর পার হয়েছে বলতে পারি। আমার সহকর্মীদের দশা হয়েছিল তাই। ধরা পড়লে আর এক্সটেনশন হতো না, সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

অর্থনৈতিক মুক্তি

তাই, আজকে ভেবে দেখুন, যে-আদর্শের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন সে আদর্শ কী? কেন স্বাধীনতা সংগ্রাম করলাম? কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিল? আজ সত্যিই আমরা স্বাধীন। আজ আমার পতাকা ওড়ে। আজ আমার জাতীয় সংগীত বাজে। দুনিয়ার ১১৬টি দেশ আমাদের রিকগ্‌নিশন দিয়েছে। আজ আমার কৃষ্টি ও ভাষার উপর কেউ আঘাত করতে পারবে না। আজ বাংলার মাটি আমার, আমি বাংলার মাটির। আজ বিদেশি শোষকরা আমার দেশকে শোষণ করতে পারবে না। আজ সাম্রাজ্যবাদের দালাল বাংলার মাটিতে স্থান পাবে না। আজ আমরা বাংলার মানুষকে শোষণ করতে দিব না। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এটা একদিক। আর একদিক রয়েছে। সহকর্মী ভাইরা মনে রেখ, কোনদিন আমি আমার কথা না-বুঝে বলি না। আমি জেনে শুনেই বলেছিলাম– স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। কিন্তু মানুষ মুক্তি পাবে সেইদিন যেইদিন অর্থনৈতিক মুক্তি দেবা বাংলার মানুষকে। তোমরা এক যুদ্ধে জয়লাভ করেছ, দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু করেছ। আওয়ামী লীগের সহকর্মীরা এইখানেই তোমাদের পরীক্ষা-অগ্নিপরীক্ষা।

ভারতের বন্ধুত্ব

আজ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করি। পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী পাঁচ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে বাংলার মাটিতে থাকতে পারে নাই। এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। আমার সহকর্মীরা আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতের জনগণ এবং শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সরকার বাংলার মানুষকে যদি সেইদিন আশ্রয় না দিত, যদি সান্ত্বনা না দিত–বাংলার মানুষের দাঁড়াবার জায়গা থাকত না। পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর লোকেরা আমার দেশের মানুষকে শেষ করে দিত। তাই, আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্মরণ করি।

কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। আমি পরিষ্কার বলতে চাই, এ বন্ধুত্ব এমনি আসে নাই। দুর্দিনে যে লোক আমার পাশে দাঁড়ায় সেই হলো আমার সত্যিকারের বন্ধু। তাই, ভারতবর্ষ আমার বন্ধু। আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ; ভারত স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। তার ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করব না। আমার ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করবে না। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ভিত্তিতে আমি বাস করতে চাই। আজ আমি স্মরণ করি, আমার সহকর্মী ভাইদের কথা, আমার বাংলার জনগণের কথা– যে জনগণ রক্ত দিয়ে গেছে। স্মরণ করি, আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের কথা– যারা রক্ত দিয়েছে, যারা মরে শহীদ হয়েছে, যারা আজ পঙ্গু হয়ে আছে। আমি স্মরণ করি, সেই মা-বোনদের কথা– যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। সেই সঙ্গে আমি নিশ্চয়ই স্মরণ করি, ভারতের সেই সমস্ত সেনাবাহিনীর জোয়ানদের কথা, ১৪ হাজার জোয়ান, যারা বাংলার মাটিতে রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচিয়েছিল।

স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে

ছেলেখেলা নয়। রাষ্ট্র চালানো এত সোজা নয়।

আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা,
আমি আগেই বলেছি– আজ স্বাধীনতা সংগ্রাম করে আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন আমাদের

অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। যে জনগণ সংঘবদ্ধভাবে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সেই জনগণ কিন্তু আজও আছে। যদি আজ জনগণ আপনাদের অশ্রদ্ধা করে, যদি আজ জনগণ আপনাদের ভালো না বাসে, জনগণ যদি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, জনগণ যদি আপনাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে, সেইজন্য বাংলার জনগণ দায়ী হবে না– দায়ী হবেন আপনারা, দায়ী হবো আমরা। আপনারা জানতেন না কোনদিন আপনারা ক্ষমতায় আসবেন। আওয়ামী লীগ সহকর্মীরা, আপনারা জানতেন না; এত সহজে কোনদিন আপনারা যুদ্ধে জয়লাভ করবেন– এত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পাবেন। আপনারা আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি। এ স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু স্বাধীনতা পেলেও বিদেশি দালালরা আজ চুপ করে বসে নাই। এ স্বাধীনতাকে তারা আজ সহজে গ্রহণ করতে পারে নাই। সেইজন্যই তারা ছলে-বলে কৌশলে কাজ করছে। সম্মুখ সমরে না-যেয়ে পিছনের রাস্তা অবলম্বন করেছে। পিছনের পথ দিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। মাত্র দু-বছর আগে আমরা যে-স্বাধীনতা পেয়েছি তাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে।

চারটি রাষ্ট্রীয় স্তম্ভ

আমি বিশ্বাস রাখি, আওয়ামী লীগ কর্মীদের জীবন থাকতে এ স্বাধীনতা কেউ নস্যাৎ করতে পারবে না।

সহকর্মী ভাইয়েরা,

আজ আপনাদের সামনে যথেষ্ট কাজ রয়েছে। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। আজ আমাদের নীতি পরিষ্কার। আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে চারটা স্তম্ভ রয়েছে। এটার মধ্যে কোন কিন্তু-টিন্তু নাই। এটা পরিষ্কারভাবে শাসনতন্ত্রে দেওয়া হয়েছে। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমরা গণতন্ত্রের বিশ্বাস করি। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। আওয়ামী লীগ পার্টি বিশ্বাস করে, আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করেছে, তাই, আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে যে-নীতি ছিল, তা আজ রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে। এটা রক্ষা করার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ কর্মীদের সবচেয়ে বেশি। যে বিশ্বাস করবে না, তার জন্য রাস্তা খোলা আছে। আমাদের নীতি পছন্দ না হয়– চলে যেতে পারেন। থাকলে নীতি বিশ্বাস করে থাকতে হবে। মানুষ মরতে পারে, নীতি-আদর্শ মরে না কোনদিন। স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের পরে আপনারা শাসনতন্ত্র দিয়েছেন। আপনারা নির্বাচন দিয়েছেন। বাংলার মানুষ শতকরা ৯৭টি সিট আপনাদের দিয়েছে। এদেশ শাসন করার অধিকার আপনাদের আছে।

আত্মসমালোচনা আত্মসংযম আত্মশুদ্ধি

কিন্তু দেশ শাসন করতে হলে নিঃস্বার্থ কর্মীর প্রয়োজন। হাওয়া-কথায় চলে না। সেদিন ছাত্ররা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাদের বলেছিলাম, আত্মসমালোচনা কর। মনে রেখ, আত্মসমালোচনা করতে না পারলে নিজকে চিনতে পারবা না। তারপর আত্মসংযম কর, আর আত্মশুদ্ধি কর। তাহলেই দেশের মঙ্গল করতে পারবা।

আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা,

কোনদিন তোমরা আমার কথা ফেলো নাই। জীবনে আমি কোনদিন কন্টেস্ট করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বা প্রেসিডেন্ট হই নাই। জীবনভরই তোমরা আমাকে সর্বসম্মতিক্রমে নেতৃত্ব দিতে দিয়েছ। তোমরা আমার কথায় রক্ত দিয়েছ, আজ শেষদিন– কেননা, আমি সভাপতি পদ ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি– তোমরা আমার কথা মনে রেখ। আমার কথা ভুলো না। কোনদিন স্বার্থে অন্ধ হয়ে তোমাদের ডাক দেই নাই। কোনদিন কোন লোভের বশবর্তী হয়ে কোন শয়তানের কাছে মাথা নত করি নাই। কোনদিন ফাঁসির কাষ্ঠে বসেও বাংলার মানুষের সঙ্গে বেঈমানী করি নাই। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা আমার কথা শুনবা,

তোমরা আত্মসমালোচনা কর, আত্মসংযম কর। তোমরা আত্মশুদ্ধি কর। দুই-চারটা-পাঁচটা লোক অন্যায় করে, যার জন্য এতবড় প্রতিষ্ঠান– যে প্রতিষ্ঠান ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, যে প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা এনেছে, যে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ কর্মী জীবন দিয়েছে, যে প্রতিষ্ঠান ২৫ বছর পর্যন্ত ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছে– তার বদনাম হতে দেওয়া চলে না।

আজ বাংলার নিভৃত কোণে আমার এক কর্মী পড়ে আছে– যার জামা নাই, কাপড় নাই। তারা আমার কাছে আসে না। আপনাদের অনেকেই এখানে আছেন, কিন্তু আমি যদি চরকুক্‌রী-মুক্‌রী যাই, আমার ঐ ধরনের কর্মীকে আজও দেখি। আমি যদি কক্সবাজার যাই, আমার গ্রামের একটা কর্মীকে দেখি। এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। আজও আমি দেখি তার পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি। আজও দেখি সেই ছেঁড়া পায়জামা, ছেঁড়া শার্ট, পায়ে জুতা নাই। বাংলাদেশে আমার এ ধরনের লক্ষ লক্ষ কর্মী পড়ে আছে।

কিন্তু কিছু কিছু লোক যখন মধুমক্ষিকার গন্ধ পায়, তখন তারা এসে আওয়ামী লীগে ভিড় জমায়। আওয়ামী লীগের নামে লুটতরাজ করে। পারমিট নিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করে।

আওয়ামী লীগ কর্মীরা,

আওয়ামী লীগ থেকে তাদের উৎখাত করে দিতে হবে– আওয়ামী লীগে থাকার তাদের অধিকার নাই। তাই বলছি, আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। আজ আত্মসংযমের প্রয়োজন আছে, আজ আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন আছে। তোমরা, আওয়ামী লীগের কাউন্সেলাররা আজ যারা এখানে বসেছ, তারা মনে মনে চিন্তা কর। বুকে হাত দিয়ে খোদার উপর নির্ভর কইরা বল যে, আমরা মানুষকে ভালোবাসি। আমরা বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমরা ২৫ বছর সংগ্রাম করেছি। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। আমরা ইতিহাস রাখব। আমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করব। আমরা দেশকে মুক্ত করব। তাহলেই আওয়ামী লীগের ইতিহাস থাকবে। তাহলে মরেও আমি শান্তি পাব। তা না হলে আমার বড় দুঃখ, বড় কষ্ট।

সহকর্মী ভাইয়েরা, বোনেরা;

নীতি ছাড়া, আদর্শ ছাড়া এবং যে-কথা আমি বলেছিলাম– আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি ছাড়া তা হয় না। ন্যায়-নীতি ও আদর্শ সামনে রাখতে হবে। সে আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

শত্রু মোনাফেক

ভুলে যেও না– স্বাধীনতা পেয়েছ এক রকমের শত্রুর সাথে ফাইট করে। তখন আমরা জানতাম আমাদের এক নম্বর শত্রু পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও শোষকগোষ্ঠী। কিন্তু এখন শত্রুকে চেনা বড় কষ্টকর। আমি একদিন গল্প করতে গিয়ে বলেছিলাম, জীবনে আমি তিনটা জিনিসকে ভয় পাই– আর কাউকে আমি ভয় পাই না। একটা হলো কুমির– নদীতে থাকে। পানির মধ্যে গোসল করতে গেলে পা ধরে টান দিয়ে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি না। দ্বিতীয়টা সাপ, ফুঁস করে মেরে দিলে যুদ্ধ করতে পারি না। আর তৃতীয়টা মোনাফেক– তার সঙ্গেও সামনাসামনি যুদ্ধ করা যায় না। কুমির, সাপ আর মোনাফেক! তোমরা আগে যুদ্ধ করেছ। কিন্তু এখন বাংলার মাটিতে এদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করার উপায় নাই।

তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে মোনাফেক, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে কেউটে সাপ, আর পানির তলে কুমির। এরা রাতের অন্ধকারে গুলি করে মারে, আর বলে রাজনীতি করে। রাত্রে একজন লোক শুয়ে আছে, তাকে জানালা দিয়ে গুলি করে মারল। বলে, আমি বিপ্লবী। তুমি বিপ্লবী, না দাগি চোর? যে-কোন সময় যে-কোন মানুষকে গুলি করে মারা যায়। এটা কি বিপ্লব? তোমরা রাত্রে গুলি করে মারো, আমরা প্রস্তাব পাস করি। আর আমি যদি লোকদের বলে দিই যে, তোমরাও রাত্রে গুলি করে মারো, তখন কী হবে? এদের কোন নীতি নাই, এদের কোন আদর্শ নাই, এদের কিছুই নাই। এরা বড় বড় কথা বলে। আসলে চোর-ডাকাতের ন্যায় হাট-বাজারে ডাকাতি করে জিন্দাবাদ দিয়ে চলে যায়। সব ডাকাত, সব চোর। হাট-বাজার, চিনির দোকানে, মুরগির দোকানে, শবজির দোকানে ডাকাতি করে বিপ্লব হয় না। ঐ

রণদিভের থিওরি ইট মারো, সেপাইর আস্তানায় ইট মারো, ওয়ালে একটা পাথর মারো। এতে বিপ্লব হয় না।

সেই জন্যই আমি বলতে চাই যে, তাকে বিপ্লব বলে না; তাকে বলে পার্ভার্সান– বিপ্লবের বিকৃতি। এই যত বিপ্লবীরা, সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা আমার পাশে বসে আছেন, বহু বিপ্লব করেছেন, এরা। ফাউন্ডার্স অব দি বিপ্লব (বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা)। সেটা এদের কাছে থেকে জেনে নাও। জনগণকে ছাড়া, গণবিপ্লব ছাড়া বিপ্লব হয় না। রাতের অন্ধকারে গুলি মাইরা কোনদিন বিপ্লব হয় নাই। পড় সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস, পড় অন্যান্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস, পড় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। দেখ সেখানে কী হয়েছে। দেখ আমাদের এই সাব-কন্টিনেন্টে কী হয়েছে। পড়, জান, শেখ, বোঝ। তারপরে বিপ্লবের কথা বল। বিপ্লব রাতের অন্ধকারে গুলি কইরা, টেরোরিজম কইরা হয় না। আবার এখন একটা সুবিধা হয়েছে, রাত্রের অন্ধকারে গুলি করে মাইরা বলে, আমরা মাওবাদী। কিন্তু আমি জানি তোমরা চোর আর গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু না।

তাই, আপনাদের কাছে আমি বলতেছিলাম যে, আপনাদের চারটা আদর্শ– যেটা রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং আওয়ামী লীগের আদর্শ– সেটা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে।

গণতন্ত্র, না সন্ত্রাস

একদল লোক গণতান্ত্রিক পন্থাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে। আমরা গণতন্ত্র বিশ্বাস করি। আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছি। পাঁচ বৎসর পর নির্বাচন কর। যদি নির্বাচনে তোমরা কেউ আসতে পার, যে-কোন দল মেহেরবানি করে চলে আস। আওয়ামী লীগ গদি ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু তোমরা জানো, যে যতই বক্তৃতা কর, আর মানুষ যতই বক্তৃতা শুনুক না কেন, ভোট দেবার সময় তোমাদের অবস্থা যা আছে– আগেও যা হয়েছে পরেও তাই হবে। সেজন্যই তোমরা জনগণের উপর আস্থা রাখো না। একদিকে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ব্যবহার করব, আর অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে আওয়ামী লীগ কর্মীকে মারব, প্রগতিশীল কর্মীকে মারব, আর বলব অস্ত্র নিয়ে মোকাবিলা করব, বলব অস্ত্র নিয়ে বিপ্লব করব। কোন স্বাধীন দেশে কোন গণতান্ত্রিক দেশে এটা এলাউ করা যায় না। বহু সহ্য করা হয়েছে। দুই বৎসর সহ্য করা হয়েছে। বলা হয়, বঙ্গবন্ধু কঠোর হও। বঙ্গবন্ধু কঠোর কি না, আইয়ুব খান-ইয়াহিয়া খান-চৌধুরী মোহাম্মদ আলী-নসরুল্লাহ খান-লিয়াকত আলী খান সবাই জানেন।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু চেয়েছিল কী? বাংলার মানুষ তাকে জাতির পিতা করেছে। বাংলার মানুষ তাকে প্রধানমন্ত্রী করেছে। বাংলার মানুষকে আমি বুঝবার চেষ্টা করেছি। তাদের বলতে চেষ্টা করেছি, তোমরা কাজ কর। তোমরা গণতন্ত্রের পথ অবলম্বন কর। দুটো খেলার অধিকার তোমাদের নাই। গণতান্ত্রিক অধিকারও তোমরা ব্যবহার করবা আর বিপ্লবের কথা বলে রাতের অন্ধকারে গুলি মারবা, অস্ত্র ফেরত দেবা না, সে অধিকার তোমাদের নাই, সে অধিকার তোমাদের দেওয়া হবে না। এটা মনে রাখা দরকার, সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া হয়েছে। জনগণ দেখতে চাও, জনগণ দেখবা। কয়েক হাজার লোক মিটিং-এ যোগদান করলেই মনে কর না যে, হয়েছে। এখনও আওয়ামী লীগ ডাক দিলে রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোক এসে হাজির হবে।

মনে কর না যেন বড় একটা কিছু হয়ে গেছ। সাবধান হয়ে যাও। একদল বলে অমুক তারিখ থেকে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু কর। তারপরেও আমি কিছু বলি না। তবু তারা বলে কী যে, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে হাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নাই, থাকতে পারে না। নইলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা অন্ধকারে মরে? আওয়ামী লীগ কর্মী এবং প্রগতিশীল কর্মী যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে, আমি তাদের কাছে অস্ত্র চেয়েছিলাম। তারা অস্ত্র জমা দিয়েছে। কিন্তু তোমরা গোপনে কিছু কিছু অস্ত্র রেখে দিয়েছ এবং সেগুলি গোপনে ব্যবহার করছ। আজ যদি আওয়ামী লীগ কর্মী বা প্রগতিশীল কর্মীর কাছে একদিন অস্ত্র দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে একজনের অস্তিত্বও বাংলাদেশে থাকবে না। আমাকে বাধ্য কর না।

দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা কর না, যাও গণতন্ত্রের অধিকার আছে, বক্তৃতা কর। বাই-ইলেকশন হবে, ইলেকশনে নামো। ইউনিয়ন কাউন্সিল ইলেকশনে জিততে পারে না, রাত্রিবেলা এসে চেয়ারম্যানকে গুলি করে মারে। কয়-কী করলাম, বিপ্লব করলাম। কী বিপ্লব-চেয়ারম্যান মারছে। বাবা এ তো শুনি নাই। আমার মনে হয় এখানে যত দেশের লোকেরা আছেন, যদি শোনেন সবাই হাসবেন। কারণ, তাহলে বিপ্লবের ইতিহাস বদলিয়ে লিখতে হবে।

কর্মীদের কর্তব্য

আজ সেইজন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের কাছে আমার কথা যে, তোমাদের কর্তব্য রয়েছে। স্বাধীনতা এসেছে। এবার খোদাকে হাজের নাজের রেখে এই প্রতিজ্ঞা করে যেতে হবে যে, বাংলার মানুষকে সুখী করতে হবে আমার। বাংলার দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। শোষণহীন সমাজ করতে হবে। যে রাষ্ট্রীয় চার আদর্শ আছে তাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে হবে। তাহলেই তোমাদের আদর্শ পূর্ণ হবে– এর আগে নয়।

তোমাদের সেজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। তোমাদের আরো ত্যাগের প্রয়োজন, যারা ত্যাগ করে তারা জীবনভর করে। তোমরা ত্যাগ করেছ, আরও করবা। আর যারা মজা মারে তারা এমনিও মারে অমনিও মারে। সেজন্য তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ আছে– কর্মীরা তোমাদের কাছে আমার দাবি আছে। তোমরা জীবনে আমার চোখের সামনে কোনদিন কথা বল নাই। যা বলেছি তোমরা তাই করেছ। তোমরা হাসতে হাসতে মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়েছ। তোমরা পারবা না আমার কথা শুনতে? দুর্নীতি আমরা দেখব না, দুর্নীতি আমরা করব না, দুর্নীতি এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। তোমরা পারবা না এদেশের মানুষকে ভালোবাসবার? আমরা দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করব। এদেশের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে চায়, আমরা শান্তি দেব। পারবা না তোমরা এ-কাজ করতে! বল আমার কাছে। না পার আমাকে বিদায় দিয়ে দাও। আমি কিছু চাই না তোমাদের কাছ থেকে।

সহকর্মী ভাইয়েরা,

আমি বলে দিচ্ছি, আমি সেন্টিমেন্টালি বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্‌। কথাটা তোমাদের পরিষ্কার বলে দেবার চাই। তোমরা সকলে জান যে, প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য আমি রাজনীতি করি নাই । তোমরা জানতা, ইচ্ছা করলে আমি বহু আগে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। এ প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাছে কাঁটা বলে মনে হয়। আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তা হলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না– পারব না– পারব না। আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে। আমার যৌবন কারাগারের অন্তরালে কাটিয়ে দিয়েছি এদেশের মানুষের জন্য। আমি ওদের কাছে থাকতে চাই, ওদের কাছে থাকতে চাই, ওদের সঙ্গে সঙ্গে মরতে চাই, এর বেশি আমি আর কিছু চাই না।

গণতন্ত্রের পথে সমাজতন্ত্র

তাই, তোমাদের আমার অনুরোধ, তোমরা শুধু পার আমার অনুরোধ রাখতে। কারণ, তোমরা আমার বহু দুর্দিনের কর্মী। ১৯৪৯ সাল থেকে তোমরা এ পর্যন্ত আপদ, বিপদ, মুসিবত, অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, গুলি সব অগ্রাহ্য করে আমার পাশে দাঁড়িয়েছ বাংলার মানুষকে স্বাধীন করার জন্য। স্বাধীন তোমরা করেছ। এবার বাংলার মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। দিতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তি, সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সমাজতন্ত্র ছাড়া রাস্তা নাই। শোষণহীন সমাজ গাছ থেকে পড়ে না। শোষণহীন সামজ বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়তে হলে আমার কর্মীভাইদের সমাজতন্ত্রের কর্মী হতে হবে। ক্যাডার তৈরি করতে হবে। ট্রেনিং দিতে হবে। না হলে পারব না কিছু করতে।

তোমাদের নিঃস্বার্থ কর্মী হয়ে ট্রেনিং নিতে হবে। সমাজতন্ত্রে আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে যাবার চাই এবং আমরা দুনিয়াকে দেখাতে চাই যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় নতুন সিস্টেমে আমরা শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলব।

আমরা বাঙালি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালি, সেদিন আমি শেষ হয়ে যাব। আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি আমার প্রাণের মাটি, বাংলার মাটিতে আমি মরব। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা, আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ তোমাদের মনে রাখতে হবে।

সমাজতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা

আর একটা জিনিস। রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক, তারা হীন, নিচ; তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালোবাসে সে কোনদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা যাঁরা এখানে মুসলমান আছেন তাঁরা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আলামিন-রাব্বুল মুসলেমিন নন। হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক– সমস্ত মানুষ তার কাছে সমান। সেই জন্যই এক মুখে সোস্যালিজম ও প্রগতির কথা এবং আর এক মুখে সাম্প্রদায়িকতা চলতে পারে না। সমাজতন্ত্র প্রগতি আর সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। একটা হচ্ছে পূর্ব, আর একটা হচ্ছে পশ্চিম। যারা এই বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায় তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যেও।

আওয়ামী লীগের কর্মীরা,

তোমরা কোনদিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ কর নাই। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। তোমাদের জীবন থাকতে যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে না পারে। তোমাদের মনে রাখা দরকার, সেজন্য আমাদের রাস্তা ক্লিয়ার। আমাদের জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কোন কিন্তু নাই। সে সমাজতন্ত্র হলো আমার অর্থনীতি। একে গড়তে হলে কর্মীদের সমাজতান্ত্রিক কর্মী হতে হবে, ক্যাডার হতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে। তাহলেই আমরা সফল হবো।

অবশ্য অনেক লোক আছে যারা সমাজতন্ত্রিক অর্থনীতিকে গ্রহণ করত পারে নাই। তারা পিছন থেকে কিছু ঢেলা মারার চেষ্টা করছে। যারা প্রগতির নামে সাম্প্রদায়িকতা করছে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। গ্রামে গ্রামে দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে বোঝাতে হবে, একেই বলে সমাজতন্ত্র। একেই বলে শোষণহীন সমাজ। একেই বলে সুষম বন্টন। তাহলে বাংলার মানুষ তোমাদের পিছনে থাকবে।

পররাষ্ট্রনীতি

সহকর্মী ভাই ও বোনেরা,

আওয়ামী লীগ পার্টি দীর্ঘদিন ধরে যে বৈদেশিক নীতি দিয়েছে, আমার মনে হয় আপনাদের এই সরকার সেই নীতি পুরাপুরি পালন করতে চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া ও অন্যান্য যেসব দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সাহায্য করেছেন, আজ তাঁদের কথা স্মরণ করি। এছাড়াও ঐ সমস্ত দেশের কথা স্মরণ করি, যারা বিপ্লবের পরেও আমাদের ভেঙ্গে-পড়া অর্থনীতি পুনর্গঠনে সাহায্য করেছেন। আমাদের সাহায্য করেছেন ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ক্যানাডা, গ্রেটব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, জিডিআর, ফ্রান্স, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি এবং আরো বিভিন্ন দেশ। সাহায্য করেছেন সমস্ত সোস্যালিস্ট কান্ট্রি। তাদের সঙ্গে আমাদের রিলেশন ভালো হয়েছে।

আমরা আজ গর্বিত যে, মধ্যপ্রাচ্যে আমরা আরব ভাইদের এবং প্যালেস্টাইনবাসীদের পাশে রয়েছি। ইসরাইলীরা তাদের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। ইসলাইলীরা জাতিসংঘের প্রস্তাব মানে নাই। তারা দখল করে বসে আছে আরবদের জমি; আরব ভাইদের এ-কথা বলে দেবার চাই এবং তারা প্রমাণ পেয়েছে যে, বাংলার মানুষ তাদের পিছনে রয়েছে। আরব ভাইদের ন্যায্য দাবির পক্ষে রয়েছে। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করব।

যেসব দেশ আমাদের সাহায্য দিয়েছে আমি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। শান্তিপূর্ণ দেশ সহঅবস্থানে বিশ্বাস করে। আমি বিশ্বাস করি নন-অ্যালাইন্ড,

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসি। আমরা কারুর পকেটে যাবার চাই না। আমরা সকলের বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, একটা দেশ পাকিস্তান শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী নয়।

আত্মসম্মানের বিনিময়ে বন্ধুত্ব নয়

যে চীন নিজেকে মহান দেশ বলে এবং দুঃখী মানুষের বন্ধু বলে গর্ব করে সে চীন সম্পর্কে আমার একটা কথা বলার আছে। চীনের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রি করে আমরা কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই না। আমরা এমন কিছু করি নাই, যে জন্য চীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে ভেটো দিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় চীন বাংলার বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছে। আমরা সেজন্য দুঃখিত। তবু চীন অনেক বড় দেশ, আমরা তাদের বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু চীন একটা সাম্রাজ্যবাদী ও ক্যাপিটালিস্ট দেশ পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। আর বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ যারা রক্ত দিয়ে বিপ্লব করে দেশকে স্বাধীন করেছে তারা যাতে জাতিসংঘে স্থান না পায় সেজন্য চীন জাতিসংঘে ভেটো দিল বাংলার বিরুদ্ধে।

ইতিহাস বড় তাৎপর্যপূর্ণ। যখন চীনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে ভেটো দেওয়া হতো তখন এই বাংলার মানুষই বিক্ষোভ করত। আমি নিজে ঐ ভেটোর বিরুদ্ধে বহুবার কথা বলেছি যে, ভেটোর জন্য চীন ২৫ বৎসর জাতিসংঘে যেতে পারে নাই; দুঃখের বিষয়, সেই চীন আজ 'ভেটো পাওয়ার' হয়ে প্রথম ভেটো দিল আমার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তবু আমি কামনা করি তাদের বন্ধুত্ব। অনেক বড় দেশ। দুশমনি করতে চাই না। বন্ধুত্ব কামনা করি। কারণ, আমি সকলের বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু জানি না, আমার এই কামনায়, আমার এই প্রার্থনায় তাঁরা সাড়া দেবেন কি না। যদি না দেন কিছু আসে যায় না। ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা এত ছোট দেশ নই। বাংলাদেশ এতটুকু নয়। পপুলেশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ দুনিয়ার অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র।

আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। এ স্বাধীনতা আমরা আলোচনা করে বা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স করে আনি নাই। সেজন্য আজ আমাদের পরিষ্কার কথা– আফ্রিকা হোক, ল্যাটিন আমেরিকা হোক, আরবদেশ হোক– যেখানে মানুষ শোষিত, যেখানে মানুষ অত্যাচারিত, যেখানে মানুষ দুঃখী, যেখানে মানুষ সাম্রাজ্যবাদীর দ্বারা নির্যাতিত– আমরা বাংলার মানুষ সেই দুঃখী মানুষের সাথে আছি এবং থাকব। আমাদের নীতির পরিবর্তন হবে না। আওয়ামী লীগের নেতারা, এটা নিশ্চয়ই আপনাদেরও নীতি– আমাদের সরকারের তরফ থেকে এটা পালন করা হচ্ছে।

আর্থিক অবস্থা

আজ আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা বড়ই খারাপ। অর্থনৈতিক অবস্থা বেশি ভালো নয়। কেন? ২৫ বছর শোষণ করে সব নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিনা পয়সায় বিনা বৈদেশিক মুদ্রায় সরকার চালাতে হচ্ছে। সাড়ে সাত কোটি লোকের দেশ। সবকিছু বিধ্বস্ত। একে গড়া এত সোজা নয়। তাছাড়া দুনিয়াতে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের মতো যারা উন্নয়নশীল দেশ, যারা দেশকে গড়ে তুলতে চায়, তারা মহা বিপদের সম্মুখীন।

আমাদের কষ্ট হবে। তবু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, সাহায্য আমি চাই। আওয়ামী লীগ যে সাহায্য চায় তা আত্মসম্মান বিক্রি করে নয়। আওয়ামী লীগ সরকার সেই সাহায্য গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের কেউ যদি কিনতে চান, ভুল হবে। কেউ যদি সাহায্যের নামে আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, তবে ভুল হবে। আমরা শোষিত মানুষ। বহু ত্যাগ করেছি। বহু রক্ত দিয়েছি। দরকার হয় আরও দেব। কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রি করে আমরা কারো কাছে সাহায্য চাই না। যারা বন্ধু হিসাবে সাহায্য করতে চান, তারা আমার ভাই। আসুন, আমরা সাহায্য নিশ্চয়ই গ্রহণ করব। কারণ, দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার দেশকে গড়তে হবে।

দুর্নীতি

আজ সত্য কথা বলতে কি, আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার। আওয়ামী লীগ কর্মীরা, কোথায় যেন গোড়ায় একটু গলদ রয়ে গেছে। মানুষ এত অর্থের জন্য পাগল হয়েছে কেন?

শুধু টাকা কামাই করবে কী করে, এই চেষ্টা। একদিন হাসতে হাসতে বললাম যে, বাংলার কৃষক, বাংলার দঃখী মানুষ এরা কিন্তু অসৎ নয়। ব্লাকমার্কেটিং করে কারা? রাগ করবেন না। আপনারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আছেন, আপনারা রাগ করবেন না। ব্লাকমার্কেটিং কারা করে? যাদের পেটের মধ্যে দুই কলম বিদ্যা হয়েছে তারাই ব্লাকমার্কেটিং করে। স্মাগলিং কারা করে? যারা বেশি লেখা-পড়া করছে তারা বেশি করে। হাইজাকিং কারা করে? যারা বেশি লেখা-পড়া শিখছে তারাই করে। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং তারাই করে। বিদেশে টাকা রাখে তারাই। আমরা যারা শিক্ষিত, আমরা যারা বুদ্ধিমান, ঔষধের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বিষাক্ত করে মানুষকে খাওয়াই তারাই। নিশ্চয়ই গ্রামের লোক এসব পারে না, নিশ্চয় আমার কৃষকভাইরা পারে না। নিশ্চয়ই আমার শ্রমিকভাইরা পারে না। পেটের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি আছে তারাই ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। আর বিদেশি এজেন্ট কারা হয়? নিশ্চয়ই আমার কৃষক নয়, নিশ্চয়ই আমার শ্রমিক নয়। আমরা যারা লেখা-পড়া শিখি, গাড়িতে চড়ি, বিদেশে যাবার পারি, বিদেশিদের সঙ্গে মিশতে পারি, ভালো স্যুট পরতে পারি; তারাই বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে বিদেশের এজন্ট হই।

মহাবিপদের মধ্যে আছি আমরা। আপনারা যারা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত, যাঁরা দেশকে নেতৃত্ব দেন, তাদের কর্তব্য হবে আত্মসমালোচনা করা। আর আওয়ামী লীগের সহকর্মী ভাইয়েরা, তোমরা ব্লাকমার্কেটিয়ারদের পিছনে লাগো। হোর্ডারদের পিছনে লাগো। ঘুষখোরদের পিছনে লাগো। তোমরা আমার কথায় আগেও লেগেছ, এখনো লাগো। শুধু আইন দিয়ে, শুধু শক্তি দিয়ে দুর্নীতি দমন করা যায় না। এজন্য এমনভাবে জনমত সৃষ্টি করতে হবে, যেমনভাবে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি করে আমরা আন্দোলন করেছিলাম। যেমনভাবে ২৫ মার্চ থেকে ন'মাস পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি করে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলাম। তেমনি বাংলার মাটিতে জনমত সৃষ্টি করতে হবে দুর্নীতিবাজ, ঘুষকোর ও শোষকদের বিরুদ্ধে। আমি বিশ্বাস করি, তাহলে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি উঠে যাবে।

গণঐক্য জোট করেছেন আপনারা। আওয়ামী লীগের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ আছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের সাথে কর্মী আছে পাঁচটি গ্রুপের– আওয়ামী লীগ, শ্রমিকলীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ। আমি মাঝে মাঝে খবর পাই– ভুল বোঝাবুঝি হয়। কোন ভুল বোঝাবুঝি হতে পারবে না। সবার সাথে আলোচনা করে নিয়ে আপনাদের পাঁচ গ্রুপকে একসাথে কাজ করতে হবে। আপনারা কাজ করছেন দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য। সেইজন্য সংঘবদ্ধভাবে বসে আলোচনা করে আপনাদের কাজ করতে হবে। কারণ, আদর্শ আপনাদের এক। নেতৃত্ব আপনাদের এক। কর্মী আপনারা এক। সম্মুখে রাস্তা আপনাদের এক। গভর্নমেন্ট আপনাদের এক।

উৎপাদন বাড়াতে হবে

ভাইয়েরা আমার,

পরিশ্রম না করলে, কঠোর পরিশ্রম না করলে সাড়ে সাত কোটি লোকের ৫৪ হাজার বর্গমাইল এলাকার এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়দা করতে হবে। শ্রমিক ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ– তোমাদের বার বার বলেছি– এখনো বলছি। প্রোডাকশন বাড়াও, সমাজতন্ত্রের অর্থ এই যে, প্রোডাকশন বাড়াও, ভোগ কর।

একবার এক মিটিংয়ে বলেছিলাম, গাই-টা খেও না, দুধ খাওয়া। তোমরা কিছু লোক যা আরম্ভ করেছ, দুধও খাবার চাও, গাইও খাবার চাও। সেজন্যই বলছি, প্রোডাকশন কর। আমি শ্রমিক ভাইদের সবাইকে দোষ দেই না। অনেক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা ভালো প্রোডাকশন করছে, ভালো কাজ করছে। কৃষক ভাইরাও এগিয়ে এসেছে। তাদের অর্গানাইজ করতে হবে। এমনকি এ-কথা ছাত্র ভাইদেরও বলি। দেখুন, বগুড়ায় গিয়ে কলেজের ছাত্ররা নিজেরা মাছ

চাষ করে। নিজের খরচ নিজেরাই কামাই করে লেখাপড়া আরম্ভ করে দিয়েছে। আপনারাও শুরু করেন। বাপ-মার উপর ট্যাক্স কম করেন। আজকে জিনিসের দাম দিন দিন বাড়ছে। বিদেশ থেকে আনতে হয়। দেশে ইনফ্লেশন হচ্ছে। মানুষের দুঃখ হবে। সেজন্য আজ আপনাদের এদিকে নজর দিতে হবে। আমি আপনাদের কাছে আজ আর বেশিক্ষণ বক্তৃতা করছি না। ইতিহাস বলে দেওয়ার দরকার ছিল বলেই এত কথা বলেছি।

আমি তোমাদের পরিষ্কার বলতে চাই, আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকতে পারব না। তোমাদের নতুন সভাপতি করতে হবে। কারণ, সময় আমি দেবার পারি না। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের কার্যপ্রণালীর মধ্যে যেটা আমি নিজে পাস করিয়েছিলাম তাতে পরিষ্কার বলা ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী বা গভর্নর হলে কেউই আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি বা কর্মকর্তা হতে পারবে না। এটাকে আমি পরিবর্তন করতে চাই না। আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে, তোমরা আমার কথা রাখবা এবং আমার কথা শোনবা। আমি সব ঠিক করে দেব, তোমরা চিন্তা করো না– গোছায়ে গোছায়ে ঠিক করে দেব। সারাজীবন আমার কথা শুনেছ, এবারও শুনতে হবে।

মানুষের পাশে দাঁড়াও

আমি আগেই বলেছি যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যা প্রয়োজন আওয়ামী লীগের সেই চারটি জিনিস– নেতৃত্ব, আদর্শ, সংগঠন ও নিস্বার্থ কর্মী রয়েছে। আমরা আওয়ামীল লীগ স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করেছি। আজ যে নতুন সংগ্রাম শুরু হয়েছে– দেশ গড়ার সংগ্রাম, দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার সংগ্রাম– এই সংগ্রামেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করি, যদি আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কামিয়াব হবো। কেউ আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে না। বিশৃঙ্খলাকারীরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাই, আজকে তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইল– গ্রামে গ্রামে কাজ কর। দুঃখের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াও। তোমরা আমার কথা শুনেছ, এখনো আমার কথা শোন। তোমাদের যা বলি সেভাবে কাজ কর। আমি যেখানেই থাকি তোমাদের সাথেই থাকব, তোমাদের পাশেই থাকব। তোমাদের বাদ দিয়ে একদিনও আমি বাঁচতে পারি না। কিন্তু সভাপতি আমি থাকতে পারব না।

আমি আমার পক্ষ থেকে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে যাঁরা বিদেশ থেকে এখানে এসেছেন সেই যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানি, ভারত, রুমানিয়া, ইরাক, মালয়েশিয়া, হাঙ্গেরি ও দক্ষিণ ইয়ামেনের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। যাঁরা আসতে পারেন নি বলে আমাদের জানিয়েছেন এবং যাঁরা এখানে কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রয়েছেন তাঁদের সকলকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি এই জন্য যে, আজ প্রয়োজন ছিল আওয়ামী লীগের কিছু ইতিহাস বলার, প্রয়োজন ছিল আপনাদের কিছু পথ দেখানোর। শুধু একটা কথা বলে যাই– শেষ কথা আমার, যে কথা আমি বার বার বলেছি– সোনার বাংলা গড়তে হবে। এটা বাংলার জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের প্রতিজ্ঞা। আমার আওয়ামী লীগের কর্মীরা, যখন বাংলার মানুষকে বলি– তোমরা সোনার মানুষ হও, তখন তোমাদেরই প্রথম সোনার মানুষ হতে হবে। তাহলেই সোনার বাংলা গড়তে পারবা। আর যারা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছ, তারা বাংলার দুঃখী মানুষের কাছ থেকে সরে যেও না।

জয় বাংলা। জয় আওয়ামী লীগ।

সূত্র : বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সম্পাদনা- খোন্দকার মোহাম্মদ ইলয়াস, আগামী প্রকাশনী এবং বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্স, ঢাকা, বর্ধিত সংস্করণ : ১৫ আগস্ট ২০০০

আওয়ামী যুব লীগের তিনদিন ব্যাপী প্রথম জাতীয় কংগ্রেস শুরু

আত্মশুদ্ধ যুবশক্তির উন্মেষ চাই : বঙ্গবন্ধু

পল্টন ময়দান, ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন এবং মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য স্বাধীন দেশে আবার সেই আত্মশুদ্ধ যুবশক্তির উন্মেষের আহ্বান জানান– যে যুবশক্তি একদিন তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে দেশে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল। তিনি বলেন যে, দেশ শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত না হইলে লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মা অভিশাপ দিবে। তাই, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আত্মকলহ বিস্মৃত হইয়া আওয়ামী লীগ, যুব লীগ, ছাত্র লীগ, শ্রমিক লীগ ও কৃষক লীগকে এক সঙ্গে কাজ করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে ৫টি অঙ্গ দলের সমন্বয় কমিটি গঠন করিতে হইবে। তিনি গত সোমবার (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের তিনদিন ব্যাপী প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে উদ্বোধনী ভাষণ দিতেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, যুগ যুগ ধরিয়া পরাধীন বাঙালি জাতি সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণে জর্জরিত হইয়াছে। তাই, দেশের মানুষ মুক্ত হইবে, শোষণমুক্ত সমাজ হইবে– এই আশায় সংগ্রাম করিয়া বহু লোক প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার দুই বৎসর পরেও শোষণ-দুর্নীতির অবসান হয় নাই। তিনি বলেন, "নির্দেশ আমি বহুবার দিয়াছি, কিন্তু কতটুকু করিতে পারিয়াছি, তাহা ভাবিবার কথা। বক্তৃতায় কাজ হয় নাই। তাই বলি, আমার বাণী নীররবে নিভৃতে কাঁদে।" যুবসমাজের নিকট তিনি প্রশ্ন করেন যে, আজও বাংলাদেশে শোষক দুর্নীতিবাজ কেমন করিয়া টিকিয়া আছে?"

দেশের কল্যাণে যুবসমাজকে আগাইয়া আসার আহ্বান জানাইয়া বঙ্গবন্ধু বলেন, "ওয়াদা কর দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবি। কেন, তোরা থাকিতে দেশে ডাকাতি-রাহাজানি হয়। আমি যেখানে আছি, সেখানে কেন তোরা উহা বন্ধ করিতে পরবি না। কিন্তু দোহাই তোদের 'ফাউল গেম' করবি না" তিনি বলেন, "চোখের আড়ালে গেলেই তোরা লটর-পটর করিস। কিন্তু তোরা লটর-পটর না করিলে বাংলাদেশে আর কেহ লটর-পটর করিতে পারিবে না।" তাই, আবার বলিতেছি, "আমার বাণী যেন নীরবে নিভৃত না কাঁদে।" প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আজিকার যুবকরাই আগামীকাল দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। তাই, এ ব্যাপারে তাহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহাদের মত ও পথ ঠিক করা এবং কথা ও কাজে সঙ্গতি থাকিতে হইবে। *ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিলে যুব সমাজ সফল হইবে বলিয়া* তিনি মন্তব্য করেন। যুবসমাজের প্রতি আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন যে, কৃষক–শ্রমিক, কুলি-মজুর ঘুষ খায় না। খায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা। লেখাপড়া জানা লোকরাই দুর্নীতি করে, বিদেশে টাকা জমায়। তাহাদের ছেলেপেলেরা গাড়ি হাইজ্যাক করে, ব্যাংক ডাকাতি করে। এ ব্যাপারে পিতা-মাতা ও স্ত্রীদের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, সকলে মিলিয়া ইহা প্রতিরোধ না করিলে দুর্নীতি বন্ধ করা যাইবে না।

দেশের সমস্যা অনুধাবন ও উহার সমাধানের ব্যাপারে যুবসমাজের দায়িত্ব প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনিতে না পারিলে দেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি বলেন, "নেতৃত্ব কতটুকু দিতে পারিব জানি না, কিন্তু চিরকাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। আজও মানুষকে ধোঁকা দিতে চাই না। কারণ, আমি ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করি নাই। দেশের মানুষকে আমি ভালোবাসি। তাহারা আমাকে জাতির পিতারূপে আখ্যায়িত করিয়াছে, কাজেই মানুষের ভালোবাসার জন্য আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।" এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জাতির পিতার প্রধানমন্ত্রী হওয়া চলে কি-না তাই ভাবিবার বিষয়। কিন্তু এক সংকটপূর্ণ অবস্থায় আমাকে এই দায়িত্বগ্রহণ করিতে হইয়াছে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী নই– দেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের একজন। দেশে একদল লোক সম্পদের পিছনে ছুটিতেছে। বিদেশ হইতে আনিত সাহায্য লুট করিয়া খাইতেছে। কিন্তু দরকার হইলে শেখ মুজিব আবার ডাক দিবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার দায়িত্ব শুধু মন্ত্রী বা সদস্যদের নহে। এ ব্যাপারে যুব সমাজকে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

সরকারের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, সমালোচনার পূর্বে দেশের অবস্থা কি ছিল তাহাও দেখিতে হইবে। ২ বৎসর পূর্বে এখানে হাহাকার ও আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। জাতীয় সরকার চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় কিছুই ছিল না। বিদেশের সাহায্য দিয়া সরকার চালাইতে হইয়াছে। তিনি বলেন, "এমনকি এখানে কেহ জানিত না কেমন করিয়া আলোচনা করিয়া বিদেশ হইতে সাহায্য আনিতে হয়।" সরকারের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করিয়া তিনি বলেন যে, ভুল-ত্রুটি মানুষ করে, কিন্তু সেটা উদ্দেশ্যমূলক কিনা তাহা বিচার্য। তিনি বলেন যে, ২ বৎসরের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে। যদি কেহ দেশ চালাইতে চাহে তবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছাড়িতে প্রস্তুত আছে।

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও প্রাথমিক অবস্থায় ৫/১০ বৎসর কষ্ট করিয়াছে। বাংলাদেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নাই। থাকিলে আপাতত জনগণের অসুবিধা দূর হইলেও ভবিষ্যতেও তাহারা গোলাম হইয়া যাইত। তাই, দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়াই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছাইতে হইবে। তিনি ৪টি মূল রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়িয়া তোলার কাজে আগাইয়া আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

খাদ্য সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে পারে না। সারা বিশ্বে বর্তমানে খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে যেখানে একটন চাউল ১৪০ ডলার অর্থাৎ ৬৫ টাকা মণদরে পাওয়া যাইত, সেখানে এখন চাউলের দাম টনপ্রতি ৩৫০ ডলার অর্থাৎ ১১০ টাকা মণ। অনুরূপভাবে গম টনপ্রতি ১৫৮ ডলারের স্থলে ২৩৫/২৪০ ডলার অথ্যাৎ ৪০ টাকা মণের স্থলে ৭২ টাকা মণদরে ক্রয় করিতে হয়।

যুব সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তাহারা বাংলার মাটিতেই তৎপর রহিয়াছে। এই স্বাধীনতার শত্রুদের পুরাপুরি উৎখাত করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়া একদল লোক দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চায়। তাহারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বলিয়া অস্ত্রের হুমকি দেয়। আবার ধরপাকড় করিলে গণতন্ত্রের দোহাই দেয়। তিনি বলেন, "অস্ত্রের কথা বলিলে কপালে আরও মার আছে।" পাটের অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যাহারা আগুন জ্বালো শ্লোগান দেয় তাহারাই এই পাট পোড়াইয়াছে। তিনি বাংলার মাটি হইতে পরগাছার মূলোৎপাটন করার জন্য যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, দেশ গড়ার কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং তাহাদের শতকরা ৯৬ ভাগ ভালোভাবে চলিতেছে। কিন্তু কতিপয় পাকিস্তানিমনা বেইমানী করার সুযোগ খুঁজিতেছে। তাহাদের প্রতি হুঁশিয়ারি জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গবন্ধু এই প্রসঙ্গে বলেন যে, দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদেরও ক্ষমা করা যায়। কিন্তু দুর্নীতিবাজদের ক্ষমা করা যায় না। তাই, তাহাদের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা হইতেছে। তিনি বলেন, সরকার পুলিশ দিয়া দুর্নীতি, শোষণ বন্ধ করিতে পারিবে না। কাজেই এ ব্যাপারে যুবসমাজকে আগাইয়া আসিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িকতাকে উৎখাত করার আহ্বান জানাইয়া বঙ্গবন্ধু বলেন যে, আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। আমি কোনক্রমেই বাংলার মানুষের আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ন হইতে দিব না। তিনি বলেন, "আমরা বন্ধু চাই, মাস্টার চাই না। আমরা সকলের বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু কাহারও চোখ রাঙ্গানী কামনা করি না।"

আওয়ামী যুব লীগের প্রথম কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, দেশে অনেক শত্রু আছে। কাজেই নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইলে শত্রুরা সুযোগ পাইবে। তিনি আওয়ামী লীগের অঙ্গদলগুলির মধ্যে 'সমন্বয় কমিটি' গঠনের আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, নীতির যখন মিল আছে তখন দেশের জন্য সকলকে এক সঙ্গে কাজ করিতে হইবে। আত্মকলহে লিপ্ত হইলে তিনি তাহাদের সহিত থাকিবেন না বলিয়া উল্লেখ করেন এবং গণঐক্যজোটের মতো আওয়ামী লীগের অঙ্গদলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের আহ্বান জানান। পরিশেষে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, দেশের লুক্কায়িত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিলে ১০ বৎসর পর মানুষ উহার সুফল লাভ করিবে।

বাংলাদেশ যুব লীগের প্রধান শেখ ফজলুল হক মণির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংগঠনের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে দেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে প্রায় ১০ হাজার প্রতিনিধি ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, জিডিআর ও ভারত হইতে যুব প্রতিনিধিদল যোগ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সভার প্রারম্ভে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ, নিহত ও পরলোকগত দলীয় কর্মী এবং বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের তিরোধানে শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয় এবং এক মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, বুধবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আহ্বান :

মূল্যবোধের এই সংকট কাটাতেই হবে

বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ১৯৭৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ :

জাতীয় মূল্যবোধের উজ্জীবনে একটি ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনের জন্যে বঙ্গবন্ধু দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণে বলেন, জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অভাব আজ সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এই অভাব যে সংকটের সৃষ্টি করেছে তা অবিলম্বে রোধ করা দরকার। তিনি বলেন, দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিজীবীরা এই সংকট উত্তরণে এবং জাতীয় মূল্যবোধের উজ্জীবন ও সুকুমারবৃত্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজিত আট দিনব্যাপী এই প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনে দেশি-বিদেশি কবি-সাহিত্যিকদের এক বিরাট সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবি সাহিত্যিকদের প্রতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখনি ধারণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আজ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে লেখনির মাধ্যমে তার মুখোশ তুলে ধরতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনদিন

কোন মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি শুধু শহরের পাকা দালানেই সীমাবদ্ধ না থেকে তাতে গ্রাম-গ্রামান্তরের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দনও যাতে প্রতিফলিত হয় সে সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

সোনার বাংলা গড়ার জন্যে সোনার মানুষের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্য থেকেই এই সোনার মানুষ সৃষ্টি করতে হবে।

নবতর চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই এই নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব। বঙ্গবন্ধু বলেন, মানবাত্মার সুদক্ষ প্রকৌশলী হচ্ছেন দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী। আমি আজকের এই সাহিত্য সম্মেলনে আপনাদের সোনার মানুষ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

ভাষা আন্দোলনের শহীদ ও বাংলাদেশের স্বাধিকার ও সার্বিক মুক্তির জন্যে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বঙ্গবন্ধু বলেন, স্বাধীন জাতি হিসেবে আজকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদাকে দেশে ও বিদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কবি জসীমউদ্‌দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এরা ছাড়াও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আবদুল মতিন চৌধুরী ও ড. আবু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ তিনটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে অভ্যর্থনা পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে ভাষণ দেন যথাক্রমে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম ও জনাব রাহাত খান।

সম্মেলনে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরি, জিডিআর ও মঙ্গোলিয়ার প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের বিরাট জনসমাবেশে তাদেরও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রীঅন্নদাশংকর রায়, সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা মি. আনোয়ার আলিমঝানভ, হাঙ্গেরির প্রতিনিধি মি. লাসলো কেরি, জিডিআর-এর প্রতিনিধি মি, হ্যাসো ক্রবলার ও মঙ্গোলিয়ার প্রতিনিধি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামে বদর-শামস বাহিনীর হাতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে শোক প্রকাশ করা হয় ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সূত্র: দৈনিক বাংলা, শুক্রবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা :

ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি

লাহোর, পাকিস্তান, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

পাকিস্তানের লাহোরে ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে (ওআইসি) প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ-এর পূর্ণ বিবরণ :

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের এখানে সমবেত ভাইদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ ও আরব ভাইদের ন্যায়সংগত সংগ্রামে তাহাদের সমর্থন ঘোষণার জন্য এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিতে পারায় আমরা খুবই আনন্দিত।

সেক্রেটারি জেনারেলসহ অন্য যাঁহারা আমাদের ভাইদের পার্শ্বে আজ আমাদের উপস্থিতির আয়োজন করিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করিয়াছেন, আমি তাহাদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যে মহামান্য নেতৃবৃন্দ আজ আমাদের স্বাগত জানাইয়াছেন আমি

তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই আমাদের মেজবান ও সম্মেলনের চেয়ারম্যান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে। আমি বলিতে চাই, সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হইয়াছে। আমরা এই উপমহাদেশে এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুগপৎ অবদান রাখার পথ উন্মুক্ত করিয়াছি।

আজিকার মতো মানবজাতি ইতিপূর্বে কখনও এতবড় কঠোর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় নাই। একদিকে ভয়াবহ বিপদ আর অপরদিকে জীবনের মানোন্নয়নে সৃজনশীল বিপুল সম্ভাবনা—বিশ্বের মানুষ ইতিপূর্বে এমন পরিস্থিতির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় নাই। মানুষ এখন বস্তুগত দিক হইতে বৃহত্তর শক্তি অর্জন করিয়াছে যাহা সে আর কখনও করিতে পারে নাই। সে পৃথিবীকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। আমরা যুদ্ধের জন্য শক্তি অপব্যবহার করিতে দেখিয়াছি, জনগণকে নিপীড়ন করিতে দেখিয়াছি। আমরা তাহাদের ন্যায়সংগত অধিকার অস্বীকার করিতে দেখিয়াছি। অকথ্য দুর্ভোগের মাঝে তাদের ঠেলিয়া দিতেও আমরা দেখিয়াছি। আর এইসব অবর্ণনীয় যাতনার চূড়ান্ত নিদর্শন হইয়া রহিয়াছেন আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা।

আর এই জন্যই অতীতের তুলনায় আজ এই শক্তিকে প্রজ্ঞার সহিত কাজে লাগানোর প্রয়োজন বেশি। ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি, দুর্ভোগ নয় মানুষের কল্যাণে আমাদের কাজ করিতে হইবে। আমরা যদি মহানবীর প্রচারিত মানব-প্রেম ও মর্যাদার শাশ্বত মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারি তাহা হইলে বর্তমানকালের সমস্যা সমাধানে মুসলিম জনসাধারণ সুস্পষ্ট অবদান রাখিতে সক্ষম হইবে।

এইসব মূল্যবোধে উদ্দীপিত হইয়া শান্তি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আমরা একটি নূতন আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে পারি। এই সম্মেলন শুধুমাত্র আরব ভাইদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে আমাদের ঐক্য সংহত করার জন্যই নয়, বরং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সহিত বিশ্বব্যাপী শান্তি ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘোষণার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ও সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে একাত্মতার উপর জোর দিতে হইবে। আমাদের ভাইদের উপর যে নিদারুণ অবিচার হইয়াছে অবশ্যই উহার অবসান ঘটাইতে হইবে।

অন্যায়ভাবে দখলকৃত আরব ভূখণ্ড অবশ্যই ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে জেরুজালেমের উপর। রমজান যুদ্ধের অকুতোভয় বীর শহীদানের প্রতি আমরা সালাম জানাই। তাঁহারা তাঁহাদের শৌর্য ও আত্মত্যাগের দ্বারা বহু অমূলক ধারণা ধূলিসাৎ করিয়া এমন একটি নয়া কার্যকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে এই কথাই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, ন্যায়বিচার ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বিজয় অবধারিত।

আমরা পুরোপুরিরূপে বিশ্বাস করি যে, ইতিহাস একটি ক্রান্তিলগ্নে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা আমাদের সম্মিলিত ও সুচিন্তিত কার্যক্রম দ্বারা আমাদের ভাইদের উপর চালিত অবিচারের অবসান ঘটাইতে পারিব।

আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরা এখন আমাদের সম্পদ ও শক্তি এমনভাবে সংহত করিতে পারি, যাহাতে আমাদের সকলের জন্য শান্তি ও ন্যায়বিচার অর্জন করা যায়।

এই সাফল্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সকল যুক্ত প্রচেষ্টা সফল করুন।

ধন্যবাদ, জনাব চেয়ারম্যান।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

শিক্ষা কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ

বৃত্তিমূলক শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে– সুপারিশ বাস্তবায়নে সেল গঠিত হবে : বঙ্গবন্ধু

গণভবন, ঢাকা, ৭ জুন ১৯৭৪

শিক্ষা কমিশন শুক্রবার ৭ জুন (১৯৭৪) গণভবণে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেছেন।

শিক্ষা কমিশনের কাছ থেকে রিপোর্ট গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটি সেল গঠন করা হবে।
ছত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত সর্বমোট প্রায় সাড়ে চারশ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে উল্লেখযোগ্য আড়াইশ সুপারিশ রয়েছে। রিপোর্টে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

শুক্রবার (৭ জুন) সকালে গণভবনে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কুদরাত-এ-খুদা প্রধানমন্ত্রীর হাতে কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট অর্পণ করেন। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং কমিশনের সদস্যগণও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ড. খুদা শিক্ষামন্ত্রীকেও রিপোর্টের একটি কপি উপহার দেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কমিশনের সদস্যবৃন্দকে দেশের জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের সঠিক দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য কমিশনের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, এই রিপোর্ট প্রণয়ন করতে গিয়ে কমিশন বিভিন্ন সময়ে যেসব অসুবিধা ও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন সে সম্পর্কে তিনি অবহিত রয়েছেন।

রিপোর্ট পেশ করার পর কমিশনের চেয়রম্যান ড. কুদরাত-এ-খুদা গণভবনে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের জানান যে, রিপোর্টে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নার্সিং, কৃষি, বাঁশ, বেত প্রভৃতি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশ অনুয়ায়ী ১ম শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, ৯ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৪ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

ড. খুদা আরো জানান যে, সুপারিশের সাফল্য যদি একাদশ শ্রেণী পর্যায়ের পরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর ৪ বছর থেকে ১ বছর কমানো যাবে। তিনি জানান যে, পরীক্ষার অসদুপায় ও বিভিন্ন দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করার জন্য রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে।

ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে জানা গেছে যে, শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ৬৫ ভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য শতকরা ২০ ভাগ এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৫ ভাগ অর্থ ব্যয় করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের মতে এসব সুপারিশ কার্যকরী করতে ১০ থেকে ১৫ বছর সময় লাগবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সরকার ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ২৩ সদ্য বিশিষ্ট এই শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন গত বছর মে মাসে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন।

সূত্র : দৈনিক বাংলা, ৮ জুন ১৯৭৪

ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়া প্রয়োজন : বঙ্গবন্ধু

জাতিসংঘ সদরদপ্তর, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন। উল্লেখ্য বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

জনাব সভাপতি,

আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এইজন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।

আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে।

জনাব সভাপতি,

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের ব্যাপারে আপনার মূল্যবান অবদানের কথা আমি স্মরণ করিতেছি।

যাঁহাদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব-সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে, এই সুযোগে আমি তাঁদেরকেও অভিবাদন জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামে সমর্থন দানকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যাঁহারা মূল্যবান সাহায্য দিতেছেন, তাঁহাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘে যাঁহারা আমাদের স্বাগত জানাইয়াছেন, তাঁহাদের আমি বাংলাদেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমাদের শান্তির সংগ্রাম

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম হইতেছে সার্বিক অর্থে শান্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রাম। আর সেই জন্যই জন্মলগ্ন হইতে বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পাশে দাঁড়াইয়া আসিতেছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরে এই ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, এই সব নীতিমালার বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কি তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইতেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধার চরম আত্মদানের মাধ্যমে শুধুমাত্র জাতিসংঘ সনদ

স্বীকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনরুদ্ধার সম্ভব।

আগ্রাসনের মাধ্যমে বেআইনিভাবে ভূখণ্ড দখল, জনগণের অধিকার হরণের জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার এবং জাতিগত বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এবং গিনিবিসাউ এই সংগ্রামে বিরাট বিজয় অর্জন করিয়াছে।

চূড়ান্ত বিজয়ের ইতিহাস জনগণ ও ন্যায়ের পক্ষেই যায়, এইসব বিজয় এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের বহু অংশে এখনও অবিচার ও নিপীড়ন চলিতেছে, অবৈধ দখলকৃত ভূখণ্ড পুরাপুরি মুক্ত করার জন্য আমাদের আরব ভাইদের সংগ্রাম অব্যাহত রহিয়াছে এবং প্যালেস্টাইনি জনগণের বৈধ জাতীয় অধিকার এখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় নাই, উপনিবেশ বিলোপ প্রক্রিয়ার যদিও অগ্রগতি হইয়াছে কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছায় নাই। বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের জিম্বাবুয়ে (দক্ষিণ রোডেশিয়া) এবং নামিবিয়ার জনগণ জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়তার সহিত লড়াই করিয়া যাইতেছে। বর্ণবৈষম্যবাদ, যাহাকে মানবতার বিরোধী বলিয়া বার বার আখ্যায়িত করা হইয়াছে তাহা এখনো আমাদের বিবেককে দংশন করা অব্যাহত রাখিয়াছে।

আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ

একদিকে অতীতের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাইতে হইতেছে, অপরদিকে আমরা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতেছি। আজিকার দিনে বিশ্বের জাতিসমূহ কোন পথ বাছিয়া নিবে তাহা লইয়া সংকটে পড়িয়াছে। এই পথ বাছিয়া নেওয়ার বিবেচনার ওপর নির্ভর করিবে আমরা সামগ্রিক ধ্বংসের ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়া এবং ক্ষুধা, বেকারী ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া আগাইয়া যাইব অথবা আমরা এমন এক বিশ্ব গড়িয়া তোলার পথে আগাইয়া যাইব, যে বিশ্বে মানুষের সৃজনশীলতা এবং আমাদের সময়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ণ সম্ভব করিয়া তুলিবে। এবং যে বিশ্ব কারিগরি বিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলার অবস্থা সৃষ্টি করিবে। যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়াছে তাহা একটি ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া জরুরিভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে।

এই বৎসরের প্রথম দিকে এই পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বর্তমান জটিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানিয়াছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ওপর সৃষ্ট বাংলাদেশ পর পর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা সর্বশেষে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইতেছে এই বৎসরের নজিরবিহীন বন্যা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করায় আমরা জাতিসংঘ, তার বিভিন্ন সংস্থা ও মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ।

আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যে আগাইয়া আসার জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। মিত্রদেশগুলি এবং বিশ্বের মানবিক সংস্থাসমূহও এ ব্যাপারে সাড়া দিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত হয় নি, ইহার ফলে দেশে আজ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মতো দেশগুলিতে দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ডলার শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে,

বার্ষিক মাথাপিছু একশ ডলারেরও কম আয়ের জনগণ বর্তমানে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহারা বর্তমান স্তরের চাইতেও তাদের জীবনযাত্রার মান কমাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিশ্বখাদ্য সংস্থার বিবেচনায় শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকার জন্য যে সর্বনিম্ন সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহার চাইতেও কম ভোগ করিয়াছে যেসব মানুষ তাহারা আজ অনাহারের মুখে পতিত হইতেছে। দরিদ্র দেশগুলির ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার। শিল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানি পণ্য, খাদ্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যের দরুন তাহা আজ ক্রমশ তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টাও প্রয়োজনীয় উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার ফলে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে ইতোমধ্যেই দারিদ্র্য ও ব্যাপক বেকারত্বের নিষ্পেষণে পতিত দেশগুলি তাহাদের পাঁচ হইতে ছয় শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির হার সংবলিত পরিমিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাঁটাই করার ভয়ানক আশঙ্কার হুমকিতে পতিত হইয়াছে। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের খরচই বহুগুণ বাড়িয়া যায় নাই, উপরন্তু তাহাদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য তাহাদের সামর্থ্যও প্রতিকূলভাবে কমিয়া গিয়াছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশ্বের জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে না পারিলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরো চরমে উঠিবে, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের সেই দুঃখ-দুর্দশার আর কোন পূর্ববর্তী নজির পাওয়া যাইবে না। ইহার পাশাপাশি অবশ্য থাকিবে গুটিকয়েক লোকের অপ্রত্যাশিত সুখ-সমৃদ্ধি। শুধুমাত্র মানবিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়িয়া তোলা এবং পারস্পরিক স্বনির্ভরতার স্বীকৃতি এই পরিস্থিতির যুক্তিযুক্ত সমাধান আনিতে পারে এবং এই মহাবিপর্যয় পরিহার করিবার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাই

একটি যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘকে এর আগে কোথাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হয় নাই। এই ধরনের ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করাই নয়, ইহাতে একটা স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নেরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি। আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার পরিবেশেই সমাধান করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জরুরি ব্যবস্থা নিতে হইবে। ইহাতে শুধুমাত্র এই ধরনের পরিবেশই সৃষ্টি হইবে না, ইহাতে অস্ত্রসজ্জার জন্য যে বিপুল সম্পদ অপচয় হইতেছে তাহাও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা যাইবে।

বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব–এই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে আমাদের সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম

করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করিতে। এই ধারণা হইতে জন্ম নিয়াছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এইজন্য সমঝোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা–বিশ্বের যে কোন অংশে যে কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন, আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই। এই নীতির প্রতি অবিচল থাকিয়া আমরা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা সম্পর্কে শান্তি এলাকার ধারণা, যাহা এই পরিষদ অনুমোদন করিয়াছে, তাহাকে সমর্থন করি।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত করার প্রতিও সমর্থন জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সমবেত উন্নয়নশীল দেশসমূহ শান্তির স্বার্থকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগুরু জনগণের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন।

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নর-নারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাইবে। এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশে আপস মীমাংসার পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয় বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তির কাঠামো এবং স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান সৃষ্টি করিবে। ইহা ছাড়া আমাদের জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অতীতের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার পরিবর্তে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও নেপালের সঙ্গে শুধুমাত্র সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করি নাই, অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া গিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়া নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি।

পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোন উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোন পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোন দর কষাকষি করি নাই। আমরা কেবল আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।

তেষট্টি হাজার পাকিস্তানি পরিবারের অবস্থা এখনো মানবিক সমস্যারূপে রহিয়া গিয়াছে। তাহারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে এবং নিজ দেশে ফিরিবার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছে। যে দেশের প্রতি তাহারা আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে, সেই দেশে তাহাদের যাইবার অধিকার আছে। আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারেই এই অধিকার তাহাদের ওপর বর্তাইয়াছে। এই মানবিক সমস্যার অবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন।

আরো একটি জরুরি সমস্যা হইল সাবেক পাকিস্তানের পরিসম্পদ বন্টন। পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত রহিয়াছে। আমরা আশা করি, উপমহাদেশের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এইসব অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হইবে, যাহাতে স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া সফল হইতে পারে।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষায় সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকিবে।

জাতিসংঘ অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহার পঁচিশ বৎসরের কার্যকালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবিক অগ্রগতির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে। এক কথায় বলা যায়, বিরোধ ও মানবিক দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও জাতিসংঘ ভাবীকালের দিকে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে। বিশ্ব সংস্থার সুনির্দিষ্ট সাফল্য ও সম্ভাবনাময় দিক সম্পর্কে বাংলাদেশ যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছে এমনটি আর কেউ করে নাই। ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীদের জন্যই বাংলাদেশে যুদ্ধের দাগ মুছিয়া ফেলিতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে এবং ভারত হইতে ফিরিয়া আসা এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করিতে জাতিসংঘ আমাদের দেশে ব্যাপক সাহায্য ও পুনর্গঠন কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছিল। এইসব শরণার্থী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়াছিল। জাতিসংঘের মহাসচিব, তাঁর সহকর্মী এবং বিভিন্ন মানবিক সংস্থা যাহারা আমাদের দেশে বিরাট কর্মসূচিতে অংশ নিয়াছিল, তাহাদেরকে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমরা বিশ্বাস করি, জাতিসংঘের গঠনমূলক নেতৃত্ব উপমহাদেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে সহায়ক হইবে। আমি আগেই বলিয়াছি, সাম্প্রতিক বিপর্যয়কারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রয়াসে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ বার বার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়িয়াছে। বাংলাদেশ বিশেষ অসুবিধার জন্য এমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই, যাহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাইয়া আসিতে পারে। জাতিসংঘ দুর্যোগ ত্রাণ সমন্বয় অফিস স্থাপন করিয়াছে। এই ব্যাপারে স্বল্প হইলেও ইহা একটি দৃষ্টান্ত সূচনা করিয়াছে। লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগ সমন্বিত করার ব্যাপারে তাই জাতিসংঘের সদস্যদের একটি বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

জনাব সভাপতি,

মানুষের অজেয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে জয় করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতে চাই। আমাদের মতো যেই সব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহাদের দৃঢ়। আমরা দুঃখ ভোগ করিতে পারি, কিন্তু মরিব না। টিকিয়া থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে জনগণের দৃঢ়তাই চরম শক্তি। আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আমাদের পথ হইতেছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির ওপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আর লক্ষ্য পূরণ এবং সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমাদের নিজেদের গড়িয়া তুলিবার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা আগাইয়া যাইব।

সূত্র : *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী ও বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকা, বর্ধিত সংস্করণ ১৫ আগস্ট ২০০০।

তিন শত্রু প্রতিরোধে সহযোগিতার ডাক

কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াতে হবে : বঙ্গবন্ধু

ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪

জাতীয় দিবস (মহান বিজয় দিবস) উপলক্ষে ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর রবিবার রাত ৮.৪৫ মিনিটে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ :

আমার প্রিয় দেশবাসী,

সংগ্রামী অভিনন্দন ও সালাম গ্রহণ করুন। কাল ১৬ ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় দিবস। শহীদের রক্তে রঞ্জিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আত্মত্যাগ ও পরম আকাঙ্ক্ষায় মূর্ত এই দিনটি। আজ আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি সেইসব অকুতোভয় বীর শহীদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, যাঁদের জন্য সোনার বাংলা আজ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত। উনিশ শ' একাত্তর সালে ডিসেম্বর মাসের ষোল তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপণ সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐকবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎপথে থাকি তবে ইনশাআল্লাহ্ জয় আমাদের অনিবার্য।

সংগ্রামী বন্ধুরা আমার,

স্বাধীনতার উষালগ্নে কী নিয়ে, কোন অবস্থায় আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, তা আপনারা ভালোভাবে জানেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে শূন্য হাতে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়। আমাদের শুরু করতে হয়েছিল পাকিস্তানিদের রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪—সময়ের দিক থেকে মাত্র তিন বছর। এ-কথা সত্য যে, তিন বছর আপনাদের কিছু দিতে পারব না, একথা আমি আপনাদের বলেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেওয়ার খাতা একেবারে শূন্য পড়ে থাকে নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য কোটি কোটি মণ খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করা ছাড়াও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, শ্রমিক ভাইদের নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধি, বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন, পাটের নিম্নতম মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীদের মর্যাদা দিয়ে বর্ধিত হারে বেতন প্রদান—এই জাতীয় কয়েকটি ব্যবস্থা, যা সরকার কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও কার্যকর করেছে। একই সাথে আমাদের দেশের বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শুধু পুনঃপ্রতিষ্ঠাই করা হয় নি; মিরপুর, নয়ারহাট, তরাঘাট প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন সেতু নির্মাণ করে দেশে উন্নততর সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই এটাও জানেন, যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জরিপ কাজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বাড়তে শুরু করেছিল, খাদ্যঘাটতির পরিমাণ কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছিল। দেশবাসীও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির কিছুটা ফল লাভ করতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনী, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী ও পুলিশবাহিনীকে নতুন করে গঠন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেশ পুনর্বাসন-পর্যায় শেষ করে প্রবেশ করেছিল পুনর্গঠনের নতুন দিগন্তে। '৭২-এর দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টি, '৭৩-এর আঞ্চলিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও দেশ যখন পুনর্গঠন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে উপর্যুপরি দুটি বিপর্যয় নেমে এলো। প্রথমত মুদ্রাস্ফীতি। তার ফলশ্রুতি আমাদের অত্যাবশ্যক আমদানি পণ্যের অবিশ্বাস্য হারে মূল্য বৃদ্ধি। অন্যদিকে আমাদের রপ্তানি পণ্যের মূল্য বিশ্ববাজারে এই সময়ে বৃদ্ধি তো পায়ই নি, বরং অনেকাংশে কমে গেছে। দ্বিতীয়ত এবারের প্রলয়ঙ্করী বন্যা। যার ফলে ১৭টি জেলার ৪ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো

মারাত্মকভাবে। দশ লক্ষ টনের বেশি খাদ্যশস্য হলো নষ্ট। এই দুই বিপর্যয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের জাতীয় পুনর্গঠন প্রচেষ্টা হয়েছে বিঘ্নিত। এইসাথে একদল নরপশু চোরাকারবারি, কালোবাজারি, মুনাফাখোর, মজুতদার ও ঘুষখোরের হীন কার্যকলাপ অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়েছে।

বাংলাদেশ আজ তিনটি মহাবিপদ তথা তিন শত্রুর মোকাবিলা করছে : ১. মুদ্রাস্ফীতি–যা আজ সারাবিশ্বে ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে, ২. প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা এবং ৩. চোরাকারবারি, মুনাফাবাজ, মজুতদার ও ঘুষখার–এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে সরকারকে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে। সেপ্টেম্বরে বন্যার তাণ্ডব শুরু হওয়ার পর থেকে ৫,৭০০ লঙ্গরখানা খুলে প্রতিদিন ৪৪ লক্ষাধিক লোককে খাবার সরবারাহ করা হয়েছে এবং কোন কোন অঞ্চলে এখনও তা অব্যাহত আছে। হেলিকপ্টার থেকে নৌকা পর্যন্ত যখন যেটা পাওয়া গেছে, তাতে করেই এই তৈরি খাদ্য পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বন্যাকবলিত মানুষের কাছে। বন্যার অব্যবহিত পরেই নতুন করে আবাদ শুরু করার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে বীজ ও চারা। দেওয়া হয়েছে কৃষিঋণ, টেস্ট রিলিফ, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা, পরনের কাপড় ও ঔষধপত্র। আমাদের সাধ্যের কিছুই আমরা অবশিষ্ট রাখি নি। বাংলার মানুষের এই মহাবিপদের দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্যও আমরা পেয়েছি। মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আজ এ-কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, মানবতার ডাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার পরিবর্তে বিশ্বের কোন কোন সংবাদপত্র যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করছিল ও দুঃখী মানুষের জন্য উপদেশ খয়রাত করছিল, তখন বাংলাদেশ সরকার তথা এদেশের মানুষ বিশ্বের বৃহত্তম ত্রাণতৎপরতা চালিয়ে, অবস্থা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছে। সম্পদ নিতান্ত সীমিত হওয়া সত্ত্বেও সুষ্ঠু ও সুচারু বিলিবন্টনের মাধ্যমে নতুন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

প্রিয় বন্ধুরা,

আমি আগেই বলেছি, তিন শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন এক প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমরা নিয়োজিত। আজ বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন তেল, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য আমদানির জন্য আমাদের ব্যয় করতে হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি তথা বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের চক্রে অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশের ন্যায় বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। তাই, দেশ-বিদেশের মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলায় উৎপাদন বৃদ্ধি, মিতব্যয়িতা ও মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে আনা, ওয়েজ আর্নার স্কিমে পণ্য আমদানি তথা পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বিলিবন্টনসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা আমরা করছি। বাজারে ইতোমধ্যেই কোন কোন ক্ষেত্রে এর শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

খাদ্য আমদানি ব্যয় হ্রাসের জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ঘাটতি পূরণের জন্য আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহের নীতি আমরা গ্রহণ করেছি, এ-কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। দেশের খাদ্য দেশে মজুত করে দুঃসময়ে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহই এর প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষক ভাইয়েরা এ ব্যাপারে যাতে সরকার-নির্ধারিত মূল্য পান এবং কোন প্রকার হয়রানির সম্মুখীন তাঁদের না হতে হয় তার প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। তাই, খাদ্য সংগ্রহ অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করা প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের কর্তব্য। বাংলাদেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন। এই পথে আমরা বেশ কিছুটা অগ্রসরও হতে পেরেছি। প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে একাধিক ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এই কারখানাসমূহে যে সার উৎপাদন হবে তা দিয়ে শুধু দেশেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না, আমরা তা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারব।

আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় তেলের সন্ধান লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তেল অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই কয়েকটি বিদেশি তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।

মুদ্রাস্ফীতির পরেই আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যার কথা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি জিনিসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন–সময় ও অর্থ। পাকিস্তানি শোষকরা ২৫ বছরের শাসন ও শোষণে এ ব্যাপারে কিছুই করে নি। বরং বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে বাংলাদেশের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেছে বিরাট ঋণের বোঝা। বাংলাদেশের সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী ভিত্তিতে চেষ্টা করছেন।

আমাদের নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান শত্রু চোরাকারবারি (স্মাগলার), কালোবাজারি, মুনাফাবাজ ও ঘুষখোরের দল। মানুষ যখন অনাহারে মারা যায়, তখনও এই সব নরপশুর দল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখের গ্রাস অন্যত্র পাচার করে দিয়ে থাকে। বিদেশ থেকে ধার-কর্জ, এমনকি ভিক্ষা করে আনা পণ্য ও বাংলার সম্পদ মজুদের মাধ্যমে এরা মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। এদের কোন জাত নেই, নেই কোন দেশ। এইসব নরপশুদের উৎখাতে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। সরকার ইতোমধ্যেই সামরিকবাহিনীসমূহ নিয়োগের মাধ্যমে সীমান্তে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিছুসংখ্যক চোরাচালানীকে গুলি করে হত্যাও করা হয়েছে। চোরাচালান অনেকাংশে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত বাহিনীসমূহ ও সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে সংসদ-সদস্যদের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে এই উদ্দেশ্যে গঠন করা হচ্ছে গণকমিটি। চোরাচালান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হলে চাই জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা। আমি আশা করি, জনগণ এ-কাজে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। এ ব্যাপারে একটা সুখের বিষয় এই যে, ভারত সরকারও চোরাচালান বন্ধের জন্য তাঁদের এলাকায় যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

এখানে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারীর কথা উল্লেখ না করে আমি পারছি না। রাতের অন্ধকারে সন্ত্রাস সৃষ্টিই তাদের প্রধান উপজীব্য। ৪ জন সংসদ-সদস্যসহ তিন হাজার আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও নিরীহ গ্রামবাসীকে এদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। তারা জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করে জনগণের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করতেও দ্বিধা করছে না। সরকার তো দূরের কথা, কোন শান্তিপ্রিয় নাগরিকই এটা বরদাস্ত করতে পারে না। সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে জনগণের কোন কল্যাণ বা কোন সমস্যার সমাধান হয় না। এ পন্থা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বহু আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

এছাড়াও ক্ষমাপ্রাপ্ত কিছু কিছু লোক দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সে সুযোগ দেওয়া হবে না। বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান বাংলাদেশে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁরা সকলেই এদেশের নাগরিক। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা সম-অধিকার ভোগ করবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

বিগত একটি বছরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যান্য সাফল্য সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আপনারাই তার বিচার করবেন। শুধু এইটুকু বলব, জাতিসংঘে আজ বাংলাদেশ স্বীয় ন্যায়সঙ্গত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, ইসলামিক শীর্ষ বৈঠক ও কমনওয়েলথ–সর্বত্র বাংলাদেশ সম্মানিত এবং সমাদৃত। প্রতিবেশী প্রতিটি দেশ, বিশেষ করে নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও বার্মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা আমরা করেছি। এমকি মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধের জন্য যাদের বিচার হওয়ার কথা ছিল, সেইসব যুদ্ধপরাধীকেও আমরা মার্জনা করে দিয়েছি। বাংলার মানুষের এ বদান্যতা ও ঔদার্য ইতিহাসে

স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সাবেক পাকিস্তানের সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বাঁটোয়ারা এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়া পাকিস্তানের কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছে না।

আরব ভাইদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্মোচিত হয়েছে সম্ভাবনাময় এক নতুন দিগন্ত। দুর্দিনে তাঁরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সর্বনাশা বন্যার সময় তাঁরা যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শুরু থেকেই বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান; শোষিত, নির্যাতিত মানুষের সাথে একাত্মতা; ও কারও প্রতি বৈরিতা নয়, সকলের সাথে বন্ধুত্বের যে-নীতি অনুসরণ করে আসছে–আজ তা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার,

একটি কথা আমি প্রায়ই বলে থাকি। আজও বলছি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। শোষিত, নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত বাংলাদেশের সমাজদেহে সমস্যার অন্ত নেই। এই সমস্যার জটগুলিকে খুলে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না। চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কিনা সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আপনি আপনার কর্তব্য দেশের ও দেশের জনগণের প্রতি কতটা পালন করেছেন, সেটাই বড় কথা।

আমি জানি, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি জিনিসের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধিতে আপনারা কী নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছেন। বিশেষ করে সীমাবদ্ধ আয়ের লোকদের দুঃখ-কষ্টে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েক হাজার লোককে আমরা অনাহারের কবল থেকে বাঁচাতে পারি নি–এ সত্য স্বীকার করতে আমার কোন লজ্জা নেই। কারণ, আমি জানি, সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও একমাত্র আমরাই তখন এসব হতভাগ্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। সামান্য যা-কিছু পেয়েছি, তাই নিয়ে এদেশের সেবায় এগিয়ে গিয়েছি। কিছুসংখ্যক ভাববিলাসীর ন্যায় বক্তৃতা বিবৃতির ঝড় তুলেই ক্ষান্ত হই নি। খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে অনাহারে মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি রোধ করার সুকঠিন চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

ভাইয়েরা আমার,

জীবন ধারণের এই দুঃসহ সংগ্রামে অতীতের ন্যায় এবারেও আমি আপনাদের পাশে রয়েছি, ভবিষ্যতেও থাকব।

আমাদের আজকের এই দুঃখ-কষ্ট যে নিতান্ত সাময়িক, সে সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত। এই বাংলায় সম্পদের কোন অভাব নেই। কিন্তু তার সদ্ব্যবহারের জন্য সময়ের প্রয়োজন। আমরা যদি বাংলার এ সম্পদ বাংলার মাটিতে রাখতে পারি, সমাজতান্ত্রিক বিলিবন্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারি এবং সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বাড়াতে পারি, তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের ভাবী বংশধরদের শোষণমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধিশালী এক ভবিষ্যৎ আমরা উপহার দিতে পারব।

আসুন, ১৬ ডিসেম্বরের এই পবিত্র জাতীয় দিবসে আমরা সকলে সেই শপথ গ্রহণ করি।
খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

সূত্র : *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী ও বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্স, ঢাকা, বর্ধিত সংস্করণ ১৫ আগস্ট ২০০০।

জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় সেনাবাহিনীকে একাত্ম হতে হবে : বঙ্গবন্ধু

কুমিল্লা সেনানিবাস, ১১ জানুয়ারি ১৯৭৫

১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি শনিবার কুমিল্লা সেনানিবাসের শহীদ লে. ক. এস আর চৌধুরী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সামরিক একাডেমীর ক্যাডেটদের প্রথম দলের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন। [উল্লেখ্য যে, জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ১১ মার্চ সোমবার কুমিল্লা সেনানিবাসে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যঘেরা পরিবেশে দেশের প্রথম সামরিক একাডেমীর উদ্বোধন করেছিলেন। আর এই সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাঁর দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন।]
বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রধান,
বাংলাদেশ সামরিক একাডেমীর অধ্যক্ষ
ও
আমার ক্যাডেট ভাইয়েরা,

আপনারা সকলেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমরা পাকিস্তানি আমলে বাংলাদেশে সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য বহুকাল সংগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু এতে কোনো ফল হয় নি। আজ লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেইজন্যই আজ বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশ সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আমি স্মরণ করি সেই সমস্ত শহীদ ভাইদের, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে। আমি স্মরণ করি বাংলার ৩০ লক্ষ মানুষকে, যাঁরা রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছে। তাঁদের জন্য গর্বে আমার বুক সত্যই ভরে ওঠে। তাঁদের জন্যই বাংলাদেশের মালিক আজ বাংলাদেশের জনসাধারণ। তাঁদের জন্যই সম্ভব হয়েছে আমাদের নিজেদের মাটিতে সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা। আমি আশা করি, ইন্‌শাআল্লাহ্ এমন এক দিন আসবে, যখন এই একাডেমী শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নয়, সারা দুনিয়াতেই সম্মান অর্জন করবে।

ক্যাডেট ভাইয়েরা,

আজ তোমরা তোমাদের ট্রেনিং শেষ করলে। কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে, এটা এক পর্যায়ের শেষ, আর এক পর্যাযের শুরু। পরের পর্যায়ে দায়িত্ব অনেক বেশি। আজ তোমরা ট্রেনিং সমাপ্ত করে সামরিকবাহিনীর কর্মচারী হতে চলেছ। এখন তোমাদের ওপর আসছে দেশ এবং জাতির প্রতি দায়িত্ব, জনগণের প্রতি দায়িত্ব; যে সমস্ত সৈনিকদের তোমরা আদেশ-উপদেশ দেবে, তাদের প্রতি দায়িত্ব; তোমাদের কম্যান্ডের প্রতি দায়িত্ব এবং তোমাদের নিজেদের প্রতি দায়িত্ব। তোমাদের এখন দায়িত্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তা না থাকলে তোমরা জীবনে মানুষ হতে পারবে না। শৃঙ্খলা ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে নি।

আমি অবশ্যই জানি, আজ আমাদের এই একাডেমীর ধরতে গেলে কিছুই নেই। আমরা সামান্য কিছু জিনিস নিয়ে এর কাজ শুরু করেছিলাম। অনেক অসুবিধার মধ্যে তোমাদের ট্রেনিং নিতে হয়েছে। সব জিনিস তোমাদের আমরা দিতে পারি নি। তোমাদের কম্যান্ডার-রা অনেক অসুবিধার মধ্যে তোমাদের ট্রেনিং দিয়েছেন।

কিন্তু আজ আমি যা দেখলাম, তাতে আমি বিশ্বাস করি, পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পেলে আমাদের ছেলেরা যে-কোন দেশের যে-কোন সৈনিকের সাথে মোকাবিলা করতে পারবে। তাদের সে-

শক্তি আছে। তবে একদিনে কিছুই হয় না। আমরা তিন বছর হল স্বাধীনতা পেয়েছি। এর মধ্যে একাডেমীর জন্য যা যতটুকু দরকার, তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নি। এমনকি, আমার নিজের চেষ্টায়ও এটা-ওটা যোগাড় করে এক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে বাঙালির স্বল্পতা

তোমরা তখন বাচ্চা ছিলে। কিংবা ছোট ছিলে, স্কুলে পড়তে। সব কথা তাই তোমরা জানো না। পাকিস্তানিরা দুনিয়াকে বুঝিয়েছিল যে, বাঙালিরা যুদ্ধ করতে জানে না। তারা বাঙালিকে সৈন্যবাহিনীতে নিত না। আমার মনে পড়ে, অনেক আগে, যখন আইয়ুব খান কম্যান্ডার-ইন-চিফ ছিলেন, তখন তিনি গোপনে একটি সার্কুলার দিয়েছিলেন, সেনাবাহিনীতে যেন শতকরা দুইজনের বেশি বাঙালি নেওয়া না হয়। যেভাবেই হোক, সেই সার্কুলার আমি পেয়ে যাই এবং সেটা নিয়ে তোলপাড় শুরু করি। হুকুমটি পরে তাঁরা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু তারপরও ছলে বলে কৌশলে বাঙালিদের দাবিয়ে রাখেন।

পাকিস্তানিরা বলত, বাঙালিরা সামরিকবাহিনীতে যোগদানের অযোগ্য। তারা কাপুরুষ, তারা যুদ্ধ করতে জানে না। কিন্তু পাকিস্তানের সৈন্যরা বাংলাদেশের মাটিতে দেখে গেছে, বাঙালিদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা কেমন। মুক্তিবাহিনীর ভয়ে তাদের বড় বড় শক্তিধর বিশালদেহ পুরুষদেরও জান বেরিয়ে যেত। আমরা বাঙালিরা আর যা-ই হই না কেন, কাপুরুষ নই। আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসতেও জানি।

স্বাধীনতার সংগ্রাম

বাঙালিরা যুগ যুগ ধরে পরাধীন ছিল। দু শ' বছর আমরা ইংরেজদের অধীনে ছিলাম। তারপর পঁচিশ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু দল ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের বাংলাদেশের মাটি দখলে রেখে শোষণ করে। এই ক্যান্টনমেন্টে তখন বাঙালিদের স্থান ছিল না। এখান দিয়ে যাওয়ার সময় বাঙালিদের রাস্তায় অপমান করা হতো। আমার সবই জানা আছে।

এখান দিয়ে গাড়ি করে যাওয়ার সময় আমার সারা শরীর জ্বলে উঠত। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দুশমনদের বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করব। তখন আমাদের অনেক ব্যথা, অনেক দণ্ড, অনেক জুলুম, কারাগারের অনেক নির্যাতন সইতে হয়েছে। আমিই শুধু নই, হাজার হাজার কর্মী এসব সহ্য করে বাংলাদেশের মাটিকে মুক্ত করবার জন্য সংগ্রাম করেছে।

তোমাদের এখন একটা জিনিস মনে রাখা দরকার। দেশ যখন আমাদের আছে, মাটি যখন আমাদের আছে, বাংলাদেশের সোনার মানুষ যখন আছে, তখন আমরা সবই পাব। যদি আমরা সোনার ছেলে তৈরি করতে পারি, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ আমার স্বপ্নের সোনার বাংলা একদিন অবশ্যই হবে। আমি হয়ত দেখে যেতে পারব না। কিন্তু তা হবে। আজ বাংলাদেশের সম্পদ কেউ লুট করে নিতে পারবে না। বাংলাদেশের মাটিতেই বাংলাদেশের সম্পদ থাকবে। বাংলাদেশের মানুষই তা ভোগ করবে। যে জাতির ৩০ লক্ষ লোক স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে পারে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দরকার হলে সে জাতির এক কোটি লোক জীবন দেবে।

ট্রেনিংপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের কর্তব্য

ছেলেরা আমার, তোমরা নতুন জীবনে যাচ্ছ। মনে রেখ, তোমরা এখন সামরিক কর্মচারী। তোমাদের অধীনে থাকবে আমাদের সেনাবাহিনী। তাদের কাছে অনেক কিছু শেখবার আছে। তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের জানতে হবে, দুঃখের সময় তারা ডাক দিলে কাছে যেতে হবে, তাদের পাশে থাকতে হবে। মনে রেখ-শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে। তোমরা শাসন করবে, তাই সোহাগ করতেও শিখবে। তাদের দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়িও, তাদের ভালোবেসো। কারণ, তোমাদের হুকুমেই তারা জীবন দেবে।

তোমাদের শ্রদ্ধাও অর্জন করতে হবে। আর সে-শ্রদ্ধা অর্জন করতে হলে শৃঙ্খলা শিখতে হবে, নিজেদের সৎ হতে হবে। নিজেদের দেশকে ভালোবাসতে হবে, মানুষকে ভালোবাসতে হবে এবং চরিত্র ঠিক রাখতে হবে। অন্যথায় কোন ভালো কাজ করা যাবে না। মনে রেখ, তোমরা বাংলাদেশের সামরিক একাডেমীর প্রথম ক্যাডেট। ভবিষ্যতে যেসব ছেলে এখানে আসবে, তারা তোমাদের দিকে তাকাবে, তোমাদের কাছ থেকে অনেক জিনিস শিখতে চাইবে। তখন তোমারা আমার মুখ কালো কর না, দেশের মুখ কালো কর না, সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখ কালো কর না। তোমরা আদর্শবান হবে, সৎপথে থাকবে। মনে রেখ-মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন; মানুষ হইতে হবে এই তার পণ।

দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে

মাঝে মাঝে আমরা অমানুষ হয়ে যাই। আমরা এত রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। তবু অনেকের চরিত্র পরির্তন হয় নি। ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারি আর মুনাফাখোর বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দীর্ঘ তিন বছর আমি তাদের কাছে অনুরোধ এবং আবেদন জানিয়েছি, তাদের হুমকি দিয়েছি। কিন্তু 'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী।' তাই আর অনুরোধ আবেদন বা হুমকি নয়। এবারে বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। তাদের জন্য আমি আমার জীবন কারাগারে কাটিয়ে দিয়েছি। তাদের দুঃখ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। তারাও আমাকে ভালোবাসে। কালও ঢাকা থেকে আসার সময় আমি দেখেছি, মানুষ খাবারের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের গায়ে কাপড় নেই, আরও নানা রকম অসুবিধার মধ্যে তারা বাস করছে, তা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ আমাকে দেখবার জন্য রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়েছিল। আমি মাঝে মাঝে তাদের জিজ্ঞেস করি, তোমরা আমাকে এত ভালোবাসো কেন?

যে দুঃখী মানুষ দিনভর পরিশ্রম করে, তাদের পেটে খাবার নেই, গায়ে কাপড় নেই, বাসস্থানের বন্দোবস্ত নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার। পাকিস্তানিরা আমাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। কাগজ ছাড়া আমাদের কারও জন্য কিছু রেখে যায় নি। আমাকে বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে সব জিনিস আনতে হয়। কিন্তু চোরের দল সব লুট করে খায়, দুঃখী মানুষের সর্বনাশ করে। এবার আমি তাই শুধু জরুরি অবস্থাই ঘোষণা করি নি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বাংলাদেশের মাটি থেকে ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, মুনাফাখোর আর চোরাচালান-কারীদের নির্মূল করব। যদি পঁচিশ বছর পাকিস্তানি জালেমদের বিরুদ্ধে লড়তে পারি, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থেকে আরম্ভ করে গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, আইয়ুব খান আর ইয়াহিয়া খান পর্যন্ত সবার সাথে বুক টান করে সংগ্রাম করতে পারি, ৩০ লক্ষ লোকের জীবন দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি, তাহলে দুর্নীতি, ঘুষখোর, মুনাফাখোরি আর চোরাচালানও নিশ্চয়ই নির্মূল করতে পারব।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমরাও প্রতিজ্ঞা কর। বাংলাদেশের জনগণও প্রতিজ্ঞা করুক। আমার আর সহ্য করবার শক্তি নেই। এসবের জন্য তো আমি জীবন-যৌবন নষ্ট করি নি। এসবের জন্য শহীদরা রক্ত দিয়ে যায় নি। মুষ্টিমেয় চোরাকারবারি, মুনাফাখোর আর ঘুষখোর দেশের সম্পদ বাইরে পার করে দিয়ে আসে, জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেয়, খাবার জিনিস গুদামে মওজুদ করে মানুষকে না খাইয়ে মারে। তাদের উৎখাত করতে হবে বাংলাদেশের বুক থেকে। আমি দেখব, তারা কি করতে পারে। এবার প্রমাণ হয়ে যাবে, চোরের শক্তি বেশি না ঈমানদারের শক্তি বেশি, অন্যায়ের কাছে আমি কোন দিন মাথা নত করি নি। বার বার পাকিস্তানিরা আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছে। কিন্তু আমি সব সময়ই বুক টান করে দাঁড়িয়ে

থেকেছি। কারণ, আল্লাহ আমার সহায় ছিল। আমার জন্য বাংলাদেশের জনগণের দোয়া ছিল। এখনও সেই দোয়া আছে। তোমাদের সাহায্য, তোমাদের সহায়নুভূতি পেলে এবারও ইনশাআল্লাহ আমি জয়ী হবো। তোমাদের কাজ দেশের জনগণকে ভালোবাসা। আর ঈমানদার মানুষের সহযোগিতায় এই দুষ্কৃতকারীদের নির্মূল করতে হবে।

আর এক দল মানুষ আছে, যারা বিদেশিদের অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে চায়। তারা রাতের অন্ধকারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। একটি লোক কেমন করে যে পয়সার লোভে মাতৃভূমিকে বিক্রি করতে পারে, তা ভাবলে আমি শিউরে উঠি। যারা বিদেশের আদর্শ বাংলাদেশে চালু করতে চায়, এদেশের মাটিতে তাদের স্থান হবে না। মনে রেখ, তোমাদের বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের শেষ করতে হবে।

আজ্ঞানুবর্তিতা চাই

আমার ছেলেরা, তোমরা আর একটি কথা মনে রেখ। জীবনে তোমরা যে কাজে নেমেছ, এটা তার জন্য জরুরি। ওপরের যাঁরা তোমাদের হুকুম দেবেন, তাঁদের কথা মানতে হবে। এর জন্য তোমরা এখনই ওয়াদা কর। তোমারা যদি তাঁদের হুকুম না মানো, তোমাদের অধীনস্থ কেউ তোমাদের হুকুম মানবে না। এই জন্যই তোমাদের ওপরওয়ালার হুকুম মানতে হবে। আমি তোমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এ-কথা বলছি না, তোমাদের জাতির পিতা হিসাবে আদশে দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী অনেক হবেন, অনেক আসবেন, প্রেসিডেন্টও অনেক হবেন, অনেক আসবেন। কিন্তু জাতির পিতা একবারই হন, দুবার হন না। জাতির পিতা হিসাবেই যে আমি তোমাদের ভালোবাসি, তা তোমরা জানো।

আমি তোমাদের আবার বলছি, তোমরা সৎপথে থাকবে, মাতৃভূমিকে ভালোবাসবে। মনে রেখ, তোমাদের মধ্যে যেন পাকিস্তানি মনোভাব না আসে। তোমরা পাকিস্তানের সৈনিক নও, বাংলাদেশের সৈনিক। তোমরা হবে আমাদের জনগণের। তোমরা পেশাদার বাহিনী নও, কেবল সামরিক বাহিনীও নও। দরকার হলে তোমাদের আপন হাতে উৎপাদন করে খেয়ে বাঁচতে হবে। এদিকে তোমাদের খেয়াল রাখা দরকার। আর তোমরা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে। যেখানে অন্যায় অবিচার দেখবে, সেখানে চরম আঘাত হানবে। তোমরা যদি গুরুজনকে মেনে শৃঙ্খলা রক্ষা করে সৎ পথে চলো, তাহলে জীবনে মানুষ হতে পারবে। এসব কথা তোমাদের ভুললে চলবে না।

চোরাচালান বন্ধ করতে হবে

একটি বিষয়ে আমি আজ গর্বিত। সামরিক বাহিনীকে আমি চোরাচালান বন্ধ করবার হুকুম দিয়েছিলাম। পঁচিশ বছরে চোরাচালান বন্ধ হয় নি। কিন্তু এবার আমার সামরিকবাহিনী, রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে শতকরা ৯৫ ভাগ চোরাচালান বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। জনগণের সাহায্য তাদের জন্য প্রয়োজন।

কিন্তু জনগণ কারা? তোমাদের বাপ, তোমাদের ভাই। এ-কথা তোমরা মনে রেখ। তোমাদের মাইনে কোত্থেকে আসে? বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের ট্যাক্স থেকে। এখানে যত সামরিক-বেসামরিক কর্মচারী আছেন, তাদের মাইনেও এই ট্যাক্স থেকে আসে। তোমরা সেই দুঃখী মানুষদের মালিক নও, সেবক। তাদের অর্থে তোমাদের সংসার চলবে। সুতরাং, তাদের শ্রদ্ধা করতে ও ভালোবাসতে শেখ। তোমরা অবশ্য অন্যায় দমন করবে। কিন্তু খেয়াল রেখ, নিরপরাধ লোকের প্রতি যেন অন্যায় কিছু না হয়। তোমাদের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল।

সোনার বাংলা দেখতে চাই

আজ তোমরা কিছু বুঝতে পারবে কিনা, আমি জানি না। আমার মনে যে আজ কি আনন্দ, তোমাদের আমি তা ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারব না। যখন আমি আগরতলা মামলায়

বন্দি ছিলাম, যখন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী জেলে বন্দি ছিলাম তখন ভাবতে পারি নি যে, একদিন এখানে তোমাদের প্যারেড হবে। অবশ্য বাংলাদেশের সামরিক একাডেমী হবে, এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু আমি দেখে যাব, এটা আমি ভাবি নি। তবে আল্লাহ্ আমাকে দেখিয়েছেন।

কিন্তু আমি আরও দেখতে চাই। আমি দেখতে চাই সোনার বাংলা। আমি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। আমি আরও দেখতে চাই, এদেশের দুঃখী মানুষ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। তাদের গায়ে কাপড় আছে, অত্যাচার-অবিচার বন্ধ হয়ে গেছে।

এই জন্য আজ আমি তোমাদের এই প্লাটফর্ম থেকে সামরিক বাহিনী, বেসামরিক বাহিনী, জনগণ–সকলের কাছে আবেদন জানাব, সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে অভাব, অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন, দেশ গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করুন। কলে-কারখানায় কাজ করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে। কাজ করব না, কিন্তু পয়সা নেব–এমন কথা বলা আর চলবে না। তিন বছর আমি এসব সহ্য করেছি, আর নয়। দেশের সম্পদ না বাড়লে দেশের মানুষ বাঁচতে পারে না।

সামরিক একাডেমীর ভবিষ্যৎ

আমি জানি, এই একাডেমীতে তোমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। অনেক অসুবিধার মধ্যে তোমাদের ট্রেনিং নিতে হয়েছে। তোমাদের কম্যান্ডার-রা বহু কষ্ট করে তোমাদের ট্রেনিং দিয়েছেন। কিন্তু একদিনে সব জিনিস হয় না। এখানে সামরিক বাহিনীর পুরোনো মানুষ যারা আছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা কর '৪৭ সালে বাংলাদেশে কী ছিল! সে যুগে আমাদের টাকা দিয়ে পাকিস্তানে যে সামরিক একাডেমী হয়েছিল, তার অবস্থাই বা দশ বছর পর্যন্ত কী ছিল।

কিন্তু আমি তিন বছরে সামরিক বাহিনীর জন্য কিছু জিনিসের বন্দোবস্ত করতে পেরেছি–সকলের জন্যই করতে পেরেছি। এর জন্য আমি আনন্দিত। সামরিক একাডেমী একদিনে গড়ে ওঠে না। তার জন্য অনেক দিন লাগে, অনেক জিনিসের প্রয়োজন হয়। ইনশাআল্লাহ সবই হবে এবং ভালোভাবেই হবে। এমনভাবে হবে যে, আমার বিশ্বাস সারা দুনিয়ার মানুষ আমাদের এই একাডেমী দেখতে আসবে।

তোমাদের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল, আমার আদেশ রইল আর রইল আমার স্নেহের আবেদন। আমি তোমাদের জন্য দোয়া করব, বাংলাদেশের জনগণ তোমাদের জন্য দোয়া করবে। তোমরা প্রথম দল। কাল থেকে তোমরা সামরিক অফিসার হয়ে যাবে। তোমরা আদর্শ সৃষ্টি কর যাতে তোমাদের পরে যারা আসবে, তারাও যেন আদর্শবান হয়। তোমাদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।

আমি তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের চিফ অব স্টাফ আর কম্যান্ডারদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁদের যাঁরা ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন এবং যাঁরা সহযোগিতা করেছেন। আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। এ স্বাধীনতা নিশ্চয়ই টিকে থাকবে। একে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। তবে, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারলে এ স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে। এজন্য তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইল, তোমরা সৎ পথে থেক। খোদা নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবে। এই কথা বলেই আমি বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

সূত্র : *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী ও বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্স, ঢাকা, বর্ধিত সংস্করণ ১৫ আগস্ট ২০০০।

পুলিশকে হতে হবে সেবক, শাসক নয়
বাংলার মানুষ চায় তারা যেন শান্তিতে ঘুমাতে পারে : বঙ্গবন্ধু

রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৫

ঐতিহাসিক রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি বুধবার প্রথম পুলিশ সপ্তাহ ও বার্ষিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ :

আমার পুলিশ বাহিনীর ভাইয়েরা,
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
ও
সমবেত অতিথিবৃন্দ,

আজ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পুলিশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। যতদিন বাংলার স্বাধীনতা থাকবে, যতদিন বাংলার মানুষ থাকবে, ততদিন এই রাজারবাগের ইতিহাস লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। ২৫ মার্চ রাত্রে যখন ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের মানুষকে আক্রমণ করে, তখন তারা চারটি জায়গা বেছে নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চালায়। সেই জায়গা চারটি হচ্ছে রাজারবাগ, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর আমার বাড়ি। একই সময়ে তারা এই চার জায়গায় আক্রমণ চালায়। রাজারবাগের পুলিশেরা সেদিন সামান্য অস্ত্র নিয়ে বীরবিক্রমে সেই সামরিকবাহিনীর মোকাবিলা করেন। কয়েক ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ করেন। তাঁরা এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করতে।

এর জন্য আজ আমি গর্বিত। আজ বাংলার জনগণ গর্বিত। সেদিন বাংলার জনগণের ডাকে, আমার হুকুমে এবং আমার আহ্বানে বাংলাদেশের জনগণের সাথে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী এগিয়ে এসেছিলেন মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে, বাংলাদেশের জনগণকে রক্ষা করতে। স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে রাজারবাগের এবং পুলিশের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। পুলিশ বাহিনীর অনেক কর্মী এখানে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাস্তায় নেমে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন নয় মাস পর্যন্ত। যাঁরা পুলিশ বাহিনীর বড় বড় কর্মচারী ছিলেন, তাদেরও অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

শহীদদের সম্মান রাখতে হবে

আজ তিন বছর হলো বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আজ প্রথম আমাদের পুলিশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। এখন একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। যে রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি, সেই রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। পুলিশ বাহিনীর ভাইয়েরা, এই রাজারবাগে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের কথা মনে রাখতে হবে। তাঁরা আপনাদের ভাই। তাঁরাও পুলিশে চাকরি করতেন। জনগণের সঙ্গে তাঁরা হাত মিলিয়েছিলেন। ত্রিশ লক্ষ লোকের সঙ্গে পুলিশের অনেক লোকও আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। তাঁদের ইজ্জত আপনারা রক্ষা করবেন। তাঁদের সম্মান আপনারা রক্ষা করবেন। তাঁদের আত্মা যাতে শান্তি পায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমনি কষ্টকর।

আজ আপনাদের কর্তব্য অনেক। যে-কোন সরকারের যে-কোন দেশের সশস্ত্র বাহিনী গর্বের বিষয়। আমার মনে আছে, যেদিন আমি জেল থেকে বের হয়ে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বুকে ফিরে আসি, সেদিন দেখেছিলাম আমাদের পুলিশ বাহিনীর না আছে কাপড়, না আছে

জামা, না কিছু, অনেককে আমি ডিউটি করতে দেখেছি লুঙ্গি পরে। একদিন রাত্রে তারা আমার বাড়ি গিয়েছিল। তাদের পরনে ছিল লুঙ্গি, গায়ে জামা, হাতে বন্দুক।

এই অবস্থায় এই দেশ শুরু হয়েছিল। পাকিস্তানি জালেমরা বাংলাদেশের সম্পদ শুধু লুট করেই নেয় নি, যাবার বেলায় সব ধ্বংস করেও দিয়ে যায়। তারা ভেবেছিল বাংলাদেশ টিকতে পারবে না। কিন্তু বাংলাদেশ টিকেছে। বাংলাদেশ থাকবে। বাংলাদেশ থাকার জন্যই এই দুনিয়ায় এসেছে। একে কেউ কোন দিন ধ্বংস করতে পারবে না। আজ আমরা জাতিসংঘের সদস্য। আজ সারা দুনিয়ায় আমার বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে। আজ দুনিয়ার মাঝে আমার বাংলাদেশের স্থান হয়েছে।

পুলিশ এখন জনগণের

একটা কথা আপনাদের ভুললে চলবে না। আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। আপনারা বিদেশি শোষকদের পুলিশ নন, জনগণের পুলিশ। আপনাদের কর্তব্য জনগণের সেবা করা, জনগণকে ভালোবাসা, দুর্দিনে জনগণকে সাহায্য করা। আপনাদের বাহিনী এমন যে, এর লোক বাংলাদেশের গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। আপনাদের নিকট বাংলাদেশের মানুষ এখন একটি জিনিস চায়। তারা যেন শান্তিতে ঘুমাতে পারে। তারা আশা করে, চোর, বদমাইশ, গুণ্ডা, দুর্নীতিবাজ যেন তাদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে। আপনাদের কর্তব্য অনেক।

আমি জানি, আপনাদের নানারকম অসুবিধা আছে। ৭০ থেকে ৮০টা থানা হানাদার বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছিল, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো নতুন করে আমরা গড়তে চেষ্টা করছি। অনেকগুলো গড়া হয়েছে, অনেকগুলোর কাজ চলছে। আপনাদের কিছুই ছিল না। আজ আস্তে আস্তে কিছু কিছু হতে চলেছে। এক দিনে কিছুই হবে না।

বাংলাদেশের মানুষ দুঃখী, বাংলাদেশের মানুষ গরিব, বাংলাদেশের মানুষ না-খেয়ে কষ্ট পায়। যুগ যুগ ধরে তারা শোষিত হয়েছে। আজ তাঁদের অবস্থা যে কেমন, আপনারা ভালো করেই জানেন। আপনারা বিদেশ থেকে আসেন নি, আপনারা ভাড়াটিয়া নন। আপনারা বাংলা মায়ের ছেলে। আপনাদের বাপ-মা এই বাংলাদেশে রয়েছেন। তাঁদের অবস্থা আপনারা জানেন। গ্রামে গ্রামে আপনারা দেখেছেন, মানুষ হাহাকার করে, না-খেয়ে কষ্ট পায়। বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে কষ্ট আরো বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ফলে, মানুষের খাবার যোগাড় করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আজ গরিবের ওপর ট্যাক্স ধরার ক্ষমতাও আমাদের বেশি নেই। তাঁরা টাকা কোত্থেকে দেবেন? তারা না-খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। এবার যে বন্যা হয়েছে, যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তা আপনারা দেখেছেন।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে

আমি আপনাদের কাছে এই আশা করব যে, আপনারা হবেন আমার গর্বের বিষয়। বাংলাদেশের মানুষ যেন আপনাদের জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, আপনা যদি সৎ পথে থেকে ভালোভাবে কাজ করেন, যদি দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকেন, তাহলে দুর্নীতি দমন করতে পারবেন। আপনারা যদি আজকে ভালোভাবে থাকেন, শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, তাহলে আমি বিশ্বাস করি, যে-থানায় ভালো অফিসার আছেন এবং ভালোভাবে কাজ করছেন, সেখানে আইন-শঙ্খলা পরিস্থিতির কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ, তারা সব সময় সজাগ থাকেন এবং দুষ্টকে দমন করেন। যিনি যেখানে রয়েছেন, তিনি সেখানে আপন কর্তব্য পালন করলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

মনে রাখবেন, আপনাদের মানুষ যেন ভয় না করে। আপনাদের যেন মানুষ ভালোবাসে। আপনারা জানেন, অনেক দেশে পুলিশকে মানুষ শ্রদ্ধা করে। আপনারাও শ্রদ্ধা অর্জন করতে শিখুন।

আপনাদের বনে-বাদাড়ে-নদীতে-লোকালয়ে-সর্বত্র যখন যেখানে প্রয়োজন পড়ে, ডিউটি করতে হয়। চব্বিশ ঘন্টা মানুষর পাশে থেকে কাজ করতে হয়। অনেকে বলেন যে, সকলের ছুটি আছে কিন্তু পুলিশের ছুটি নেই। এজন্য আমার দুঃখ হয়। সংখ্যায় আপনারা খুব কম বলেই আপনাদের রাতদিন কাজ করতে হয়। আমি আপনাদের সব অসুবিধার খবর-যে রাখি না, তা নয়। কিন্তু উপায় কী? সাধারণ মানুষের টাকা দিয়েই সব চলে। কিন্তু আজ মানুষের যে অবস্থা, দেশের যে অবস্থা, তাতে তাদের ওপর আর ট্যাক্সের বোঝা চাপানো যায় না। আজ আমরা যারা এখানে আছি, তারা সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারী। পুলিশ, সামরিকবাহিনী, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী বা আনসার যা-ই আমরা হই না কেন, সকলেই এই বাংলাদেশের জনগণের টাকা দিয়েই চলি। এবং সবাইকে রাখা হয়েছে জনগণের সেবা করবার জন্য।

সরকারি কর্মচারী জনগণের সেবক

জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের ওপর অত্যাচার করবেন? গরিবের ওপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে। তাই শুধু আপনাদের নয়, সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য, যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব শেষপর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপে, আমার সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপে। এজন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, আমার অনুরোধ রইল, আমার আদেশ রইল, আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতে হয় না। একটা গরিব যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন। এজন্য কোনদিন যেন গরিব-দুঃখীর ওপর, কোন দিন যারা অত্যাচার করে নি, তাদের ওপর অত্যাচার না হয়। যদি হয় আমাদের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।

আমার ভাইয়েরা, একদল লোকের পয়সার লোভ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। পয়সার জন্য তাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মৃত্যুর পর এ পয়সা তাদের কোন উপকারে আসবে না। এই পয়সায় যদি তাদের সন্তানরা মানুষ না হয়, তাহলে তারা নানা অপকর্মে তা উড়িয়ে দেবে। তাতে তারা লোকের অভিশাপ কুড়িয়ে আখিরাতেও শান্তি পাবে না। তাই, আমি সকলকে অনুরোধ করি, রাত্রে একবার চিন্তা করবেন, সারাদিন ভালো কিছু করেছেন, না মন্দ করেছেন। দেখবেন, এতে পরের দিন মনে আশা জাগবে যে, আমি ভালো কাজ করতে পারি। এদেশের মানুষ বহু কষ্ট করেছে। যুগ যুগ ধরে তারা কষ্ট করছে। এই বাংলাদেশের কয়েক হাজার লোক না-খেয়ে মারা গেছে। এ-কথা আমি গোপন করি নি। বিদেশ থেকে খাবার আনতে

চেষ্টা করেছি। নিরন্ন মানুষদের খাওয়াবার জন্য পাঁচ হাজার সাত শ'র মতো লঙ্গরখানা চালু করা হয়েছিল। সরকারি কর্মচারী ও রাজনৈতিক কর্মীরা মিলে সেই সব লঙ্গরখানা চালিয়েছেন। কোনমতে আমরা এই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি।

দুর্নীতিবাজদের খতম করতে হবে

মাঠে, কল-কারখানায় সর্বত্র আমাদের উৎপাদান বাড়ানোর জন্য কাজ করতে হবে। কোনরূপ ফ্যাশন আর চলবে না। এই তিন বছরে অনেক ফ্যাশন হয়েছে। কিন্তু যে ফ্যাশন বজায় রাখতে গিয়ে মানুষ তার নিজের কাজে ফাকি দেবে, চুরি-ডাকাতি করবে, আর বড় বড় কথা বলবে; সে-ফ্যাশন আর করতে দেওয়া হবে না। মানুষের সহ্যের সীমা আছে। আমারও সহ্যের সীমা আছে। এবার আমি আপনাদের কাছে সাহায্য চাই। আপনারা একবার আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকব'। প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতিবাজদের খতম করব'। প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দেশকে ভালোবাসব, দেশের মানুষকে ভালোবাসব'। প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দেশের মাটিকে ভালোবাসব'। যারা দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, থানা আক্রমণ করে, অস্ত্র নিয়ে আপনাদের মোকাবিলা করে, বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের উৎখাত করুন।

আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমি জানি; আপনাদের খাওয়া-পরার কষ্টের কথাও। কিন্তু কষ্ট কি শুধু আপনারাই করছেন? যাদের টাকা দিয়ে আমরা চলি, তারাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট করছে। আমরা চাই একটা শোষণহীন সমাজ। আমরা চাই ইনসাফের রাজত্ব। আমরা চাই মানুষ সুখী হোক, গরিব-দুঃখী, বড় ছোট সবাই পেটভরে ভাত খাক। তাহলেই তো আমাদের স্বাধীনতা সার্থক হবে। যাঁরা আত্মত্যাগ করেছে, রক্ত দিয়েছে, তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে।

আজ হতে শুরু হোক আপনাদের নতুন জীবন। এই পুলিশ-সপ্তাহ থেকে আপনারা নতুন মনোভাব নিয়ে কাজ শুরু করুন। যাতে বাংলাদেশের পুলিশ দুনিয়ার বুকে গর্বের বস্তু হয়ে উঠতে পারে। এটিই আমি চাই, আপনাদের কাছে। আপনাদের জন্য আমার সহানুভূতি আছে। আপনারা জানেন, আপনাদের আমি ভালোবাসি। আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ করেও আমি ক্লান্তি বোধ করি না। কিন্তু আমি চাই, আপনারা মানুষকে ভালোবাসুন। তাহলেই শান্তি আসবে।

আমি আপনাদের এই 'সপ্তাহ'-এর কামিয়াবি কামনা করি। এবং আরও কামনা করি, সব পুলিশ কর্মচারী, যিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সবাই যেন সৎ হওয়ার এবং মানুষকে ভালোবাসার সুযোগ পান। আজকে আপনারা আরও প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা এমন পুলিশ গঠন করব, যে পুলিশ হবে মানুষের সেবক, শাসক নয়'। আমি পুলিশবাহিনীর ভাইদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বলছি, একদিন বাংলার মানুষ সুখী হবে। এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সৎ পথে থাকতে হবে।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

সূত্র : *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী ও বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্স, ঢাকা, বর্ধিত সংস্করণ ১৫ আগস্ট ২০০০।

শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব : বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫

স্পিকার জনাব আবদুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকের সমাপনী (চতুর্থ সংশোধনি বিল ১৯৭৫ পাশ) ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

জনাব স্পিকার সাহেব,

আজকে আমাদের সংবিধানের কিছু অংশ সংশোধন করতে হল। আপনার মনে আছে যে, সংবিধান যখন পাস করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম যে, এই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয়, এই সংবিধানের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব,

আপনি জানেন যে, যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি পরাধীন ছিল। দু শ' বৎসরের ইংরেজ-শাসন, পঁচিশ বৎসরের পাকিস্তানি শাসন এবং শোষণ বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করেছিলাম বাংলার মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য। এ দেশের হাজার হাজার নেতা কর্মী ও জনসাধারণ শুধু কারাবরণ করেন নাই, তাঁদের অনেককে জীবন দান করতে হয়েছিল।

শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আমরা বহুদিন চেষ্টা করেছিলাম এবং তাদের আঘাত বারবার আমাদের উপর এসেছিল। তারপর চরম আঘাত তারা হানে, যে আঘাতের বিনিময়ে আমাদেরও চরম আঘাত হানতে হয়। দুনিয়ার দিকে যদি আপনি দেখেন, তাহলে তাই দেখতে পাবেন।

জনাব স্পিকার সাহেব,

আমাদের যে আওয়ামী লীগ পার্টি, তারা এত ত্যাগ স্বীকার করে সংগ্রাম করেছে, কিন্তু কোনদিন আদর্শ-বিচ্যুত হয় নাই। ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করলে আমি বহুপূর্বে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম এবং আমার দলের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী বা অন্যান্য পদে আসতে পারতেন। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম একটা শোষণমুক্ত সমাজ। আমরা চেয়েছিলাম, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। আমরা চেয়েছিলাম এই দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে।

জনাব স্পিকার সাহেব,

সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই সময় আমি যখন কারাগারে আটক ছিলাম, তখন এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরাজিত করি আমরা দুশমন-বাহিনীকে। নিশ্চয় আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভারতের জনসাধারণ, তার সামরিক বাহিনী এবং তার সরকারের প্রতি, যাঁরা আমাদের সাহায্য করেছিলেন। সেদিন এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে চলে যায়। কোটি কোটি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিতে বাধ্য হয়। তবু আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে, দেশে যাঁরা রাজনীতি করতে চান, দেশকে ভালোবাসতে চান, নিশ্চয় তাঁরা কাজ করবেন এবং তাঁদের একটা কর্তব্য রয়েছে।

কোন দেশে কোন যুগে বিপ্লবের পরে বা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এভাবে মানুষকে সম্পূর্ণ অধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সকল দলকে দেয় নি। আমরা দিয়েছিলাম। তার প্রমাণ আমাদের সংবিধান। আপনি জানেন, স্পিকার সাহেব, কী দেখেছি আমরা। তিন বৎসর হলো স্বাধীনতা পেয়েছি। আপনি জানেন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। যারা দেশ ত্যাগ করে গিয়েছিল, তারা ফিরে এলো। দেশে তাদের rehabilitate করতে হলো। রাস্তাঘাট সব ধ্বংসপ্রাপ্ত।

আমরা সরকার নিলাম–সাড়ে সাত কোটি মানুষের সরকার, যেখানে কাগজের নোট ছাড়া কোন কিছু ছিল না। তাকে back করার মতো আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না অথবা gold reserveও ছিল না। পাকিস্তানিরা সর্বস্ব এখান থেকে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কত কষ্টকর, সে কথা আপনি বুঝতে পারেন, অন্যরা বুঝতে পারে না।

এ সমস্ত বিপ্লবের পরে দেখা গেছে, অনেক দেশে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেছে, আশ্রয়হীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি, বন্ধু-রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে তাদের rehabilitate করার জন্য। কতদূর পেয়েছি, না পেরেছি, জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নি।

বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আজকে আপনি জানেন, এই সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। এর আগে Consitituent Assembly-র যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেও কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে। গাজী ফজলুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। নূরুল হককে হত্যা করা হয়েছে। মোতাহার মাস্টারকে হত্যা করা হয়েছে। এমন কি, আমরা যা কোনদিন দেশে শুনি নাই, ঈদের নামাজের জামাতে, এই সংসদের একজন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

কাদের হত্যা করা হয়েছে? হত্যা করা হয়েছে তাঁদের, যাঁরা স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা। কাদের হত্যা করা হয়েছে? যাঁরা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল। কাদের হত্যা করা হয়েছে? পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত এই বাংলাদেশে পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাঁরা কারা-নির্যাতন, অত্যাচার-অবিচার সহ্য করেছে, তাদের হত্যা করা হয়েছে।

কোন রাজনৈতিক দল–যাদেরকে আমরা অধিকার দিয়েছিলাম–একটা কোনদিন condemn তারা করেছে এদের বিরুদ্ধে? না, তারা condemn করে নি।

তারা মুখে বলেছে, অধিকার চাই। তারা মিটিং করেছে, সভা করেছে। পার্টি করতে তাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কী করেছে তারা?

আমরা বলেছি, যা আমাদের সংবিধানে আছে যে, ভোটের মাধ্যমে তোমরা সরকারের পরিবর্তন করতে পার। সে ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম বাই-ইলেকশনের মাধ্যমে। বাই-ইলেকশনসমূহ আমরা তিন মাসের মধ্যে দিয়েছি, জনগণ তাদের ভোট না দিলে আমরা কী করব।

তখন তারা বলেছে, এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। মুখে তারা বলেছে, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করি। তারা অস্ত্র যোগাড় করেছে, সেই অস্ত্র, যে অস্ত্র দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের লোকদের কাছ থেকে আমরা অস্ত্র নিয়ে নিয়েছি। আর, তারা সেই অস্ত্র দিয়ে ঘরে ঢুকে শৃগাল-কুকুরের মতো মানুষকে হত্যা করেছে।

আমরা দেখেছি, প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে যে, আপনি যদি অধিকার ভোগ করতে চান, তবে অন্যের অধিকার রক্ষা করতে হয়। আপনি জানেন, you have a liberty, you have a responsibility। এ কথা ভুললে চলবে না। কোন responsibility নিব না, এটা হয় না। এবং সেখানে গিয়ে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করবেন, আবার জনগণের মধ্যে অন্য কথা বলবেন। অস্ত্র যোগাড় করবেন এবং রাতের অন্ধকারে গিয়ে মানুষকে হত্যা করবেন। সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করবেন–এমন কি আমাদের উৎখাত করে দেওয়া হবে।

আমি যদি বলতাম যে, আপনারা যারা বক্তৃতার মধ্যে বলেন, উৎখাত করতে হবে–আপনারা কবে প্রস্তুত হয়ে উৎখাত করবেন? আর, আমাদের যে শক্তি আছে, সেই শক্তি দিয়ে আমরা দুই মিনিটে উৎখাত করতে পারি আপনাদের। তবু আমরা অধিকার দিয়েছি।

আজ আপনারা জানেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটা একটা hot bed of international clique হয়েছে। এখানে অর্থ আসে, এখানে মানুষকে পয়সা দেওয়া হয়, এখানে তারা বিদেশিদের দালাল হয়।

আজকে একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না, যে রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি, সে রক্ত দিয়ে দরকার হলে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হবে–স্বাধীনতাকে নস্যাৎ হতে দেওয়া হবে না। এবং তাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা যারা দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর মাথা নত না করে বাংলার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য এবং দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এ দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারও নাই। অস্ত্র আইয়ুব খান নিয়ে এসেছিল, অস্ত্র ইয়াহিয়া খান নিয়ে এসেছিল, অস্ত্র ইস্কান্দার মীর্জাও নিয়ে এসেছিল; কিন্তু কোনদিন তাদের কাছে আমরা মাথা নত করি নাই ।

আজ সত্যি আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। কারণ, আমরা কী নিয়ে শুরু করেছিলাম? ভুললে চলবে কেন যে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটা দেশ এটা। লোক সংখ্যা কত বেশি এখানে। ৫৪ হাজার square mile এলাকা এর। পঁচিশ বৎসরের সমস্ত সম্পদ পাকিস্তান নিয়ে গিয়েছে। এখানে একটা কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। এখানে রেল-লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখানে port ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখানে ব্যাংকে আমাদের gold reserve নাই, foreign exchange নাই। এখানে communication নাই। এখানে প্লেন নাই। এখানে গুদামে খাবার নাই। তাই নিয়ে আমাদের সরকার শুরু করতে হয়েছিল। কষ্ট আমাদের আছে। কষ্ট মানুষের অনেকদিন পর্যন্ত করতে হবে, যে পর্যন্ত দেশ গঠন করা না যাবে।

আজ আমরা নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, তিন বৎসরে না হলেও আমরা ২,১৫৩ কোটি টাকা বিদেশ থেকে এনেছি সমস্ত মিলে। food aid, non-project aid, project aid মিলে দুনিয়ার বন্ধু-রাষ্ট্ররা আমাদের সাহায্য করেছে। তারা দিয়েছে আমাদের ২,১৫৩ কোটি টাকা, এবং এ পর্যন্ত খরচ করেছি এদেশের মানুষের জন্য ১,৪০০ কোটি টাকা। আর, আমাদের যে আয় প্রায় ৯০০ থেকে ১,০০০ কোটি টাকা, তাও আমরা ব্যয় করেছি। এই টাকা আমরা বাংলার মানুষের জন্য খরচ করেছি, যাতে মানুষের rehabilitation হয়।

আমাদের food কিনতে হয়। আমাদের food deficit কত? আমাদের এখন নানা রকম কাজ। মানুষ দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মারা যায়। আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম, তার পরে বাংলাদেশে হলো draught। তারপর হলো সারা দুনিয়া জুড়ে inflation। যেখানে একটা জিনিস আমরা কিনতাম এক টাকা দিয়ে, সেখানে সে জিনিস কিনতে হয় আমাদের দুই টাকা দিয়ে। যে জিনিস কিনতাম এক শ' টাকা দিয়ে, সে জিনিস কিনতে হয় দুইশ' টাকা দিয়ে। আমাদের জিনিস যা বিদেশে বিক্রি করলাম, তার ন্যায্য মূল্য আমরা পেলাম না। আমরা যারা অনুন্নত দেশ, এই কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়। কারণ, আমাদের শোষণ করেই তারা বড়লোক হয়। তাদের কাছ থেকে যখন আমাদের জিনিস আনতে হয়, তখন অনেক পয়সা দিয়ে আনতে হয়। আর, আমরা যখন বিক্রি করি, তখন তার দাম আমরা পাই না। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশ চলছে।

তারপরেও আমাদের দেশ চালাতে হয়েছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়ায় ঘুরতে হয়েছে। খাবার দুনিয়া থেকে আনতে হয়েছে। গ্রামে গ্রামে পৌছাতে হয়েছে।

সারা দুনিয়া জুড়ে inflation হয়ে গেল। শুধু আমরা না, সমস্ত দুনিয়ায় যারা অনুন্নত দেশ, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসল ভয়াবহ বন্যা। এত বড় বন্যা আমার জীবনে আমি দেখেছি কি-না, সন্দেহ।

না ছিল খাবার। ৫,৭০০ লঙ্গরখানা করা হলো এবং relief operation চালানো হলো। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে, নিজেদের যা কিছু ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাঁচাতে পারলাম না সকলকে। ২৭,০০০ লোক না খেয়ে মারা গেল। এখনও মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। গায়ে তাদের কাপড় নাই।

আমি জীবনভর ওদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। ওদের পাশে পাশে রয়েছি। কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে ওদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার মানসে।

আমি একদিন তো বলেছি এই হাউসে, স্পিকার সাহেব যে, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা বড় বড় অর্থশালী লোক, যারা বিদেশিদের পয়সা ভোট কেনার জন্য দেয়, তাদের গণতন্ত্র নয়, শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা নয়, বহুদিনের কথা আমাদের, এবং সেজন্য আজকে আমাদের শাসনের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

জনাব স্পিকার সাহেব,

আজকে আমাদের কর্তব্য কতটুকু পালন করেছি, আমরা যারা এখানে লেখাপড়া শিখেছি? আজ দেশের মানুষ দুঃখী, না খেয়ে কষ্ট পায়, গায়ে কাপড় নাই, শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাত্রে একটু হারিকেন জ্বালাতে পারে না, নানা অসুবিধার মধ্যে তারা চলছে।

স্পিকার সাহেব, আমরা আমাদের কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি, আজ আমরা যারা শিক্ষিত, এম এ পাস করেছি, বি এ পাস করেছি।

স্পিকার সাহেব, আপনি জানেন, এই দুঃখী বাংলার গ্রামের জনসাধারণ আমাদের এই অর্থ দিয়েছে লেখাপড়া শেখার জন্য। আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছি, আজ যারা লেখাপড়া শিখেছে, তাদের লেখাপড়ার খরচের একটা অংশ দেয় কে? আমার বাপ-দাদা নয়। দেয় বাংলার দুঃখী জনগণ। কী আমি তাদের ফেরত দিয়েছি? তাদের repay করেছি কতটুকু? তাদের প্রতি কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি? এটা আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে।

আজ একজন ডাক্তার হয়। একজনকে ডাক্তারি পাস করাতে বাংলার দুঃখী মানুষের না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। একটা ইঞ্জিনিয়ার করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ। একজন এগরিকালচার-গ্রাজুয়েট করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। এইভাবে মানুষ তৈরি করতে, বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে অনেক টাকা লাগে।

এ দেশের দুঃখী মানুষের পেটে খাবার নাই, তাদের অর্থে এদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। আজ আমাদের বিবেচনা করতে হবে, কী আমি দিলাম তাদের? কতটুকু তাদের ফেরত দিয়েছ, যার অর্থে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছ, যার অর্থে আমরা আজকে বড় বড় গ্রাজুয়েট হয়েছি, যার অর্থে তুমি আজকে ডাক্তার হয়েছ, যার অর্থে তুমি scientist হয়েছ, যার অর্থে তুমি মানুষ হয়েছ, যার অর্থে তুমি প্রফেসর হয়েছ, যার অর্থে তুমি লেখাপড়া শিখেছ? তোমাদের প্রত্যেকটি শিক্ষার জন্য একটি অংশ বাংলার দুঃখী জনগণ দিয়েছে। সেটাই সরকারের টাকা এবং শিক্ষা বাবদ সেই টাকা ব্যয় করা হয়।

আজকে আত্মসমালোচনার দিন এসেছে–কতটুকু কর্তব্যপালন করেছি, কতটুকু আমরা তাদের দিয়েছি। শুধু আমাকে দাও! বাংলার দুঃখী জনগণ কী পেল? তোমরা কী ফেরত দিয়েছ, সেটাই আজ প্রশ্ন। আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

আজ দেশে শৃঙ্খলা আনতে হবে। তা না হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আজকে এদের কর্তব্যবোধ বোঝাতে হবে যে, আমি আমার কী কর্তব্য পালন করেছি।

দুঃখের বিষয়, আজ শুধু আমরা বলি, আমরা কী পেলাম। তোমরা কী পেয়েছ? তোমরা পেয়েছ শিক্ষার আলো, যে শিক্ষা পেয়েছ বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কী দিয়েছ বাংলার মানুষকে, যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মারা যায়, যে দুঃখী মানুষের পরনে কাপড় নাই, যে দুঃখী মানুষ বহু কিছু করতে পারে না? যার রাস্তা নাই, ঘাট নাই, যার বুকের হাড় পর্যন্ত দেখা যায়, তাদের তোমরা কী দিয়েছ, এই প্রশ্নই আজ প্রথম জেগে ওঠে। বহুবার বলেছি।

আজকে corruption-এর কথা বলা হয়। আজকে বাংলার মাটি থেকে corruption উৎখাত করতে হবে। corruption বাংলার কৃষক করে না। Corruption বাংলার মজদুর করে না। Corruption করি আমরা শিক্ষিত সমাজ, যারা আজকে এদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছি।

আজ যেখানে যাবেন corruption দেখবেন। দেখবেন, যেখানে আমরা রাস্তা করছি, সেখানে corruption। খাদ্য কিনতে যাই, corruption। জিনিস কিনতে যাই, corruption। বিদেশের টাকা উঠাতে corruption। কারা করে? আমরা যারা five percent, যারা শিক্ষিত, আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে corrupt people। আর, আমরা করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে। আমরা এখানে এই করি।

আজকে আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এভাবে চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে, কবরে যেতে হবে, কী সে নিয়ে যাবে? তবু মানুষ ভুলে যায় যে, কেমন করে এই কাজ চলতে পারে! বহু দুঃখে কাজ করতে হয়েছে বহু দিন পর্যন্ত। বিবেকের দংশনে জ্বলে মরে গেছি বহু দিন পর্যন্ত। আপস করি নাই কোনদিন অন্যায়ের কাছে। মাথা নত করি নাই কোন দিন অন্যায়ের কাছে। জীবনভর সংগ্রাম করেছি। আর এই দুঃখী মানুষ রক্ত দিয়ে আজকে স্বাধীনতা এনেছে। তাদের রক্তে বিদেশ থেকে খাবার আনব, সেই খাবার চুরি করে খাবে। অর্থ আনব, সেই অর্থ চুরি করে খাবে। টাকা আনব, তা বিদেশে চালান দেবে। বাংলার মাটি থেকে তাদের উৎখাত করতে হবে, জনাব স্পিকার সাহেব। এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি।

আজকে আমাদের কী অবস্থা? আজ আমাদের population কমাতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আজ আমাদের শ্রমিক-আন্দোলন করতে হবে। কী করব? কারখানায় কাজ হবে না। কারখানায় কারখানায় production বন্ধ। ভিক্ষুকের জাত। ইজ্জত আছে? দুনিয়ায় জীবনভর ভিক্ষা পাওয়া যায়?

স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেইজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। কাজ করব না, ফাঁকি দেব। ফ্রি স্টাইল চালাব। এর মানে গণতন্ত্র নয়। অফিসে দশটার সময় যাওয়ার কথা হলে বারটার আগে যাব না। পাঁচটায় ছুটি হবে, তিনটায় ফিরে আসব। কারখানায় কাজ করব না, অথচ পয়সা দিতে হবে।

আমার শ্রমিকরা খারাপ নয়। আমার শ্রমিকরা কাজ করতে চায়। আমার শ্রমিকরা আজকে কাজ করছে। food production-এ তারা এগিয়ে গিয়েছে। আমরা বাধার সৃষ্টি করি। আমরা ষড়যন্ত্র করি। আমরা ধোঁকা দেই। আমরা লুট করে খাই। আমরা জমি দখল করে নিয়ে যাই। আজকে আমরা বড় বড় যারা আছি, তারা এই সমস্ত করি। তারাই করে, যারা এই দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, এই দেশের তথাকথিত লেখাপড়া জানা মানুষ, যাদের পেটের মধ্যে দু অক্ষর বুদ্ধি–আমার বাংলার দুঃখী মানুষের পয়সায় এসেছে। তারা এ কথা ভুলে যায়।

আজকে কথা হলো, কী দিলাম। আমি কী পেলাম আর আমি কী দিলাম। আজকে সেটাই প্রশ্ন।

আমি বারবার বলেছি, আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মসংযমের প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। তা না হলে দেশকে ভালোবাসা যাবে না, দেশের জন্য কাজ করা যাবে না এবং দেশের উন্নতি করা যাবে না। কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে আমার production বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।

কি করে আপনি করবেন? যদি ধরুন, বছরে ২০ লক্ষ টন খাবার deficit হয়, আমাকে যদি প্রত্যেক বছর বিদেশ থেকে এই খাবার আনতে হয়, তাহলে কত হলো? ২৭০ লক্ষ মণ? এই তিন বছর পর্যন্ত গড়ে এর চেয়ে অনেক বেশি খাদ্য আনতে হয়েছে। প্রথম আনতে হয়েছে ৩০ লক্ষ টন। অর্থাৎ ৫৪০ লক্ষ মণ খাদ্য যদি গড়ে প্রত্যেক বছর বিদেশ থেকে আনতে হয়, তাহলে তা কোথায় পাওয়া যাবে? কে দেবে? জাহাজ ভাড়া কোথায়?

যাই হোক, ২০ লক্ষ টন ধরে নিন। কারণ, হিসাব যখন এখানে করে আনি নাই–এক টনে ২৭ মণ হয়। সেটা হিসাব করে এখন বের করুন। এই তিন বছরে প্রত্যেক বছর ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাবার আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে। বন্ধু-রাষ্ট্রেরা সাহায্য করেছে,

grant দিয়েছে, loan দিয়েছে। খাবার আনছি, খাবার দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কতকাল দেবে? কতদিন দেবে?

মানুষ বাড়ছে। বছরে ৩০ লক্ষ লোক আমার নতুন বাড়ে। আজকে আমাদের population planning করতে হবে, population control করতে হবে। না হলে, ২০ বছর পরে ১৫ কোটি লোক হয়ে যাবে। ২৫ বছর পরে? ৫৪ হাজার বর্গমাইল। বাঁচতে পারবেন না। যেই ক্ষমতায় থাকেন– বাঁচার উপায় নাই। আজকে population control আমাকে করতেই হবে। সেজন্য definite step আমাদের নিতেই হবে। বাংলাদেশে production বাড়াতে হবে। না হলে মানুষ বাঁচতে পারবে না। এবং ঘাটতি পুরাবার জন্য তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে।

বিশৃঙ্খল জাতি কোনদিন বড় হতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ফ্রি স্টাইল। এটা হবে না, ওটা হবে না। আজ যাকে arrest করব, বলবে যে, আমি অমুক পার্টির লোক। একে arrest করব, অমুক পার্টির লোক। ওকে arrest করব, অমুক পার্টির লোক। খবরের কাগজে বিবৃতি যে, এক জায়গায় দাম ১১০ টাকা হলো, অথবা একদিনে হঠাৎ ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা হলো, অমনি খবর ছাপা হয়ে গেল। সারা বাংলাদেশে তা ২০০ টাকা হয়ে গেছে। যেখানে সমস্ত কিছুর অভাব, যখন দুনিয়া থেকে সমস্ত কিছু আনতে হয়।

আমরা কলোনি ছিলাম। আমরা কোন কিছুতে self-sufficient না। আমরা food-এ self-sufficient না, আমরা কাপড়ে self-sufficient না, আমরা তেলে self-sufficient না, আমরা খাবার তেলে self-sufficient না, আমাদের raw materials কিনতে হবে, ওষুধে self-sufficient না। আমরা কলোনি ছিলাম পাকিস্তানের। আমাদের সব কিছু produce করতে হবে। সব বিদেশ থেকে আনতে হবে।

আমরা কোথায় পাব বৈদেশিক মুদ্রা? ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে? না। আমাদের income করতে হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে, তাদেরও তেমনি ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

সংবিধানের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই, স্পিকার সাহেব। যারা জীবনভর সংগ্রাম করছে, একথা যেন কেউ মনে না করে যে, জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গেছে। No, জনগণ যা চেয়েছে, এখানে সেই system করা হয়েছে। তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারগণ জনগণের দ্বারা ভোটে নির্বাচিত হবেন। যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন, তাঁকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার আছে।

আজকে বিচার-বিভাগের কথা ধরুন। আমরা আজকে একটা কোর্টে বিচারের জন্য গেলে, একটা সিভিল মামলা যদি হয়, আপনি তো উকিল, স্পিকার সাহেব, আল্লাহ্‌র মর্জি যদি একটা মামলা সিভিল কোর্টে হয়, তাহলে বিশ বছরেও কি সেই সিভিল মামলা শেষ হয়, বলতে পারেন আমার কাছে? বাপ মারা যাওয়ার সময় বাপ দিয়ে যায় ছেলের কাছে, আর উকিল দিয়ে যায় তার জামাইয়ের কাছে সেই মামলা। আর ক্রিমিনাল কেস হলে লোয়ার কোর্টের মামলা জজ-কোর্টে–বিচার নাই। Justice delayed, justice denied. We have to make a complete change এবং system আমাদের পরিবর্তন করতে হবে, যেন easily মানুষ বিচার পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার পায়।

সমস্ত কিছুর পরিবর্তন দরকার। colonial power -এর rule নিয়ে দেশ চলতে পারে না। Colonial power এ দেশ চলতে পারে না।

নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে। সেখানে judicial system-এর অনেক পরিবর্তন দরকার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। কোন কথা শুনব না।

কলে-কারখানায় কাজ করতে হবে। কাজ করে production বাড়াও। নিশ্চয়ই তোমরা তার অংশ পাবে। কাজ করবে না, আর পয়সা নেবে, তা হবে না। কার পয়সা নেবে? গরিবের পয়সা নেবে? গরিবের উপর ট্যাক্স বসাব? খাবার আছে তার? কাপড় আছে তার? তার উপর ট্যাক্স বসাব কোত্থেকে? আমি পারব না। তোমাদের কাজ করে, production করে পয়সা নিতে হবে।

ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে হবে। কোন জমি পড়ে থাকতে পারবে না। তোমাদের production বাড়াতে হবে।

জানি, আমাদের অসুবিধা আছে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ হয় নাই। আমাদের বন্যা হয়ে যায় প্রত্যেক বছর। সাইক্লোন হয়। প্রত্যেক বছর natural calamity হয়। সেটা বোঝা গেল।

আজকে আমাদের কথা কী? আমাদের শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। এটায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজকে থেকে নয়, আপনি মেম্বার ছিলেন প্রথম দিন থেকে, স্পিকার সাহেব। আপনি জানেন, এই দল এই সংজ্ঞা নিয়ে সংগ্রাম করেছে। কারও কাছে কোনদিন আপস করে নাই, মাথা নত করে নাই।

আজ দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কালোবাজারি, নতুন পয়সাওয়ালা এদের কাছে আমার আত্মবিক্রয় করতে হবে? এদের অধিকারের নামে এদেরকে আমরা ফ্রি স্টাইলে ছেড়ে দিতে পারি না। কক্ষণও না। কোন দেশ কোন যুগে তা দেয় নাই, দিতে পারে না।

যারা আমার মাল বাংলার মাটি থেকে বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারির মাধ্যমে দুর্নীতি করে, যারা মানুষের কাছ থেকে পয়সা নেয়, তাদের এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। যারা তোমার মাইনা দেয়, তোমার সংসার চালায়, তাদের কাছ থেকে তুমি আবার পয়সা খাবে। Mentality change করতে হবে।

সরকারি কর্মচারী–মন্ত্রী হই, প্রেসিডেন্ট হই, আমরা যারা আছি, আমরা জনগণের সেবক, আমরা জনগণের master নই। এই mentality আমাদের change করতে হবে। আর, যাদের পয়সায় আমাদের সকলের সংসার চলে, যাদের পয়সায় আমাদের রাষ্ট্র চলে, যাদের পয়সায় আজ আমার embassy চলে, যাদের পয়সায় আমরা গাড়ি চড়ি, যাদের পয়সায় আমরা পেট্রোল খরচ করি, যাদের পয়সায় আমরা কার্পেট ব্যবহার করি, তাদের জন্য কী করলাম? সেটাই আজ বড় জিনিস।

আমি সেদিন গিয়েছিলাম কুমিল্লা পর্যন্ত। একটি মাত্র প্রশ্ন করেছি : তোমরা না খেয়ে মরছ, খাবার চাউল নাই, কারও গায়ে কাপড় নাই, তোমরা কেন আমাকে দেখতে এসেছ, তোমরা কেন আমাকে ভালোবাস? আমি বুঝতে পারি না। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার লোক।

আমার মনে আছে, আমি সহকর্মীদের বারবার বলেছিলাম যে, আমি আমার কাজ করেছি, তোমরা এবার আমাকে ছুটি দাও। জনগণের কাছে বলেছি, আমাকে ছুটি দাও। আমি পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে-সেই ১৯৩৮ সালে, যখন বাচ্চা মানুষ, তখন থেকে জেলে যাই। তারপর থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই, আমি রাজনীতি করেছি। অত্যাচার, অবিচার আমি যা সহ্য করেছি, তা সব বাদ দিন। অনেক লোক মারা গেছে, আমার চেয়ে অনেক মানুষ বেশি ত্যাগ করেছে এ দেশে। আমি সংগ্রাম করেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে।

কিন্তু এখন, একটা খেলা পেয়ে গেছে। বাজার নিয়ে খেলা, দাম নিয়ে খেলা। বেশি অসুবিধা হলে গোপনে গিয়ে অমনি লিখে দেয় যে, এই খবরটা একটু ছাপিয়ে দিন। আর অমনি গোলমাল লেগে গেল। বক্তৃতা আরম্ভ করে দিল। ফ্রি স্টাইল চলে না।

সাড়ে সাত কোটি মানুষ, ৫৪ হাজার বর্গমাইলের দেশ। বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়, কাপড় আনতে হয়, অনেক কিছুই আনতে হয়। এখানে ফ্রি স্টাইল চলতে পারে না।

Production করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, মানুষ হতে হবে। ছাত্রসমাজকে লেখাপড়া করতে হবে, লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে, জনগণ টাকা দেয় মানুষ হওয়ার জন্য। সেই মানুষ হতে হবে। আমরা যেন পশু না হই। লেখাপড়া শিখে যেন আমরা মানুষ হই।

কী পার্থক্য আছে একটা জানোয়ারের সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে, যে জানোয়ার একটা বাচ্চা পেলে কামড়িয়ে ধরে খেয়ে ফেলে? আর একটা মানুষ বুদ্ধিবলে পয়সা নিয়ে অন্য মানুষকে না খাইয়ে মারে! কী পার্থক্য আছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে? যদি মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমি মানুষ কোথায়?

প্রথমত, আমাকে মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে, তবে আমি মানুষ হবো। তা না হলে মানুষ আমাকে কেন বলা হয়? কারণ, আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। যখন মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি, তখন তো আমি মানুষ থাকি না। আমরা মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলেছি।

আমি সকলের কাছে আবেদন করব, আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করব। আজ আপনারা constitution সংশোধন করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন। আমার তো ক্ষমতা কম ছিল না। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সমস্ত ক্ষমতা আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন। আমার দুই-তৃতীয়াংশ majority দরকার। তা আমার আছে। মাত্র ৭ জন ছাড়া সমস্ত সদস্যই আমার। তবু আপনারা amendment করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছেন। এই সিটে আমি আর বসব না, এটা কম দুঃখ না আমার। আপনাদের সঙ্গে এই হাউসের মধ্যে থাকব না, এটা কম দুঃখ নয় আমার।

জনাব স্পিকার সাহেব,

তবু আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি সংবিধানকে। কারণ, একটা সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা এ দেশে কায়েম করতে হবে, যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে, যেখানে মানুষ অত্যাচার, অবিচার হতে বাঁচতে পারে।

চেষ্টা নতুন। আজ আমি বলতে চাই, This is our Second Revolution। এই Revolution-আমাদের এই Revolution হবে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য। এর অর্থ : অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

আমি তাই হাউস থেকে, জনাব স্পিকার, আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে, দলমত নির্বিশেষে সকলকে বলব, যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, চারটি principle কে ভালোবাসেন—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা—এই চারটিকে, তাঁরা আসুন, কাজ করুন। দরজা খোলা আছে। সকলকেই আহ্বান জানাচ্ছি, যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন। যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আসুন, কাজ করুন, দেশকে রক্ষা করুন। দেশকে বাঁচান, মানুষকে বাঁচান, মানুষের দুঃখ দূর করুন। আর, দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারিদের উৎখাত করুন।

আর, একটা দল—তাদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, কোন দেশে করে নাই, স্পিকার সাহেব, আপনি তো ছিলেন, কোন দেশের ইতিহাসে নাই। পড়ুন দুনিয়ার ইতিহাস, বিপ্লবের পরে যারা বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে, যারা শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, যারা দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, কোন দেশ তাদের ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম, সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম। বলেছিলাম, দেশকে ভালোবাস, দেশের জন্য কাজ কর, স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নাও। থাক। কিন্তু অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা গোপনে বিদেশিদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা মনে করে যে, খবর রাখি না। এত বড় তারা bandit। মানুষকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে মনে করে যে, তাকে কেউ ধরতে পারবে না।

কোথায় সিরাজ সিকদার? তাকে যদি ধরা যায়, আর তার যে দলবল, তাদের যদি ধরা যায়, ধরতে পারব না— কোন অফিসে কে ঘুষ খান? ধরতে পারব না— কোন অন্ধকারে বিদেশ থেকে কে পয়সা খান? ধরতে পারব না— কে কোথায় পয়সা লুট করেন? ধরতে পারব না— কোথায় কারা hoarder আছেন? ধরতে পারব না—কারা black marketeer আছেন? নিশ্চয় ধরতে পারব। সময়ের প্রয়োজন। যেতে পারবে না কেউ। ইনশাআল্লাহ, পাপ একদিন ধরা দেবেই। এটা মিথ্যা হতে পারেনা।

দুনিয়ায় কোনদিন পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। পুণ্য চলে একদিকে, পাপ চলে অন্য দিকে। Vice and virtue cannot go together. We should not forget it. আজকে তাদের ক্ষমা করেছিলাম। তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কটাক্ষ করে। বন্ধ করে দেওয়া হবে এ সব। তাদের অধিকার দেওয়া হবে স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য? কোন দেশ দেয় নাই। আমরা দিয়েছিলাম মাফ করে। মাফ যদি হজম করতে না পারা যায়, তাহলে কেমন করে কঠোর হস্তে দমন করতে হয়, তা আমরা জানি। আজকে দুঃখের সঙ্গে এ কথা বলতে হচ্ছে।

সেজন্য আমরা amended constitution-এ যে নতুন ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, এটাও একটা গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ কোনদিন বাংলার মাটিতে আসতে পারবে না, আমি allow করব না।

বাংলাদেশকে ভালোবাসব না। বাংলার মাটিকে ভালোবাসব না, বাংলার ভাষাকে ভালোবাসব না, বাংলার কালচারকে ভালোবাসব না। আর ফ্রি স্টাইলে চালাব, এটা হতে পারে না।

যার যা ইচ্ছা লেখে। কেউ এ-নামে বাংলাদেশকে ডাকে, কেউ ও-নামে বাংলাদেশকে ডাকে, বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে তারা লজ্জাবোধ করে। তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার, যেমন নাই চোরাকারবারি, ঘুষখোর, মুনাফাখোরদের, যেমন নাই দুর্নীতিবাজদের। তেমনি নাই এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের, যারা মনে করে যে, তাদের কেউ ধরতে পারবে না। ভুলে যান, ভুলে যান। বাংলার মাটি, বাংলার নাড়ি আমি জানি।

জনাব স্পিকার সাহেব,

এইভাবে রাত্রিবেলা দুজনকে মেরে বিপ্লব করা যায় না। যদি তাই হতো, তবে আওয়ামী লীগ বোধ হয় দশ বছর, বিশ বছর আগেই আরম্ভ করতে পারত। দশটিকে মারলাম, পাঁচটিকে মারলাম, তাতে বিপ্লব হয় না। ওটা ডাকাতি হয় বা খুন হয়। এতে মানুষের জীবনকেই অতিষ্ঠ করা হয়।

সেদিন বাগেরহাটের একটা জায়গাতে চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাইকে রাত্রে এসে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এটা কি একটা political philosophy? এই philosophy দুনিয়ার পচা, গান্দা-ডাস্টবিনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এই philosophy-তে কোন দেশের মুক্তি আসতে পারে না। এবং কোনদিন কেউ successful হতে পারে নাই, এটা ফেল।

আন্দোলনের মধ্যেই আমার জন্ম, আন্দোলন আমি জানি। কিন্তু আজ কী দেখতে পাচ্ছি? ফ্রি স্টাইল। ওরা কিন্তু enjoying the full liberty। যার যা ইচ্ছা। বিদেশিরা আসে এখানে। আমাদের মিয়ারা গোপনে দু বোতল মদ খাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের ব্রিফ করে দেওয়া হয়। ওরা মনে করে, আমরা খবর রাখি না। আমরা খবর রাখি।

আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে নিশ্চয়ই এই তিন বছরের মধ্যে আমরা কিছু করেছি। আপনাদের কি কোন গভর্নমেন্ট ছিল? কেন্দ্রীয় সরকার ছিল? ছিল কি আপনাদের foreign office? ছিল কি আপনাদের defence office? ছিল কি আপনাদের planning? ছিল কি আপনাদের finance? ছিল কি আপনাদের customs? কী নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম? We have now organizsed a national government, and effective national government, *insha-allah*, and better than many countries. I can challenge.

বিদেশ থেকে খাবার আনতে আমাদের বহু সময় লেগে যায়। অনেক efficient government আমি দেখেছি। কিন্তু আমাদের যেখানে যোগাযোগ-ব্যবস্থা নাই, সেখানে পনের দিনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে ৫,৭০০ লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে বাঁচানোর মত efficiency এ দেশের গভর্নমেন্ট দেখিয়েছে। আমরা কাজ করতে পারি না বলে? নিশ্চয় পেরেছি।

কেউ কোন দিন স্মাগলিং বন্ধ করতে পারে নাই। আমরা শতকরা ৯৫ ভাগ স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছি, এ গর্ব আমাদের আছে। আমরা অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করেছি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো set up করেছি। আজ আমরা আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর–সমস্ত organize করেছি।

আমরা কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম? আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন, জনাব স্পিকার সাহেব, এই অ্যাসেম্বলির মধ্যে কী ছিল?

এ অবস্থার মধ্যে দেশকে চলতে দেওয়া যায় না বলে পার্টির মিটিঙে decision নেওয়া হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার। কিন্তু শুধু পরিবর্তন করলেই দেশের মুক্তি আসে না যদি মানুষের মেন্টালিটির পরিবর্তন না হয়।

আজকে আমরা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছি, যাঁরা জনপ্রতিনিধি, জনগণের ভোটের মাধ্যমে যাঁরা এখানে এসেছি, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে : জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে, দলমত-নির্বিশেষে, বাংলার জনগণ যে যেখানে আছেন, আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করে নতুন জীবন শুরু করব। আমরা নতুন বিপ্লব শুরু করব। কেন করতে পারব না? হয় নাই? ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত আমার ঘরে বসে তিন-চারজনকে নিয়ে সমস্ত বাংলার মানুষের non-cooperation movement আমরা চালাই নাই? তখন একটা চুরি হয় নাই, একটা ডাকাতি হয় নাই, ভলান্টিয়াররা কাজ করেছে।

তাই, আজকেও আমাদের নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে mobilize করতে হবে।

মানুষ ভালো। বাংলার মানুষের মতো মানুষ কোথাও নাই। বাংলার গরিব ভালো, বাংলার কৃষক ভালো, বাংলার শ্রমিক ভালো। যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে তারা বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। তারাই যত গোলমালের মূল। যত অঘটনের মূল তারাই। তার কারণ, তাঁরা হলেন vocal শ্রেণী। তাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁরা কাগজে লেখেন। তাঁদের একটু স্বার্থে আঘাত লাগলেই দু কলম লিখে ফেলেন। কিন্তু এই অবস্থায় দেশ চলতে দেওয়া যায় না। সেই জন্যই আজ এই সংবিধান আমাদের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

এখন আমাদের সামনে কাজ কী? এক নম্বর : দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে-কল-কারখানায় সবখানে।

Population planning আমাদের করতে হবে, population control করতে হবে। দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাকারবারি, মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, কাজ করতে হবে। আমাদের জাতিকে united করতে হবে। বাঙালি জাতি যে প্রাণ, যে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করেছিল, সেই প্রাণ, সেই অনুপ্রেরণা, সেই মতবাদকে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

দেশের দুঃখী মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, তাদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য আজকে, জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে বলব, যে যেখানে আছেন, যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, সকলকে আহ্বান করব, আসুন, দেশকে গড়ি, দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাই। আসুন, দেশের মানুষের দুঃখ দূর করি। তা না করতে পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করবে।

জনাব স্পিকার সাহেব,

বড় দুঃখ। এই হাউসের আমি Leader ছিলাম। এ পার্টির আমি Leader ছিলাম। এতদিন আমি এ সিটে বসতাম। আমার সহকর্মীরা আজ আমার মেম্বারশিপ কেড়ে নিয়েছেন। আমি আর মেম্বার থাকতে পারব না। আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন এবং আজকে নতুন system-এ government form হতে যাচ্ছে।

System পরিবর্তন করেই আমরা সফল হতে পারব না যদি আপনারা চেষ্টা না করেন। আপনারা যদি নিঃস্বার্থভাবে, যেভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করেছিলেন, যেমন নিঃস্বার্থভাবে পঁচিশ বৎসর সংগ্রাম করেছিলেন, সেইভাবে যদি সংগ্রাম না করেন অন্যায়, অবিচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তাহলে দেশগড়ার কাজে, production-এর কাজে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে।

তাই, আল্লাহ্‌র নামে, চলুন, আমরা অগ্রসর হই। 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' বলে আল্লাহ্‌র নামে অগ্রসর হই। ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা কামিয়াব হবই। খোদা আমাদের সহায় আছেন। এত বড় দুর্ধর্ষ, এত বড় শক্তিশালী, এত বন্দুক, এত কামান, এত মেশিনগান, এত পাকিস্তানি সৈন্য, এত বড় তথাকথিত শক্তিশালী আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্কান্দার মীর্জা বাংলার মানুষকে অত্যাচার করার চেষ্টা করেছে বন্দুক দিয়ে, তার বিরুদ্ধে বিনা অস্ত্রে আপনাদের নিয়ে সংগ্রাম করে যদি তাদের উৎখাত করতে পারি, তাহলে কিছু দুর্নীতিবাজ, কিছু ঘুষখোর, কিছু শোষক, কিছু black marketeer-কে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারব না, এ বিশ্বাস আমি করি না।

যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণে নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির-নাজির করে, নিজের আত্মাসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে, 'ইনশাআল্লাহ' বলে কাজে অগ্রসর হন; তাহলে জানবেন, বাংলার জনগণ আপনাদের সাথে আছে, বাংলার জনগণ আপনাদের পাশে আছে। জনগণকে আপনারা যা বলবেন, তারা তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা কামিয়াব হবোই।

আজ আমি আপনাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। আমার পার্টি আছে এবং আপনারা পার্টির সদস্য। বহু দুঃখের দিন আমরা কাটিয়েছি। সুখের মুখ আমরা দেখি নাই। এই ক্ষমতায় যে আমরা আছি, এই ক্ষমতা সুখের নয়। এ বড় কষ্টের, বড় কন্টকাকীর্ণ এই ক্ষমতা।

জনাব স্পিকার সাহেব,

আপনাকে ধন্যবাদ দেই, সকলকে ধন্যবাদ দেই, সদস্যদের ধন্যবাদ দেই, স্টাফকে ধন্যবাদ দেই, কর্মচারীদের ধন্যবাদ দেই, সহকর্মীদের ধন্যবাদ দেই। আমি আপনাদের একজন। আপনাদের একজন হিসাবে আমি আপনাদের পাশে থাকব, আপনাদের কাছে থাকব, আপনাদের মধ্যে থাকব এবং আপনাদের নিয়েই কাজ করব। আমাদের সেই গভর্নমেন্ট থাকবে, মন্ত্রী থাকবে, সব থাকবে, কাজ-কর্ম করবে। কোন অসুবিধার কারণ নাই। তবে কথা হলো এই, সবচেয়ে বড় কাজ আমাদের, we have to work sincerely and honestly for the emancipation of the poor people of this country. This is our aim. ইনশাআল্লাহ্‌।

আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা!

স্পিকার জনাব আবুদল মালেক উকিল : Order, Please!

সংসদের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আমাদের জাতির জনককে মোবারকবাদ জানাই। তিনি আমাদের পরিষদের নেতা ছিলেন, চিরজীবন আমাদের এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরিষদ-নেতা হিসাবে খুব ঘনিষ্ঠ থাকার দরুন পরিষদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বা পরিষদ-সচিবালয়ের কর্মচারীরা এতদিন তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে, খুব নিকটে পেতেন। এখন তাঁরা কাগজে-কলমে দূরে হলেও জাতির জনক হিসাবে, বঙ্গবন্ধু হিসাবে এবং এই জাতির পথনির্দেশক হিসাবে তাঁকে আশা করি কাছেই পাবেন, যদিও বৃহত্তর দায়িত্বের ক্ষেত্রে তিনি একটু দূরেই চলে গেছেন।

এই পরিষদের নিশ্চয়ই একজন নতুন নেতা হবেন, সেই নেতা জাতির জনকের আশীর্বাদপুষ্টই হবেন ধরে নেওয়া যায় এবং যিনিই স্থলাভিষিক্ত হবেন, নেতার আশীর্বাদ থেকে এই সংসদ, সংসদের অধ্যক্ষ অথবা সংসদ-কর্মচারী, সংসদ-সচিবালয় বঞ্চিত হবে না, এ বিশ্বাস রাখি। আমরা জাতির জনকের দীর্ঘায়ু কামনা করি, তাঁর সাফল্য কামনা করি। তাঁর শুভযাত্রার জয় হোক। এই বলে সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবি করলাম।

[অতঃপর প্রথম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশন সমাপ্ত হয়]

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২-৭৫), শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

রাঙামাটিতে বঙ্গবন্ধু :

জাতীয় সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষিত থাকবে

বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ সুবিধা পাবে

রাঙামাটি, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে বলেন, জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার অবশ্যই সংরক্ষিত হবে।

রাষ্ট্রপতি আজ স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজাতীয় প্রধান, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতীয় সংখ্যালঘুদের ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা হবে।

স্থানীয় সমস্যাদির প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকার পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যেই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করেছেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ শ' ছেলেকে পুলিশ বাহিনীতে এবং ২ শ' ছেলেকে রক্ষীবাহিনীতে অবিলম্বে নিয়োগের জন্যে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় জনপদ গড়ে তোলা হবে এবং সেসব এলাকার লোকজনকে বিনামূল্যে আবাদের জন্যে জমি দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এছাড়াও স্কুল করা হবে ও জনগণকে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, স্থানীয় চাকরি-বাকরিতে স্থানীয় জনগণকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

স্থানীয় ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের জন্যে বঙ্গবন্ধু দু-লাখ টাকা মঞ্জুর করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে সুযোগ-সুবিধাদানের জন্যে বঙ্গবন্ধু প্রশাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। সমবায় মার্কেটিং-এর জন্যে এক লাখ টাকা মঞ্জুর এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে শতকরা ৫০ ভাগ স্থানীয় জনগণের জন্যে সংরক্ষিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলায় বিভক্তকরণের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি তিনটি জেলার সদর দপ্তর নির্ধারণের ব্যাপারে স্থানীয় উপজাতীয় প্রধানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। দক্ষ ও উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে সরকারি সংকল্পের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিববুর রহমান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকেই শুরু করা হবে এই পদ্ধতি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সকল অস্থানীয় লোক এসে বসবাস করছে বঙ্গবন্ধু তাদের বলেন, স্থানীয় জনগণ যেন ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি থেকে বঞ্চিত না হন। তিনি বলেন, সরকার এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে এবং উপজাতীয় এলাকাগুলিতে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা হবে।

তিনি বলেন, আদর্শ গ্রামগুলিতে বসবাসের ও আবাদের জন্যে বিনামূল্যে জমি দেওয়া হবে। শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। এই প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্যে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।

দেশের বনসম্পদের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির জন্যে রাষ্ট্রপতি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বনসম্পদ রক্ষার জন্যে নির্দেশ দেন। তিনি নতুন নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি এবং তা রক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

দেশে মাছের চাষ এবং মৎস্যসম্পদ বাড়িয়ে তোলার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তিনি ইতোমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। মৎস্যসম্পদ বাড়িয়ে তোলার জন্যে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রপতি আবার আহ্বান জানিয়েছেন– কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার জন্যে। রাষ্ট্রপতি জনসংখ্যার বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতি পুনর্গঠনের কাজে আত্মসমালোচনার দ্বারা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছনোর জন্যে জাতীয় ঐক্য অটুট করে গড়ে তুলতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারি কর্মচারীদের জনসেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যারা সততা ও আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে দেশের সেবা করছেন রাষ্ট্রপতি তাদের প্রশংসা করেন।

আজ সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতীয় প্রধান ও স্থানীয় কলেজের ছাত্রদের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর আগে রাষ্ট্রপতি কাপ্তাই লেক পরিদর্শন করেন। কাপ্তাই লেকে মাছ চাষের অগ্রগতি নিজের চোখে দেখার জন্যেই তিনি কাপ্তাই লেকে গিয়ে ছিলেন। -বাসস

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে : বঙ্গবন্ধু

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা, ২৬ মার্চ ১৯৭৫

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ জীবনে শেষবারের মতো তিনি এলেন জনসভায়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তিল ধারণের স্থান নেই। সেই উদাত্ত কণ্ঠ, সেই মমতাময় ভাষা, কিন্তু যেন রয়েছে কিছুটা ব্যতিক্রম। এক এক করে হাজির করলেন তিনি তাঁর কর্মসূচি। নতুন পথযাত্রার নির্দেশ দিলেন বাঙালি জাতিকে। এই বক্তৃতায় তাঁর উপলব্ধি এবং রাজনৈতিক আদর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট করে ধরা পড়ে। কে জানত, যে মানুষের মাঝে থেকে তিনি আজীবন নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই মানুষের মাঝে তিনি আর ফিরে আসতে পারবেন না। ঘাতকের নির্মম আঘাতে স্তব্ধ হয়ে যাবে সে কণ্ঠ, থমকে দাঁড়াবে জাতি-রাষ্ট্র-সমাজের অগ্রযাত্রা?

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেষ জনসভায় প্রদত্ত জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

আমার ভাই ও বোনেরা,

আজ ২৬শে মার্চ ১৯৭৫ সাল। একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষকে আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল। সেদিন রাতে বিডিআর-এর ক্যাম্পে, পুলিশ ক্যাম্পে, আমার বাড়িতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চারিদিকে আক্রমণ চালায় ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশবিক শক্তি নিয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ডাক দিয়েছিলাম। ৭ই মার্চ আমি তাদের প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে আবার আমি ডাক দিয়েছিলাম। আর নয়, মোকাবিলা কর। বাংলার মানুষ যে যেখানে আছ, যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা কর। বাংলার মাটি থেকে শত্রুকে উৎখাত করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীন করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

দুনিয়ার মানুষের কাছে আমি সাহায্য চেয়েছিলাম। আমার সামরিক বাহিনীতে যারা বাঙালি ছিল, তাদের এবং আমার বিডিআর, আমার পুলিশ, আমার ছাত্র, যুবক ও কৃষকদের আমি আহ্বান করেছিলাম। বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে মোকাবিলা করেছিল। ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছিল, শতশত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল। দুনিয়ার জঘন্যতম ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানি শোষক শ্রেণী। দুনিয়ার ইতিহাসে এত রক্ত স্বাধীনতার জন্য কোন দেশ দেয় নাই, যা বাংলার মানুষ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা এমনভাবে পঙ্কিলতা শুরু করল। যা কিছু ছিল ধ্বংস করতে আরম্ভ করল। ভারতে আমার এক কোটি লোক আশ্রয় নিয়েছিল। তার জন্য আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। আমি তাদের স্মরণ করি, খোদার কাছে তাদের মাগফেরাত কামনা করি, যারা এদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে। আমি তাদের স্মরণ করব, যে সকল মুক্তিবাহিনীর ছেলে, যেসব মা-বোন, আমার যে কর্মীবাহিনী, যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছিল, শহীদ হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। এদেশ তাদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যাঁরা জীবন দিয়েছিল বাংলার মাটিতে, আজ তাদের কথাও আমি স্মরণ করি।

এখানে একটা কথা। আপনাদের মনে আছে, পাকিস্তানিরা যাওয়ার পূর্বে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে, ১৬ই ডিসেম্বরের আগে, কারফিউ দিয়ে ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় আমার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করব, সম্পদ ধ্বংস করব, বাঙালি স্বাধীনতা পেলেও এই স্বাধীনতা রাখতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা হয়েছে। বাংলার লোক স্বাধীন হয়েছে। বাংলার পতাকা আজ দুনিয়ায় ওড়ে। বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য, কমনওয়েলথের সদস্য, ইসলামি সামিট (Summit)-এর সদস্য। বাংলাদেশ দুনিয়ায় এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে, কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না।

পাকিস্তানের আচরণ

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার,

আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি, জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি। আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আমরা জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বস করি, আমরা কো-একজিস্টেনস(co-existence)-এ বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তানিরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে, আমার সম্পদ ফেরত দেবে। আমি ওয়াদা করেছিলাম, তাদের বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাপ করেছি। তাদের আমি বিচার করি নি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এই জন্য যে, এশিয়ায়-দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানিরা আমার সম্পদ এক পয়সাও দিল না। আমার বৈদেশিক মুদ্রার কোন অংশ আমাকে দিল না। আমার গোল্ড রিজার্ভের কোন অংশ আমাকে দিল না। একখানা জাহাজও আমাকে দিল না। একখানা প্লেনও আমাকে দিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ এক পয়সাও দিল না। এবং যাওয়ার বেলায় পোর্ট ধ্বংস করল, রাস্তা ধ্বংস করল, রেলওয়ে ধ্বংস করল, জাহাজ ডুবিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানিরা মনে করেছিল, বাংলাদেশকে যদি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে দেখাতে পারব যে, তোমরা কি করছ।

ভুট্টো সাহেব বক্তৃতা করেন। আমি তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম, লাহোরে আমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল বলে। ভুট্টো সাহেব বলেন, বাংলাদেশের অবস্থা কী? ভুট্টো সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি, ফ্রন্টিয়ারের পাঠানদের অবস্থা কী? ভুট্টো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, বেলুচিস্তানের মানুষের অবস্থা কী? অ্যারোপ্লেন দিয়ে গুলি করে মানুষ হত্যা করছেন। সিন্ধুর

মানুষের অবস্থা কী? ঘর সামলান বন্ধু, ঘর সামলান। নিজের কথা চিন্তা করুন। পরের জন্য চিন্তা করবেন না। পরের সম্পদ লুট করে খেয়ে বড় বড় কথা বলা যায়। আমার সম্পদ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। তোমরা আমার কী করেছ? আমি সবার বন্ধুত্ব কামনা করি। পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নাই। কিন্তু আমার সম্পদ তাকে দিতে হবে।

আমরা চাই সকলের সাথে বন্ধুত্ব

আমি দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই, কারো সাথে দুশমনি করতে চাই না। সকলের সাথে বন্ধুত্ব করে আমরা শান্তি চাই। আমার মানুষ দুঃখী, আমার মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়। আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে এলাম, তখন আমি শুধু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাংকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম। আমাদের গুদামে খাবার ছিল না। গত তিন-চার বৎসরে না হলেও বিদেশ থেকে ২২ কোটি মণ খাবার বাংলাদেশে আনতে হয়েছে। বাইশ শ' কোটি টাকার মতো বিদেশ থেকে হেল্প আমরা পেয়েছি। সেজন্য যারা আমাদের সাহায্য করেছে, সে-সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্রকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু আর একটি কথা। অনেকে প্রশ্ন করেন, আমরা কী করেছি? আমরা যখন ক্ষমতায় এলাম, দেশের ভার নিলাম, তখন দেশের রাস্তা-ঘাট যে অবস্থায় পেলাম, তাকে রিপেয়ার করবার চেষ্টা করলাম। সেনাবাহিনী নাই, প্রায় ধ্বংস করে গেছে। পুলিশ বাহিনীর রাজারবাগ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই খারাপ অবস্থা থেকে ভালো করতে কী করি নাই? আমরা জাতীয় সরকার গঠন করলাম। আমাদের এখানে জাতীয় সরকার ছিল না। আমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ছিল না, বৈদেশিক ডিপার্টমেন্ট ছিল না, প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট ছিল না। এখানে কিছুই ছিল না। তার মধ্যে আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে হলো। যাঁরা শুধু কথা বলেন, তাঁরা বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে বলুন, কী করেছি! এক কোটি লোককে ঘরবাড়ি দিয়েছি। রাষ্ট্রের লোককে খাওয়ানোর জন্য বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়েছে। পোর্টগুলোকে অচল থেকে সচল করতে হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ২২ কোটি মণ খাবার এনে বাংলার গ্রামে গ্রামে দিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হয়েছে।

অধিকার ও দায়িত্ব

এরপরও কথা আছে। আমি মানুষকে বললাম, আমার ভাইদের বললাম, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বললাম, তোমাদের অস্ত্র জমা দাও। তারা অস্ত্র জমা দিল। কিন্তু এক দল লোক- আমার জানা আছে, যাদের পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল, তারা অস্ত্র জমা দেয় নি। তারা এসব অস্ত্র দিয়ে নিরপরাধ লোককে হত্যা করতে আরম্ভ করল। এমনকি, পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকেও তারা হত্যা করল। তবুও আমি শাসনতন্ত্র দিয়ে নির্বাচন দিলাম। কিন্তু যদি বাংলার জনগণ নির্বাচনে আমাকেই ভোট দেয়, তা হলে সেটা আমার দোষ নয়। ৩১৫টি সিটের মধ্যে ৩০৭টি সিট বাংলার মানুষ আমাকে দিল। কিন্তু একদল লোক বলে, কেন জনগণ আমাকে ক্ষমতা দিল? কোন দিন কোন দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কাউকে এভাবে অধিকার দেয় না। কিন্তু অধিকার ভোগ করতে হলে তার জন্য যে রেসপনসিবিলিটি আছে, সেটা তারা ভুলে গেল। আমি বললাম, তোমরা অপজিশন সৃষ্টি কর। তারা তা সৃষ্টি করল। বক্তৃতা করতে আরম্ভ করল। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করল। দরকার হলে অস্ত্র দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করতে চায়। অস্ত্রের হুমকি দেওয়া হলো।

মানুষ হত্যা থেকে আরম্ভ করে রেল লাইন ধ্বংস করে, ফারটিলাইজার ফ্যাক্টরি ধ্বংস করে, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করল, যাতে বিদেশি এজেন্ট যারা দেশের মধ্যে আছে, তারা সুযোগ পেয়ে গেল। আমাদের কর্তব্য মানুষকে বাঁচানো। চারিদিকে হাহাকার। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের দাম আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। সমস্ত দুনিয়া থেকে আমাদের কিনতে হয়। খাবার কিনতে হয়, কাপড় কিনতে হয়। ঔষধ কিনতে হয়। তেল কিনতে হয়। আমরা তো কলোনি ছিলাম। দুই শ' বছর ইংরেজদের কলোনি ছিলাম, পঁচিশ বছর পাকিস্তানের কলোনি ছিলাম। আমাদের তো সব কিছুই বিদেশ থেকে কিনতে হয়। কিন্তু তারপরেও বাংলার জনগণ কষ্ট স্বীকার করে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তারা তাদের এগোতে, কাজ করতে দেয় না।

আর একদল বিদেশে সুযোগ পেল। তারা বিদেশ থেকে অর্থ এনে বাংলার মাটিতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করল। আজ এদিনে কেন বলছি একথা? অনেক বলেছি, এত বলার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার চোখের সামনে মানুষের মুখ ভাসে। আমার দেশের মানুষের রক্ত ভাসে। আমার চোখের সামনে ভাসে আমারই মানুষের আত্মা। আমার চোখের সামনে সে সমস্ত শহীদ ভাইয়েরা ভাসে, যাঁরা ফুলের মতো ঝরে গেল, শহীদ হলো। রোজ কিয়ামতে তারা যখন বলবে, আমরা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করলাম, তোমরা স্বাধীনতা নস্যাৎ করেছ, তোমরা রক্ষা করতে পার নাই, তখন তাদের আমি কি জবাব দেব?

আর একটি কথা। কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য। কথা হলো, এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, অফিসে গিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, সাইন করিয়ে নেয়। ফ্রি স্টাইল! ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কাজ না করে টাকা দাবি করে। সাইন করিয়ে নেয়, যেন দেশে সরকার নাই। আবার শ্লোগান হলো, বঙ্গবন্ধু কঠোর হও।

বঙ্গবন্ধু কঠোর হবে। কঠোর ছিল, কঠোর আছে। কিন্তু দেখলাম, চেষ্টা করলাম। এত রক্ত, এত ব্যথা, এত দুঃখ। তার মধ্যে ভাবলাম, দেখি, কী হয়, কিছু করতে পারি কি-না। আবদার করলাম, আবেদন করলাম, অনুরোধ করলাম, কামনা করলাম, কিন্তু কেউ কথা শোনে না। চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী।

আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র

ভাইয়েরা, বোনেরা আমার,

আজকে যে সিস্টেম করেছি, তার আগেও ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর কম ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না, ক্ষমতা বন্দুকের নলে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে, 'বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও।' বঙ্গবন্ধু তারপর একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে, বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষণহীন সমাজ কায়েম করবার জন্য।

দুঃখের বিষয়, তারা রাতের অন্ধকারে পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকে হত্যা করেছে, তিন-চার হাজারের মতো কর্মীকে হত্যা করেছে। আরেক দল দুর্নীতিবাজ টাকা-টাকা, পয়সা-পয়সা করে পাগল হয়ে গেছে। তবে যেখানে খালি দুর্নীতি ছিল, গত দুই মাসের মধ্যে সেখানে ইনশাআল্লাহ্, কিছুটা অবস্থা ইম্প্রুভ করেছে। দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য আজকে কিছু করা হয়েছে।

হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সিয়াল ফরম অব গভর্নমেন্ট করেছি। জনগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। পার্লামেন্ট থাকবে। পার্লামেন্টের নির্বাচনে একজন, দুইজন, তিনজনকে নমিনেশন দেওয়া হবে। জনগণ বাছবে, কে ভালো, কে মন্দ। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র, আমরা চাই না শোষকের গণতন্ত্র। এটা পরিষ্কার।

বর্তমান কর্তব্য

আমি প্রোগ্রাম দিয়েছি। আজকে আমাদের সামনে কাজ কি? আজকে আমাদের সামনে অনেক কাজ। আমি সকলকে অনুরোধ করব, আপনারা মনে কিছু করবেন না, আমার কিছু উচিত কথা কইতে হবে। কারণ, আমি কোন দিন ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। সত্য কথা বলবার অভ্যাস আমার আছে। মিথ্যা বলবার অভ্যাস আমার নাই। কিন্তু কিছুটা অপ্রিয় কথা বলব।

বন্যা হলো। মানুষ না খেয়ে কষ্ট পেল, হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরে গেল। দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনলাম! পাঁচ হাজার সাত শ' লঙ্গরখানা খুললাম মানুষকে বাঁচাবার জন্য। সাহায্য নিয়েছি মানুষকে বাঁচাবার জন্য। আমি চেয়েছিলাম স্বাধীনতা। কী স্বাধীনতা? আপনাদের মনে আছে, আমার কথার মধ্যে দুইটি কথা ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট ভরে ভাত খেতে না পারে, কাপড় পরতে না পারে, বেকার সমস্যা দূর না হয়, তা হলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে না।

আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয়, সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায়, সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে, সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্ল্যাক মার্কেটিং করে, সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে, সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না, তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে, তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে, তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। আমি কেন ডাক দিয়েছি? এই ঘুণেধরা ইংরেজ আমলের, পাকিস্তানি আমলের যে শাসন ব্যবস্থা, তা চলতে পারে না। একে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। তা হলে দেশের মঙ্গল আসতে পারে, না হলে আসতে পারে না। আমি তিন বৎসর দেখেছি। দেখে শুনে আমি আমার স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছি। এবং তাই জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে শাসনতন্ত্রের মর্মকথা।

আজকে জানি, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি জানি, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। আমার চেয়ে অধিক কে জানতে পারে? বাংলার কোন্ থানায় ঘুরি নাই। বাংলার কোন্ জায়গায় আমি যাই নাই? বাংলার মানুষকে আমার মতো কে ভালো করে জানে?

আপনারা দুঃখ পান, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। আপনাদের গায়ে কাপড় নাই। আপনাদের শিক্ষা দিতে পারছি না। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস খাদ্য।

দুর্নীতিবাজদের উৎখাত করতে হবে

একটা কথা বলি আপনাদের কাছে। সরকারি আইন করে কোন দিন দুর্নীতিবাজদের দমন করা সম্ভব নয়, জনগণের সমর্থন ছাড়া। আজকে আমার একটিমাত্র অনুরোধ আছে আপনাদের কাছে। আমি বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, জেহাদ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। আজকে আমি বলব বাংলার জনগণকে, এক নম্বর কাজ হবে, দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। কেমন করে করতে হবে? আইন চালাব। ক্ষমা করব না। যাকে পাব, ছাড়ব না। একটা কাজ আপনাদের করতে হবে। গণআন্দোলন করতে হবে। আমি গ্রামে গ্রামে নামব। এমন আন্দোলন করতে হবে। যে ঘুষখোর, যে দুর্নীতিবাজ, যে মুনাফাখোর, যে আমার জিনিস বিদেশে চোরাচালান দেয়। তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে মিটিং করে দেখতে হবে, কোথায় আছে, ওই চোরা, ওই ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, ওই ঘুষখোর। ভয় নাই, কোন ভয় নাই, আমি আছি। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের উপর অত্যাচার করতে দেব না। কিন্তু আপনাদের গ্রামে গ্রামে আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলন করতে পারে কে? ছাত্র ভাইয়েরা পারে। পারে কে? যুবক ভাইয়েরা পারে। পারে কে?

বুদ্ধিজীবীরা পারে। পারে কে? জনগণ পারে। আপনারা সংঘবদ্ধ হন। ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সে দুর্গ গড়তে হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করবার জন্য, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন করবার জন্য। এই দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এত চোর যে কোথা থেকে পয়দা হয়েছে, জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গেছে, কিন্তু এই চোর রেখে গেছে। এই চোর তারা নিয়ে গেলে বেঁচে যেতাম। কিন্তু দালাল গেছে, চোর গেলে বেঁচে যেতাম।

জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে

দ্বিতীয় কথা, আপনারা জানেন, আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয়, জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ বেশি ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল করতে পারব না, দ্বিগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না, ভিক্ষা করতে হবে না।

ভায়েরা আমার, বোনেরা আমার,

ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত নাই। একটা লোককে আপনারা ভিক্ষা দেন এক টাকা কি আট আনা। তারপর তার দিকে কিভাবে চান? বলেন, "ও বেটা ভিক্ষুক। যা বেটা, নিয়ে যা আটা আনা পয়সা।" কোন জাতি যখন ভিক্ষুক হয়, মানুষের কাছে হাত পাতে, মানুষকে বলে, "আমাকে খাবার দাও, আমাকে টাকা দাও," তার তখন ইজ্জত থাকতে পারে না। আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না।

আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাই-এর কাছে, যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট-পরা কাপড় পরা ভদ্রলোক, তাদের কাছেও চাই, জমিতে যেতে হবে। ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ওই শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি, আমাদের অভাব, ইনশাআল্লাহ, হবে না। কারো কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে হবে না।

আমি পাগল হয়ে যাই চিন্তা করে। এ-বৎসর, ১৯৭৫ সালে, আমাকে ছয় কোটি মণ খাবার আনতে হবে। কী করে মানুষকে বাঁচাব? কী করে অন্যান্য জিনিস কিনব? বন্ধুরাষ্ট্র সাহায্য দিচ্ছে বলে বেঁচে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

ভাইয়েরা আমার,

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হলো ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে, তাহলে ২৫/৩০ বৎসরে বাংলায় কোন জমি থাকবে না হাল চাষ করবার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সেই জন্য আজকে আমদের পপুলেশান কনট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। এটা হলো তিন নম্বর কাজ। এক নম্বর হলো, দুর্নীতিবাজ খতম করা। দুই নম্বর হলো, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে প্রোডাকশন বাড়ানো। তিন নম্বর হলো, পপুলেশান প্ল্যানিং। চার নম্বর হলো, জাতীয় ঐক্য।

জাতীয় ঐক্য গড়বার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাকে ভালোবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে, সৎ পথে চলে তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবে। যারা বিদেশি এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নাই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবে। কারণ, তারাও এই জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এই জন্য সকলে, যে যেখানে আছি, একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে।

জাতীয় দল ও তার শাখা

ভাইয়েরা, বোনেরা আমার,

এই জাতীয় দলের আপাতত পাঁচটা ব্রাঞ্চ হবে। একটা শ্রমিক ভাইদের অঙ্গদল, কৃষক ভাইদের একটা, যুবক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা এবং মহিলাদের একটা। এই পাঁচটা অঙ্গদল মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। আমাকে অনেকে বলে, কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ তো হলো। কিন্তু আমাদের কী হবে? আমি বলি আওয়ামী মানে তো জনগণ। ছাত্র, যুবক, শিক্ষিত সমাজ, সরকারি কর্মচারী, সকলে মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

শিক্ষিত সমাজের কাছে আমার একটি কথা

আমরা শতকরা কতজন শিক্ষিত লোক? আমরা শতকরা ২০ জন শিক্ষিত লোক। তার মধ্যে সত্যিকার অর্থে আমরা শতকরা ৫ জন শিক্ষিত। শিক্ষিতদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন। আমি এই যে দুর্নীতির কথা বললাম, তা কারা করে? আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না। আমার শ্রমিক? না। তাহলে ঘুষ খায় কারা? ব্ল্যাক মার্কেটিং করে কারা? বিদেশি এজেন্ট হয় কারা? বিদেশে টাকা চালান দেয় কারা? হোর্ড করে কারা? এই আমরা, যারা শতকরা ৫ জন শিক্ষিত। এই আমাদের মধ্যেই রয়েছে ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। আমাদের চরিত্রের সংশোধন করতে হবে, আত্মশুদ্ধি করতে হবে। দুর্নীতিবাজ এই শতকরা ৫ জনের মধ্যে, এর বাইরে নয়।

শিক্ষিত সমাজের চরিত্রের পরিবর্তন চাই

শিক্ষিত সমাজকে আর একটা কথা বলব। আপনাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। একজন কৃষক যখন আসে খালি গায়ে, লুঙ্গি পরে, আমরা বলব, "এই বেটা, কোত্থেকে আইছিস, বাইরে বয়, বাইরে বয়।" একজন শ্রমিক যদি আসে বলি "ঐখানে দাঁড়া।" "এই রিক্সাওয়ালা, ঐভাবে চলিস না।" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের সাথে কথা বলেন। তাদের তুচ্ছ করেন। এর পরিবর্তন করতে হবে। আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনে দেয় ওই গরিব কৃষক। আপনার মাইনে দেয় ওই গরিব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ওই টাকায়। আমরা গাড়ি চড়ি ওই টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলুন, ইজ্জত করে কথা বলুন। ওরাই মালিক। ওদের দ্বারাই আপনার সংসার চলে।

সরকারি কর্মচারীদের বলি, মনে রেখ, এটা স্বাধীন দেশ। এটা ব্রিটিশের কলোনি নয়। পাকিস্তানের কলোনি নয়। যে লোককে দেখবে, তার চেহারাটা তোমার বাবার মতো, তোমার ভাইয়ের মতো। ওরই পরিশ্রমের পয়সায় তোমরা মাইনে পাও। ওরাই সম্মান বেশি পাবে। কারণ, ওরা নিজেরা কামাই করে খায়।

একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করবেন না। আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে কে? আমার বাপ-মা, আমরা বলি, বাপ-মা। লেখাপড়া শিখিয়েছে কে? ডাক্তারি পাশ করায় কে? ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করায় কে? সায়েন্স পাশ করায় কে? বৈজ্ঞানিক করে কে? অফিসার করে কে? কার টাকায়? বাংলার দুঃখী জনগণের টাকায়। একজন ডাক্তার হতে সোয়া লাখ টাকার মতো খরচ পড়ে। একজন ইঞ্জিনিয়ার করতে এক লাখ থেকে সোয়া লাখ টাকার মতো খরচ পড়ে। বাংলার জনগণ গরিব। কিন্তু এরাই ইঞ্জিনিয়ার বানাতে টাকা দেয়, মেডিকেলের টাকার একটা অংশ দেয়।

আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, শিক্ষিত ভাইয়েরা, আপনাদের লেখাপড়ার যে খরচ জনগণ দিয়েছে, তা শুধু আপনাদের সংসার দেখবার জন্য নয়। আপনাদের ছেলে মেয়েদের দেখবার জন্য নয়। দিয়েছে এই জন্য যে, তাদের জন্য আপনারা কাজ করবেন, তাদের সেবা করবেন। তাদের আপনারা কী দিয়েছেন? কী ফেরত দিয়েছেন, কতটুকু দিচ্ছেন? তাদের

টাকায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, তাদের টাকায় ডাক্তার সাহেব, তাদের টাকায় অফিসার সাহেব, তাদের টাকায় রাজনীতিবিদ সাহেব, তাদের টাকায় মেম্বার সাহেব, তাদের টাকায় সব সাহেব। আপনারা দিচ্ছেন কী? কী ফেরত দিচ্ছেন? আত্মসমালোচনা করুন। বক্তৃতা করে লাভ নাই। রাতের অন্ধকারে খবরের কাগজের কাগজ ব্ল্যাক মার্কেটিং করে সকাল বেলা বড় বড় কথা লেখার দাম নাই। রাতের বেলা ঔষধ ব্ল্যাক মার্কেটিং করে বড় বড় কথা বলার দাম নাই। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মদ খেয়ে অনেস্টির কথা বলার দাম নাই। আত্মসমালোচনা করুন, আত্মশুদ্ধি করুন। তা হলেই হবেন মানুষ।

সমাজের পরিবর্তন চাই

এই যে কী হয়েছে সমাজের, সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই। যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের, সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি, আপনাদের সমর্থন আছে।

কিন্তু একটা কথা এই, যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বৎসরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ। এর জমি মালিকের থাকবে। কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যাঁরা টাউট আছেন, তাদেরকে বিদায় দেওয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বৎসরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচ শত থেকে এক হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।

দ্বিতীয়ত, থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। এই কাউন্সিলে রাজনৈতিক কর্মী বা সরকারি কর্মচারী যে-ই হন, একজন তার চেয়ারম্যান হবেন। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী, তার মধ্যে আমাদের কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি থাকবে, যুব প্রতিনিধি থাকবে, কৃষক প্রতিনিধি থাকবে। তারাই থানাকে চালাবে।

আর, জেলা থাকবে না, সমস্ত মহকুমা জেলা হয়ে যাবে। সেই মহকুমায় একটি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল হবে। তার চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী এক সঙ্গে তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিপল্‌স রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে। পার্টি রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে। সেখানে তারা সরকার চালাবে। এইভাবে আমি একটা সিস্টেম চিন্তা করেছি এবং করব বলে ইনশাআল্লাহ্ আমি ঠিক করেছি। আমি আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই।

যুদ্ধের মনোভাব দূর হোক

ভাই ও বোনেরা আমার,

আজকে আর একটা কথা বলি। আমি জানি, শ্রমিক ভাইয়েরা আপনাদের কষ্ট আছে। কী কষ্ট, আমি জানি। তা আমি ভুলতে পারছি না। বিশেষ করে ফিক্সড ইনকাম গ্রুপের কষ্টের সীমা নাই। কিন্তু কোথা থেকে কী হবে? টাকা ছাপিয়ে বাড়িয়ে দিলেই তো দেশের মুক্তি হবে না।

ইনফ্লেশন হবে। প্রোডাকশন বাড়াতে পারলে তার পরেই আপনাদের উন্নতি হবে। না হলে উন্নতি হবে না। আমি এই-ই জানি। যেমন আমরা আজকে দেখছি।

কপাল, আমাদের কপাল! আমরা গরিব দেশ। আমাদের কপাল, আমার পাটের দাম নাই, আমার চায়ের দাম নাই। আমরা বেচতে গেলে অল্প পয়সায় আমাদের বিক্রি করতে হয়। আর, আমি যখন কিনে আনি, যারা বড় বড় দেশ, তারা তাদের জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমরা বাঁচতে পারি না। আমরা এই জন্য বলি, তোমরা মেহেরবানি করে যুদ্ধের মনোভাব বন্ধ কর। আরমামেন্ট রেস বন্ধ কর। তোমরা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ কর। ওই সম্পদ দুনিয়ার দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যয় কর। তাহলে দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে। আজকে তোমরা মনে করেছ, আমরা গরিব, আমাদের তাই কোন মূল্য নাই। কিন্তু–

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।

তোমরা মনে করেছ, আমরা গরিব, আমাদের তাই যে দামেই হোক, বিক্রি করতে হয়। কিন্তু এই দিন থাকবে না। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি, ইনশাআল্লাহ এ দিন থাকবে না। তোমরা আজকে সুযোগ পেয়ে জাহাজের ভাড়া বাড়িয়ে দাও। জিনিসের দাম বাড়িয়ে দাও। আর তাই আমাদের কিনতে হয়। আমরা এখানে না খেয়ে মরি, আমাদের ইনফ্লেশন হয়, আমরা বাঁচতে পারি না। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাই; তোমরা কিছু খয়রাত দিয়ে একটু মিষ্টি হাস। হাস, হাস, হাস। দুঃখে পড়েছি, বিক্রিত হয়েছি। তোমাদের কাছে হাত পাততে হবে, হাস। অনেকে হেসেছ, যুগ যুগ ধরে হেসেছ। হাস! আরব ভাইয়েরাও গরিব ছিল।

আরব ভাইদের সঙ্গে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করেছি। প্যালেস্টাইনের আরব ভাইদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করে বাংলার মানুষ। আরব ভাইদের পিছনে তারা থাকবে প্যালেস্টাইন উদ্ধার করবার জন্য। এও আমাদের পলিসি। যেখানে নির্যাতিত দুঃখী মানুষ, সেখানে আমরা থাকব। শ্রমিক ভাইয়েরা, আমি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান করছি। আপনাদের প্রতিনিধি, ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট, লেবার ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি বসে একটা প্ল্যান করতে হবে। সেই প্ল্যান অনুযায়ী কী করে আমরা বাঁচতে পারি, তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

ছাত্রদের মানুষ করতে হবে

ছাত্র ভাইয়েরা, লেখাপড়া করুন। আমি দেখে খুশি হয়েছি, আপনারা নকল-টকল বন্ধ করেছেন একটু। কিন্তু একটা কথা আমি বলব। আমি পেপারে দেখেছি যে, এবারে প্রায় এক পার্সেন্ট পাস, দুই পার্সেন্ট পাস, তিন পার্সেন্ট পাস। শিক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে আমার আকুল আবেদন, ফেল করাবেন না। নকল বন্ধ করেছি। আপনাদের একটা কর্তব্য আছে। বলতে পারেন, দুই পার্সেন্ট পাস করিয়ে আপনাদের কর্তব্য পালন করলেন। আপনাদের কর্তব্য আছে, ছেলেদের মানুষ করতে হবে। ফেল করানোতে আপনাদের তেমন বাহাদুরি নাই, পাস করালেই বাহাদুরি আছে। আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। খালি ফেল করিয়ে বাহাদুরি নেবেন, তা হয় না। তাদের মানুষ করুন। আমি তো শিক্ষকদের বেতন দেব। আমরা সব আদায় করব। আপনারা লেখাপড়া শেখান, আপনারা তাদের মানুষ করুন। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন, রাজনীতি একটু কম করুন। তাদের একটু মানুষ করবার চেষ্টা করুন। একটু সংখ্যা বাড়ান। শুধু এক পার্সেন্ট, দুই পার্সেন্ট, পাঁচ পার্সেন্ট দিয়ে বাহাদুরি দেখিয়ে বলবেন, খুব স্ট্রিক্ট

হয়েছি। আমিও স্ট্রিক্ট চাই। নকল করতে দেবেন না। তবে, আপনাদের কাছে আবেদন, মেহেরবানি করে আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। ছেলেদের মানুষ করবার চেষ্টা করুন। পাসের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করুন। ওদের মানুষ হিসাবে তৈরি করুন। সেটাই ভালো হবে। রাগ করবেন না। আপনারা আবার আমার উপর রাগ করেন। আমি বুদ্ধিজীবীদের কিছু বলি না। তাদের সম্মান করি। শুধু এইটুকুই বলি যে, বুদ্ধিটা জনগণের খেদমতে ব্যয় করুন। এর বেশি কিছু বলি না। বাবা, ওদের কিছু বলে কি বিপদে পড়ব! আবার কে কী বই লিখে ফেলবে! খালি সমালোচনা করলে লাভ হবে না।

আমার যুবক ভাইয়েরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে, এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর, গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাকসেসফুল করবার জন্য কাজ করতে হবে। এ-কাজে যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই।

বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই

আর একটি কথা বলতে চাই। বাংলাদেশের বিচার ইংরেজ আমলের বিচার। আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে, সেই মামলা শেষ হতে লাগে ২০ বছর। আমি যদি উকিল হই, আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে কেস দিয়ে যাই। ওই মামলার ফয়সালা হয় না। আর, যদি ক্রিমিনাল কেস হয়, তিন বছর, চার বছরের আগে শেষ হয় না। এই বিচার বিভাগকে নতুন করে গড়তে হবে। থানায় ট্রাইব্যুনাল করবার চেষ্টা করছি। সেখানে যাতে মানুষ এক বছর, দেড় বছরের মধ্যে বিচার পায়, তার বন্দোবস্ত করছি। আশা করি, সেটা হবে।

এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে একটি কথা জানতে চাই। এই যে চারটি প্রোগ্রাম দিলাম, এই যে, আমি কো-অপারেটিভ করব, থানা কাউন্সিল করব, সাবডিভিশনাল কাউন্সিল করব, আর, আমি যে আপনাদের কাছ থেকে ডবল ফসল চেয়েছি, জমিতে যে ফসল হয়, তার ডবল চাই, কলে-কারখানায় কাজ চাই, এ-সম্পর্কে আপনাদের মত কি?

সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, একটু ডিসিপ্লিন এসে গেছে। অফিসে যান, কাজ করুন। আপনাদের কষ্ট আছে, আমি জানি। দুঃখী মানুষ আপনারা। আপনারা কাজ করুন। জনগণের পেটে খাবার নাই। তাদের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে আমি আপনাদের পুষতে পারব না। প্রোডাকশন বাড়লে আপনাদেরও এদের সঙ্গে উন্নতি হবে। এই যে কথাগুলি আমি বললাম, এতে আপনারা আমাকে সমর্থন করেন কিনা, আমার ওপর আপনাদের আস্থা আছে কিনা, আমাকে দুই হাত তুলে দেখিয়ে দিন।

ভাইয়েরা, আবার দেখা হবে, ইনশাআল্লাহ, আবার দেখা হবে। আপনারা বহু দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন। গ্রামে গ্রামে ফিরে যান। গিয়ে বলবেন, দুর্নীতিবাজদের খতম করতে হবে। ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনারাও কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য হবেন। আপনারা প্রাণ দিয়ে কাজ করুন। ইনশাআল্লাহ, বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

সূত্র : ঢাকা নগর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হানিফ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু কর্তৃক ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'বঙ্গবন্ধু স্মরণে' থেকে সংকলিত।

উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে : বঙ্গবন্ধু

কিংস্টন, জ্যামাইকা, ৩ মে ১৯৭৫

জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে ১৯৭৫ সালের ৩ মে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কমনওয়েলথ সম্মেলনে বলেন যে, উপমহাদেশের দেশসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য আমরা বরাবরই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে। কারণ, আমরা মনে করি যে, এই পথেই আমাদের জনগণের স্বার্থের সর্বোত্তম নিশ্চয়তা রহিয়াছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্ম্পক পরিবর্তনের ব্যাপারে সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন যে, উপমহাদেশের সকল দেশের মধ্যে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়িয়া তোলার জন্য বাংলাদেশ ও ভারত উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধজাত সমস্যাবলি নিরসনের জন্য উভয় প্রতিবেশী দেশ যৌথভাবে কাজ করিয়াছে। দিল্লি চুক্তি ইহারই ফল। বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন যে, এই চুক্তি মোতাবেক পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বিপুলসংখ্যক আটক নাগরিক স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ যুদ্ধ-অপরাধীদের পর্যন্ত ক্ষমা করিয়া দিয়াছে। উপমহাদেশে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের নূতন অধ্যায় সূচনা করার মানসেই বাংলাদেশ এই উদার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তান সক্রিয়ভাবে সাড়া দিলে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার এই প্রক্রিয়া আরও অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিত। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশে অবস্থিত সকল পাকিস্তানি নাগরিককে ফেরত নেয় নাই এবং সম্পত্তি ব্যাটোয়ারার প্রশ্নেও অনুকূল সাড়া দেয় নাই।

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, নিজেদের সমস্যাবলি নিজেরাই মীমাংসা করিয়া ফেলার ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বৎসরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি যথেষ্ট দক্ষতা ও পরিপক্কতা প্রদর্শন করিয়াছে। ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে অমীমাংসিত বিরোধ মীমাংসায় তাঁহারা নিজেদের উপরই নির্ভর করিয়াছেন, বাহিরের কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে তিনি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত সীমান্ত চুক্তির কথা উল্লেখ করেন।

আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ঘোষণা করিয়া তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ও মেডিক্যাল সাহায্যদানের সংকল্প ব্যক্ত করেন।

আফ্রিকান মুক্তি আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন

প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য আফ্রিকান কৌশলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন ও দারেসসালাম ঘোষণা অনুমোদন করার জন্য কমনওয়েলথ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের নেতা সংখ্যালঘু সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধ নূতন করিয়া দৃঢ়তর করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ দৃঢ়তার সহিত রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখিয়া চলিয়াছে।

বঙ্গবন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্যের নির্যাতন উৎখাত ও স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ন্যায়ের সংগ্রামে নিয়োজিত আফ্রিকানদের সহিত তাঁহার দেশের জনগণের একাত্মতার কথা ঘোষণা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত আফ্রিকান নেতাদের তিনি আশ্বাস দেন যে, তাঁহাদের ন্যায়ের সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমর্থনের ব্যাপারে তাঁহারা নিশ্চিত থাকিতে পারেন।

আফ্রিকান ভাইদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের কথা পুনর্ঘোষণা করিয়া বঙ্গবন্ধু তাঁহার দেশের মুক্তিসংগ্রামে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্তদের জাম্বিয়া ও নামিবিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে কাজ করার প্রস্তাব দেন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশন, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের দরজা ওই এলাকার তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বদাই খোলা থাকিবে।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আফ্রিকা প্রসঙ্গে তাঞ্জানিয়ার প্রসিডেন্ট নায়ারারের শান্তিপূর্ণ সমর্থনের জন্য আলোচনা চলাকালেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে প্রেসিডেন্ট নায়ারারের সহিত একমত হন।

মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন যে, ইহা বিশ্বশান্তির প্রতি মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। তিনি আপস-মীমাংসায় ইসরাইলদের অস্বীকৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সঙ্কট জিয়াইয়া রাখার জন্য ইসরাইলকে দায়ী করেন।

ইন্দোচীন

তিনি কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের জনগণের বিজয়কে কয়েক-দশকব্যাপী রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্যদিয়া জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে, ভিয়েতনামের বীর জনতা বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই শান্তির পরিবেশে নিজেদের অঞ্চল উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিবে।

জোটনিরপেক্ষ নীতি

বঙ্গবন্ধু মনে করেন যে, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে তাহাদের যোগদান শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নয়, বরং সারা বিশ্বে শান্তিকামী শক্তিকে প্রেরণা যোগাইবে।

বাংলাদেশ-ভারত

বঙ্গবন্ধু সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ফলপ্রসূ ও অর্থবহ সহযোগিতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমস্যা সমাধানে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানিসম্পদ ব্যবহার শুরুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার সরকার অভিন্ন সমস্যা সমাধানের সম-অংশীদারিত্ব অনুসন্ধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তি দ্বন্দ্ব হ্রাসের প্রয়াসের প্রতিও বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষীকরণ ও ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকায় পরিণত করার ধারণার প্রতিও তাঁহার আস্থা প্রকাশ করেন।

সুষ্ঠুতর আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানাইয়া বঙ্গবন্ধু বলেন যে, এ ব্যাপারে কমনওয়েলথ ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করিতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন।-*বাসস-এনা*

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোমবার, ৪ মে ১৯৭৫

বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা

বিদেশ হইতে আমদানি করা 'ইজম' বা 'সিস্টেম' নহে দেশের মাটির সাথে সংযোগ রাখিয়াই শোষণহীন সমাজ গড়িব

দরবার হল, বঙ্গভবন, ঢাকা, ১৯ জুন ১৯৭৫

একক জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান জাতির পিতা প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত ঘোষণা করেন, বিদেশ হইতে কোন 'ইজম' বা 'সিস্টেম' আমদানি করিয়া নহে, আমার দেশের মাটির সহিত সংযোগ রাখিয়া শোষণহীন সমাজ গড়িব। বৃহস্পতিবার ১৯ জুন (১৯৭৫) বঙ্গভবনের দরবার হলে জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বক্তৃতাদানকালে বঙ্গবন্ধু একথা বলেন।

বাকশালের নবগঠিত ১১৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির ১ শত ৯ জন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বাকি ৬ জন অসুস্থতা বা বিদেশ যাত্রার কারণে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। বঙ্গভবনের দরবার হলের মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর ডানে ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং বামে প্রধানমন্ত্রী ও দলের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব এম মনসুর আলী আসন গ্রহণ করেন। মঞ্চের নিচে ডান দিকে দলের তিনজন সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান, জনাব শেখ ফজলুল হক মণি ও জনাব আবদুর রাজ্জাক উপবিষ্ট ছিলেন। মঞ্চের পেছনে দরবার হলের দেয়ালে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় দলের নূতন পতাকা শোভা পাইতেছিল।

জাতীয় দলের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব এম মনসুর আলী দলীয় চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মাল্যভূষিত করেন। দলের অপর তিনজন সেক্রেটারিও বঙ্গবন্ধু এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলামকে মাল্যভূষিত করেন।

বৃহস্পতিবার ১৯ জুন ১৯৭৫ সকালে বঙ্গভবনের দরবার হলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় দলীয় চেয়ারম্যান জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

আজকে প্রথমদিন আমরা এখানে বসেছি সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করার জন্য-যাকে বলা হয় 'গেট টুগেদার'। যাতে আমরা মেম্বার যারা রয়েছি, সকলে একসঙ্গে বসতে চাই। সকলকে যেন চেনা যায়, আলোচনা করা যায় এবং জানা যায়, কি অবস্থা।

শীঘ্রই অ্যাসেম্বলি সেশন হবে, বাজেট সেশন। আগস্ট মাসে সেন্ট্রাল কমিটির বৈঠক বসবে। একদিন দুদিনের জন্য নয়, দরকার হলে পাঁচ-সাতদিনের জন্য বসবে। এবং সেই সেন্ট্রাল কমিটির মিটিংয়ে বিভিন্ন এজেন্ডা দেওয়া হবে। সেই এজেন্ডা অনুযায়ী কনফারেন্সকে ভাগ করে কতকগুলো সাব-কমিটি বা কমিশন করে দেওয়া হবে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং বাইরের কাউকে যদি দরকার হয় তাদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে একটি প্রপোজাল সাবমিট করা হবে-কনফারেন্সের কাছে। যেমন ফুড, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রি, ফ্লাড কন্ট্রোল, এডুকেশন বিভিন্ন সাবজেক্টের সাব-কমিটি করে তাঁদের কাছে ভার দেওয়া হবে। রেসপেক্টিভ মিনিস্টার সেখানে থাকবেন। সরকারি কর্মচারীরা থাকবেন। দরকার হয় বাইরে থেকে-যাঁরা আমাদের কমিটি মেম্বার নন, কিন্তু যাঁরা কন্ট্রিবিউট করতে পারেন, তাঁদেরকে আমরা ইনভাইট করতে পারব। সেখানে বসে কতটুকু কি করা হয়েছে, কতটা ভুল হয়েছে, কি ত্রুটি হয়েছে বা কি কি করলে আমরা দেশের ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারব, সে সম্পর্কে সাজেশন দিলে তখন সেন্ট্রাল কমিটি থেকে এটা প্রস্তাব করে গভর্নমেন্ট সেই অনুযায়ী তাদের কাজকর্ম করবে। এই আমাদের ইচ্ছে। আগস্ট মাসে একটা ফুল এজেন্ডা নিয়ে কাজ শুরু করা হবে।

নতুন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

আপনাদের কাছে বক্তৃতা করে বোঝানোর দরকার নেই। তবে, এটুকু বলতে পারি, কেন আমরা এ নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করলাম আর কেনইবা আমরা একে বিপ্লব বললাম। সেদিন ডক্টর এনামুল হক সাহেবের একটা লেখা পড়লাম। তিনি বললেন যে, বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয় নি, সেকথা সত্য নয়। বাংলাদেশ অনেকবার স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু রাখতে পারি নি। বিদেশিদের ডেকে আনতে হয়েছে, ডেকে এনেছে এই বাঙালিরাই। কথাটা আমার মনে লাগল। কিন্তু আমি তো উনার মতো শিক্ষিত নই। তিনি তো আমার চেয়ে অনেক গুণীজন, গুরুজন। ওনাকে আজও ভক্তি করি আমি। আমি যা চিন্তা করতাম বা ইতিহাসে যা পড়েছি, তা উনার কথা পড়ে আমি তা 'কনফার্ম' করলাম। আজকে স্বাধীনতার পরে বিনা কারণে এভাবে 'সিস্টেম চেঞ্জ' করি নি। বাংলাদেশে নির্বাচন দিয়েই ৯৭ পারসেন্ট ভোট, আউট অব থ্রি হানড্রেড ফিফটিন, থ্রি হানড্রেড সেভেন সিটস আমাদের পার্টি আওয়ামী লীগের ছিল। যদি তারপরও ইলেকশন দিতাম, এখনও বিশ্বাস করি, দু-এক পারসেন্ট বাদ যেতেও পারে, কিন্তু নব্বই পারসেন্ট-এর কম পাবে না আমাদের পার্টি। সেজন্য এই সিস্টেমে, ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনা আমাদের অনেকদিন ছিল না–যদি ক্ষমতায় থাকতে চাইতাম, আর ক্ষমতার জন্য রাজনীতি যদি করতাম-তাহলে আমরা অনেকাবরই ক্ষমতায় আসতে পারতাম। যদি নিগোসিয়েশন বা আপসে আমরা ক্ষমতা চাইতাম, তাহলে কেন আমরা এই পরিবর্তন করলাম!

আজ দুনিয়ার দিকে আমাদের চাইতে হবে। স্বাধীনতার পর আমাদের কি দশা হলো? ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা পেলাম এবং রক্তের বিনিময়ে পেলাম। সাড়ে সাত কোটি লোক, ৫৪ হাজার স্কোয়ার মাইল। সম্পদ বলতে কোন পদার্থ আমাদের ছিল না। সমস্তকিছু ধ্বংস, আমরা কিন্তু চেষ্টা করলাম যে, ঠিক আছে। আমরা একদম যাকে যা ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে দিলাম। আচ্ছা বল, আচ্ছা কর, আচ্ছা দল গড়, আচ্ছা লেখ, আচ্ছা বক্তৃতা কর, বাধা নাই, ফ্রি হ্যান্ড। আমার অনেক পুরানা নেতৃবৃন্দ আছেন, আমার মনে পড়ে না যে, দশ–বিশ বছরের মধ্যে তাদের কেউ পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে গালাগালি না করে ফিরে গেছেন। এ আমার জানা নাই বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে। কিন্তু তাও বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে বললাম, যদি কিছু ভালো কথা বলতে চাও বলো, যদি দেশের মঙ্গল হয় বলো, কিন্তু দেখতে পেলাম কি? আমরা যখন এই পন্থায় এগুতে শুরু করলাম, বিদেশি চক্র এদেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং তারা এদেশের স্বাধীনতা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করল এবং ফ্রি স্টাইল শুরু হয়ে গেল। হুড়হুড় করে বাংলাদেশে অর্থ আসতে আরম্ভ করল। দেশের মধ্যে শুরু হলো ধ্বংস, একটা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ।

এছাড়াও আরও দেখা গেল, যাদের আমরা এ সমস্ত ভোগ করতে দিলাম তারা রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করল। যখন আমরা বলেছি যে, বাবা, ঠিক আছে, পাঁচ বছর পরে ইলেকশন হবে, ইলেকশন কর, ইলেকশনে যদি ডিফিট খাই আর একজন এসে বসবে। হাইকোর্টের একজন এক্স–জাজ আমাদের ইদ্রিস সাহেবকে ইলেকশন কমিশনার করা হয়েছিল। তাঁকে আমি ইলেকশনের ব্যাপারে বলেছি, কোন কথা নাই। যা ভালো বুঝবেন, তাই করবেন আপনি, 'ফ্রি ফেয়ার' ইলেকশন হবে। তা না করে রাতের অন্ধকারে ইলেকটেড মেম্বার অব পার্লামেন্ট, তাদের হত্যা করা হল। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধ করেছেন, দেশ ত্যাগ করেছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যাঁদের সম্পত্তি, তাঁদের রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হলো। মোট কয়েক হাজার কর্মীকে হত্যা করা হলো। যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলে, তাঁদের হত্যা করা হলো। চরম ষড়যন্ত্র। এত অস্ত্র উদ্ধার করি, তবু অস্ত্র শেষ হয় না। এই রাজনীতির নামে হাইজ্যাক, এই রাজনীতির নামে ডাকাতি, টেলিফোন করে মানুষের কাছ

থেকে টাকা আদায় করে বা মানুষের বাড়িতে গিয়ে গহনা কেড়ে নেয়। রাজনীতির নামে একটা 'ফ্রি স্টাইল' শুরু হয়ে গেল। নব্য, কিছু দিন আগে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটা দেশে এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। পিপলস-এর মধ্যে যে ডিমরালাইজিং ইফেক্ট হয়, তার ফল খুব খারাপ হয়। আমরা জানি, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। আমরা জানি, বন্যা হয়েছে, এক কোটি লোক চলে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে, তাদের রিহ্যাবিলিটেশন দরকার। ওয়ার্লড ইনফ্লেশন, যা আমার হাতে আপনার হাতে নয়। জিনিসের দাম বেড়ে গেল। ড্রাউট হলো বাংলাদেশে, এই সাউথ-ইস্ট এশিয়াতে। ফ্লাড আসল, সাড়ে সাত কোটি লোক, ২০০ বছরের গোলামি, অর্থনৈতিক কাঠামো নেই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলে কোন গভর্নমেন্ট নেই, সবকিছু রয়েছে ইসলামাবাদে। একটা প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট ছিল ছোটখাটো, তাও নয় মাসে আর্মি কন্ট্রোলে নিয়ে নিল। তাদের স্ট্রাকচার ধ্বংস করে দিল। নেই একটা ফরেন অফিস, নেই একটা প্ল্যানিং অফিস, নেই একটা কোন কিছু। আমাদের সব কিছু আরম্ভ করতে হয়েছিল গোড়া থেকে। এই সুযোগে আমাদের যারা স্বাধীনতার নামে অনেক চেষ্টা করেছিল, যার যার নিজেদের একটা 'বেস' করা যায় কিনা। ভবিষ্যতে তাদের ক্রীড়নকরা এদেশে সরকার চালাতে পারে কিনা! তারা তার ফিকির খুঁজতে লাগল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এবং আগে যে পলিসি আমরা নিয়েছি, বৈদেশিক নীতি, বাংলাদেশের মানুষ, শিক্ষিত সমাজ এবং দুনিয়া এটাকে এ্যাপ্রিশিয়েট করেছে।

স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি

আমরা নন-অ্যালায়েন্ড, আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসিতে বিশ্বাস করি, আমরা পিসফুল কো-ইগজিসটেন্স-এ বিশ্বাস করি। আমরা দুনিয়ার নির্যাতিত জনগণের সাথে আছি, আমরা কারো সাথে শত্রুতা করতে চাই না। আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। আমরা আন্ডার ডেভেলপড্ কান্ট্রি, আমরা বিশ্বে শান্তি চাই, আমরা কারুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না, আমাদের ব্যাপারেও কেউ হস্তক্ষেপ করুক, এটা আমরা চাই না। আমরা দেশকে গড়তে চাই, আমরা সকলের শান্তি চাই। আমাদের লোক বাঁচতে চায়। এই পলিসি সকলেই–প্রায় হোল ওয়ার্লড–পছন্দ করল। আমার দেশবাসী সেটাকে সমর্থন জানাল।

আমরা মনে করি, আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণরূপে সাকসেসফুল হয়েছে। আজ আমরা নন-অ্যালায়েন্ড কান্ট্রিতে আছি, আজ আমরা ইসলামিক সামিট-এ আছি, আজ আমরা কমনওয়েলথ-এ আছি, আজ আমরা ইউএনও-তে আছি। ইউএনও-র চার্টারে বিশ্বাস করি। আমরা সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। ইন্টারন্যাশনাল পলিটিকস্-এ আমাদের প্রয়োজন নাই, এতে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। আমরা, যেখানে কোন অপ্রেসড ইন্টারন্যাশনাল পিপল থাকবে, তাঁদের মর‍্যাল সমর্থন দিতে পারি এবং দেব, যেখানেই থাকুক না কেন, আমরা দেব। আমরাও অপ্রেসড পিপল, আমরাও যুগ যুগ ধরে এটার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, আমরাও মার খেয়েছি, দুনিয়ার শোষকগোষ্ঠী, ইম্পিরিয়ালিস্ট পাওয়ার আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়েছে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আমাদের স্বজন হারানোর অর্থ কি? এর অর্থ হলো, আমাদের অর্থনীতির মালিক আমরা এবং আমাদের দেশ সেই সম্পদ ভোগ করবে।

পাকিস্তানের কার্যকলাপ

তারপর পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আমরা এত রক্ত দিয়েছি, এত আমরা আঘাত পেয়েছি, আমাদের এত ইন্টেলেকচুয়ালকে হত্যা করা হয়েছে, মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আমাদের রাস্তাঘাট ধ্বংস করা হয়েছে, তবুও আমরা বলেছি, আমরা সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৫ জন, যারা কমিটেড ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি, তাদের পর্যন্ত আমরা মাপ করে দিলাম, উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমরা এদেশে–সাউথইস্ট এশিয়া, পার্টিকুলারলি সাব-কন্টিনেন্টে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে আমরা

এদেশে ডেভেলপমেন্টের কাজ করব। আমাদের অ্যাটেনশন থাকবে মানুষের মঙ্গল করা, দেশকে গড়া। কিন্তু পাকিস্তান, দুঃখের বিষয়, একটা পয়সা পর্যন্ত দিল না, আমরা ছিলাম ৫৬ পারসেন্ট পলুলেশন, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সম্পদ আমাদের দিল না, ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ আমাদের দিল না, গোল্ড রিজার্ভ আমাদের দিল না। আমাদের কোন একটা জাহাজ দিল না, কোন কিছুই তারা আমাদের দিল না। আমরা আমাদের দিক দিয়ে শত চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তারা এগিয়ে আসল না, দ্যাটস অল রাইট। মাটি আছে, মানুষ আছে, দেশ আছে, ইনশাআল্লাহ। কষ্ট হয়েছে আমার মানুষের, না-খেয়ে মরেছে, সত্য কথা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে যে সম্পদ আছে, যদি গড়তে পারি, অনেস্টলি কাজ করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের কষ্ট একদিন দূর হয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা চেষ্টা করেলিাম, আমরা এখনও পর্যন্ত চেষ্টা করছি, কিন্তু তারা এগুচ্ছে না। এছাড়া কারও সঙ্গে দুশমনি নাই। চায়না রেকগনিশন দিল না। আমরা চায়নার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। তারা একটা বিগ কান্ট্রি। আমরা এখনও বন্ধুত্ব চাই। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে রাশিয়ার, আমার বন্ধুত্ব আছে ভারতবর্ষের সঙ্গে, আমার বন্ধুত্ব আমেকিার সঙ্গে। এ বন্ধুত্ব সকলের সঙ্গে আমরা চাই। আমরা কারও সঙ্গে গোলমাল করতে চাই না। কারণ, আমি আমার দেশকে গড়তে চাই।

বিদেশের সাহায্যে চক্রান্ত

এই পলিসিতে আজ পর্যন্ত আমারা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু দেশের মধ্যে এজেন্সি শুরু হয়ে গেল। বহুদিন রাজনীতি করেছি, ১৮ বছর বয়স থেকে, তখন বোধ হয় ১৯৩৮ সন। তারপর চোঙ্গা মুখে দিয়ে রাজনীতি করেছি, রাস্তায় হেঁটেছি, পায়ে হেঁটেছি, ফুটপাতে ঘুমিয়েছি। সেই রাজনীতি থেকে আজ এ পর্যন্ত এসেছি, এর মধ্যে আমি বলতে চাই না যে, আমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছি, সাধারণ মানুষ থেকে আমি চোঙ্গা ফুঁকেছি, সাইকেলে ঘুরেছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাজনীতি করেছি। আমি জানি, একটা খবরের কাগজ চলতে পারে না, যদি অ্যাডভারটাইজমেন্ট না পায়। বৎসরের পর বৎসর এই টাকা কোন পলিটিক্যাল পার্টি ব্যয় করতে পারে বলে আমার জানা নাই। আর আমি হলাম বিগেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি লিডার। আমি দেশে একটা পার্টি গড়ে তুলেছি এবং চালিয়েছি, যেটা নাম্বার ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি অব বাংলাদেশ।

আমি একটি ডেইলি কাগজ চালাতে পারি নাই। অর্ধেক ভাগ করেন তার মানিক ভাই। বরং মানিক ভাইর 'অ্যাবিলিটি' এবং 'এক্সপেরিয়েন্স'-এ ইত্তেফাক কাগজ চালাতেন তিনি। তা থেকে আমাদের সমর্থন করতেন। অথচ এ তিন বছরের মধ্যে দেখা গেল যে, এমন কাগজও চলল, যে কাগজ বছরে এক ইঞ্চি অ্যাডভারটাইজমেন্ট পায় নাই। কিন্তু একটা কাগজ করতে মাসে কম পক্ষে এক লক্ষ, সোয়া লক্ষ, দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়। আজকে এই টাকা তারা কোথা থেকে পায়? কে দেয়? তাদের এই টাকা কোথা থেকে আসে? তারপর 'ইন্ডাস্টিয়ালিস্ট' বলতে যে পদার্থ বাংলাদেশে আছে, তাদের এত টাকা আছে বলে আমার জানা নাই-ছিল কিনা জানি না। এখন কিছু লোক নতুন টাকার মানুষ হয়েছে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি তো আমরা নিয়ে নিলাম। দেখা গেল যে, বিদেশের কিছু কিছু জায়গা থেকে পয়সা পেয়ে তারা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, গোলমাল সৃষ্টি করে।

একতাই মঙ্গলের পথ

আর দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা এই 'সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস' করলাম কেন? এই যে আমাদের সমাজ, এখানে দেখতে পাই, আমি অনেক চিন্তা করেছি, বহুদিন কারাগারে, জেলে একলা একলা বসে বসে চিন্তা করতে আমি সময় পেয়েছি, এই সব বিষয়ে যে, আমার দেশের ২০% লোক আমরা শিক্ষিত। তার মধ্যে আমরা ১০% বা ৫% লোক বলব আমরা লেখাপড়া কিছুটা

জানি। এর মধ্যে এক গ্রুপ আমরা 'পলিটিশিয়ান' হয়ে গেলাম। এক গ্রুপ আমরা বুদ্ধিজীবী। এক গ্রুপ স্কুল টিচার, যারা এই ঘোর প্যাচের মধ্যে আসতে চায় না। এক গ্রুপ সরকারি কর্মচারী হয়ে গেলাম, কেউ ডাক্তার হয়ে গেলাম, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলাম, কেউ অমুক হয়ে গেলাম। আর কিছু সংখ্যক হয়ে গেলাম রাজনীতিবিদ। কিন্তু 'এ্যাকচুয়াল' যেটা 'পিপল', তাদেরসহ সবাইকে একতাবদ্ধ করতে না পারলে সমাজের দুর্দিনে দেশের মঙ্গল হতে পারে না। সেজন্য আমরা চিন্তা করলাম, সমাজের, যেখানে যে আছেন, বুদ্ধিজীবী হন, ডাক্তার হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, সরকারি কর্মচারী হন, রাজনীতিবিদ হন, ল-ইয়ার হন, আর যা-ই হন-কারণ, আমার সমাজে তো শতকরা ২০ জনের বেশি শিক্ষিত নন; এর মধ্যে সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ করে দেশের মঙ্গলের জন্য যদি এগিয়ে যেতে না পারি, তবে দেশের মঙ্গল করা কষ্টকর হবে। সেজন্য নতুন 'সিস্টেমের' কথা বহু দিন পর্যন্ত চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়, বাংলাদেশবাসী এটাকে গ্রহণ করেছে এবং ভালোভাবে গ্রহণ করেছে।

নতুন পদ্ধতির লক্ষ্য

আর একটা জিনিস আমি 'মার্ক' করলাম। সেটা হলো, এই যে, একদল বলে আমরা পলিটিশিয়ান, একদল বলে আমরা 'ব্যুরোক্রেট'। তাদের অ্যাটিচিউড হলো : 'হাউ টু ডিসক্রেডিট দি পলিটিশিয়ান।' 'পলিটিশিয়ানরা' তাদের 'স্ট্রেংথ' দেখাবার জন্য বলত যে, 'অল রাইট, গেট আউট'। এই নিয়ে সমস্ত দেশে একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকত এবং এই সন্দেহটা দূর করা দরকার। এবং দূর করে সকলেই যে এক এবং সকলেই যে দেশকে ভালোবাসে এবং মঙ্গল চায়, এটা প্রমাণ করতে হবে। আমার সমাজের যে সমস্ত গুণী-জ্ঞানী লোক আছেন ও অন্য ধরনের যত লোক আছেন, তাদের নিয়ে আমার একটা 'পুল' করা দরকার। এই পুল আমি করতে পারি, যদি আমি নতুন একটা 'সিস্টেম' চালু করি এবং একটা নতুন দল সৃষ্টি করি-জাতীয় দল, যার মধ্যে একমত, একপথ, একভাব, এক হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়, যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে পার। এজন্য আজকে এটা করতে হয়েছে।

আর দ্বিতীয়ত, পয়সাকড়ি খরচ করে অন্য ধরনের রাজনীতি করা যায়। কিন্তু আমি যেটা বলেছি-শোষিতের গণতন্ত্র কেন বলেছি? শোষিতের গণতন্ত্র এজন্য বলেছি যে, আজকে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসে মানুষ। বঙ্গবন্ধু বলে দিয়েছে, 'অল রাইট', যাও তুমি যেয়ে কনটেস্ট কর। আমি যেয়ে কিছু বক্তৃতা করে দিয়ে আসলাম-যাও। পছন্দ করল না, বঙ্গবন্ধু কইছে, আর করব কি, ভোটটা দিয়েই দিলাম। এ-ও হয়েছে, অনেক জায়গায়-হয়। কাজেই সেজন্য সিস্টেম চেঞ্জ করে বলেছি এই যে, কনস্টিটিউয়েনসিতে চারজন, কি তিনজন, কি দুইজন লোক আছে, তাদের সম্বন্ধে লোকদেরকে বলে দেওয়া হলো, এই তিনজন-চারজন পার্টির লোক আছে তার মধ্যে যাকে আপনারা পছন্দ করেন, ভোট দিন। ফলে ওই জনগণ সুযোগ পেল 'এ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওউন চয়েস'-ভালো লোককে পাঠাবার জন্য। না হলে আমরা অনেক সময় 'জিন্দাবাদ', 'মুর্দাবাদ' দিয়ে পাস করে নিয়ে আসি। তাতে দেখা গেছে যে, সত্যিকারের ভালো লোক অনেক সময় নাও আসতে পারে। কিন্তু এতে সত্যিকারের ভাল লোক আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেজন্য এই সিস্টেম করা হয়েছে। তৃতীয়ত, জাতীয় ঐক্য, যেটা বলেছি আমি, জাতীয় ঐক্য আমরা করতে পারব। আর যারা দেশকে ভালোবাসে না, দেশের সঙ্গে বেঈমানি করল, তাদের সকলকে আমরা ক্ষমা করলাম। স্বাধীনতার সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করল, বেঈমানি করল, রাজাকার হলো, তাদেরও আমরা ক্ষমা করে দিলাম। অন্য দেশে বিপ্লবের পরে এভাবে ক্ষমা করে নাই। একেবারে নির্মূল করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা ক্ষমা করলাম। বললাম যে, ঠিক আছে, তওবা কর, আল্লাহ তোমাদের ঈমান দিক।

তোমরা দেশের কাজ কর, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তাদের মধ্যে একটা গ্রুপ, সেই শত্রু–যে শত্রু আমাদের এখানে ম্যাসাকার করল, তাদের মাধ্যমে লন্ডনে বসে অর্থ খরচ করে বাংলাদেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। তাদের কি অধিকার আছে রাজনীতি করার বাংলাদেশে? ক্ষমা করতে পারি কিন্তু কি অধিকার তাদের আছে বিদেশে বসে বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করার? স্বাধীনতার সঙ্গে শত্রুতা করার? অন্য একটা দেশের প্রভিন্স করবার চেষ্টা করার? বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক অধিকার থাকবে না, থাকতে পারে না। অ্যান্ড উই মাস্ট বি রুথলেস ফর দ্যাট। এ সমস্ত লোককে সন্দেহ হয়। আমরা জানি–পরিষ্কার জানি যে, এ জিনিস হচ্ছে। সেজন্যই আজকে আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। আজকে আমাদের যাদের একমত, একপথ, আজকে তারা, আমরা মিলে এক সঙ্গে, এক ঐক্যে নতুন দলের সৃষ্টি করেছি। নতুন সিস্টেম করেছি। আমাদের দেশে বহুদিনের একটা মেন্টালিটি দেখেছি। কিছু একটা নতুন জিনিস দেখলে আমাদের একটা বাধা আসে। বিপ্লব কাকে বলা হয়? পুরানো রীতি, যেটা দেশের মঙ্গল না করে, সেই রীতি বদলানোর মতো সৎ সাহস থাকা প্রয়োজন। পুরানো আইন, যে আইন দেশের মঙ্গল না করে, সেই আইনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার অধিকার জনগণের রয়েছে। পুরানো মত্ এবং পথ যদি দেশের মঙ্গল করতে না পারে, সেই মত্ এবং পথের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করার অধিকার বাংলাদেশের জনগণের রয়েছে। নতুন বিপ্লব যখন আপনি বলছেন তখন এই বিপ্লবের মাধ্যমে জাতির জন্য একটা নতুন জিনিস নতুন সিস্টেম আপনাকে গড়ে তুলতে হবে। যে সিস্টেম আজকে আমরা দেখি, সেই সিস্টেম ব্রিটিশ কলোনিয়াল সিস্টেম। এতে দেশের মঙ্গল হতে পারে না। এটাতে আমরা কনভিন্সড। ব্রিটিশ যে সিস্টেম করে গিয়েছিল বা যেটা আমাদের দেশে চলছিল অর্থাৎ উপনিবেশবাদীরা দেশকে শোষণ করার জন্য যে সিস্টেম দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে চালু করে গিয়েছিল, সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেই সিস্টেম, সেই আইন, সেই সব কিছু পরিবর্তন করার নামই বিপ্লব। শুধু এজন্যই যে, আমি এক পার্টি করেছি তা নয়। ঘুণেধরা এই শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার আমি করতে চাই। বর্তমানের ঘুণেধরা বিচার পদ্ধতিকে ভেঙেচুরে জনগণ যাতে তাড়াতাড়ি বিচার পায় সে রকম ব্যবস্থা আমি নতুন করে করতে চাই। আমার এই নতুন সিস্টেমই একটা বিপ্লব। সেজন্যই আজকে আমি কারও কথা শুনি নাই। শুনতে আসি নাই। আজকে আপনাদের কাছে বলার জন্য আমি খবরের কাগজেও দেই নাই। কাল আমি অর্ডার দিয়ে এসেছি। গো অন, সিক্সটি ডিসট্রিক্টস। ষাটটি সাবডিভিশন হবে ষাটটি জেলা। প্রত্যেক জেলার জন্যে একজন গভর্নর থাকবেন। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তাঁর অধীনে এসপি থাকবেন, দলের প্রতিনিধিগণ থাকবেন, সংসদ সদস্যরা থাকবেন, জনগণের প্রতিনিধিরা থাকবেন। কাউন্সিলে সরকারি কর্মচারীরাও থাকবেন। প্রত্যেক জেলায় অর্থাৎ বর্তমান মহকুমাসমূহে একটি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল থাকবে এবং তার একজন গভর্নর থাকবে। সে স্থানীয়ভাবে শাসনব্যবস্থা চালাবে। শাসনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জেলা গভর্নরের কাছে যাবে আমার ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা। তার কাছে যাবে আমার খাদ্যসামগ্রী। তার কাছে যাবে আমার টেস্ট রিলিফ, লোন, বিল ও সেচ প্রকল্পের টাকা। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ডাইরেক্ট কনট্রোলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করবে।

তবে ব্রিটিশ আমলারা বলে গিয়েছেন, সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে হবে, এসডিও সাহেব যা করবেন সেটাই হবে ফাইনাল কথা। সিও সাহেব শাসন করবেন থানায় বসে, সেই

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রাখতে হবে? এতে দেশের মঙ্গল হবে না। কারণ, আমি যে টাকা দেব একটা থানায়, সেই টাকা দেব সিও সাহেবকে। এনি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ইজ বেটার দ্যান এনি সিও, ইফ দি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ইজ সিনসিয়্যার। অন্যথায় ক্যাশের টাকা সেখান থেকে লুট হয়ে যাবে, সেজন্য আমি অর্ডার দিয়েছি, আজকে অর্ডার হয়ে গেছে। ১৫ জুলাই থেকে এই ৬০ জন গভর্নরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে। ১ বছরের মধ্যে থানা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল করতে হবে। সেখানে বাকশালের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, কৃষকের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, শ্রমিকের থাকবে, যুবকের থাকবে, মহিলাদের থাকবে। একজন গভর্নর থাকবে, যিনি হবেন হেড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সেখানে মেম্বার অব পার্লামেন্ট গভর্নর হতে পারে, সেখানে পার্লামেন্টর মেম্বার নয় এমন পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হতে পারে, সেখানে সরকারি কর্মচারী যাকে বিশ্বাস করি, সে-ও হতে পারে। আবার নাক উঁচু করা চলবে না। পার্টির মেম্বার হওয়ার পরে দে উইল টেক রেসপনসিবিলিটিজ অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

সোজাসুজি কাজ চালাতে হবে

এই তো গেল একদিক। তবে আমি কাজ বাড়িয়ে দিয়েছি আইনমন্ত্রীর। আমি অর্ডারগুলি করে দিয়েছি, কিন্তু তাঁর জান শেষ। মানে এইগুলি করতে করতে তাঁর জান শেষ হয়ে যাবে। বুঝেছি। শুনে মুখ কালো করে ফেলেছেন। অর্ডার আমি দিয়ে দিয়েছি, আইন তাঁর বদলাতে হবে। আইন-টাইন আমি বুঝি না। আমি বলেছি কাজ করে যান যা কিছু দরকার হয়। এই অ্যাডমিটিস্ট্রেশন, তারপর আমাদের সেক্রেটারিয়েট এসব ভাঙতে হবে। এসব চলতে পারে না। আই অ্যাম গোয়িং ফর দ্যাট। টাকা নাই, পয়সা নাই, খাবার নাই, এটা নাই, ওটা নাই। ভাঙতে হবে। ভাবল, ট্রিপল, অ্যান্ড দ্যাট। এক এক নোট লিখে নিয়ে আসে। আমি বলেছি, এস্টাবলিশমেন্টের সাহেবরা আছেন। এখান থেকে আরম্ভ করে সেকশন অফিসার, তারপর ডেপুটি সেক্রেটারি, সেক্রেটারি তারপর আসে আমার কাছে, এইটুকু নোট, ওই টুকু ফাঁক। প্রয়োজন নাই, সোজাসুজি কাম চালান। করপোরেশন করেছি। অলরেডি দুইটি করপোরেশন করে ফেলেছি। এভরি করপোরেশন ডাইরেক্টলি আন্ডার দি মিনিস্টার থাকবে। লেট দি মিনিস্টার গেট ওয়ার্ক ফ্রম জয়েন্ট সেক্রেটারি। ব্রিটিশ আমলের সেই ঘুণেধরা অ্যাডমিনিস্ট্রেডিভ সিস্টেম দিয়ে বাংলার মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। ইট মাস্ট গো। সে জন্য আমূল পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়েছে। দ্যাট ইজ অলসো এ রেভল্যুশন।

আত্মসমালোচনা চাই

আজকে এই যে, নতুন এবং পুরান যে সমস্ত সিস্টেম-এ আমাদের দেশ চলছে, আমাদের আত্মসমালোচনা প্রয়োজন আছে। আত্মসমালোচনা না করলে অত্মশুদ্ধি করা যায় না। আমরা ভুল করেছিলাম, আমাদের বলতে হয় যে, ভুল করেছি। আমি যদি ভুল করে না শিখি, ভুল করে শিখব না, সে জন্য আমি সবই ভুল করলে আর সকলেই খারাপ কাজ করবে, তা হতে পারে না। আমি ভুল নিশ্চয়ই করব, আমি ফেরেশতা নই, শয়তানও নই, আমি মানুষ, আমি ভুল করবই। আমি ভুল করলে আমার মনে থাকতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে, না, আমি যেটা করেছি, সেটাই ভালো। দ্যাট ক্যান নট বি হিউম্যান বিইং। ফেরেশতা হইনি যে, সবকিছু ভালো হবে। হতে পারে, ভালো হতে পারে। উই উইল রেকটিফাই ইট, এই সিস্টেম ইনট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে, খারাপ হচ্ছে, অল রাইট, রেকটিফাই ইট। কেননা, আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেম-এ আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভ-এ আসতে চাচ্ছি। দিজ

ইউনিয়ন কাউন্সিল ওল্ড ব্রিটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল। যেখানে যা দেওয়া হয় অর্ধেক থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে সাফ। সেজন্য একমাত্র উপায় আছে যে, আমরা যে আজকে মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি, এটা যদি গ্রো করতে পারি, আস্তে আস্তে এবং তাকে যদি আমরা ডিস্ট্রিক্ট এবং থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তা হলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ডেডিকেটেড ওয়ার্কার চাই

এজন্য ডেডিকেটেড ওয়ার্কার দরকার। এটা উইদাউট ডেডিকেটেড ওয়ার্কার হতে পারে না। সেইজন্য আজকে আমি চাচ্ছি-আর্মির মধ্যে হোক, নেভির মধ্যে হোক, এয়ারফোর্স-এর মধ্যে হোক, বিডিআর হোক, রক্ষীবাহিনী হোক, পুলিশ হোক, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হোক, পলিটিশিয়ান হোক, যেখানেই হোক-ভালো লোক যেখানে আছে, তাঁদের এক জায়গায় করে কাজে লাগাতে হবে। যাও, ওখানে বসো, কাজ করে নিয়ে এসো। আমার তো দরকার নেই। খালি খালি বসে আর্মি অত পয়সা খরচ করার তো দরকার নাই। আই ওয়ান্ট মাই আর্মি-এ পিপলস আর্মি। আই ডু নট ওয়ান্ট মাই আর্মি-টু ফাইট এগেইনস্ট এ্যানিবডি। বাট আই ওয়ান্ট মাই আর্মি-টু ডিফেন্ড মাইসেলফ অ্যান্ড এ্যাট দি সেম টাইম টু ওয়ার্ক।

সকল কাজই সকলের

আর একটা ফ্যাশন আছে আমাদের-এই কাজটা তো ফুড ডিপার্টমেন্টের, এটা তো এগরিকালচারের, আমার তো না। এটা তো ইরিগেশনের, আমার তো না। ডিস্ট্রিক্টে, সাবডিভিশনে সব জায়গাতে হয় কি? একজন (আপনার) বড় অফিসার। আমরা যখন চলে যাব-দেখব যে, রাস্তায় একটা ইট পড়ে আছে, ঐটা আমার ডিপার্টমেন্টের না-একথা বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। হোয়াট ইজ দিস? দিজ মেন্টালিটি মাস্ট বি চেঞ্জড। প্রত্যেকটি লোক, প্রত্যেকটি কাজই আমার-মাটি কাটা আমার কাজ, ফ্যাক্টরিও আমার কাজ, রাস্তা বানানোও আমার কাজ। আমি একটা হাই অফিশিয়াল, আমি একটা পলিটিশিয়ান, আমি একটা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, আমি একটা এমপি, আমি দেশের একটা কর্মচারী, আমি একজন পুলিশ অফিসার। আই হ্যাভ মাই রেসপনসিবলিটি। এখানে চুরি হচ্ছে, এখানে অন্যায় হচ্ছে, এখানে খারাপ হচ্ছে-এটা বলার অধিকার আমার থাকবে। দেখার অধিকার থাকবে। সেই জন্য আজকে যদি পলিটিক্যাল অরগানাইজেশন স্ট্রং না করা হয়-ভিলেজ লেভেল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত যাকে ওয়াচ ডগ বলা হয়, তা যদি না থাকে তাহলে দেশের মঙ্গল করা যায় না শুধু সরকারি কর্মচারীর উপর নির্ভর করে। দেয়ার মাস্ট বি এ ব্যালেন্স। দেয়ার মাস্ট বি পিপলস মবিলাইজেশন। হোল কান্ট্রিকে, সমস্ত দেশকে মবিলাইজ করতে হবে ফর ডেফিনিট পারপাস।

সার চুরি

দেখুন, বাংলাদেশের কৃষকও পিছিয়ে নাই। আমি সার দিতে পারি নাই। যা সার দিয়েছি তার থার্টি পারসেন্ট চুরি হয়ে গেছে। স্বীকার করেন? আমি স্বীকার করি। আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না। মিথ্যা বলে একদিনও হারাম এদেশের প্রেসিডেন্ট থাকব না। আমার যে সার আমি দিয়েছি, তার কমপক্ষে থার্টি পারসেন্ট ব্ল্যাক মার্কেটিং-এ চুরি হয়ে গেছে। আমি যে ফুড দেই, তার কুড়ি পারসেন্ট চুরি হয়ে যায়। আমি যে মাল পাঠাই গ্রামে গ্রামে, তার ২০%/২৫% চুরি হয়ে যায়। সব চুরি হয়ে যায়। হুইট-আমি তো হুইট পয়দা করি না, খুব কমই করি। কোন বাজারে হুইট পাওয়া যায় না? গভর্নমেন্ট গোডাউনের হুইট। সার তো আমি ওপেন মার্কেটে বিক্রি করি না, কোন বাজারে সার পাওয়া যায় না? লেট আস ডিসকাস দিস ম্যাটার। দেয়ার শ্যাল বি এ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ডিসকাশন। আমাদের একটি জিনিস মনে রাখা দরকার, যে লোক হাসতে হাসতে জীবনের মায়া কাটিয়ে ফাঁসি পর্যন্ত যেতে পারে, যে জানে, গুলি হয়ে

এক ঘন্টা পর মারা যেতে পারে, সেই মানুষ ক্ষমতার জন্য মিথ্যা কথা বলবে না, এটা আপনাদের জেনে রাখা উচিত। এইগুলো কি করে আপনারা করবেন। এই এগরিকালচার আমার নয়, চুরি হয় হোক। এই ফুড আমার নয়, চুরি হয় হোক। এটা আমার নয়, চুরি হচ্ছে হোক–এসব চলতে পারে না। নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড এগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সিস্টেমকে পরিবর্তন করতে হবে। ঘুণেধরা সিস্টেম দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যায় না। এই সিস্টেম-ই হলো করাপশন-এর পয়দা। এই সিস্টেম করাপশন পয়দা করে এবং করাপশন চলে।

নতুন করে গড়তে হবে

সেই জন্য আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। ভেঙে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারেশনে গিয়েছি। আমি জাম্প করতে চাই না, আমি জাম্প করার মানুষ নই। আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সালে। কিন্তু আমি ২৭ বৎসর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি। আমি জানি, এদের সঙ্গে মানুষ থাকতে পারে না। আমি ইম্পেশেন্ট হই না, আমি অ্যাডভেনচারিস্ট নই। আমি খোদাকে হাজির নাজির জেনে কাজ করি, চুপি চুপি, আস্তে আস্তে মুভ করি, সব কিছু নিয়ে। সেই জন্য আমি বলে দিয়েছি ৬০টা থেকে ৭৫ কি ১০০ টা কো-অপারেটিভ করব। এই কো-অপারেটিভ-এ যদি দরকার হয়, সেন্ট্রাল কমিটির এক-একজন মেম্বার এক-একটার চার্জে থাকবেন। লেট আস স্টার্ট আওয়ারসেলভস। ১১৫ জন সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার আছেন। এর মধ্যে ১০০ কি ৭০ জনকে এক-একটা কো-অপারেটিভ-এর চার্জ দিয়ে দেব সুপারভাইজিং অফিসার করে। লেট আস স্টার্ট। ওয়ান্স উই আর সাকসেসফুল এবাউট দিস মালটিপারপাস সোসাইট, যেখানে দেশের মানুষকে একতাবদ্ধ করা যাবে। বদমায়েশ একদল লোক–জমি সব শেখ সাহেব নিয়ে যাবে বলে তারা প্রপাগাণ্ডা করে। জমি নেব না, তোমরা চেষ্টা করবে, এক সঙ্গে ফসল উৎপাদন করবে। তোমার শেয়ার তুমি নিবে। কিন্তু তবু এগেইনস্টে প্রপাগাণ্ডা করে, জমি নেব না, জমি থাকবে। কিন্তু জমির একটা লিমিট আছে তোমাদের রাখার। আইন হয়েছে ১০০ বিঘার বেশি রাখতে পারবে না। সেটা আমরা ফলো করার চেষ্টা করব। এবং আস্তে আস্তে যদি ফ্রাড বন্ধ করতে পারি, সেচের ব্যবস্থা করতে পারি, ফার্টিলাইজার দিতে পারি, নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করব, আরও কতদূর কী করতে পারি। কেননা, আমার দেশের জমির মধ্যে পার্থক্য আছে। এখন আমি যদি সুনামগঞ্জের জমি–যেখানে ৩ বৎসর বন্যা হয়, এক বৎসর ফসল হয়, নর্থ বেঙ্গলের জমি আর বরিশালের জমি, আর চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-এর জমি, আর অন্য সব জমি যদি এক পর্যায়ে দেখতে চাই, তাহলে অসুবিধা আছে। আমার 'স্টাডি' প্রয়োজন আছে যে, কোন জায়গায় কত পরিমাণ ফসল হতে পারে।

আজকে কো-অপারেটিভ যদি আমরা করতে পারি, সেখানে যদি ফার্টিলাইজার দিতে পারি, রেশন কার্ড দিতে পারি, তাহলে সেখানে চুরিটা কম হবে। সেখানে যদি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা দিতে পারি, চুরিটা কম হবে। একটা সিস্টেমের মধ্যে আসতে পারি। চীৎকার করে, গালাগালি করে কাজ হবে না।

মেম্বার বেছে নিতে হবে

এই যে পলিটিক্যাল পার্টি–একটা খুব ইমপরট্যান্ট জিনিস। এর মেম্বারশিপ ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না। মেম্বার বেছে বেছে নিতে হবে। গলায় সাইনবোর্ড লাগিয়ে বলবে–আমি মেম্বার, আমাকে একটা পারমিট দাও, সেটি হবে না। মেম্বার যে হবে, তার একটা কার্ড থাকবে। প্রাইমারি মেম্বার থাকবে অনেকে। এছাড়া আমি আপনাদের বর্তমান মেম্বার করে দিয়েছি। আপনাদের জন্য কৃষক, লেবার অর্গানাইজেশন হচ্ছে। লেবার পলিসি করতে হবে,

প্ল্যান করতে হবে। কোন ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় থাকবে না। এই আমার আছে, এই তোমার ডেভেলপমেন্ট, এই ইনকাম করতে পারলে এই তোমরা পাবে। দিতে চাই আমি তোমাদের লাভের জন্য। ওদেরও দিতে হবে। তোমরা মানুষের মতো বাস করবে। তাদের দিতে হবে, যাতে কৃষক কৃষকের মতো বাস করতে পারে। ছাত্র লেখাপড়া করবে নতুন সিস্টেমে। আমরা একটা নতুন এডুকেশন সিস্টেম করতে বলেছি। কেরানি পয়দা করে লাভ হবে না, মানুষ পয়দা করতে হবে। নতুন এডুকেশন সিস্টেম করতে পারি কিনা, আমরা তা দেখছি। দেশের সার্বিক অবস্থা ইমপ্রুভ করতে সময় লাগবে। তিন বছর, সাড়ে তিন বছর একটা দেশের জীবনে কিছুই না। আমাদের ইকনমিক কন্ডিশন ভালো না। আমাদের মাল বিদেশ থেকে বেশি আনতে হয়। ফাইন্যান্স মিনিস্টার সাহেব, কমিটি করতে গেলে আমার কলম ধরে বসেন। মহাবিপদ আমাকে নিয়ে। টাকা পাওয়া যাবে না।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

দেশের ট্যাক্স, জাতীয় আয় বাড়াতে পারলে দেশের আয়ও বাড়ে। ইনশাল্লাহ, আমরা কতকগুলি স্টেপ নিয়েছি–ইকনমিক স্টেপ। তাতে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আমরা যে একটা ভীষণ খারাপ অবস্থায় পড়েছিলাম গত বছর, ইনশাল্লাহ, আমরা অতখানি খারাপ অবস্থায় এ বছর নাই। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি এখন এখানে বেশি কিছু বলতে চাই না। ফাইন্যান্স মিনিস্টার এ মাসের ২৩ তারিখে পার্লামেন্টে বক্তৃতা করবেন। তিনি সেদিন বলবেন। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, আমাদের ইকনমিক কন্ডিশন ইজ নট সো ব্যাড অ্যান্ড ইট উইল ইমপ্রুভ ডে বাই ডে। কারণ, দেশের মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসছে, তারা কাজ করছে। ফ্যাক্টরিতে কাজ হচ্ছে, কৃষক ভাইরা সবাই কাজে অ্যাডভান্স করেছে, দেশের মানুষও এগিয়ে এসেছে। ইনশাল্লাহ, আই সি এ ব্রাইট ফিউচার অব মাই কান্ট্রি। তবে, এখানে যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আমরা বলেছি, সে অর্থনীতি আমাদের, সে ব্যবস্থা আমাদের, কোন জায়গা থেকে 'হায়ার' করে এনে, ইমপোর্ট করে এনে, কোন 'ইজম' চলে না, এদেশে-কোন দেশে চলে না। আমার মাটির সঙ্গে, আমার মানুষের সঙ্গে, আমার কালচার-এর সঙ্গে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে, আমার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই আমার ইকনমিক সিস্টেম গড়তে হবে। কারণ, আমার দেশে অনেক অসুবিধে আছে। কারণ, আমার মাটি কি, আমার পানি কত, আমার এখানে মানুষের কালচার কি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি, তা না জানলে হয় না। ফান্ডামেন্টালি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে চাই। বাট দি সিস্টেম ইজ আওয়ার্স। উই ডু নট লাইক টু ইমপেটি ইট ফ্রম এ্যানিহোয়্যার ইন দি ওয়ার্লড। এটা আমার মত, পার্টির মত।

হটবেড অব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স

আমরা কারোর বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে চাই না। আমাদের একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে যে, এ ওর বিরুদ্ধে গালাগালি করে, ও অন্য একজনের বিরুদ্ধে গালাগালি করে। বাংলাদেশের মাটিতে যেন একটা হটবেড অব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স হয়ে গেছে। এ ওরে গালাগালি করে, ও ওরে গালাগালি করে, আমার মাটিতে বসে গালাগালি দরকার কি বাবা। যার যার দেশে গিয়ে গালাগালি কর। একটা ডিপ্লোম্যাটিক ডেকোরাম আছে। এক দেশে দাঁড়িয়ে অন্য দেশের বিরুদ্ধে কথা বলা চলে না। আমার দেশে তোমার কি ভালো, সেটা বলো।

আই বিলিভ ইন পজিটিভ অ্যাপ্রোচ, নট এ নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। সেজন্য আমার পার্টিতে যারা আপনারা আছেন, আসুন, আমরা পজিটিভ অ্যাপ্রোচ নেই। আমি যখন খুব ইয়ং ছিলাম, আমার নেতা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে কেউ গালাগালি করলে আমি রাগ করে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি হেসে বলতেন, "থাক, বলতে দাও, ওতে কি হবে?" উনি আমাকে বলেছেন,

"থিংক ফর এ পজিটিভ অ্যাপ্রোচ, দ্যান এ নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ" আমার লাইফকে আমি ওই দৃষ্টিতেই দেখেছি।

যখন আমি ছয়-দফা দিলাম, আমার বিরুদ্ধে যখন আরম্ভ করল সকলে মিলে, আমি কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কোন কথা বললাম না। আমি চলে গেলাম দেশের মানুষের কাছে। গিয়ে ছয়-দফার প্রচার আরম্ভ করে দিলাম। আমি যখন পার্টি রিভাইভ করলাম, আমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা হলো। কিন্তু আমরা চলে গেলাম পিপলের কাছে। পিপল আমাকে গ্রহণ করে নিল। কাউকে গালাগালি করে লাভ নেই।

আমি বিশ্বাস করি, কম্বোডিয়া, আই শুড রিকগনাইজ ইট। আই ডোন্ট কেয়ার এনিবডি ইন দি ওয়ার্লড হোয়েদার এনিবডি ইজ স্যাটিসফায়েড অর এনিবডি ইজ আনহ্যাপি অর এনিবডি ইজ হ্যাপি। আই ফিল দ্যাট দে আর ফাইটিং ফর দেয়ার ওউন লিবার্টি। আই অ্যাম উইথ দেম। আই সাপোর্ট পিআরজি। আই গিভ দেম রিকগনিশন বিকজ আই অ্যাম এ সাফারার। আই অ্যাম এ সাফারার ফর জেনারেশন টু জেনারেশন ফর দিস বেঙ্গলি নেশন। আমার কাছে–যে যুদ্ধ করছে তার মাতৃভূমির জন্য, তাকে সমর্থন দেব। তাই বলে আমি অন্যকে গালাগালি করব না। এই জিনিসটি আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব।

শোষণহীন সমাজ গঠনের পথ

আজকে আপনারা মনে রাখবেন যে, নতুন আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি কর্মচারী, পলিটিশিয়ান, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ডক্টরস, ইঞ্জিনিয়ারস, যদ্দুর সম্ভবপর এদের রাখার চেষ্টা করেছি। পলিটিশিয়ানদের মধ্যে অনেক এক্সপিরিয়েন্সড-আমার পুরানো বন্ধুরা আছেন, যাঁরা আগে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কিছুদিন ডিফারেন্ট পার্টি করেছেন। আগে আমরা এক জায়গায়ই ছিলাম। মধ্যে ভাগ হয়ে গেলাম–এটা সব জায়গায় হয়। আবার আমরা এক হয়েছি। সেকেন্ড রেভল্যুশন ইজ নট দি এনড্। সেকেন্ড রেভল্যুশন যে করেছি আমি, চারটা প্রোগ্রাম দিয়েছি, এটাই শেষ নয়। শেষ কথা নয়, এটা হলো স্টেপ। ডেভেলপমেন্ট, মোর প্রডাকশন, ফাইট এগেইনস্ট করাপশন, ন্যাশনাল ইউনিটি অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এগুলো করলেই আমরা একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে পারব–যেখানে মানুষ সুখে-স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারবে। এটাই হলো আমার সেকেন্ড রেভল্যুশনের মূল কথা–এ জন্যই আমি সেকেন্ড রেভল্যুশনের ডাক দিয়েছি।

আজ আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, আমার বহু সহকর্মী–যাঁদের সঙ্গে আমি দুর্দিনে কাজ করেছি, বিপদের দিনে কাজ করেছি, '৪৭, '৪৮, '৪৯ সালে–তাঁরা আজকে এখানে এসেছেন। মাঝখানে এদিক-ওদিক ছুটে টুটে গিয়েছিলাম অনেকে। ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন-এর জন্য। আজকে আমরা আবার এক হয়েছি–সরকারি কর্মচারীরা এক হয়েছি। আজকে সকলে মিলে, যার যার যা কর্তব্য আছে, সেই সঙ্গে করাপশন-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সারা বাংলাদেশের টুয়েনটি থেকে থার্টি পারসেন্ট দুঃখ দূর হয়ে যাবে যদি করাপশন বন্ধ করতে পারি। থার্টি পারসেন্টি দুঃখ দূর হয়ে যাবে মানুষের। এজন্য লেট আস টেক ওথ টুডে। যে নিজেরা আমরা করাপট প্র্যাকটিস করি, তাই আবার অন্য কেউ করলে আমরা সহ্য করি না। উই মাস্ট মবিলাইজ দি পিপল এগেইনস্ট করাপশন। এটা যদি করতে পারি, দেখবেন অনেক প্রবলেম আমরা সল্‌ভ করতে পারব। এ জন্যই আজকে আমাদের মবিলাইজ করতে হবে পিপলকে–আমাদের সোশ্যালি বয়কট করতে হবে যে লোকটা ঘুষ খায়, তাকে। সোশ্যালি বয়কট করতে হবে যে লোকটার মাইনে হাজার টাকা, কিন্তু সে ব্যয় করে পাঁচ হাজার টাকা, তাকে। যে লোকটার ইনকাম তিন হাজার টাকা, কেমন করে সে ব্যয় করে পনের হাজার টাকা? এই যে জিনিসটা সমাজের কাছে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে এবং তাহলেই সমাজ তথা পিপলের আপনাদের ওপর আস্থা ফিরে আসবে।

আমি মাঝে মাঝে আল্লার কাছে বলি যে কি, গেছি চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম থেকে গেছি সেখানে (বেতবুনিয়া)। সে গ্রামের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক দুইপাশে বসে আছেন, এরা এসেছে আমাকে দেখার জন্য-মনে মনে আমি বলি যে, আমি কি করেছি ওঁদের জন্যে? আমার দুঃখ হয়, স্টিল দে লাভ মি। দুনিয়ার নিয়মই ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসতে হয়। এবং সে ভালোবাসা সিনসিয়ারলি হওয়া দরকার। তার মধ্যে যেন কোন খুঁত না থাকে। ইফ ইউ ক্যান লাভ সামবডি সিনসিয়ারলি, ইউ উইল গেট দি লাভ অব সামবডি। দেয়ার ইজ নো ডাউট এবাউট ইট। আমার জীবনে আমি দেখেছি, লাখ লাখ লোক দুপাশ দিয়ে কি অবস্থার মধ্যে–আমি তো কল্পনাও করতে পারি না। হোয়াই দে লাভ মি সো মাচ? আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি, মবিলাইজ দি পিপল অ্যান্ড ডু গুড টু দি হিউম্যান বিইংস অব বাংলাদেশ। দিজ আনফরচুনেট পিপল হ্যাভ সাফার্ড লং-জেনারেশন আফটার জেনারেশন। এদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটতে হবে, এদের খাবার দিতে হবে।

যদি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে পারি, যদি করাপশন বন্ধ করতে পারি, আমি বিশ্বাস করি, ইনশাআল্লাহ, বাংলার মাটিতে যা এখনো আছে, ৭ কোটি লোক হলেও বাংলার মানুষ না খেয়ে মরতে পারে না। আই হ্যাভ সিন দ্যাট। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। কারণ, আই হ্যাভ বিকাম ইমোশনাল। আগস্ট মাসে আমি আপনাদের সভা ডাকছি উইথ ডেফিনিট এজেন্ডা। ফুড, এগরিকালচার, ইনডাস্ট্রি, এডুকেশন, কো-অপারেটিভ, সমস্ত প্রোগ্রাম দিয়ে তারপর আমি আপনাদের এই হাউসটাকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে দিচ্ছি। আপনারা ডিভাইড হয়ে যাবেন, সবকিছু ডিভাইড হয়ে গেলে তখন এই কমিটিতে বা গ্রুপে সেক্রেটারিয়েট থেকে লোক আসবে, গভর্নমেন্ট থেকে লোক আসবে, ডিপার্টমেন্ট থেকে আসবে, পলিটিক্যাল ওয়ার্কার আসবে, সমস্ত ফ্যাকট্স ফিগার নিয়ে। এই জায়গাতে কোথায় ডিফেক্ট হয়েছে, কোন জায়গাতে ইমপ্রুভ করতে পারি, সে-সম্পর্কে আপনারা একটা সাজেশন দিবেন। তখন কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট সুপারিশ পেশ করবে এবং ওই কমিটি সরকারকে এটা কার্যকরী করতে অনুরোধ করবে।

আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম। বেয়াদবি মাফ করবেন। লেট আস ওয়ার্ক টুগেদার। উই আর নাউ ওয়ান পার্টি। পার্টি মানে কি জানেন? এভরি পার্টি ওয়ার্কার অব মাইন ইজ লাইক মাই ব্রাদার, ইজ লাইক মাই সন। আই ক্রিয়েটেড এ ফ্যামিলি হোয়েন আই অরগ্যানাইজড আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে আমি যাই নি। আর পলিটিক্যাল পার্টি মিনস এ ফ্যামিলি–যার মধ্যে আছে আইডিওলজিক্যাল অ্যাফিনিটি। সেজন্য এই পার্টিতে উই আর ওয়ান ফর সাম পার্টিকুলার পারপাসেস, হোয়্যারেভার উই আর। আমাদের আদর্শ হলো, বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা, বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা এবং যেখানে অত্যাচার–অবিচার–জুলুম থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না। লেট আস অল ট্রাই ফর দ্যাট। আসুন, আমরা চেষ্টা করি সে সম্পর্কে সকলে মিলে।

আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, শুক্রবার, ২০ ও শনিবার, ২১ জুন ১৯৭৫

পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু

উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিক কল্যাণে ব্রতী হন

গণভবন, ঢাকা, ১১ জুলাই ১৯৭৫

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকদের কল্যাণ এবং কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার কাজে নিয়োজিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি নির্ভর করছে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজন উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্যে কলে-কারখনায় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে শ্রমিকদের উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে তোলার জন্যে বঙ্গবন্ধু শ্রমিক লীগ নেতৃবর্গের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল (শুক্রবার) অপরাহ্নে জাতীয় শ্রমিক লীগ কমিটির সদস্যগণ গণভবনে তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হলে বঙ্গবন্ধু তাদের প্রতি এই আহ্বান জানান বলে বাসস'র এ খবরে উল্লেখ করা হয়। জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর নেতৃত্বে জাতীয় শ্রমিক লীগ কমিটির সদস্যবর্গ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, জাতীয় দলের সেক্রেটারি শেখ ফজলুল হক মণিও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি জাতীয় শ্রমিক লীগ নেতৃবৃন্দকে বলেন, পরিবর্তিত অবস্থার পরিপেক্ষিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাদের আগেকার নীতি বদলাতে হবে।

বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন যে, আগে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে এবং পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে শ্রমিকদের রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করতে হতো। কিন্তু বর্তমানে সমাজে মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। আর এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে শ্রমিকদের কল্যাণ এবং কলে-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধানে নিয়োজিত করতে হবে। কেননা, জনগণের কল্যাণ ও দেশের অগ্রগতি- এসবই একান্তভাবে উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

জাতীয় শ্রমিক লীগ নেতৃবর্গকে রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, ধর্মঘট ও হরতাল করার মতো উৎপাদন বিঘ্নিত করার তৎপরতাগুলি বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একেবারেই অচল। যেহেতু আমরা আজ এক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও তাদের পুরাতন নীতি বদলাতে হবে এবং উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, অতীতে মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতি মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলার জন্যে শ্রমিকদের ব্যবহার করত।

কিন্তু বর্তমানে শ্রমিকদের শ্রমবিক্রি হয় না, এখন শ্রমিকদের শ্রম নিয়োজিত হয় জনগণের কল্যাণ ও দেশের উন্নয়নের জন্যে।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্যে একটি কর্মসূচি তৈরি করতে রাষ্ট্রপতি জাতীয় শ্রমিক লীগের নেতৃবর্গের প্রতি নির্দেশ দেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, শ্রম পরিদপ্তর কষাকষির জন্যে নয়। শ্রম পরিদপ্তর রয়েছে শ্রমিকদের আইনসঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে।

সূত্র : দৈনিক বাংলা, শনিবার, ১২ জুলাই ১৯৭৫

প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রতি বঙ্গবন্ধু

প্রশাসন ও জনগণের মধ্যকার শূন্যতা দূর করতেই এ ব্যবস্থা নয়া ব্যবস্থার সুফল জনগণক পৌছে দিতে হবে

দরবার হল, বঙ্গভবন, ঢাকা, ২১ জুলাই ১৯৭৫

জাতির জনক, জাতীয় দলের চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গভবনের দরবার হলে ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই সোমবার সকালে নবনিযুক্ত ৬১ জন গভর্নরের ২১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জাতীয় দলের সেক্রেটারি জেনারেল প্রধানমন্ত্রী জনাব এম মনসুর আলী, জাতীয় সংসদের স্পিকার জনাব আবদুল মালেক উকিল, জাতীয় দলের তিন সেক্রেটারি, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ ও প্রতিমন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

কি উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এসেছেন, সকলেই জানেন। তবু আমি আরও দুই-একটা কথা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। কারণ, আপনারা যাঁরা নবনিযুক্ত গভর্নর হয়েছেন, তাঁদের প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ প্রশিক্ষণ হবে এবং নানা বিষয়ে তাঁদের শিখতে হবে, জানতে হবে। যাঁরা আমার সহকর্মী আছেন বহুদিন পর্যন্ত, তাঁরা জানেন যে, স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে বারবার আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখেছি যে, প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন দরকার। যে কোন কারণেই হোক, ইংরেজ যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল, সেটা শাসন করার জন্যই কায়েম করেছিল বা শোষণ করার জন্যই কায়েম করেছিল। কিন্তু আমরা যারা স্বাধীনতা পেলাম, আমাদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। বহুদিন পর্যন্ত পুরানা আমলের মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করেছি। যে ট্রেনিং আমরা আগে পেয়েছি, সেটা পুরনো ঘুণেধরা সিস্টেম ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনারা আজ জনগণের শাসক নন, আজ আমরা স্বাধীনতা এনেছি বা আজকে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম সরকার পরিচালনা করছি–আমরা এদেশের শাসক নই, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা এদেশের সেবক, মনে রাখতে হবে। এবং জনগণের সেবার জন্যই আমরা নির্বাচিত হয়েছি এবং তাঁদের সেবার জন্যই আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

জনগণের সাথে যোগাযোগ চাই

আপনারা যাঁরা বহুদিন পর্যন্ত এদেশের শাসনের সঙ্গে বা প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত আছেন, তারা দেখেছেন–অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, কাজের মাধ্যমে দেখেছেন যে, জনগণ থেকে আমাদের শাসন কাঠামো অনেকটা বিচ্ছিন্ন, প্রকৃত যোগাযোগ এদের সঙ্গে অতটা নয়। যারাই আমরা সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করতে গিয়েছি, তারাই তখন মুরুব্বিয়ানাভাব দেখিয়েছি, আমরাই হলাম মালিক, তোমরা আমার গোলাম। তোমরা এসে আমার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাক, আমার হুকুম নেও, আমার হুকুম মতো চল, আমার হুকুম মতো কাজ কর, এই ছিল মনোভাব। কোন স্বাধীন দেশে এই মনোভাব চলতে পারে না–তাতে দেশের মঙ্গল হয় না; তাতে দেশের অমঙ্গল টেনে আনা হয়। এটা বিস্তারিত আলোচনা না করলেও আপনারা বুঝতে পারবেন, কারণ, বক্তৃতা করে বুঝাবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনারা বহুদিন পর্যন্ত এই প্রশাসনযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত আছেন এবং বহুদিন পর্যন্ত আপনারা রাজনীতি করছেন সেজন্য আমি আপনাদের বুঝাতে চাই না। কিন্তু এই চিন্তাধারা আমার ও আমার সহকর্মীদের মনে ছিল যে, এ আমূল পরিবর্তন করা দরকার।

দুনিয়ার অনেক দেশে দেখেছি– কোথায়ও প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার-তাদের এক রকম চলে, কোথায়ও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার–তাদের এক রকম চলে, কোথায়ও আছে মিক্সড পদ্ধতির সরকার–তাদের অন্য রকম চলে, কিন্তু আমার বাংলাদেশের যে সমস্যা এবং বাংলাদেশের যে অবস্থা, তাতে সম্পূর্ণরূপে ভাড়া করে কোনটা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি থাকতে হবে। কারণ, আমার মানুষকে আমার চিনতে হবে, মানুষকে জানতে হবে, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের মনোভাব জানতে হবে, তাদের ইতিহাস, তাদের যা কিছু আছে, তাদের সংস্কার অনেক কিছুই এদেশের মানুষের আছে, তাকে বিবেচনা করে একটা পন্থা অবলম্বন করা দরকার। তাই বহুদিন চিন্তা ভাবনা করে দেখা গেল যে, এমন একটা পরিবর্তন করা দরকার যার উদ্দেশ্য হলো এদেশের মানুষের মঙ্গল করা, এদেশের মানুষের উপর থেকে অত্যাচার, অবিচার ও জুলুম উৎখাত করা। যাতে সহজ এবং সরলভাবে মানুষের মধ্যে সোজাসুজি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পৌছিয়ে দেওয়া যায়।

নতুন পদ্ধতি

সেটা কেমন? আজকে যে সিস্টেমটা করা হয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে নাই যে, পার্লামেন্টের মেম্বাররা বা সংসদ সদস্যরা এই রকমভাবে লোকালি শাসন পরিচালনা করেন। এই পদ্ধতিতে এ্যাপয়েন্টেড গভর্নর, এ্যাপয়ন্টেড ম্যাজিস্ট্রেট আছে। অনেক কিছু এইভাবে নাই যা আমরা এখানে দিয়েছি। এটা একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট। এর উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের জনগণের মঙ্গল এবং যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছি, এতে কতটা কৃতকার্যতা লাভ করতে পারব।

আজ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, সেটা পরিষ্কার করে বলা যাক। আজ যে একষট্টিটি জেলা করা হল, দেখতে হবে যে বাংলাদেশের কমিউনিকেশন সিস্টেম এত খারাপ, বোধ হয় দুনিয়ার আর কোথাও এই রকম কমিউনিকেশন সিস্টেম খারাপ নাই, একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পয়ত্রিশ লক্ষ, চল্লিশ লক্ষ, পঞ্চাশ লক্ষ, ষাট লক্ষ লোকের উপর বসে থেকে তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না, শত চেষ্টা করলেও, সুচারুরূপে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। আজ দুনিয়ার অনেক দেশে দেখা গেছে যে, সে দেশের লোক সংখ্যা এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ, ২০ লক্ষ বা পঁচিশ লক্ষ। আমার এমন নতুন ডিস্ট্রিক্টও আছে, যার লোক সংখ্যা তাদের থেকে বেশি । আমার মনে হয় ময়মনসিংহ সদর নামে যে ডিস্ট্রিক্ট করেছি, তার লোক সংখ্যা বোধ হয় ৩০ লক্ষের কম নয়। অনেক ডিস্টিক্ট আছে, কিশোরগঞ্জ বলেন, মাদারীপুর বলেন, নেত্রকোনা বলেন, চাঁদপুর বলেন, এমনি অনেক জেলায় পনের লক্ষ, বিশ লক্ষ, পঁচিশ লক্ষ পর্যন্ত লোকসংখ্যা রয়েছে। তারা কেমন করে সে রকম সুযোগ পাবে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের তেমন সুযোগ কোথায় যে, চল্লিশ লক্ষ, পঞ্চাশ লক্ষ, ষাট লক্ষ লোকের একটা প্রশাসন একটা জেলায় বসে কেমন করে সুপারভাইস করবে? কেমন করে দেখবে কোন্ ইউনিয়নের মধ্যে কি হচ্ছে? কিসের মধ্যে কি হচ্ছে?

আরও একটি ডিফিকালটি হয় যে, অনেক সময় দেখা যায় আমাদের সরকারি কর্মচারীদের যখন বদলি করে দেওয়া হয়, তখন তাঁরা ডিস্ট্রিক্ট-এ যান ও থাকেন। তারা যখন দরকার পড়ল, পছন্দ হলো বা না হলো, ভালো কাজ করলে সুনাম নিয়ে চলে আসেন, আর খারাপ কাজ করলেও সোজা চলে আসেন। কারণ, ভবিষ্যতে তাঁদের আর সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। সেজন্য আজ একটা বিরাট কিছু চিন্তা করতে হবে। স্থানীয় এমপি সাহেবরা, রাজনীতিবিদদের আমি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় গভর্নর এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। তাদের বিশেষ করে অনেক বেশি দায়িত্ব। কারণ, আমরা বুঝি, লোকালি নিজেদের মধ্যে দলাদলি থাকে, একজন আর একজনকে পছন্দ করেন, একজন আর একজনকে পছন্দ করেন না।

এছাড়া নিজের পার্টি আগে ছিল, অন্যদলেও সেটা থাকে, নানারকম জিনিস আছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থাকে, কুটুম্বস্বাক্ষাৎ থাকে, বড় ভীষণ ব্যাপার। যদি আপনারা এ সমস্ত জিনিসের উর্ধ্বে না উঠতে পারেন, তাহলে যে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার কি অবস্থা হবে, তা বলতে, তা ভাবতে আমার ভয় হয়। আপনাদের স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠতে হবে।

গভর্নরের ক্ষমতা ও প্রশাসন

গভর্নরশিপ-এর যে ক্ষমতা আমরা আইনে দিয়েছি, তা কম নয়। সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জেলার আমরা কানেকশন রাখতে চাই। তেমনি সরাসরি জেলার সঙ্গে থানার, থানার সঙ্গে ইউনিয়নের কানেকশন রাখতে হবে। এখন আপনারা চিন্তা করে দেখেন, যে যে ক্ষমতা আইনে গভর্নরদের দেওয়া হয়েছে, এ ক্ষমতা আগে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্টেটও ভোগ করেন নাই। তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আপনাদের দেওয়া হয়েছে। আপনাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিল করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পার্টি থাকবে। পার্টির যে সেক্রেটারি থাকবে আপনার চেয়ে তার ক্ষমতা কোন অংশে কম থাকবে না। এক দিকে আপনি যেমন রেসপনসিবল ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তেমনি পার্টির যিনি সেক্রেটারি থাকবেন, তিনিও রেসপনসিবল সমস্ত পার্টির জন্য। যখন গভর্নর সাহেব কাউন্সিল মিটিং কল করবে, তখন নিশ্চয়ই সেক্রেটারি সেখানে উপস্থিত হবে। আবার, যখন সেক্রেটারি সাহেব পার্টি মিটিং কল করবেন, তখন গভর্নর সাহেব তার সামনে গিয়ে বসবেন। এটা ভুললে চলবে না।

কিন্তু যে-কথা আমি আগে বলছিলাম যে, আপনাদের মহাবিপদ, বিশেষ করে, যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার বা লোকাল লিডার যাঁরা গভর্নর হয়েছেন তাঁদের রেসপনসিবিলিটি কতখানি, তা আপনারা ভেবে দেখবেন। আমি আমার বিবেকমত সকলের সঙ্গে পরামর্শ করি। যাঁদের গভর্নর করেছি, যাঁরা আমার সঙ্গে বহুদিন রাজনীতি করেছেন, তাঁদের আমি চিনি এবং তাঁদের উপর বিশ্বাস এবং আস্থা আছে বলেই আমি তাঁদের গভর্নর করেছি। কিন্তু বিশ্বাস এবং আস্থা আপনাদেরও রাখার কর্তব্য রয়েছে। আমার বিশ্বাস এবং আস্থা আপনাদের উপর রেখেছি। সেই জন্যে আপনাদের গভর্নর করেছি। পার্লামেন্টের মেম্বার, আপনাদের কাজ অ্যাসেমব্লিতে আইন পাস করে বাড়ি যাবেন, দেখবেন, শুনবেন। কিন্তু এখানে আপনাদের রেসপনসিবিলিটি দিয়েছি। কারণ, দেখা যায় যে, বাংলার জনগণ পার্লামেন্টের মেম্বারদের ভোট দেয় যে, তাঁরা সব কাজ করে দিবেন। কিন্তু তাঁদের রেসপনসিবিলিটি এমন কিছু নাই, আইন পাস করা ছাড়া। কিন্তু লায়াবিলিটি তাঁদের বেশি, গালাগালি তাঁদের খেতে হয়, কিন্তু শাসন তাঁরা চালাতে পারেন না। সেই জন্যই নতুন সিসটেম-এ যাচ্ছি আমি। আপনারা রেসপনসিবিলিটি নেন, আপনারা আইনও পাস করেন, মাঠে ময়দানে কাজ করলে বুঝতে পারবেন।

গভর্নরের দায়িত্ব

এখানে একটা কথা বলব, আপনাদের কেউ কেউ এমন জেলায় গভর্নর হয়েছেন, যেখানে আপনাদের নিজেদের বাড়ি-ঘর, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, নিজেদের পার্টি রয়েছে তাঁরা সাবধান। স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠতে হবে, দুর্নীতির উর্ধ্বে উঠতে হবে, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করার উর্ধ্বে উঠতে হবে। একটা রিস্ক আছে, আপনাদের যাঁরা পার্লামেন্ট মেম্বার আছেন, সবচেয়ে বড় রিস্ক আপনাদের। সেটা কি জানেন? যদি আপনারা কৃতকার্য না হতে পারেন, যদি মানুষ আপনাকে ভালো না বাসে, মানুষকে যদি খুশি করতে না পারেন তাহলে অসুবিধায় পড়বেন। পার্লামেন্টের মেম্বাররা আগে ছাড়া পেতে পারতেন, কোন রকমে লুকিয়ে রাখতে পারতেন আগে, কিন্তু এবার সুদে-আসলে দুটোই যাবার সম্ভাবনা আছে। গভর্নর

সাহেবদের ভয় থাকা দরকার। চার্জ দেওয়া হয়েছে যে, গভর্নর সাহেবরা যেয়ে কাজ করুন– ল অ্যান্ড অর্ডার আপনাদের দেখতে হবে। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক আপনাদের দেখতে হবে। জিনিসপত্র বিদেশ থেকে যা আসে, তা ডিস্ট্রিবিউশন ঠিকমত হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা আপনাদের দেখতে হবে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং আপনাদের দেখতে হবে, পাবলিসিটি আপনাদের দেখতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে, খাল কাটা হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে, ঘুষ খাওয়া বন্ধ হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে, থানার মধ্যে করাপশন আছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। আপনার সঙ্গে থাকবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, আপনার সঙ্গে থাকবে এসপি, আপনাদের সঙ্গে থাকবে জয়েন্ট এসপি (ক্রাইম), আপনাদের সঙ্গে থাকবে সমস্ত অফিসাররা, আপনাদের সঙ্গে থাকবে রাজনৈতিক কর্মীরা। আপনাদের একটি কাউন্সিল হবে। কাউন্সিলকে আপনাদের কনফিডেন্স-এ নিতে হবে। কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে নিজে সবসময় ডিক্টেটরশিপ করতে যাবেন না। কাউন্সিল ডেকে তাঁদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

কিন্তু আজকে মেম্বার সাহেবদের বড় ভয় হলো এই বাংলাদেশের জনগণ সাংঘাতিক রি-অ্যাক্ট করে, এটা মনে রাখবেন। সারাজীবন সাধনা করবেন, একটা অন্যায় করবেন, মুছে যাবেন বাংলাদেশ থেকে। এইটেই বাংলাদেশের নিয়ম। সারা জীবন সাধনা করবেন, একটা অন্যায় করবেন, বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের মুছে দেবেন। সেজন্য আপনারা যাঁরা যেখানে লোকালি থাকবেন, সেখানে পারমানেন্টলি থাকতে হবে, কাজ করতে হবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে হবে। দেখতে হবে, যে নতুন জিনিস আমরা করতে যাচ্ছি, তাতে আমরা সাকসেসফুল হতে পারি কিনা। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ, এ ব্রিজ বিটুইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট অ্যান্ড সাউথ-ইস্ট এশিয়া। অন্যান্য দেশ যত বড়ই হোক না কেন, ভবিষ্যতে তারা আমাদের ফলো করবে, যদি আমাদের সিস্টেম সাকসেসফুল হয়, এটা মনে রাখা দরকার। আর যদি না হয়, ইতিহাস থেকে আপনারা মুছে যাবেন।

নতুন পদ্ধতির লক্ষ্য

আমাদের উদ্দেশ্য কি? কেন আপনারা রিস্ক নিয়েছিলেন? কেন স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন? যাঁদেরকে আজ আমি গভর্নর করেছি, তাঁরা আমার সঙ্গে একত্রে কাজ করেছেন। তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, ২৫/২৬ বৎসর পর্যন্ত আমার সঙ্গে কাজ করেছেন। আপনারা বিট্রে করেন নি, বেঈমানি করেন নি। আপনারা আমাকে ছেড়ে সরকারি দলে যোগদান করেন নি। আপনারা যুদ্ধের সময় শত্রুর মোকাবিলা করেছেন। বাড়িঘর আপনাদের জ্বালিয়ে দিয়েছে। আপনারা সংসার ছেড়ে দিয়েছিলেন। আপনারা সবকিছু করেছেন। কেন করেছিলেন? নিজের জন্য? তা নয়। এদেশের গরিব-দুঃখীদের জন্য, যাতে একটা শোষণমুক্ত সমাজ করতে পারেন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীত করতে পারেন। যাতে বাংলার মানুষ সুখী হয়, বাংলার মানুষ অত্যাচার-অবিচার থেকে বাঁচতে পারে।

চারটা যদি মডেল করি, ডিস্ট্রিক্ট-এ যদি আমরা সাকসেসফুল হই, সেখানে যদি মানুষের উপর অত্যাচার না হয়, অবিচার না হয়, ঘুষ-দুর্নীতি যদি বন্ধ করতে পারেন, রাস্তা-ঘাট যদি করতে পারেন, জনগণকে যদি মবিলাইজ করতে পারেন–তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে। শুধু সরকারি অর্থে জনগণের মঙ্গল হয় না, উন্নতির কাজ হয় না। জনগণকে একতাবদ্ধ করতে হবে, আপনাদের জনগণকে মবিলাইজ করতে হবে, সেজন্য জনগণের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। সেই অনুপ্রেরণা সৃষ্টির দায়িত্ব থাকবে পার্টির এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের, গভর্নরের, জয়েন্টলি। সরকার যদি দেয় ৫০ হাজার টাকা, আপনি কাজ করাবেন সেখানে পাঁচ লাখ টাকার। মানুষকে বললে বাংলার মানুষ 'না' বলে না। বাংলার মানুষ যদি বুঝে যে,

এই কাজে তাদের উন্নতি হয়, তবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেজন্য আপনাদের-যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার, গভর্নর হয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত, যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার আগে ছিলেন, এখন নাই, তাঁরাও আমার সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁদের এবিলিটি সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট ধারণা আছে। পার্লামেন্ট মেম্বার যাঁরা গভর্নর হয়েছেন, গভর্নর করেছি, যদি মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা না পান, আপনাদের পরিষ্কার কথায় বলতে চাই যে, যদি পপুলারিটি হারিয়ে ফেলেন, তাহলে অসুবিধায় পড়বেন। আমার কিন্তু সাফ সাফ কথা। আমার কে কি করল না করল আমি কিছু শুনব-টুনব না। সে জায়গার মানুষ আপনাকে ভালোবাসে কিনা, আমি সেটা দেখব। যদি আপনার বিরুদ্ধে সেখানে গণবিক্ষোভ হয়, বাংলার জনগণ যদি দেখে যে, আপনি ভালো কাজ করছেন না, যদি আপনার সম্বন্ধে নেপোটিজম করাপশনের অভিযোগ দেখা যায়, আমি কিছু শুনব-টুনব না। আপনাদের ধারণা আছে, আমি হাত দিলে কিন্তু হাত উঠাই না, এটা আমার নিয়ম নয়। হাত দেওয়ার আগে আমি বহুবার চিন্তা করি। কিন্তু একবার যদি হাত দিয়ে বসি-মাথা চলে যেতে পারে কিন্তু সে হাত আমার কমই উঠে। সেজন্য এই যে, আমি আপনাদের নতুন সিস্টেম দিয়েছি, এর মধ্যে শুধু আপনারা বেঁচে থাকবেন না, আমিও বেঁচে থাকব। বাংলাদেশ দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে। অনেক অনুন্নত দেশ আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবে যে, এখানে কি ব্যাপার হয়েছে। অত্যাচার-অবিচার আপনাদের এরিয়ার মধ্যে যাতে না হয়, তার জন্য ড্রাস্টিক্যালি আপনি সেখানে শাসন চালান। ভালো করে কাজ চালান, আমি আছি, সরকার আছে, মিনিস্টার সাহেবরা আছেন, সবাই আছেন আপনাদের সাহায্যের জন্য। যদি দরকার হয় তাঁদের ডাকবেন, তাঁরা বলবে, তারা আপনাদের সাহায্য করবে। দরকার হয়, আমার কাছে চলে আসবেন। গণভবনে টেলিফোন থাকবে। আমার অফিস থাকবে একটা। আপনারা যদি দেখেন যে, কোন জায়গায় কোন ডিপার্টমেন্ট আপনাদের কো-অপারেট করছে না, সোজাসুজি টেলিফোন করবেন; সেল থাকবে, অফিসার বসা থাকবে, সিনিয়র অফিসার; খবর দিলে দেখবেন যে, সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা আমি আপনাদের জন্য করেছি।

আর সেজন্যই আজকে মনে রাখতে হবে। সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, যাঁদের গভর্নর করেছি-পার্টির সদস্য ছাড়া গভর্নর হতে পারে না এবং এ পর্যন্ত খুব কম মানুষই পার্টির সদস্য পদ পেয়েছে এবং যাঁদের আমি আজকে গভর্নর করেছি, তাঁদেরকে আজকে পার্টির মেম্বারশিপ দিয়ে এখানে আসতে, বসতে দেওয়া হয়েছে। তা না হলে তারা এখানে বসতে পারেন না। যেসব সরকারি কর্মচারী ভাইদের গভর্নর করেছি, তাদের বেলাও এমনটি করতে হয়েছে। পার্টির সদস্য পদ দেওয়া হয়েছে, সেই সব সরকারি কর্মচারীদের যাঁরা আমার চোখে ভালো, তাঁরা সিনিয়র হোক বা জুনিয়র হোক, তাঁদেরকে আমি গভর্নর করেছি। পূর্ণ রেসপনসিবিলিটি তাঁরা নিচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, সেখানে যে যে সরকারি কর্মচারী থাকবে, সেখানে যিনি গভর্নর হয়েছেন, তিনি প্রিসাইডও করবেন। মেম্বার,পার্লামেন্টের মেম্বার-সেখানে বসবেন। তার মানে তাঁর পজিশনটা কোথায় উঠে গেল, সেকথা চিন্তা করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, যেখানে পার্টি কল করবে, সেখানে গভর্নরকে যেতে হবে, সেখানে বসতে হবে, আলোচনা করতে হবে। তোমরা এখন থেকে আর সরকারি কর্মচারী নও- পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ার্কার, রিমেম্বার ইট, বাকশালের সদস্য। যেমন আমার পার্লামেন্ট মেম্বার বাকশালের সদস্য, তেমনি সরকারি কর্মচারীরা বাকশালের সদস্য এবং সদস্য হিসাবে তাঁদের সেইম পজিশনে সেখানে যেতে হবে এবং সেখানে কাজ করতে হবে। পার্লামেন্টের মেম্বার এর সঙ্গে থাকবে ওই কাউন্সিলের সদস্য। আর আর্মি থেকেও একজনকে দিয়েছি। তাঁকেও মেম্বারশিপ দিয়ে আমি গভর্নর করেছি খুলনায়।

এইরকম করে আমি সব জায়গা থেকে লোক এনে দেখতে চাই। এটা মনোপলি নয়। আর যেই ফেল করবেন, চলে যাবেন। রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে বসিয়ে দেব। যে ভালো কাজ করবে, সেই চালাবে। কোন কথাবার্তা নাই।

এটা একটা নতুন সিস্টেম, নতুন সিস্টেম-এ বাধা আসে। নতুন সিস্টেম-এর মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। একটা আশঙ্কা আসে, নতুন কিছু করতে গেলে। মানুষের মধ্যে দ্বিধা, সংশয় দেখা দেয়। গত বিশ-পঁচিশ বছর আমি দেখেছি যে, ওই ইংরেজ আমলের ওই সিস্টেম এদেশে চলতে পারে না।

থানা প্রশাসন

আজ আমি কেবল গোড়ায় হাত দিয়েছি। এখন ডিস্ট্রিক্ট করেছি। এক বছরের মধ্যে আমি থানায় যাচ্ছি। থানায়ও আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল করছি। সেখানে থানায় যে হেড হবে, তাঁর নাম হবে থানা প্রশাসক। সেখানে এমপি হতে পারেন, গভর্নমেন্ট অফিসার হতে পারেন, বাইরের মানুষ হতে পারেন এবং সেখানে হাই অফিসিয়াল থাকবে। এইভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে। এমনি করে, যাতে লোকাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম হোক, কালেকশন হোক, এমনও করতে হতে পারে ভবিষ্যতে যে, এই যে আমাদের ডিস্ট্রিক্টগুলো হয়েছে, যখন আমরা ফুড-এর অবস্থা জানতে পারব, তখন প্রোকিয়োরমেন্টে-এর অবস্থা জানতে পারব, ডিস্ট্রিবিউশন-এর অবস্থা জানাতে পারব। ফুল রেসপনসিবিলিটি তাঁদের নিতে হবে। ভবিষ্যতে সব কিছুর দায়িত্ব নিতে হবে।

সার্বিক দায়িত্ব

এই দায়িত্ব গভর্নর সাহেবের এবং তাঁর কাউন্সিলের। যদি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হয়, সমস্ত দায়িত্ব আপনার, যদি ফুড সিচুয়েশন খারাপ হয়, পুরো দায়িত্ব আপনার, যদি সেখানে দুর্নীতি হয়, তা দমনের কর্তব্য আপনার, যদি সেখানে টেস্ট রিলিফের টাকা চুরি হয়, তাহলে তা বন্ধের ভারও আপনার, যদি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা চুরি হয়, তবে জনসাধারণকে আপনাদেরই জবাব দিতে হবে। ফারটিলাইজার বাজারে বিক্রি হয় না। কোথায় আছি আমরা? ফারটিলাইজার আমরা সরকার থেকে দেই। কিন্তু কোন বাজারে ফারটিলাইজার পাওয়া যায় না? আমাকে বুঝিয়ে বলুন, কোথা থেকে বাজারে যায়, গভর্নমেন্টের গোডাউন থেকে নিশ্চয় যায়। আমরা গম আনি, গম বাজারে বিক্রি হয়। আমি ওয়ার্কস প্রোগ্রাম-এ গম দেই, ফুড ফর ওয়ার্ক-এ দেই, গম আমরা কিছুটা জাস্টিফাই করতে পারি। কিন্তু ফারটিলাইজার জাস্টিফাই করি কি করে? সেজন্য আজকে দেখতে হবে যে, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট-এ যে টাকা যাবে, সব গভর্নরদের একটা রুমে সে বিষয়ে চার্ট টাঙিয়ে রাখতে হবে বড় করে। পাবলিক যাতে দেখতে পারে, আমার টেস্ট রিলিফ-এর টাকা আসছে, এই এই প্রোজেক্ট-এ এইখানে খরচ হচ্ছে, এই ওয়ার্কস প্রোগ্রামে আসছে, এখানে এখানে খরচ হচ্ছে, এই ফারটিলাইজার আসছে, এই জায়গায় গেল, অমুক ইউনিয়নে গেল। সব কিছুর চার্ট টাঙিয়ে দিতে হবে। ওই ডিস্ট্রিক্ট-এর লোকদের জানাতে হবে। সরকারের জিনিসপত্র কোন দিক দিয়ে আসে, কোন দিক দিয়ে যায়, কেউ জানে না। কত ফুড গেল সেই ডিস্ট্রিক্ট-এ তা জানতে হবে। কোন থানায় কত গিয়েছে, কোন ইউনিয়নে কত গিয়েছে। তাও জানাতে হবে। সমস্ত জাতিকে মবিলাইজ করতে হবে। জাতিকে মবিলাইজ না করতে পারলে কোন কাজ হবে না। আজ দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি। আপনাদের যে টেকনিক্যাল ট্রেনিং আছে, সেগুলো কাজে লাগাতে হবে। বক্তৃতা করলে চলবে না। এমপি সাহেবরা অনেক বক্তৃতা করেছেন। বক্তৃতা করলে চলবে না। এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে হবে। বুঝেছেন? শিখতে হবে। শুধু অর্ডার দিলে হবে না, এটা কর, ওটা কর–এটা করলে হবে না।

আইনের শাসন

দেশে আইন-কানুন আছে। আইনকানুনের মধ্যে আপনারা। বেআইনি কোন কাজ করবেন না। দেশের আইনের মধ্যে থাকতে হবে, তার মধ্যে অর্ডার করতে হবে। এই আইনগুলো পার্লামেন্টের, তা বললে হবে না। এটা দেখে নিতে হবে। এই আইন এবং এই আপনাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্ষমতা রয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে, তাঁদের এক্সপেরিয়েনস আছে, তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করেছেন। তারা ওই সমস্ত আইন-কানুন, খুঁটিনাটি জানেন। মনে রাখবেন, মিনিস্টার সাহেবরা আছেন, ওনারা অর্ডার করেন, কিন্তু অর্ডারটা ইস্যু হয় সেক্রেটারির নামে, সেকশন অফিসারের নামে। ভুলে গেলে চলবে না। আমরা অর্ডার করি 'ডু দিস'। সেটা ওই জায়গার ফাইলেই থাকে। ঐখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, সেকশন অফিসার থেকে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে ইস্যু হয়ে যায়। তেমনি করে আপনি বলবেন, আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সেক্রেটারি, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, তার নামে ইস্যু হবে। আপনার অর্ডার আপনার ফাইলেই থাকবে। এই নিয়ম আছে, আপনাদের কতকগুলি প্রটোকল মানতে হবে। আপনাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদেশি লোক গেলে আপনারা কি করে প্রটোকল করবেন। আপনাদের ফরেন পলিসি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। আপনাদের রাষ্ট্রের কাঠামো সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার।

নতুন বিচার পদ্ধতি চাই

আর, বিচার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি বদলিয়ে ফেলা দরকার। বিচারের নামে অবিচার আর চলে না। এবার নতুন একটা কাঠামো করুন। সোজাসুজি বিচার হয়ে যাক। যাওয়ার সময় একজন জামাইয়ের কাছে ব্রিফটা দিয়ে যায়, মরার আগে পর্যন্ত মামলা চলতে থাকে। সাহেবরা থানায় যাক। থানায় গিয়ে ওকালতি করুক, আমার আপত্তি নাই–সব থানায় নিয়ে যান। থানার মানুষ অতিসহজে নৌকা ভাড়া করে, পায়ে হেঁটে এসে বিচার পাবে। এই ডিস্ট্রিক্ট–এ এসে, মানে সদরে এসে, বাংলার দুঃখী মানুষ কোন দিন বিচার পায় নাই। দেখেন যেয়ে, জেলের মধ্যে 'ফিফটি ফোর'-এর আসামি হয়ে ৬ মাস, ১ বছর পড়ে থাকে; তার ১৫ দিন জেল হয়। জীবনভর আমি জেল খেটেছি, কয়েদিদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছি। আমি জানি যে, তাদের কী দুঃখ, কী কষ্ট। বিচার হোক, জেল খাটুক। কিন্তু বিচার হয় না, হাজতে থাকে, 'ফিফটি ফোর'-এ এক বছর, দু বছর হাজত খেটে ১ মাস জেল। আর এই যে, ১ বছর ১১ মাস গেল, ক্ষতিপূরণটা কে দেয়? আবার খালাসও হয়ে যায়। আমি এগুলিকে থানা 'লেভেল'-এ নিয়ে যেতে চাই। পয়সা-কড়ির আমাদের অভাব আছে–বুঝি। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এ পয়সা কিছু কম খরচ করতে হবে।

নির্মাণ কাজ

এই যে, আমাকে বলে যে, আমাদের অফিস কোথায় হবে? গভর্নর সাহেবরা আপনাদের যার যার এরিয়ার মধ্যে বাড়ি আছে, এই যে, যারা সরকারি কর্মচারী আছেন, তাদের একটু 'হেল্প' করব। আর আপনাদের বাড়ি-ঘর ওখান থেকে জোগাড় করে নিতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা দেব, কিছুকিছু বাড়িঘর করে দেব। কিন্তু নিজেদের জোগাড় করে নিতে হবে, আর যদি দরকার হয়, নিজে কুঁড়ে ঘরে থাকবেন। গ্রামে যান–আর ওই ডাকবাংলো করবেন না। আগে ডাকবাংলো করা হতো, এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ডাকবাংলো উপকারে লাগে। কিন্তু এর মেইনটেন্যান্স খরচ অনেক বেশি। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।

যাই হোক, আগে যান। যেখানে যাবেন, কিছু কিছু টিনের 'শেড' করেন। টাকা কিছু কিছু আমরা রেখেছি–দেবার জন্য। টিনের 'শেড' করে অফিসারদের জন্য কিছু বাড়ি, কিছু থানা,

কিছু জেলখানা করতে হবে। এগুলি আমরা করে দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি হয় এবং সেটাও আপনাদের উপর চার্জ দিচ্ছি। 'রিমেম্বার'। টাকা ভাগ করে স্কিম করে, সব বলে দেওয়া হবে। গভর্নর সাহেবেরা, আপনারা 'টেন্ডার কল' করে তাড়াতাড়ি করে ঘর উঠিয়ে ফেলেন। 'অনলি' ইঞ্জিনিয়ার যাবে, যদি দরকার হয়, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার থাকবেন, হাই ওয়েজ-এর ইঞ্জিনিয়ার থাকবেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবেরা, গভর্নর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এই পাঁচ জনকে দিয়ে আমরা কমিটি করে দেব এবং টাকা তাঁদের হাতে ফেলে দেব। সেই টাকা আমরা তাঁদের কাছে দিয়ে, আমরা তাঁদের স্কিম করে দেব। সেই টাকা দিয়ে 'কাট-ছাঁট' করে, কিছু অফিস, কিছু টিনশেড ঘর-বাড়ি তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। যেখানে যা কিছু পাওয়া যায়, ভাগ করে থাকবেন। এক কামরা, দু কামরা, যা পাওয়া যায় তাতে থাকবেন। এদেশের মানুষ না খেয়ে মারা যায়, তার অত ফ্যাশনের কি হলো? ঠিকভাবে আপনারা কাজ করেন।

অন্যান্য ব্যাপারগুলি, যা আমি সমস্ত মিনিস্টার সাহেবদের অনুরোধ করেছি, ভাইস-প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অনুরোধ করেছি, প্ল্যানিং সম্বন্ধে প্রাইম মিনিস্টার সাহেবকে অনুরোধ করেছি, তিনিও বলবেন। আর এই যে, আমি আপনাদের জন্য ম্যাপ করে এনেছি, দেখেছেন? 'অলরেডি' ম্যাপ করা হয়ে গেছে। বুঝতেই পারেন যে, আমরা কত অগ্রসর হয়ে গেছি। আপনাদের এরিয়া কম নয়। বুঝতেই পারেন যে, 'পপুলেশন' এক-একটা এরিয়ায় যা, তাতে দেখা যায় যে, অনেক দেশ–বলতে পারেন অনেকে, যাঁরা খবর রাখেন, বলতে পারেন যে, ২০ লক্ষ, ৩০ লক্ষ লোকের দেশ শ'খানেক দুনিয়ায় হবেই। আমার ১০ লক্ষ, ২০ লক্ষ, ৩০ লক্ষ লোকের দেশ, আর তোমরা এক-একজন তার বাদশার মতো। 'অফকোর্স' ইউ আর নট এ 'বাদশা', তোমরা খাদেম। সমস্ত জেলাগুলো ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু একটার মধ্যে আমাকে 'চেঞ্জ' করতে হবে। বান্দরবন এরিয়ার একটা থানা কক্সবাজারে নিয়ে যেতে হবে। আর সব দেখে ম্যাপ করা হয়েছে। 'অ্যাডজাস্টমেন্ট', 'রি-অ্যাডজাস্টমেন্ট' করতে হবে, কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখবে, কোথায় কি অ্যাডজাস্টমেন্ট, রি-অ্যাডজাস্টমেন্ট-এর দরকার।

মিলেমিশে কাজ করতে হবে

এখন আমি সরকারি কর্মচারীদের বলব যে, যদিও তোমরা সরকারি কর্মচারী বা তোমরা গভর্নর হয়েছ, সেখানে পার্লামেন্টের মেম্বার থাকবে, সকলে মিলেমিশে কাজ করতে হবে, এখন থেকে সবাই গভর্নমেন্টের চাকরি করবেন, সঙ্গে সঙ্গে পার্টি মেম্বার। পার্টি মেম্বার গোজ, গভর্নরশিপ গোজ, এভরি থিং গোজ। বুঝতে পারছ, ব্যাপারটা? সব কাঁধের উপর চাপায়ে দেব, যাতে খালি এসে বক্তৃতা না কর। এরপর থানায় থানায় দেব, বলব কাজ কর। ফেল করলে, বাস খতম। আমি গিয়ে বক্তৃতা করে আসব যে, ও কাজ করতে পারে না, ওরে বিদায় করে দাও। লোকে তাই করে দেবে। এইভাবে কাজ করতে হবে।

মোটকথা হলো এই যে, এই শাসন ব্যবস্থা হয়েছে জনগণের, জনগণের মঙ্গলের জন্য এবং জনগণ যাতে সোজাসুজি শাসন ব্যবস্থার ফল ভোগ করতে পারে, তার জন্যই এই সিস্টেম করা হয়েছে। মানে সোজাসুজি, মানে কোন রকম কোন অসুবিধা তাদের ভোগ করতে না হয়, জনগণের সামনে নিয়ে যাওয়া যায়–ইডেন বিল্ডিংস বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাখতে চাই না। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায়, জেলা পর্যায়ে এটা পৌঁছায়ে দিতে চাই, যাতে জনগণ সরাসরি তাদের সুযোগ-সুবিধা পায়।

দুর্নীতি দূর করতে হবে

বড় জিনিস হলো, একটা লাস্ট কথা, যেটা আমি বার বার বলি যে, করাপশন। আমি আমার সহকর্মীদের, যাদের দিচ্ছি এবং এ পর্যন্ত যাদের আমি গভর্নর করেছি, সরকারি কর্মচারী থেকে

আরম্ভ করে, সকলের প্রতি আমার আস্থা আছে, আমি বিশ্বাস করি যে, তারা করাপশন-এর উর্ধ্বে থাকবেন। কিন্তু শুধু নিজেরা ঘুষ খাওয়াই করাপশন নয়। এ সম্বন্ধে আমি বলছি যে, করাপ্ট পিপলকে সাহায্য করাও কিন্তু করাপশন, নেপোটিজমও কিন্তু এ টাইপ অব কারাপশন, স্বজনপ্রীতিও কিন্তু করাপশন, আপনারা এসব বন্ধ করুন। কোন ভয় নাই, কোন ভয় নাই, কারো ভয় নাই, আল্লাহ ছাড়া কারো ভয় কর না। আমি ও আপনাদের সাথে আছি।

স্বজনপ্রীতি ছেড়ে দিলে করাপশন বন্ধ করতে পারবা তোমারা। কারণ, যাঁরা থানা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এ রয়েছে, তাঁরা সেখানে করাপশন বন্ধ করবা। সেখানেই অনেক জিনিসের ডিস্ট্রিবিশন হয়, থানা লেভেলে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে। সেখানে যদি করাপশনটা বন্ধ করবার পার, তাহলে তো উপরের করাপশন অটোমেটিক্যালি বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উপর আর নিচ দুইটাতেই বন্ধ করতে পারলে মধ্যখানে তো এমনিভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এটার ওপর সোজা নজর দেও, প্রত্যেকে নজর দেও।

আজ আমার কাছে তওবা করে যাও যে, স্বজনপ্রীতি করবে না, ঘুষখোরদের সাহায্য করবে না, মাত্র কয়েকটা লোকের জন্যই বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না এবং সে জন্য তোমাদের কাছে আমি দেখতে চাই, আমার কর্মী যাঁরা আছ, যাঁরা আমার কথায় বন্দুক ধরে যুদ্ধ করেছিলে, যাঁরা আমার কথায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলে, যাঁরা আমার কথায় সবকিছু ত্যাগ করতে পারতে, তোমরা আমার একটা কথা রাখ যে, ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করবা, তোমাদের এরিয়াতে যেয়ে। দেখ, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর হয় কি-না। ওরা না খেলেও ওরা কথা বলবে না। যদি ওরা দেখে যে, ওদের সামনের খাবার অন্যে না খায়। যদি বুঝান যায় যে, না, আমার নাই, তাহলে ওরা দুঃখ করবে না। ওরা যখন দেখবে যে, তাদের জন্য যে আটা পাঠানো হয়েছে, তা যদি কেউ চুরি করে খায়, তাহলে সেখানে দুঃখের জায়গা ওদের থাকে না। তখন ওরা অভিশাপ দেয়, সে অভিশাপ তোমাদের লাগে কিনা, জানি না। কিন্তু আমার লাগে। কারণ, তারা আমার জন্য দোয়া করেছে। এদেশের মা-বোনেরা যদি আমার জন্য রোজা না রাখত, মসজিদে-মন্দিরে যদি দোয়া না করত, তাহলে বোধ হয় আমি ফিরে নাও আসতে পারতাম। লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষ রোজা রেখেছে, আমার জন্য, মাসের পর মাস।

আমি সহ্য করতে পারি না মাঝে মাঝে যে, কেন এই করাপশন সমাজের মধ্যে ঢুকেছে? অনেকটা এখন অনেকে এগিয়ে আসছে। তোমরা যাঁরা ৬১ জন লোক আছ, তোমাদের স্থান ছোট হয়ে গেছে। তোমরা ইচ্ছা করলে সেখানে এরিয়ার মধ্যে করাপশন বন্ধ করতে পার। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা পারবে। অন্য কাজ কর বা না কর, কিন্তু এটা কর। একটা কাজ তোমাদের কাছে আজ বলবার চাই যে, করাপশন, ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ কর। থানায় এসে যেন মানুষ বসতে পারে, তাদের যেন পয়সা দিতে না হয়। সাব-রেজিস্টার অফিসে আসলে যেন পয়সা দিতে না হয়। সিও অফিসে যেন পয়সা দিতে না হয়, কোর্টে আসলে যেন পয়সা দিতে না হয় এবং তারা যেন হয়রানি না হয়।

যে যেখানে থাকবে, সেখানে যে পুলিশ আছে, সেই পুলিশ তোমাদের আন্ডারে থাকবে। যে বিডিআর সেখানে আছে, সেই বিডিআর তোমাদের আন্ডারে থাকবে। যে রক্ষীবাহিনী সেখানে থাকবে, সেই রক্ষীবাহিনী তোমাদের আন্ডারে থাকবে। এমনকি, যে আর্মি সেখানে পোস্টিং আছে, সেই আর্মি সেখানে তোমাদের আন্ডারে থাকবে এ মুহূর্তে ওই জায়গায়। অভকোর্স, তাদের নিজ নিজ কম্যান্ড আছে। কিন্তু তোমরা যা বলবা, তা তাদের শুনতে হবে। তোমাদের কর্তব্য আছে অনেক। করাপশন বন্ধ কর, আল্লাহর দোহাই, করাপশন বন্ধ করার চেষ্টা কর। তোমাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তোমরা পারবে।

তোমরা লোকালি ঘুরতে থাক। তোমরা নৌকায় ঘুরো, গাড়ি নিয়ে ঘুরো–মানুষ যাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে। যে থানায় চুরি-ডাকাতি কমবে না, তাদের ডেকে কনফারেন্স করে বলো, চুরি-ডাকাতি তোমাদের এরিয়ায় বন্ধ করতে না পারলে, তোমরা বিদায় হবে। সাফ সাফ কথা। রেসপনসিবিলিটি, তোমরা যাঁরা ঐখানে আছ, তোমাদের এসব বন্ধ করতে হবে।

চুরি-ডাকাতি, ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, এটা ভালো করে জেন। সাবধান, তোমাদের আমি বলে রাখি সবাই যারা এখানে আছ, আমি এ সম্বন্ধে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছি, ভাবছি কি করে এগুলি দূর করা যাবে। আমি কিন্তু বলছি, এক কথা বলি দুই বছর আগে, কিন্তু এক বছর পরে সে বিষয়ে আমি হাত দেই। রিমেম্বার ইট, তোমরা জান, আমাকে ভালো করেই জান। তোমাদের কাছে আমার কথা রইল, যাঁদের আমি গভর্নর করেছি, তোমরা করাপশন বন্ধ কর।

দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি

ডেভলপমেন্ট ওয়ার্ক, ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর আমার যে চারটি প্রোগ্রাম আছে, দ্বিতীয় বিপ্লবের, সেগুলো কাজে লাগাও। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য পাম্প পেলাম না, এটা পেলাম না, ওটা পেলাম না, বলে বসে না থেকে জনগণকে মবিলাইজ কর। যে খাল কাটলে পানি হবে, সেখানে সেচের পানি দাও। সেই পানি দিয়া ফসল ফলাও। মবিলাইজ দি পিপল। পাম্প যদি পাওয়া যায় ভালো, যদি না পাওয়া যায়, তবে স্বনির্ভর হও। বাঁধ বেঁধে পানি আটকাও, সেই পানি দিয়ে ফসল ফলাও। আমাদের দেশে আগে কি পাম্প ছিল? দরকার হয়, কুয়া কেটে পানি আন। আমাদের দেশে পাঁচ হাত, সাত হাত, আট হাত কুয়া কাটলেই পানি উঠে। সেখানে অসুবিধা কি আছে? যে দেশে পানি আটকে রাখলে পানি থাকে, সেখানে চিন্তা কি ফসল হবার? বর্তমানে যে সমস্ত সার থানায় যাবে, সে সমস্ত সার যেন রেগুলারলি গরিব-দুঃখীরা পায়।

আর একটি কথা। মাথা যেন গরম না থাকে, সাবধান। মাথা গরম করে শাসন করা যায় না। মাথা গরম না করে, সংযম ও সহনশীলতা যেন থাকে। সংযম ও সহনশীলতা না থাকলে কোন কিছুই করতে পারবে না। এবং যে কোন ডিসিশন নিতে যাবা চিন্তাভাবনা করে, পরামর্শ করে করবা। যেটা ভালো মনে করবা, সেটা করবা চিন্তা-ভাবনা করে। হঠাৎ কিছু করবা না, হঠাৎ করলে কিন্তু মানুষের ভুল হয়। চিন্তা ভাবনা করে ডিসিশন নিয়ে যদি মনে কর, এটা ভালো, তাহলে স্টিক কর।

সার্বিক দায়িত্ব

আর স্কুল-কলেজ আছে, গভর্নমেন্ট টাকা দেয়। প্রাইমারি স্কুলে আমরা টাকা দিয়েছি। অনেকে স্কুল করে না, অনেকে পড়ায় না, স্কুলেও যায় না। সেখানে লোকে গরু-ছাগল বেঁধে রাখে, টাকাও পায়। আবার রেশনও দেই। সেগুলি ওয়াচ কর। তুমি না পার, তোমার একজন অফিসার পাঠিয়ে দেও। ডিস্টিক্ট অফিসার, স্কুল অফিসার, এই সমস্তকে কন্ট্রোলে নিয়ে আস। তাঁরা এ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে আসুক। যদি দেখ কোন টিচার কাজ করছে না, তাকে বদলি করে দাও। তাঁরা সরকারি কর্মচারী এখন। টাকা যা পাঠানো হয়, খেয়ে ফেলে দেয়, সাবধান! দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

যত ডিপার্টমেন্ট আছে, সমস্ত ডিপার্টমেন্টের ব্রাঞ্চ সব ডিস্ট্রিক্টে বাংলাদেশে এখানে বসে থাকবে, ওভারঅল রেসপনসিবিলিটি তোমাদের। তারপর ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট। বাংলাদেশে এখানে বসে যে কাজ হয়, এই কাজের 'পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট' প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট, সাবডিভিশন-এ আছে। আল্লাহর মর্জি কাগজ কয়খানা দরজায় লাগিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে

ঘুমিয়ে থাকেন আর বাকি কাগজ সের দরে বিক্রি করে দেন। তাঁর কাছে খোঁজ নিতে হবে, কত কাগজ আসল। যাও গ্রামে গ্রামে, পাবলিসিটি কর।

সকলেরই সকল বিষয়ে কর্তব্য আছে

একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই নতুন সিস্টেম করলাম কেন? কোন ডিপার্টমেন্ট কাউকে মানতে চাইত না। আমি অমুক, আমি ফুড, আমি এগরিকালচার, আমি হেলথ, আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং, আমি ইনফরমেশন, আমি এটা, আমি ওটা। এসডিও সাহেব, ডিসি সাহেব যতদূর পারতেন করতেন, না পারতেন, না করতেন। কিন্তু সকলেরই সকল বিষয়ে কর্তব্য আছে। একথা সকলেরই মনে রাখা দরকার। যদি গভর্নর বা ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলে, এই অফিসারের এই কাজ করতে হবে, ফুড ডিপার্টমেন্ট-এর অফিসার, তাঁর সে কাজ করতে হবে। এগরিকালচার ডিপার্টমেন্টের অফিসার হলেও এর এই কাজ করতে হবে। আমার কাজ ওটা নয়, একথা বললে চলবে না। রাস্তার উপর একটা বাঁশ পড়ে আছে, সেটা কেউ উঠাবে না। বলবে, এ কাজ আমার নয়, এটা রোড অ্যান্ড হাইওয়েজ-এর। হাত দিয়ে কেউ বাঁশটা তুলবে না। এই হয়েছে আমাদের দেশের গভর্নমেন্টের সব চেয়ে বড় অসুবিধা। এটা আমার নয়, টি অ্যান্ড টি'র, এটা আমার নয়, ওয়ার্কাস ডিপার্টমেন্ট-এর, এটা আমার নয়, অমুক ডিপোর্টমেন্ট-এর। দ্যাট নুইসেন্স মাস্ট বি স্টপড ইন দিস কানট্রি। সকলেরই সকল কাজে রেসপনবিলিটি আছে। সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। সবাই বাংলাদেশের সরকারের চাকরি করে। তোমাদের কর্তব্য যেখানে অন্যায় বা খারাপ কাজ হয়, সেটা দেখতে হবে। যাঁর কাজ তাঁকে ডেকে বলো, কিন্তু খবরই দেয় না কেউ।

এই ঢাকা শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি দেখেছি। কোটি কোটি টাকার মাল এখানে সেখানে পড়ে থাকে। তেজগাঁও এয়ারপোর্ট-এর কাছে মাল পড়ে ছিল, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের কাছে মাল পড়ে ছিল, কিছু মাল পড়ে ছিল অন্যান্য জায়গায়। এটা কার? এটা আমার নয়, টি অ্যান্ড টি'র। এটা কার, এটা আমার নয়, সি অ্যান্ড বি'র। আমি বললাম, এসব কথা আমি বুঝি না। আগামীকালের মধ্যেই সব মাল পরিষ্কার করে নেওয়া হোক। এটা ঢাকা শহরে দেখেছি। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দেখতে হবে। কোথায় কি আছে, না আছে। আমরা ঢাকা মেট্রোপলিস-এ বাস করি। আর কয়দিন পর ঢাকা শহর থাকবে কিনা, ভাববার কথা। টি অ্যান্ড টি রাস্তা কেটে যায়, গ্যাস রাস্তা কেটে যায়, ওয়াসা রাস্তা কেটে যায়। রাস্তার জান শেষ। প্ল্যান্ড ওয়েতে কাজ হচ্ছে না।

সমন্বয় ও পরিকল্পনা

আর একটা কথা, কো-অরডিনেশন, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাউ। আপনাদের রেসপনসিবিলিটি, ক্ষমতা কতখানি। ৪টি কথা বলেছি, সেকেন্ড রেভল্যুশন-এর জন্য। আশা করি, সকলের মনে আছে, এটা সামনে রেখে কাজ করবেন। বক্তৃতা যা করি, মেহেরবানি করে একটু পড়ুন, যেগুলো পলিসি বক্তৃতা করেছি। আজ বক্তৃতা করি নি, আজ আপনাদের ট্রেনিং-এর বিষয় আলোচনা করেছি। আপনাদের ট্রেনিং কোর্স-এর উপর বললাম, আপনারা কি কি শিখে যাবেন, এর অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি, কেন বললাম, কেন অন্য মিনিস্টার এটা বলল, এটা বুঝতে হবে। প্ল্যানিং থেকে কাগজপত্র নিতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, আমাদের একটা ন্যাশনাল প্ল্যানিং আছে, সে সম্বন্ধে ভাইস প্রেসিডেন্ট কাল বলবেন। ন্যাশনাল প্ল্যানিং একটা হবে। কিন্তু লোকালি হ্যাপহ্যাজার্ড ওয়েতে কাজ করা হয়। আগে দেখেছি ওয়ার্কস প্রোগ্রাম-এ মাটি কেটে পানি বন্ধ হওয়ার ফলে জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওটা আমরা বন্ধ করেছি। এখন লোকালি বসে আমাদের প্ল্যান করতে হবে। আপনারা নিজেরা কামড়াকামড়ি করবেন না। এই একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট-এ ৫ জন বা ৬ জন এমপি আছেন, ৪টি থানা আছে। কেউ বলবে, আমার থানায় এটা হোক, আর একজন বলবে, আমার থানায় ওটা হোক, এভাবে কাজ হয় না। এই প্রোজেক্টটি ভালো, এই বৎসর হোক; নেকস্ট প্রোজেক্ট ওই বৎসর হোক, তারপরের প্রোজেক্ট অন্য জায়গায় করুন। এইভাবে আস্তে আস্তে করুন। ভাগ করে করে প্ল্যান নষ্ট করবেন না।

এখানে এই জিনিসটা ভালো হবে, এটা করলে এত হাজার একর জমিতে ফসল ভালো হয়, এই খালটা আমি করব। এখানে এই রাস্তাটা করলে ভালো হয়, এটা করব। এখানে এই পুকুরটা খনন করলে ভালো হয়, এটা আমি করব। এইভাবে কাজ করতে হবে।

সবাই যখন কনফারেন্সে বসবেন, তখন কেউ বলবেন না যে, আমার থানায় কত দিলেন। আগে প্রোজেক্ট নিয়ে আসবেন, কাজ করবেন, তারপর দিবেন। প্রথমে দেখবেন, কোনটাতে মানুষের উপকার বেশি হবে, সেটা আগে করবেন। আজ এখানে হোক, কাল ওখানে হোক, এভাবে করলে পাঁচ বছরে সব জায়গায় হয়ে যাবে, অসুবিধার কিছু নাই। দুটো করে প্রোজেক্ট করুন, মানুষ দেখুক, বুঝুক। এটা ভুললে চলবে না আপনাদের।

সেজন্যে আপনারা নিজেরা আপনাদের ছোট ছোট প্ল্যান রাখুন, আপনারা সেভাবে কাজ করুন। আপনাদের কাছে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে, টেস্ট রিলিফ যাবে, ফুড ফর ওয়ার্ক যাবে, এজন্য প্রোজেক্ট করে রাখবেন। এছাড়া কোন কোন প্রোজেক্ট ভালো হলো প্ল্যান করে প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, ওয়ার্কসে পাঠিয়ে দেবেন। তাছাড়া পাওয়ারের দরকার যেখানে, সেটা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

আমি খবর পেলাম যে, ঠাকুরগাঁয়ে একটা কোল্ডস্টোরেজ করা হয়েছে, এক বছর আগে সেটা হয়ে গেছে, কিন্তু পাওয়ার নাই। খবর নিয়ে জানালাম, পাওয়ার সেখানে যেতে এক বছর লাগবে। কারণ, খাম্বা নাই। খাম্বা নাকি বিদেশ থেকে আনতে হবে। মিনিস্টার সাহেবকে বললাম, খাম্বা টাম্বা আমি বুঝি না। বাঁশ আছে, আর এখানে দাঁড়াও, খাম্বা কাট, দা লাগাও, দেড় মাস-দুই মাসের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। এটা লাগাও, কি করে লাগবে সেটা আমি বুঝি-টুঝিনা। দিল, লেগে গেল। কিন্তু আমার কাছে যদি না আসত, এক বছরের আগে খাম্বা পেত না, এটা হতো না। খাম্বা আসে কোত্থেকে? পাওয়ার গেল, আলু রাখল। আলু রাখার জায়গা নাই, এই মেন্টালিটি কেন হয়? খাম্বা বাংলাদেশের গাছে গাছে হয়। আমি বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় পাওয়ার দিতে চাই।

গ্রাম সমবায়

কো–অপারেটিভ আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালি কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারিটেভ ডিপার্টমেন্ট আছে, থাক, ওটা চলুক। আমি এটার স্পেশাল কো-অপারেটিভ নাম দিয়েছি। এর জন্য দশ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য আমার একটা টারগেট রয়েছে। তোমরা ৬১ জন গভর্নর যখন চার্জ নিয়ে যাবে, দুই-তিন মাসের মধ্যে জায়গা ঠিক কর, একটা ভিলেজ ঠিক কর। আমি এখন প্রোগ্রাম করছি। আমি নিজে ঠিক করছি আমার পদ্ধতি। যেটা করে এক-একটা ডিস্ট্রিক্ট-এ একটা করে কো-অপারেটিভ করতে হবে। সেটা হবে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ। প্রথমত, এরিয়া ভাগ করে নেন, এমন জায়গায় নেন, যেখানে আমি ইমিডিয়েটলি পাওয়ার দিতে পারি। ওই কো-অপারিটিভ গুলিতে আমি পাওয়ার দেব। ধরুন, যদি রাজশাহীতে করি, তাহলে এমন জায়গায় করতে হবে, যেখানে পাওয়ার নিতে পারি। যদি নাটোরে করি, তাহলে এমন জায়গায় করতে হবে যেন সেখানে পাওয়ার নিতে পারি। এভাবে একটা-দুইটা-তিনটা গ্রাম নিয়ে কো-অপারেটিভ করতে হবে এবং এটা হবে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ। এতে কোন কিন্তু-টিন্তু নাই। তারপর সিস্টেম যা হবে, সবাইকে তা বলে দিতে হবে। এটাকে সাকসেসফুল করতে হবে। এটাকে পুরোপুরি সাকসেসফুল করতে হলে– এটা স্পেশাল কো-অপারেটিভ নামে পুরোপুরি করতে হবে। তারপর আমার সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বারদের সুপারভিশন-এ একটা কো-অপারেটিভ করব। তাঁরা সেখানে সুপারভাইজ করবেন। একটা করে স্যাম্পল করে আমরা অগ্রসর হবো। ইনশাআল্লাহ তারপর আর কোন অসুবিধা হবে না।

একবার যদি একটা ডিস্ট্রিক্ট-এ একটা কো-অপারেটিভ মানুষ দেখে যে, এই দেশের মানুষের এই উপকার হয়েছে, তাহলে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। মানুষ নিজেরাই এসে বলবে যে, আমাদের এটা করে দাও, আমাদের করে দাও, আমাদের করে দাও।

কাজ শিখতে হবে

আর আমাদের আইডিয়া হলো, একটা ট্রেনিং কোর্স, ট্রেনিং সেন্টার কর। ট্রেনিং, বই পড়ে ট্রেনিং হয় না। খুব কম হয়। কেউ করে শেখে, কেউ দেখে শেখে, আর কেউ বই পড়ে শেখে। আর সবচেয়ে যে বেশি শেখে সে করে শেখে। আপনারা করে শিখবেন। কাজ করে দেখিয়ে দিন, কীভাবে কাজ করতে হয়। বই পড়ে আমাদের একটা ফ্যাশন হয়েছে যে, ট্রেনিং সেন্টার কর। কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার করে সেখানে নিয়ে যাও। একমাস এইখানে ট্রেনিং হবে। সেখানে পেনশন খাইয়ে কি হবে? কি করবে সেখানে? লেকচার? পাট গাছে ধান হয় না, ধান গাছে পাট হয় না, বাংলাদেশের মানুষ এটা ভালো বোঝে। তামাকে বৃষ্টি পড়লে নষ্ট হয় তাও বোঝে। রবিশস্য কেমন করে হয় তাও বোঝে। যত লোক এখানে আছি, আমাদের কোন্ লোক ধান আর পাট বেচে লেখাপড়া শিখিনি? এই যাদের গভর্নর করেছি, এর মধ্যে কোন লোকটা ধান-পাট বেচে, ধান, মরিচ, পিঁয়াজ বেঁচে লেখাপড়া শেখেনি? আপনাদের প্রাকটিক্যাল নলেজ নাই। খালে ডুবে গোসল করেছি আমরা। নদী সাঁতরিয়ে পার হয়েছি আমরা। গ্রামে করেছি কি জানেন না? হ্যাঁ, একটা সিস্টেম শেখার জন্য যে কোর্স আমরা দিচ্ছি, এই কোর্সটা কেন দিচ্ছি যে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিখতে হবে আপনাদের কাগজে-কলমে। কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাকে কাজ করে শিখতে হবে। সেই জন্য আমার কো-অপারেটিভ যদি সাকসেসফুল করতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল কর। তোমরা আমার কথা জীবনভর শুনেছ। আজও শোন। দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে দেশের জন্যে কাজ কর। সিস্টেমটাকে আমাদের সাকসেসফুল করতেই হবে। আমি অনেক ভালো অফিসার দিয়েছি, দরকার হয় ভবিষ্যতে আরও দিব। আমি তাদের বিশ্বাস করি বলেই দিয়েছি। বিশ্বাস করি এরা ভালো কাজ করবে। এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। এতে একটা কমপিটিশন আছে কিন্তু। গভর্নমেন্ট অফিসার আছে, আর্মি অফিসার আছে, পলিটিশিয়ান আছে, আর এমপি আছে, নন-এমপি আছে, কমপিটিশন কিন্তু একটা আছে। এমপি আছে, নন-এমপি আছে, সরকারি কর্মচারী আছে, আর্মি অফিসার আছে। কমপিটিশন ভালো হবে। যাই হোক, সে জন্য মনে রাখতে হবে–সাফ কথা বলে দিলাম। বি কেয়ারফুল। তোমরা কিন্তু সবাই এক।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, বুধবার, ২৩ ও বৃহস্পতিবার, ২৪ জুলাই ১৯৭৫.

বাণী ও নির্দেশ

যে কোন প্ররোচনার মুখে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করুন

সংবর্ধনা-উত্তর দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে শেখ মুজিবের বাণী

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ঢাকা ক্লাবের সম্মুখে সশস্ত্র বাহিনীর গুলি বর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (রবিবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) এক বিবৃতিতে বলেন, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবরে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। রেসকোর্সের ময়দানে দশলক্ষ লোকের ঐতিহাসিক জনসভা আজ এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেছে যে, শহীদের আত্মত্যাগপূত সংগ্রামকে আমরা কিছুতেই অবাঞ্ছিত উত্তেজনা সৃষ্টির মুখে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেব না। এখন এই শপথ রক্ষার জন্য আমি আমার প্রিয় দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলে দেশের দিগন্তে যে আশার আলো ফুটে উঠেছে, তাকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। যে কান প্রকার প্ররোচনা ও উত্তেজনার মুখে দেশবাসীকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমি আবারও আকুল আবেদন জানাচ্ছি। সরকারকেও আমি কোন প্রকার প্ররোচনা প্রদান ও উস্কানিমূলক কাজ না করার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছি। এই দুর্ঘটনায় যারা আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাচ্ছি।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোমবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

বিচারের ভার আপনাদের –শেখ মুজিব

৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

পাকিস্তানের ২৩ বৎসরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর উদ্দেশে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করিয়াছেন :

"পাকিস্তানে এবারই সর্বপ্রথম জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মূল সনদ শাসনতন্ত্র রচিত হতে চলেছে। বাংলাকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে, এ দেশের তের কোটি মানুষকে সত্যিকার মুক্তির সন্ধান দিতে হলে চাই এক কণ্ঠের আওয়াজ– সে আওয়াজ তুলতে হবে বাংলারই জনপ্রতিনিধিদের, পশ্চিম পাকিস্তানের অসহায় মানুষের ভোটে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন, তাদের অধিকাংশই এদেশের সামন্ত স্বার্থেরই প্রতিভূ। তাদের কণ্ঠে কখনও দেশের কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বহারা মানুষের স্বার্থের কথা ধ্বনিত হতে পারে না। বরং, নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা চাইবেন গণ-স্বার্থকে দাবিয়ে রাখতে। জাতীয় পরিষদে তাঁদের মোকাবিলা করে এদেশের আপামর মানুষের স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে এনে পাকাপাকিভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান দেওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে কেবল বাংলার মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঐক্য। ভিন্ন ভিন্ন দলের পৃথক চিন্তাধারার প্রতিনিধিদের কণ্ঠে বেসুরো আওয়াজ উঠতে বাধ্য। তার উপর রয়েছে বাংলার মীরজাফরদের ভূমিকা। ইতোমধ্যেই আপনারা দেখেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক দল কেউ ৯০/৯৫টি, কেউবা ৩০/৪০টি আসনে দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, এসব দলের সব কয়টিরই শিকড় পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের জন্য তাঁদের এমনই দরদ যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পেলেও, বাংলাদেশের বেলায় 'যে

কয়টি আসন পাওয়া যায়, ভালো' এই নিয়মেই তাঁরা নির্বাচনে নেমেছেন। তাঁরা যে বাংলার তথা আপামর জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক নন, তার সব চাইতে বড় প্রমাণ তাঁরা নির্বাচিনে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কোন চেষ্টাই করতে চান না। তাঁরা জানেন, যেনতেন প্রকারে গুটিকয়েক আসনে যদি তাঁরা এখান থেকে তাঁদের প্রার্থীকে পার করিয়ে নিতে পারেন তাহলে তাঁদেরকে বগল দাবা করে যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাকে সংখ্যালঘু করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের পথ ঠিকই করে নিতে পারবেন। এ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাই বাংলার মানুষকে সজাগ থাকতে হবে।"

"ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই। তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে– কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমার চাই-ই চাই। সে শক্তি যোগাতে পারেন কেবল আপনারাই। এ-কারণে, আপনাদের খেদমতে একটিই মাত্র আমার প্রার্থনা : জাতীয় পরিষদে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের হয়ে এককণ্ঠে আওয়াজ তুলে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থ ও অধিকার যাতে আমরা আদায় করে আনতে পারি, তার জন্য জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের ১৬২টি আসনের প্রত্যেকটি আসনে আপনারা আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। কারণ, আপনাদের চাহিদামত শাসনতন্ত্র পাস করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমার চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের চাবিকাঠি। এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি আপনারা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে দেন, তাহলে ওয়াদা দিচ্ছি, আপনাদের স্বার্থ ও অধিকার আমি আদায় করে আনবই। আর যদি আপনাদের বিচারে ভুল হয়, আবার যদি পার্লামেন্টে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের দরুন বাংলার প্রতিনিধিরা দলে দলে ভাগ হয়ে বসে বেসুরো আওয়াজ তোলেন, তাহলে হাতে পেয়েও সবই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, আর তার অর্থ হবে এদেশের তের কোটি মানুষ ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সর্বনাশ। এ সর্বনাশে আপনি–আমি জ্ঞানত শরীক হতে পারি কি-না তা বিচারের ভার আপনাদের উপরই আমি ছেড়ে দিচ্ছি।"

সূত্র : *ইত্তেফাক*, সোমবার, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০

জাতীয় শোক দিবস

১৫ জানুয়ারি ১৯৭২

আজ ১৬ জানুয়ারি (রবিবার) ১৯৭২ জাতীয় শোক দিবস– স্বাধীন সোনার বাংলায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদান মুক্তিসৈনিক ও বর্বর ইয়াহিয়া বাহিনীর হাতে নিহত লক্ষ লক্ষ বীর বাঙালির স্মরণে আজ শোক প্রকাশের দিন।

শোক দিবস উপলক্ষে আজ দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকিবে। এ উপলক্ষে সমগ্র দেশের মানুষ কালো ব্যাজ পরিধান করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গত বৃহস্পতিবার ১৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে আজ রবিবার (১৬ জানুয়ারি ১৯৭২) সরকারিভাবে জাতীয় শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বীর শহীদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আজ ঢাকা শহরের সিনেমা হলগুলিও বন্ধ থাকিবে।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২

কোসিগিন ও ইন্দিরার নিকট বঙ্গবন্ধুর বাণী

৬ মার্চ ১৯৭২

গতকাল (৬ মার্চ '৭২, সোমবার) প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের উপর দিয়া বিমানযোগে আসিবার সময় প্রধানমন্ত্রী মি. কোসিগিন ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর নিকট শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন।

বঙ্গবন্ধু মি. কোসিগিনের নিকট প্রেরিত বাণীতে বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে আমাদের যে উষ্ণ সংবর্ধনা দান করা হইয়াছে, তার জন্য আমি আপনাকে, মি. ব্রেজনেভকে ও মি. পদগর্নিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

"আমাকে ও আমার সহযাত্রীদেরকে বন্ধুত্বমূলক আতিথেয়তা প্রদানের জন্য আমি বিশেষভাবে মস্কো, লেনিনগ্রাদ, তিফলিস ও তাসখন্দের জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানাই।"

"আমার বিশ্বাস, আমাদের সফরের ফলে আমাদের দু-দেশের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর হইয়াছে এবং বন্ধুত্ব ও সমঝোতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমার দেশের জনসধারণ অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশে দেখিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিবে।"

মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নিকট প্রেরিত বাণীতে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে ভারতের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময় আপনাকে, ভারত সরকারকে ও ভারতের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাইতেছি। সোভিয়েত ইউনিয়নে যাত্রাকালে এবং সোভিয়েত হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে আমি বোম্বে নগরীতে অবতরণ করিয়াছিলাম।"

"আমাকে ও আমার সহযাত্রীদেরকে সদয় ব্যবহার ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করার জন্য আমি বোম্বে সরকার ও বোম্বের জনসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞ।"

"শীঘ্রই ঢাকায় আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর সুযোগ লাভের জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিব।"-বাসস

সূত্র : *ইত্তেফাক*, মঙ্গলবার, ৭ মার্চ ১৯৭২

রক্তস্নাত বাংলায় নববর্ষ এসেছে

সোনার বাংলা গড়তে হবে : বঙ্গবন্ধুর নববর্ষের বাণী

১৩ এপ্রিল ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতি ধর্ম ও রাজনৈতিক মর্তাদর্শ নির্বিশেষে সকলের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করার দৃঢ় শপথ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

বাসস'র খবরে প্রকাশ, বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ' উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বাণীতে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশকে আমরা 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তুলব– এই হোক আমাদের নববর্ষের শপথ।

বঙ্গবন্ধুর বাণীর পূর্ণ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

আজ পহেলা বৈশাখ।

১৩৭৮ সনের দুঃখ-দুর্দশা আর ত্যাগ ও তিতিক্ষার কাল পেরিয়ে নতুন বছর ১৩৭৯ সনের শুভ সূচনা হলো। মহাকালের গর্ভে বিলীন হলো আরো একটি বছর। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিগত বছরটি মানব ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। এই বছরেই তিরিশ

লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাসভূমি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।

সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের দুঃখ-দুর্দশা, সংগ্রাম এবং ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর এক রক্তক্ষয়ী মুক্তি যুদ্ধের মধ্যদিয়ে রক্তিম বলয় খচিত সবুজ পতাকা উড়ছে আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে।

তাই আসুন, সবাই এই পতাকার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখবার উদ্দেশ্যে লাখো শহীদের আত্মার নামে শপথ করে দেশগড়ার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করি।

মাত্র ছাপান্ন হাজার বর্গ মাইল এলাকা সংবলিত আমাদের বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে সাত কোটি লোক বসবাস করছেন। এদের সার্বিক উন্নতি সাধন করতে হলে সরকারের অনুসৃত প্রতিটি নীতির বাস্তবায়ন অপরিহার্য। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র– প্রতিটি আদর্শই আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যে আজ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার এই বিশ্বাস থেকে আমাকে কেউই বিচ্যুত করতে পারবে না। আর এই চারটি আদর্শকে আমাদের সমাজ জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্যে সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জনগণের সাহায্য ও পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি আজ এই চারটি আদর্শের বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

তাই আজকের এই শুভ মুহূর্তে আমি দলমত, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, সব রকম ব্যক্তিগত, আর গোষ্ঠীগত ভেদাভেদ ভুলে আসুন, আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশের নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের কল্যাণের কাজে ব্রতী হই– দুঃখী মানুষের সেবাই হোক আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্ম। বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তুলতেই হবে– এটাই হোক নববর্ষে আমাদের ইস্পাত-কঠিন শপথ। জয় বাংলা।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, শুক্রবার, ১ বৈশাখ ১৩৭৯, ১৪ এপ্রিল ১৯৭২

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর বাণী

রক্ত দিয়ে আমরা রবীন্দ্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি

৭ মে ১৯৭২

বঙ্গবন্ধু বলেছেন, বাঙালি তাঁর আপন বুকের রক্ত দিয়ে রবীন্দ্র অধিকারকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বাংলা একাডেমী রবিবার (৭ মে ১৯৭২) আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "নতুন পরিবেশ ও নতুন চেতনায় এবার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ ও অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে। কিন্তু সত্য, শ্রেয়, ন্যায় ও স্বজাত্যের যে চেতনা বাঙালি কবিগুরুর কাছ থেকে লাভ করেছে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে তারও অবদান অনেকখানি। বাঙালির সংগ্রাম আজ সার্থক হয়েছে। বাঙালি তার বুকের রক্ত দিয়ে রবীন্দ্র অধিকারকে বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

রবীন্দ্র-সম্মানণায় এর চেয়ে বড় কোন দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।"

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, সোমবার, ৮ মে ১৯৭২

বাংলাদেশ আপনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে

বিদ্রোহী কবির কাছে বঙ্গবন্ধুর চিঠি

২০ মে ১৯৭২

পূর্তমন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান ও আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবা সম্পাদক জনাব মোস্তফা সারওয়ার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তাঁর ৭৩তম জন্মবার্ষিকীতে ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য আগামীকাল কলকাতা যাচ্ছেন।

জনাব মতিউর রহমান বিদ্রোহী কবির জন্য বঙ্গবন্ধুর লেখা একটি চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন।

চিঠির বিবরণ এখানে দেওয়া হলো :

"আমি আমার বন্ধু ও সহকর্মী জনাব মতিউর রহমান এবং আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব মোস্তফা সারওয়ারকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহপূর্বক আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণ ও আমার পক্ষে আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার জন্মবার্ষিকীতে আপনার আদর্শে বাংলাদেশকে সিক্ত হতে দিন।

আমরা বাংলাদেশে সাগ্রহে আপনার আগমনের প্রতীক্ষা করছি। আমি আশা করি, আপনি অনুগ্রহ করে আসবেন। জয় বাংলা।"

সূত্র : *সংবাদ*, রবিবার, ২১ মে ১৯৭২

নজরুলের অগ্নিমন্ত্র এক মরণজয়ী প্রেরণা

নজরুল একাডেমীতে বঙ্গবন্ধুর বাণী

২৪ মে ১৯৭২

স্বাধীন বাংলার পবিত্র মাটিতে নজরুল একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত নজরুল জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বাণীতে বলেন : "স্বাধীন বাংলার পবিত্র মাটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের চারণকবি মহাবিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবস পালিত হচ্ছে। এটা অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়। নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালির স্বাধীন ঐতিহাসিক সত্তার রূপকার। বাংলার শেষ রাতের ঘনান্ধকারে নিশীথ-নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিপ্লবের রক্তলীলার মধ্যে বাংলার তরুণরা শুনেছে রুদ্র বিধাতার অট্টহাসি কাল ভৈরবের ভয়াল গর্জন– নজরুলের জীবনে কাব্যে সংগীতে ও কণ্ঠে। প্রচণ্ড সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো লেলিহান অগ্নি-শিখার মতো, পরাধীন জাতির তিমির-ঘন অন্ধকারে বিশ্ব বিধাতা নজরুলকে এক স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়ে পাঠিয়েছিলেন এই ধরার ধূলায়। সাহিত্যে সম্মানের সুউচ্চ শিখরে নজরুলকে পথ করে উঠতে হয় নি, পথ তাঁকে হাত ধরে উর্ধ্বে তুলেছে। মহা অভ্যাগতের মতো তাঁর আগমন নন্দিত হয়েছে।

সে এসেছে ঝড়ের মাতন তুলে, বিজয়ীর বেশে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নন্দিত হয়েছিল :

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোকনা লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন॥

সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, পরাধীনতার বিরুদ্ধে নজরুলের অগ্নিমন্ত্র বাঙালি জাতির চিত্তে জাগিয়েছিল মরণজয়ী প্রেরণা, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুকঠিন সংকল্প।

শুধু বিদ্রোহ ও সংগ্রামের ক্ষেত্রেই নয়। শান্তি ও প্রেমের নিকুঞ্জেও কবি বাংলার অমৃত কণ্ঠ বুলবুল। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষার এই বিস্ময়কর প্রতিভার অবদান সম্বন্ধে তেমন কোন আলোচনাই হলো না। বাংলার নিভৃত অঞ্চলে কবির বিস্মৃত-প্রায় যে সব অমূল্য রত্ন ছড়িয়ে আছে তার পুনরুদ্ধারের যে কোন প্রচেষ্টাই প্রশংসার যোগ্য। মনে রাখতে হবে, বিদ্রোহী কবির এমন এক সময়ে আবির্ভাব যখন মধ্যাহ্নে মার্তণ্ডের মতো বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী প্রতিভা সমস্ত দিক, সমগ্র আকাশ, সমস্ত সাহিত্য-চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। কাব্যের অনুভূতি, চেতনার, ছন্দের, সুরের, প্রকাশের যে পথ দৃষ্টিতে পড়ে, সে পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন মেঘেতে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নজরুল কাব্যের অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য হলো, তাঁর কাব্যের স্বকীয়তা আপন মহিমায় ভাস্বর। বৈপ্লবিক কাব্য জগতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন স্বতন্ত্র, একক, একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিত্ব।

চুরুলিয়া গ্রামের পর্ণ কুটির থেকে আগত এক কিশোর আর কলকাতার ইট-পাথরের কামরায় জীবন্ত অবস্থায় অচল, নির্বাক এক অগ্নিগর্ভ যুগস্রষ্টা-এ দুয়ের মধ্যকার সময় খুব দীর্ঘ নয়। এই সময়ের মধ্যে ঘটে গেছে কাব্যের ইতিহাসে, ব্যক্তিত্বের ইতিহাসে, জাতীয়তার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর বিবর্তন। শুধু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে তার অনন্য সৃষ্টি, আর জীবন্ত অবস্থায় পাথরের মূর্তির মতো সকলের কৃপা প্রার্থী ও অসহায় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সংগীতকার।

তাই, কবির সৃষ্টির পূর্ণমূল্যায়নের দায়িত্ব এই বাংলাদেশের বিদগ্ধ সমাজকে নিতে হবে। নজরুল একাডেমী এই কাজে অগ্রণী হয়েছে জেনে আশ্বস্ত হয়েছি। নজরুল জন্মদিনের উৎসবের রেশ স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজে তাঁরা পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করবেন বলে আশা রাখি।

অপরিহার্য রাষ্ট্রীয় কাজে আমার অন্যত্র ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে বলে এই উৎসবে যোগদান আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। তবে একাডেমীর এই মহৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমার প্রাণ মন জড়িত থাকবে। আমি অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।"

সূত্র : *সংবাদ*, বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ১৯৭২

প্রথম জাতীয় বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ উপলক্ষে

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাণী

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২

বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর বীর সেনানীরা জনগণের সহযোগিতায় এবং সহায়তায় সুসজ্জিত হানাদার পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের কাছ থেকেই ছিনিয়ে-নেয়া সামান্য অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায় সংযোজন করেছে। এ কেবল একটি দেশের জন্মের ইতিহাস নয়, এ এক দুর্জয় সাহসিকতায় শত্রুর মোকাবিলার একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ও বটে। আমাদের মুক্তিসংগ্রামে সশস্ত্রবাহিনী, গণবাহিনী এবং জনসাধারণের অবদান চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশের সমস্ত্রবাহিনী হবে জনগণের বাহিনী আর দেশের সার্বভৌমত্বের প্রহরী। দেশের দুর্দিনে যে সশস্ত্রবাহিনী জনগণ ও অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে

পড়েছিল। তাদের দুর্জয় শক্তি নিয়ে আমার বিশ্বাস, প্রয়োজন মূহূর্তে তারা পবিত্র মাতৃভূমি রক্ষার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করবে।

প্রথম জাতীয় বিজয় দিবসে আমি সশস্ত্রবাহিনীকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, শনিবার, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

৭ এপ্রিল ১৯৭৩

২৫তম বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাণী।

আজ ৭ এপ্রিল ১৯৭৩ পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশেরও সর্বত্র এ দিবসটি বিশেষ মর্যাদা সহকারে উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসনে স্বাধীনতালাভের শুরু থেকেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছেন। আমি এ মহান প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৯৭২ সালের মে মাসে আমরা যখন এ মহান সংস্থার সদস্যপদের জন্যে আবেদন করি তখন পাকিস্তানের বিপুল অপ-প্রচারণা সত্ত্বেও পৃথিবীর সকল দেশের সহায়তায় বাংলাদেশ এ বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভ করে। বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে কোন দেশ প্রতিকূলতা প্রদর্শন করে নি। সে জন্যে আমি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে প্রতিটি সদস্যদেশকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জানতে পারলাম, এ বছর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা "গৃহেই স্বাস্থ্যের সূচনা" বা "Health begins at home" এ আদর্শের ওপর কাজ করে যাবেন। আদর্শটি সত্যিই প্রশংসারযোগ্য। তবে, এ আদর্শের বাস্তবায়নে আরো প্রয়োজন হচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা। যুগপৎভাবে এ কার্যক্রম কার্যকরী করতে পারলেই একটি সুস্থ বিশ্বসমাজ গড়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশে গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতালাভের পর থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে প্রত্যেক থানায় ডাক্তার পাঠানো হচ্ছে। ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের শ্রমিকদেরকে পাঠানো হচ্ছে। তাঁরা যুগপৎ রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা ও জন্ম-মৃত্যু নিরোধের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। একদিকে প্রতিটি মানুষ সুস্থ ও সবল দেহে যাতে দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারে এবং অন্যদিকে পরিকল্পিত পরিবার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যাতে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও আনুসঙ্গিক সমস্যাবলীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা যেতে পারে সে জন্য বাংলাদেশ সরকার যাবতীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করে চলেছেন। আমি আশা করি, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতা বাংলাদেশ সরকারের গণমুখী চিকিৎসার আদর্শ বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় সারা বাংলাদেশে আমি এ দিবসটি পালনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

– শেখ মুজিবুর রহমান

সূত্র : *ইত্তেফাক*, শনিবার, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩

সোনার বাংলা গড়ে তুলতে আত্মোৎসর্গ করুন : বঙ্গবন্ধু

৬ জুন ১৯৭৩

বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে আজ থেকে সাত বছর আগে যে বাঙালি বীর শহীদরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের কথা পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

বাঙালি জাতির মুক্তির প্রতীক ৭ জুন পালনের প্রাক্কালে এক বাণীতে বঙ্গবন্ধু বলেন, বিগত ১৯৬৬ সালের এই দিনে তিনি যখন ঐতিহাসিক ছয়-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করার পর কারারুদ্ধ ছিলেন, সে সময় বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্যে শহীদ মনুমিয়া, শহীদ মুজিবুল্লাহ এবং আরও অনেকে তাদের রক্তদান করেছিলেন।

বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্যে যে বীর শহীদরা তাদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন তাদের কথা স্মরণ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার জন্যে এবং একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে পুনরায় আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণের জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু বলেন, লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি বটে কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে এখনও আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু বলেন, অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষে পৌছতে হলে আসুন, আমরা এখন ঐকবদ্ধভাবে কাজ করে যাই, যাতে আমাদের জনগণ অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় পাবে, পাবে জীবনধারণের অবলম্বন। গতকাল বাসস'র এক খবরে এ কথা উল্লেখ করা হয়।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, বৃহস্পতিবার, ৭ জুন ১৯৭৩

নির্যাতিত মানুষের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা : বার্লিন যুব উৎসবে বঙ্গবন্ধুর বাণী

বাংলাদেশ মুক্তিকামী জনতার পাশে থাকবে

২১ জুলাই ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের মানুষ সব সময়ই জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে রত বিশ্বের জনগণের পাশে থাকবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে নির্যাতিত জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন, বিশ্বের নির্যাতিত জনগণের অত্যানিয়ন্ত্রণাধিকার এবং কল্যাণে আমরা বিশ্বাসী।

বার্লিনে বিশ্বযুব উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একথা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন যে বার্লিনে বিশ্বযুব উৎসবে সমবেত বিশ্বের যুব সংস্প্রদায় বিশ্বসমাজের সম্মুখে কল্যাণের পথ উম্মুক্ত করবে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দেবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে গগনবিদারী আওয়াজ তুলবে। এছাড়া বর্তমান পৃথিবীর ক্ষুধা দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ পাবে।

সংগ্রামী বিশ্বযুব সমাজের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, বিশ্বের যুব সমাজ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে আমাদের প্রতি যে সহযোগিতা দেখিয়েছে তা আমরা কোন দিনই ভুলব না।

বার্লিনে বিশ্বযুব উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, যুব সম্প্রদায় যে কোন দেশের কাছেই আশা-আশাঙ্কার এক মূর্ত প্রতীক। পৃথিবীর যে কোন

দেশেই জাগ্রত যুব সমাজ শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে এক সোচ্চারিত কণ্ঠ। বার্লিন যুব উৎসব সারা বিশ্বের যুব সমাজের এক উজ্জ্বল প্রাণকেন্দ্র। বিশ্বযুব সমাজের প্রাণকেন্দ্র এই বার্লিন যুব উৎসবে বিশ্বের যুব সমাজের সমাবেশ ও মহাসম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যুবকদের মধ্যে যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে তাতে তারা পরস্পর পরস্পরকে জানবে বুঝবে এবং ভবিষ্যতের কথা ভাববে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশের যুব সমাজ আমাদের গর্ব। আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আমাদের যুব সমাজের অবদান অবিস্মরণীয়। আজ তারা দেশে শোষণমুক্ত একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলদেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে বিশ্বের যুব সমাজ তাদের যে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছিল তা আমরা কখনও ভুলব না। বিশ্বের নির্যাতিত জনগণের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ সংহতি প্রদান করেছে। জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে রত বিশ্বের জনগণের পাশে আমরা সব সময়েই থাকব। বিশ্বের নির্যাতিত জনগণের কল্যাণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাদিকারে আমরা বিশ্বাসী।

বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, বিশ্বযুব সমাজ পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করবে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দেবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বযুব সমাজ ক্ষুধা দারিদ্র্য আর নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ দেখাবে।

বিশ্বের সংগ্রামী যুবসমাজ আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

গতকাল শনিবার বাসস এ খবর দিয়েছে।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, রবিবার, ২২ জুলাই ১৯৭৩

বঙ্গবন্ধুর ঈদের বাণী

কঠোর শ্রমের মাধ্যমে কঠিন দিনগুলোকে অতিক্রম করতে হবে

২৬ অক্টাবর ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের কঠিন দিনগুলোকে সহজ ও মাধুর্যময় করে তোলার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (২৬ অক্টাবর ১৯৭৩) এ খবর দিয়েছে বাসস।

পবিত্র ঈদুল ফিতরের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বাণীতে বঙ্গবন্ধু বলেন, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংযমের মাস রমজান শেষ হয়ে আসছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ক্লিষ্ট মানুষের দুয়ারে খুশির ঈদ এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু সব রকম অভাব, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা সত্ত্বেও আমাদের এই উৎসব পালন করতে হবে। কারণ, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, ঐক্য ও পরিপূর্ণ মিলনবোধের সুমহান ঐতিহ্যে এই দিনটি উজ্জ্বল।

বঙ্গবন্ধু বলেন, এই পবিত্র দিন উপলক্ষে আমি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশবাসীকে এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদের মোবারকবাদ জানাই।

বঙ্গবন্ধু বলেন, আজ আমাদের মনে রাখতে হবে, সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌছার সংক্ষিপ্ত কোন সড়ক নেই। ঈপ্সিত সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌছাতে হলে সমাজের প্রতিস্তরের মানুষকে কঠোরতম পরিশ্রম করতে হবে। কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য শান্তি অত্যাবশ্যক। দেশের সর্বত্র এবং সমাজের সর্বস্তরে অটুট শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দেশবাসীকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা বলিষ্ঠভাবে পালন করতে হবে। নিশ্চিত সম্ভাবনাকে যারা কৃত্রিম সংকটের ঠুনকো বলয়ে আবদ্ধ করতে চায় সেই সব নগণ্যসংখ্যক ছায়াচরিত্রগুলোকে অবিলম্বে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে হবে। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের কঠিন দিনগুলিকে সহজ করে ঈদের খুশিকে ছিনিয়ে আনতে হবে বাংলার ঘরে ঘরে। সেই অবশম্ভাবী সাফল্যের প্রতীক্ষায় আমি দেশবাসীর ওপর পরম ভরসা করে আছি। ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের হবেই।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, শনিবার, ২৭ অক্টোবর ১৯৭৩

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার মুখবন্ধে বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান

কঠোর শ্রম ও ত্যাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করুন

২৭ নভেম্বর ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ়তর সংকল্প নিয়ে জাতি গঠনের কাজে পূর্ণ আত্মনিয়োগের জন্যে জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু এবং পূর্ণ রূপায়ণের জন্যে দেশবাসীকে তিনি কঠোর পরিশ্রম ও অপরিহার্য আত্মত্যাগের ডাক দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় প্রকাশিত দেশের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) মুখবন্ধে বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর প্রতি এই উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

পরিকল্পনা কমিশনে প্রণীত দেশের এই প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার মুখবন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, দেশের জনগণ যদি সর্বাত্মক সংকল্প নিয়ে কঠোর পরিশ্রম এবং অপরিহার্য আত্মত্যাগে ব্রতী না হয় তাহলে কোন পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হতে পারে না, তা সে পরিকল্পনা যত সুপরিকল্পিতই হোক না কেন।

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার ভূমিকায় বঙ্গবন্ধু গভীর আত্মপ্রকাশ করেন যে, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জনগণ যে দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, দেশের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার রূপান্তরের জন্যেও জনগণ সেই একই সাহসের পরিচয় দেবেন।

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার মুখবন্ধে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, দেশের এই প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র দেড় বছরে মধ্যে দেশের এই প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন যে, স্বাধীনতার পরপরই এই প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়নে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেননা, স্বাধীনতার পর সরকারের কাছে কোন পরিকল্পনা সংগঠন বা প্ল্যানিং মেশিনারি ছিল না, ছিল না অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি। বঙ্গবন্ধু বলেন, এই কারণেই প্রণীত প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় কিছুটা ফাঁক থেকে যেতে পারে।

বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন যে, দেশের অর্থনীতির গতিধারা কোন দিকে প্রবাহিত হবে তা নির্দেশের জন্যে এবং কি কি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সে সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুসমঞ্জস কর্মসূচি নেওয়ার উদ্দেশ্যেই সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা চালু করার সিদ্ধান্ত নেন।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, বুধবার, ২৮ নভেম্বর ১৯৭৩

বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি উপলক্ষে

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ৬, ১৯৭৪

১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম শুমারি। বলা বাহুল্য, শুমারি হচ্ছে জাতীয় জীবনের দর্শন। এর মাঝেই প্রতিফলিত হবে আমাদের বর্তমান অবস্থা কি এবং বোঝা যাবে সুস্থ ও সবল জাতি গঠনে কি আমাদের প্রয়োজন। এই লোক গণনার উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে। অতএব, শুমারির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান যত বেশি নির্ভুল হবে আমাদের কর্মসূচিও হবে বেশি বাস্তব। তাই, আদম শুমারির সফল করার জন্য চাই জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা।

বাংলাদেশের প্রথম শুমারি মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যে লক্ষাধিক কর্মচারী স্বল্প পারিশ্রমিকে নিয়োজিত রয়েছেন তারা উৎসর্গমনা হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করবেন, এ বিশ্বাস আমার রয়েছে। তাদের এই মহৎ প্রচেষ্টার আমি পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। আমি আশা করি, বাংলাদেশের জনগণ সঠিক তথ্য সরবরাহ করে এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলবেন এবং দেশকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ক্রোড়পত্র, রবিবার, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু

মুক্তিযুদ্ধকালীন ত্যাগের মনোভাব লইয়া কাজ করুন– সুদিন ফিরিয়া আসিবে

২৫ মার্চ ১৯৭৪

জাতীয় স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল (২৫ মার্চ '৭৪, সোমবার) মস্কো হইতে প্রেরিত এক বাণীতে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ও বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা অক্ষণ্ন রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশের জনগণের। মস্কোর বারভিকা ক্লিনিকের রোগশয্যা হইতে প্রদত্ত বাণীতে বঙ্গবন্ধু বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন আত্মত্যাগের মনোভাব লইয়া সকলে দেশগড়ার কাজে নিয়োজিত হইলে সুদিন নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। বঙ্গবন্ধু তাঁহার বাণীতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করিয়া গঠনমূলককাজে ব্যাপৃত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু বলেন, আজ আমি অনেক দূরে মস্কো, বারভিকা ক্লিনিকে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছি। এই দিনে আপনাদের কাছে থাকিতে পারিলাম না। এই জন্য নিশ্চয়ই আমি মনোকষ্ট ভোগ করিতেছি। ১৯৭১ সালে এইদিন রাত্রে ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর লোকজন আমার নিজের বাড়ি এবং বাংলাদেশের মানুষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। সেইদিন আমি যে ডাক দিয়াছিলাম এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলাম গ্রেপ্তারের পূর্বে, দেশবাসী জনসাধারণ আমার কথা মতো তাহাদের হত্যার মোকাবিলা করিয়াছিল। তাই, আমার মনে পড়ে লক্ষ লক্ষ শহীদের কথা। লক্ষ লক্ষ মা-বোনের কথা, যাঁহারা নির্যতিত অত্যাচারিত হইয়াছেন। লক্ষ লক্ষ বাপ, মা, ভাইদের কথা– যাঁহারা আপনজনকে হারাইয়াছেন। শয্যায় অসুস্থ অবস্থায় সব সময় তাঁহাদের কথাই আমার মনে পড়ে। আর মনে পড়ে আমার বাংলাদেশের সাড়ে সাত

কোটি দুঃখী মানুষের কথা। আমি আজ আপনাদের কাছে বেশি কিছু বলিতে পারিব না। ডাক্তারেরও হুকুম নাই আমার বেশি কথা বলার। শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভিতর দিয়া বহু ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা পাইয়াছি। এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশের জনসাধারণের। আজ বাংলাদেশের মানুষ অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছে। ভাতের কষ্ট, কাপড়ের কষ্ট, থাকার কষ্ট, শত কষ্ট– যে কষ্টের কোন সীমা নাই। তবে কঠোর পরিশ্রম করিলে সৎ পথে থাকিয়া যদি কাজ করা যায়, যে আত্মত্যাগের মনোভাব লইয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম করিয়াছিল দেশের জনসাধারণ সেই আত্মত্যাগের মনোবল লইয়া যদি তাহারা কাজে আগাইয়া যায় ইনশাল্লাহ্ বাংলার সুদিন একদিন নিশ্চিয়ই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আজ এই দিনে আমার যে আফসোস একদল লোক যাহারা বিদেশিদের হাতের পুতুল হইয়া এবং তাহাদের এজেন্ট হইয়া বাংলাদেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছে এবং ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপ করিতেছে। কেহ কেহ পাটের গুদামে আগুন লাগায়, রেললাইন নষ্ট করে, সরকারি জিনিস-পত্র পোড়াইয়া দেয়, তাহারা বুঝে না, এই সমস্ত সম্পত্তি এই দেশের সাড়ে সাত কোটি জনসাধারণের, কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

আমি আপনাদের কাছে এই দিনে শহীদদের কথা স্মরণ করিয়া শপথ গ্রহণের অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা দেশের গঠনমূলক কাজে হাত দিন। দুর্নীতি হইতে দূরে থাকুন, স্বজনপ্রীতি হইতে দূরে থাকুন আর যাহাতে জনসাধারণ জিনিসপত্র ন্যায্যমূল্যে পায় সেদিকে খেয়াল রাখুন। দুঃখ হয়, একদল লোক গুপ্তহত্যায় লিপ্ত হইয়াছে। যাহারা প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলিয়া থাকে, তাহাদের বাংলার মাটিতে রাজনীতি করার অধিকার আছে কিনা, উহা আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

আজ বড় কর্তব্য হইল, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো। এই দিনে সকলকে আমি আবেদন করিব, আপনারা দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য, সোনার বাংলা গঠন করার জন্য কাজ করুন। নিশ্চয়ই খোদা আপনাদের সহায় আছেন।

আপনারা সকলে দোয়া করেন। তাড়াতাড়ি যেন আরোগ্য লাভ করিয়া আপনাদের কাছে ফিরিয়া আসিতে পারি। যে বাংলার মাটিকে আমি এত ভালোবাসি, যে বাংলার মানুষকে আমি এত ভালোবাসি, যত দূরেই যেখানেই আমি থাকি না কেন, একটি মূহূর্তে জন্য তাহাদের কথা আমি ভুলিতে পারি না। আপনারা আমার বেয়াদবী মাফ করিবেন।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, মঙ্গলবার, ২৬ মার্চ ১৯৭৪

আরাফাতের নিকট বঙ্গবন্ধুর বাণী

সংগ্রাম আমাদের অভিন্ন, বিজয় সুনিশ্চিত

১৩ নভেম্বর ১৯৭৪

গতকাল (১৩ নভেম্বর '৭৪, বুধবার) রাত্রে বাংলাদেশ বেতারের খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিএলও'র সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিন মুক্তিসংস্থা প্রধান জনাব ইয়াসির আরাফাতের নিকট প্রেরিত এক বার্তায় এই আশ্বাস দেন।

জনাব আরাফাত প্যালেস্টাইন প্রশ্নে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিতর্কের ব্যাপারে এখন নিউইয়র্ক রহিয়াছেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণ ও আমার ব্যক্তিগত তরফ হইতে আমি আপনাকে ও ফিলিস্তিনি ভাইদের সাদর অভিনন্দন জানাই।

তিনি বলেন যে, জাতিসংঘের সর্বাধিক সমর্থন আদায় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে আরব ভাইদের সঙ্গে নিজেদের প্রচেষ্টার পূর্ণ সমন্বয় বিধানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে যে, আমাদের অভিন্ন সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় হইবে। কেননা, ন্যায়-বিচার আমাদের পক্ষে রহিয়াছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তার বিষয় সকল আরব রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ও বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থানরত আরব প্রতিনিধিদলের প্রধানদের জানাইয়া দিয়াছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন দান করেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, বৃহস্পতিবার, ১৪ নভেম্বর ১৯৭৪

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু

শোষিতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহান নেতার প্রেরণা পথ দেখাবে

৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪

মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বাণীতে বলেন, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একনিষ্ঠ অনুগামী হিসাবে তাঁর স্নেহ ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা বাংলাদেশের শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে চিরকাল তাঁকে পথ প্রদর্শন করবে। তিনি বলেন, এই মহামানবের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে আমাদের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করছি।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাণীতে বলেন, বাংলার সংগ্রামী সূর্য-সারথি হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর মহাপ্রয়াণের বেদনাবহ দিনটি সমাগত। বাঙালি জীবনের এ অনন্য দিনে আমরা এই মহামানবের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে আমাদের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করছি। সংগ্রামী আওয়ামী লীগের এই প্রতিষ্ঠাতা নেতার আদর্শ আজ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন–শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। আর এই সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে।

বাংলার শোষিত মানুষের উপর সোহরাওয়ার্দী সাহেবের আস্থা ছিল অপরিসীম। তাদের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন। নেতার একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা বাংলাদেশের শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে চিরকাল আমাকে পথ প্রদর্শন করবে।

আজ ৫ ডিসেম্বর সারাদেশে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। দেশবাসীর সঙ্গে আমিও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং অমর স্মৃতির প্রতি নিবেদন করি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪

দ্বিতীয় বিপ্লব সার্থক করতে একুশের আত্মদান জাতির পাথেয় হোক : বঙ্গবন্ধু

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মাহন একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বাণীতে বলেন, দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে অমর একুশের আত্মদানের মহান দৃষ্টান্ত জাতির চলার পথের পাথেয় হোক। রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন :

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আবার আমাদের মাঝে সমাগত। বাংলার মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের অম্লান অবদানের কথা আজ সমগ্র জাতির সঙ্গে আমিও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শহীদদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভাষা আন্দোলনেরই সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি। এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হবে– শোষণহীন সামজ প্রতিষ্ঠা, দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং জাতির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে।

আজ আমাদের দ্বিতীয় বিপ্লব শুরু হয়েছে। দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য এই বিপ্লব সার্থক করে তুলতে শৃঙ্খলার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির মূলোৎপাটন, উৎপাদন বৃদ্ধি, সুনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এই কর্তব্য পালনে অমর একুশের আত্মদানের মহান দৃষ্টান্ত জাতির চলার পথের পাথেয় হোক, শহীদদের পবিত্র স্মৃতি আমাদের নিত্যদিনের সংগ্রামে পথ প্রদর্শন করুক, এই আমার একান্ত কামনা।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, শুক্রবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

আজ শের-এ বাংলার ত্রয়োদশ মৃত্যুবার্ষিকী

শের-এ বাংলার আদর্শ আমাদের পাথেয় হোক : বঙ্গবন্ধু

২৭ এপ্রিল ১৯৭৫

আজ সাতাশে এপ্রিল। জাতি আজ শের-এ বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের ত্রয়োদশ মৃত্যুবার্ষিকী পালন করবে। ১৯৬২ সালের এইদিনে বাংলার সাধারণ মানুষের নয়মনণি প্রিয় 'হক সাহেব' ইন্তেকাল করেন।

এ উপলক্ষে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বাণীতে শের-এ বাংলার অনন্য ব্যক্তিত্বের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর বাণীতে বলেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্‌গাতা হিসেবে এবং বাঙালির সার্বিক কল্যাণে শের-এ বাংলার গৌরবময় ভূমিকা ইতিহাসের এক প্রোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে। এদেশের দুঃখী মানুষের অধিকার আদায়ে তাঁর অবদান যুগে যুগে নির্যাতিত ও শোষিত মানুষকে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রেরণা যোগাবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আজ আমরা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার নতুন সংগ্রামে নিয়োজিত। বাংলাদেশের মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের এই সংগ্রামে শের-এ বাংলার দেশব্রত ও আত্মত্যাগ আমাদের পথ নির্দেশ দিক।

শের-এ বাংলার মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজধানী ঢাকায় জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ছাত্র লীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক ও ছাত্র সংগঠন বহু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সকালে মরহুম নেতার মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, ফাতেহা পাঠ, বিভিন্ন মসজিদে বিশেষ মোনাজাত, মিলাদ মাহফিল, কোরানখানি, আলোচনাসভা এই দিনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে শের-এ বাংলার উপর বিশেষ কর্মসূচি প্রচারিত হবে।

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওামী লীগ সন্ধ্যা সাতটায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেবেন।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা,* ২৭ এপ্রিল ১৯৭৫

মানিক মিয়া প্রেরণার এক উৎস : বঙ্গবন্ধু

১ জুন ১৯৭৫

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলছেন, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন বীর সন্তান এবং জনগণের প্রকৃত বন্ধু। বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণের মুক্তির জন্যে মানিক মিয়ার কলম ছিল সদা জাগ্রত।

মানিক মিয়ার ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের দুর্গত জনগণের মুখে হাসি ফুটানো ও জনগণের কল্যাণের জন্যে মানিক মিয়া আজও প্রেরণার এক উৎস হয়ে আছেন।

তিনি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে বলেন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে জাতির অভিযাত্রায় মানিক মিয়ার অমর আদর্শ সহায়ক হবে। তিনি বলেন, মানিক মিয়ার অমর স্মৃতি আমাদের মনে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা,* ১ জুন ১৯৭৫

সংবাদপত্রে "বাংলার স্বাধিকার" শিরোনামে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাইয়া নিজ স্বহস্তে লেখা

বঙ্গবন্ধুর বাণী

বাংলা দেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য আমাদের আজকের এই সংগ্রাম। অর্জিত বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। বুলেট বেয়নেট দিয়ে বাংলা দেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবেনা। কেননা মনতা আর ঐক্যবদ্ধ।

লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আর আর গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের দাবী ন্যায় সংগত। তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।

বাংলা দেশের স্বাধিকার আন্দোলন দৃঢ়তর করার অন্যতম প্রচেষ্টা হিসেবে সংবাদপত্র সমূহের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা।

শেখ মুজিবুর রহমান
১১/৩/৭১

সূত্র : ইত্তেফাক, ২২ মার্চ ১৯৭১

"–কোন ব্যক্তির খেয়ালের উপর নয়, বরং জনগণের ইচ্ছাই সরকারি নীতির ভিত্তি হতে হবে। গণতন্ত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে আমি সচেতন; কারণ, গণতন্ত্র মানুষেরই তৈরি। এর অনেক অপরিহার্য ত্রুটি আছে কিন্তু মোটের উপর গণতন্ত্রই হচ্ছে প্রগতি ও বিবর্তনের একমাত্র নিশ্চিতপথ। একে শুধু সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগই দিতে হবে না, বরং একে এই রাজনৈতিক স্বতন্ত্র সিদ্ধরূপে গ্রহণ করতে হবে যে, নির্ভুল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।" –**সোহরাওয়ার্দী**

বঙ্গবন্ধুর বাণী

বাংলার সংগ্রামী চেতনার সূর্যসন্তান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মহাপ্রাণের বিয়োগবিধূর দিনটি আবার এসেছে। এই দিনটি বাঙালি জীবনের একটি অনন্য দিন। এদিনে আমরা শুধু অভিভাবক হারিয়েছি তাই নয়, এদিনে আমরা এক মহামানবের অনুসরণে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছি।

আজীবন সংগ্রামী আওয়ামী লীগের এই প্রতিষ্ঠাতা নেতা সশরীরে আমাদের মধ্যে না থাকলেও তাঁর অনুসৃত আদর্শ আজ অবিসংবাদিত সত্য হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের সাধক এই মহামানব যে শাশ্বত মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন সেই মূল্যবোধকে সমাজের প্রতিস্তরে প্রতিষ্ঠিত করার সার্বিক প্রয়াস আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আজীবন সংগ্রাম করেছেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। অতি পরিচিত পাশব শক্তির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম পরিচালনা করলেও, এ সংগ্রামের একটা নীতিমালা ছিল। আর সে নীতিমালাই তাঁর জীবনে মূল্যবোধের স্মারক।

বাংলার মানুষের উপর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অসীম আস্থা ছিল। তিনি তাদের ভালোবাসতেন তাঁর প্রাণের চাইতেও বেশি। বাংলার গণমানুষের অধিকার নিয়ে তিনি কোনদিন আপস করেন নি। তাই, তাঁর আপসহীন সংগ্রামী চেতনা আমাদের মাঝে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। নেতার একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ, ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তা চিরকাল আমার পাথেয় হয়ে থাকবে।

আজ সমগ্র দেশে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। দেশবাসীর সঙ্গে আমিও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। জয় বাংলা।

(শেখ মুজিবুর রহমান)
৫/১২/৭৩

সূত্র: বাংলার বাণী, বুধবার, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩

দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৪ উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সভাপতি

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাণী

প্রধানমন্ত্রী
ঢাকা
২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৩

শত সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন আগামী ১৮, ১৯, ২০শে জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের দেশ ও জাতির এই বিশেষ মুহূর্তে এই ঐতিহাসিক অধিবেশন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪৯ সালের জুন মাসে এই প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনের পর থেকে আমরা ধাপে ধাপে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিয়ে যাই। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানি শাসন আমলে প্রত্যেকটি গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে, সুখে-দুঃখে সর্বদা জনগণের পাশে থেকেছে। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরই চরমরূপ ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ও বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম।

আজ বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখী মানুষের মুখে এখনও হাসি ফোটে নি, অর্জিত হয় নি অর্থনৈতিক মুক্তি। চব্বিশ বছরের সুমহান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ রেখেই এবারের দেশগড়ার সংগ্রামেও আওয়ামী লীগকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দেশগড়ার কাজে, গড়ে তুলতে হবে সোনার বাংলা। আত্ম-সমালোচনা, আত্ম-সংযম আর আত্ম-শুদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টি করতে হবে সোনার মানুষ। স্বাধীনতার সাধ পৌঁছে দিতে হবে প্রতিটি শ্রমিক-কৃষক-দুঃখী মানুষের কাছে। অন্যথায় ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মা, আড়াই লক্ষ ইজ্জত হারা মা-বোনের আর্তচীৎকার, ছেলেহারা মায়ের আর্তনাদ আমাদের ক্ষমা করবে না।

আমার স্থির বিশ্বাস, যে আত্মপ্রত্যয় ও চেতনাবোধ নিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মীরা স্বাধীনতা যুদ্ধের মরণজয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই বলিষ্ঠতা নিয়েই তারা আজকের এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবেন। আসন্ন কাউন্সিল অধিবেশন দেশবাসী বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের কাছে প্রেরণাদায়ক হয়ে উঠুক, সাফল্যমণ্ডিত হোক। জয় বাংলা।

(শেখ মুজিবুর রহমান)
২৮/১২/৭৩

সূত্র : ইত্তেফাক, ক্রোড়পত্র, শুক্রবার, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেস ১৯৭৪ উপলক্ষে

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাণী

প্রধানমন্ত্রী
ঢাকা
২৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রথম কংগ্রেস উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

বলাবাহুল্য, আজ জনসাধারণ যুব সমাজের কাছ থেকে সৎ ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব আশা করে। দেশের সার্বিক উন্নতির জন্যে দেশগড়ার কাজে সুশৃঙ্খল যুব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমি আশা করি, আওয়ামী যুবলীগ কর্মীরা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

আমি আওয়ামী যুবলীগের প্রথম কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করছি।

(শেখ মুজিবুর রহমান)
২৯/১/৭৪

সূত্র : ইত্তেফাক, ক্রোড়পত্র, বুধবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মদ নিষিদ্ধ : বঙ্গবন্ধু

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মদ পরিবেশন নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া 'এনা' পরিবেশিত এক খবরে জানা যায়।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, রবিবার, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২

তদ্বির চলিবে না : বঙ্গবন্ধু

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শনিবার ১৫ জানুয়ারি (১৯৭২) দলীয় লোকদিগকে তদ্বিরের ব্যাপারে মন্ত্রীদের কক্ষে ভীড় না জমাইয়া মন্ত্রীবর্গকে নীরবে কাজ করিতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন।

সূত্র : *সংবাদ*, রবিবার, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২

লাল ফিতার দৌরাত্ম্য অবসানকল্পে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ

ঢাকা, ১০ জুন ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শনিবার ১০ জুন (১৯৭২) সরকারি কর্মচারীদের প্রতি এক নির্দেশনামায় বলেন যে, সকল চিঠিপত্র, আদেশ, নির্দেশ এবং দলিলাদি এখন হইতে একই শহরের মধ্যে সরকারি কর্মচারীরা সরাসরি নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করিবেন। সিডিও'র মাধ্যমে আদান-প্রদান করিবেন না, সরকারি কর্মচারীরা চিঠিপত্র, নির্দেশ বা দলিল পাওয়ার তারিখ ও সময় উল্লেখ করিবেন।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অবশ্য বলা হয় যে, শহরের বাহিরে চিঠিপত্র বা সরকারি দলিল প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সিডিও'র মাধ্যমে প্রেরিত হইবে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আরও বলা হয় যে, এই ধরনের চিঠিপত্র, নির্দেশ বা দলিলাদি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সেকশন অফিসাররা ৭২ ঘন্টা, ডেপুটি সেক্রেটারিরা ৪৮ ঘন্টা এবং আরও উর্ধ্বতন কর্মচারীরা মাত্র ২৪ ঘন্টা সময় নিতে পারিবেন।

জটিল ব্যাপারে সেক্রেটারি, অতিরিক্ত সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, ডিরেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা একযোগে বসিয়া এক দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

লালফিতার দৌরাত্ম্য অবসানের জন্যই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু এই নির্দেশ জারি করিয়াছেন।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ১১ জুন ১৯৭২

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ

মহিলাদের চাকরিতে সমান সুযোগ দিতে হবে

ঢাকা, ১৯ জুন ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের শিক্ষিতা ও সক্ষম মহিলাদের চাকরির সমান সুযোগদানের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।

চাকরিতে মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোন রকম বৈষম্য করা হবে না এটা সুনিশ্চিত করার জন্যে বঙ্গবন্ধু সকল মন্ত্রণালয়, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিও নির্দেশ দিয়েছেন।

মহিলাদের জন্যে চাকরির সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা এবং অবিলম্বে এ সম্পর্কে তাদের সুপারিশ এসটাবলিশমেন্ট ডিভিশনে পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী সকল মন্ত্রণালয় ও উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দিয়েছেন। দেশের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধানের জন্যে সরকার যে কর্মসূচি নিয়েছেন মহিলাদের চাকরি সমস্যার সমাধানের জন্যে বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ তারই অংশবিশেষ বলে এনার এ খবরে উল্লেখ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু সকাশে খাদি সমবায় সমিতি প্রতিনিধিদল

গতকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন যে, দেশের কাঁচামালের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের বিকাশের জন্য সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য ও উৎসাহ দেবেন।

বাসস'র খবরে বলা হয় যে, গতকাল সকালে ফেনীর নতুন মুন্সীরহাট খাদি শিল্প সমবায় সমিতির একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাদের উপরোক্ত আশাবাদ দেন।

খাদি প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদিত সুতা দিয়ে তৈরি খদ্দরের কিছু নমুনা প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন।

উল্লেখ করা যায় যে, খাদি সমিতি আগামী শীতকালে দেশজ সুতা দিয়ে এক লাখ খণ্ড খদ্দর তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, বুধবার, ২০ জুন ১৯৭৩

'৬৯-৭০ সালের সব রাজনৈতিক মামলা তুলে নাও : বঙ্গবন্ধু

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩

১৯৬৯-৭০ সালের গণআন্দোলনের সময় রুজু করা যে সব রাজনৈতিক মামলা এখনো আদালতে ঝুলছে, তা সব তুলে নেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন। ওই সব মামলায় যদি ইতোমধ্যেই কেউ সাজা পেয়ে আটক থেকে থাকেন, তাদেরকেও আসন্ন বিজয় দিবসের আগে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

গতকাল (মঙ্গলবার) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মালেক উকিল আরো জানান, বঙ্গবন্ধুর ঐ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। জেলা ও মহকুমা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত স্মরণ্য, '৬৯-৭০-এর ঐতিহাসিক গণআন্দোলনকালে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক ও শাসকচক্র হাজার হাজার কৃষক শ্রমিক ও ছাত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা দায়ের করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, বিতর্কিত মামলাগুলো সম্পর্কে জেলা তদন্ত কমিটি সিদ্ধান্ত নেবেন। ইতিপূর্বেই ওই কমিটি গঠিত হয়েছে।

আলোচ্য মামলাগুলো দ্রুত বাছাইয়ের কাজে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদ সদস্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যে সব সাজানো মামলা দায়ের করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতির ১৬ নং আদেশ বলে তা আগেই তুলে নেয়া হয়েছে।

সূত্র : *বাংলার বাণী*, বুধবার, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ [বিপিআই প্রদত্ত

মন্ত্রীদের সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে

বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত

গণভবন, ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

সব মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রী এবং যেসব ব্যক্তি এ ধরনের পদমর্যাদা ভোগ করছেন— তাঁদের নামে, তাঁদের স্ত্রী এবং তাঁদের সন্তানদের নামে যে সম্পদ ও সম্পত্তি আছে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে হিসাব দাখিল করতে হবে।

মঙ্গলবার ১৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৫) সকালে গণভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপরাষ্ট্রপতিও এই সিদ্ধান্তের আওয়াতায় আসবেন।

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক এক ঘন্টার বেশি সময় স্থায়ী হয়। উপরাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব এম মনসুর আলী এবং ঢাকায় উপস্থিত মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য সদস্য এই বৈঠকে যোগদান করেন।

সূত্র : *বাংলার বাণী*, বুধবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

সংসদ সদস্যদের সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে

ঢাকা, ১৩ মার্চ ১৯৭৫

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় সংসদ সদস্যদের প্রতি ৩০ এপ্রিলের (১৯৭৫) মধ্যে তাঁদের নিজ নামে ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে রাখা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব তাঁর কাছে দাখিলের অনুরোধ জানিয়েছেন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৫) রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও অনুরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁদের নিজ নামে ও তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের নামে রাখা সম্পত্তির হিসাব রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাসস'র এক খবরে একথা জানানো হয়েছে।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, ১৪ মার্চ ১৯৭৫

৯০ হাজার রেডিও ও ছয় হাজার টিভি সেট সরবরাহ করা হবে

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ : সস্তায় রেডিও-টিভি দেওয়ার ব্যবস্থা

এক ব্যান্ডের রেডিও ও ২০ ইঞ্চি টিভির লাইসেন্স ফি বাতিল

ঢাকা, ৩ জুলাই ১৯৭৫

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনের কোন কোন জনপ্রিয় ব্যান্ড যাতে সস্তায় পাওয়া যায়, তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে, বেশ কয়েকটি আদেশ প্রদান করেছেন।

বাসস'র খবরে প্রকাশ, একটি কার্যকর জনসংযোগ মাধ্যম হিসেবে রেডিও ও টেলিভিশনের ব্যবহার জনপ্রিয় করাই এই আদেশের লক্ষ্য।

চলতি অর্থ বছরে ৭৫ হাজার সেট এক ব্যান্ডের রেডিও, ১৫ হাজার সেট দুই বা তিন ব্যান্ডের রেডিও, পাঁচ হাজার সেট ২০ ইঞ্চি টেলিভিশন ও এক হাজার সেট ২৪ ইঞ্চি টেলিভিশন উৎপাদন বা সংযোজনের জন্যে সরঞ্জাম আমদানির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে আদেশ দিয়েছেন।

এক ব্যান্ডের রেডিও যাতে সস্তায় পাওয়া যায়, সেজন্যে রাষ্ট্রপতি এক ব্যান্ডের রেডিও'র ওপর থেকে লাইসেন্স ফি, আমদানি কর ও বিক্রয় কর প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছেন।

এক ব্যান্ডের রেডিও সেটের দাম ২১০ টাকা থেকে ২৪৫ টাকার মধ্যে সীমিত রাখার জন্যে নামমাত্র হারে শুধু শুল্ক ধার্য করা হবে।

২০ ইঞ্চি টেলিভিশন সেটের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি লাইসেন্স ও অন্যান্য ফি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন। এর পরিবর্তে, এই সেটের দাম সাড়ে তিন হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে শুল্ক হিসেবে আড়াইশ টাকা ধার্য করা হবে।

তবে সরবরাহ ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্যে ২০ ইঞ্চি টেলিভিশন সেট বিক্রয়ে বর্তমান পারমিট ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

বঙ্গবন্ধু স্কুল, কলেজ, সমবায় সমিতি, কমিউনিটি সেন্টার ও অনুরূপ অন্যান্য সংস্থাকে রেডিও ও টেলিভিশন সেট সরবরাহের জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

দেশে ড্রাই ব্যাটারি সেলের অভাব দূর করার উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি চলতি বাণিজ্য মৌসুম থেকে ড্রাই ব্যাটারি সেল সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে সুপারিশ করার জন্যে একটি কমিটি গঠন করেছেন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্প্রতি রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র পরিদর্শনকালে সস্তায় টেলিভিশন সেট পাওয়ার ব্যাপারে স্কিম তৈরির জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য যে, রেডিও ও টেলিভিশনকে আর বিলাস দ্রব্য হিসেবে গণ্য করা হয় না।

সূত্র : *দৈনিক বাংলা*, ৪ জুলাই ১৯৭৫

"চালনা বন্দর শ্রমিক কল্যাণ তহবিল" গঠনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ

ঢাকা, ৯ আগস্ট ১৯৭৫

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চালনা বন্দরে কর্মরত শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে "চালনা বন্দর শ্রমিক কল্যাণ তহবিল" গঠনের জন্য ৯ আগস্ট শনিবার এক নির্দেশ দিয়াছেন। বাসস'র খবরে প্রকাশ, এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

১৯০৮ সালের বন্দর আইনের (১৯০৮ সালের ১৫ নম্বর আইন) ৫ এর খ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এই নির্দেশ দিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতির এই আদেশের অধীনে চালনা বন্দর শ্রমিকরা চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিকদের মতো এই কল্যাণ তহবিলের সুফল ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

চালনা বন্দর শ্রমিকরা এই ধরনের কল্যাণ তহবিলের সুফল ও সুযোগ-সুবিধা পাইতেছেন না, এইমর্মে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি এই নির্দেশ জারি করেন।

এই আদেশ অনুযায়ী সকল স্টিভেডর ও শ্রমিক ঠিকাদার নিম্নলিখিত হারে এই তহবিলে অর্থ প্রদান করিবেন :

ক. স্টিভেডর-বোঝাই ও খালাস করা প্রতি টন মালে ২৭ পয়সা।

খ. শ্রমিক ঠিকাদার-বোঝাই ও খালাস করা প্রতি টন মালে ১৭ পয়সা।

রাষ্ট্রপতির নিদের্শ অনুযায়ী গঠিত এই তহবিলের অর্থ চালনা বন্দরে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করা হইবে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী এই তহবিল পরিচালনার ভার পোর্ট ডিরেক্টরের উপর ন্যস্ত থকিবে।

এই তহবিল পরিচালনার ব্যাপারে ডিরেক্টর সরকারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে তিনি এই অর্থ জমা দিবেন এবং হিসাব রক্ষা করিবেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, বঙ্গবন্ধু ইতিপূর্বেই চালনা বন্দর শ্রমিকদরে নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধি করিয়া চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিকদের সমানে উন্নীত করার নিদের্শ দিয়াছেন। বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশে চালান বন্দর শ্রমিকরা শতকরা ৮৫ ভাগ বেশি মজুরি পাইবেন।

সূত্র : ইত্তেফাক, রবিবার, ১০ আগস্ট ১৯৭৫

সাক্ষাৎকার

ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের নেওয়া

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার

১৮ জানুয়ারি ১৯৭২

১৯৬৯-৭২ সময়ে আমেরিকায় ডেভিড ফ্রস্ট শো বিভিন্ন টেলিভিশন স্টেশন থেকে প্রচারিত হতো। ডেভিড ফ্রস্ট (পরবর্তীতে স্যার) তখন একই সঙ্গে লন্ডনে বিবিসিতে ও আমেরিকায় আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম করতেন। ১৯৭২ সালে পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলে ডেভিড ফ্রস্ট ঢাকায় এসে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। 'ডেভিড ফ্রস্ট প্রোগ্রাম ইন্ বাংলাদেশ' শীর্ষক এক ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে এই সাক্ষাৎকার আমেরিকায় অনেক টেলিভিশন স্টেশনে যথা WNEW নিউইয়র্ক বা WTTG ওয়াশিংটনে ১৮ জানুয়ারি প্রদর্শিত হয়। পুরো সাক্ষাৎকারটি ভারত সরকার প্রকাশিত বাংলাদেশ ডকুমেন্টস দ্বিতীয় খণ্ড সংকলনে আছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারটির পূর্ণ বিবরণ :

ডেভিড ফ্রস্ট : সে রাতের কথা আপনি বলুন। সেই রাত, যে রাতে একদিকে আপনার সঙ্গে যখন চলছিল আলোচনা এবং যখন সেই আলোচনার আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছিল, সেই রাতের কথা বলুন। সেই ২৫শে মার্চ, রাত আটটা। আপনি আপনার বাড়িতে ছিলেন। সেই বাড়িতেই পাকিস্তানি বাহিনী আপনাকে গ্রেপ্তার করেছিল। আমরা শুনেছিলাম, টেলিফোনে আপনাকে সাবধান করা হয়েছিল, সামরিক বাহিনী অগ্রসর হতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু আপনি আপনার বাড়ি পরিত্যাগ করলেন না। আপনি গ্রেপ্তার হলেন। কেন আপনি নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গেলেন না এবং গ্রেপ্তারবরণ করলেন? কেন এই সিদ্ধান্ত? তার কথা বলুন।

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, সে এক কাহিনী। তা বলা প্রয়োজন। সে সন্ধ্যায় আমার বাড়ি পাকিস্তান সামরিক জান্তার কম্যান্ডো বাহিনী ঘেরাও করেছিল। ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রথমে ওরা ভেবেছিল, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে ওরা আমায় হত্যা করবে এবং প্রচার করে দেবে যে, তারা যখন আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আপসের আলোচনা করছিল, তখন বাংলাদেশের চরমপন্থীরাই আমাকে হত্যা করেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরুনো-না-বেরুনো নিয়ে চিন্তা করলাম। আমি জানতাম, পাকিস্তানি বাহিনী এক বর্বর বাহিনী। আমি জানতাম, আমি আত্মগোপন করলে, ওরা দেশের সমস্ত মানুষকেই হত্যা করবে। এক হত্যাযজ্ঞ ওরা সমাধা করবে। আমি স্থির করলাম, আমি মরি, তাও ভালো, তবু আমার প্রিয় দেশবাসী রক্ষা পাক।

ফ্রস্ট : আপনি হয়ত কলকাতা চলে যেতে পারতেন।

শেখ মুজিব : আমি ইচ্ছা করলে যে-কোন জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু আমার দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে আমি কেমন করে যাব? আমি তাদের নেতা। আমি সংগ্রাম করব। মৃত্যুবরণ করব। পালিয়ে কেন যাব? দেশবাসীর কাছে আমার আহবান ছিল, তোমরা প্রতিরোধ গড়ে তোল।

ফ্রস্ট : আপনার সিদ্ধান্ত অবশ্যই সঠিক ছিল। কারণ, এই ঘটনাই বিগত ন'মাস ধরে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আপনাকে তাদের একটি বিশ্বাসের প্রতীকে পরিণত করেছে। আপনি তো এখন তাদের কাছে প্রায় ঈশ্বরবৎ।

শেখ মুজিব : আমি তা বলিনে। কিন্তু এ কথা সত্য, তারা আমাকে ভালোবাসে। আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবেসেছিলাম। আমি তাদের জীবন রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হানাদার বর্বর বাহিনী আমাকে সে রাতে আমার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল। ওরা আমার নিজের বাড়ি ধ্বংস করে দিল। আমার গ্রামের বাড়ি, যেখানে ৯০ বছরের বৃদ্ধ পিতা এবং ৮০ বছরের বৃদ্ধা জননী ছিলেন, গ্রামের সে বাড়িও ধ্বংস করে দিল। ওরা গ্রামে ফৌজ পাঠিয়ে আমার বাবা-মাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে তাদের চোখের সামনে সে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। বাবা-মার আর কোন আশ্রয় রইল না। ওরা সব কিছুই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে পেলে ওরা আমার হতভাগ্য মানুষদের হত্যা করবে না। কিন্তু আমি জানতাম, আমাদের সংগঠনের শক্তি আছে। আমি একটি শক্তিশালী সংগঠনকে জীবনব্যাপী গড়ে তুলেছিলাম। জনগণ তার ভিত্তি। আমি জানতাম, তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। আমি তাদের বলেছিলাম, প্রতি ইঞ্চিতে তোমরা লড়াই করবে। আমি বলেছিলাম, হয়ত এটাই আমার শেষ নির্দেশ। কিন্তু মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত তাদের লড়াই করতে হবে। লড়াই তাদের চালিয়ে যেতে হবে।

ফ্রস্ট : আপনাকে ওরা ঠিক কিভাবে গ্রেপ্তার করেছিল? তখন তো রাত ১.৩০ মি. ছিল? তাই নয় কি? তখন কি ঘটল?

শেখ মুজিব : ওরা প্রথমে আমার বাড়ির ওপর মেশিনগানের গুলি চালিয়েছিল।

ফ্রস্ট : ওরা যখন এলো, তখন আপনি বাড়ির কোনখানটাতে ছিলেন?

শেখ মুজিব : এই যেটা দেখছেন, এটা আমার শোবার ঘর। আমি এই শোবার ঘরেই তখন বসেছিলাম। এদিক থেকে ওরা মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করে। তারপরে এদিক, ওদিক—সবদিক থেকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। জানালার ওপর গুলি চালায়।

ফ্রস্ট : এগুলো সব তখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, সব ধ্বংস করেছিল। আমি তখন আমার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে ছিলাম। একটা গুলি আমার শোবার ঘরে এসে পড়ে। আমার ছ'বছরের ছোট ছেলেটি বিছানার ওপর তখন শোয়া ছিল। আমার স্ত্রী এই শোবার ঘরে দুটি সন্তানকে নিয়ে বসেছিলেন।

ফ্রস্ট : পাকিস্তান বাহিনী কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিল?

শেখ মুজিব : সবদিক দিয়ে। ওরা এবার জানালার মধ্য দিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমি আমার স্ত্রীকে সন্তান দুটি নিয়ে বসে থাকতে বলি। তারপর তার কাছ থেকে উঠে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি।

ফ্রস্ট : আপনার স্ত্রী কিছু বলেছিলেন?

শেখ মুজিব : না, কোন শব্দ উচ্চারণের তখন অবস্থা নয়। আমি শুধু তাকে একটি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম। আমি দুয়ার খুলে বাইরে বেরিয়ে ওদের গুলি বন্ধ করতে বলেছিলাম। আমি বললাম : "তোমরা গুলি বন্ধ কর। আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা গুলি করছ কেন? কি তোমরা চাও?" তখন চারদিক থেকে ওরা আমার দিকে ছুটে এলো, বেয়নেট উদ্যত করে। ওদের একটা অফিসার আমাকে ধরল। ওই অফিসারই বলল : "এই! ওকে মেরে ফেল না।"

ফ্রস্ট : একটা অফিসারই ওদের থামিয়েছিল?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, ওই অফিসারটি থামিয়েছিল। ওরা তখন আমাকে এখান থেকে টেনে নামাল। ওরা পেছন থেকে আমার গায়ে, পায়ে বন্দুকের কুদো দিয়ে মারতে লাগল। অফিসারটা আমাকে ধরেছিল। তবু ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে টেনে নামাতে লাগল। আমি বললাম : "তোমরা আমাকে টানছ কেন? আমি তো যাচ্ছি।" আমি বললাম : "আমার তামাকের পাইপটা নিতে দাও।" ওরা একটু থামল। আমি ওপরে গিয়ে আমার তামাকের পাইপটা নিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী তখন দুটি ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে কিছু কাপড়-চোপড়সহ একটি ছোট স্যুটকেস দিলেন। তাই নিয়ে আমি নেমে এলাম। চারদিকে তখন আগুন জ্বলছিল। আজ এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে ওরা আমায় নিয়ে গেল।

ফ্রস্ট : আপনার ৩২ নং ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে সেদিন যখন আপনি বেরিয়ে এলেন, তখন কি ভেবেছিলেন, আর কোনদিন আপনি এখানে ফিরে আসতে পারবেন?

শেখ মুজিব : না, আমি তা কল্পনা করতে পারি নি। আমি ভেবেছি, এই-ই শেষ। কিন্তু আমার মনের কথা ছিল : আজ আমি যদি আমার দেশের নেতা হিসেবে মাথা উঁচু রেখে মরতে পারি, তাহলে আমার দেশের মানুষের অন্তত লজ্জার কোন কারণ থাকবে না। কিন্তু আমি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, আমার দেশবাসী পৃথিবীর সামনে আর মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। আমি মরি, তাও ভাল। তবু আমার দেশবাসীর যেন মর্যাদার কোন হানি না ঘটে।

ফ্রস্ট : শেখ সাহেব, আপনি একবার বলেছিলেন : 'যে-মানুষ মরতে রাজি, তুমি তাকে মারতে পার না।' কথাটি কি এমনই ছিল না?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। যে-মানুষ মরতে রাজি, তাকে কেউ মারতে পারে না। আপনি একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন। সে তো তার দেহ। কিন্তু তার আত্মাকে কি আপনি হত্যা করতে পারেন? না, তা কেউ পারে না। এটাই আমার বিশ্বাস। আমি একজন মুসলমান। এবং একজন মুসলমান একবারই মাত্র মরে, দুবার নয়। আমি মানুষ। আমি মনুষ্যত্বকে ভালোবাসি। আমি আমার জাতির নেতা। আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি। আজ তাদের কাছে আমার আর কিছু দাবি নেই। তারা আমাকে ভালোবেসেছে। সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েছে। কারণ, আমি আমার সব কিছুকে তাদের জন্যে দিবার অঙ্গীকার করেছি। আজ আমি তাদের মুখে হাসি দেখতে চাই। আমি যখন আমার প্রতি আমার দেশবাসীর স্নেহ-ভালোবাসার কথা ভাবি, তখন আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই।

ফ্রস্ট : পাকিস্তানি বাহিনী আপনার বাড়ির সবকিছুই লুট করে নিয়েছিল?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, আমার সব কিছুই ওরা লুট করেছে। আমার ঘরের বিছানাপত্র, আলমারি, কাপড়-চোপড়—সব কিছুই লুণ্ঠিত হয়েছে। মি. ফ্রস্ট, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এ বাড়ির কোন কিছুই আজ নেই।

ফ্রস্ট : আপনার বাড়ি যখন মেরামত হয়, তখন এসব জিনিস লুণ্ঠিত হয়েছে, না পাকিস্তানিরা সব লুণ্ঠন করেছে?

শেখ মুজিব : পাকিস্তানি ফৌজ আমার সবকিছুই লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু এই বর্বর বাহিনী আমার আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, আমার সন্তানদের দ্রব্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করেছে, তাতে আমার দুঃখ নেই। আমার দুঃখ, ওরা আমার জীবনের ইতিহাসকে লুণ্ঠন করেছে। আমার ৩৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের দিনলিপি ছিল। আমার একটি সুন্দর লাইব্রেরি ছিল। বর্বররা আমার প্রত্যেকটি বই আর মূল্যবান দলিলপত্র লুণ্ঠন করেছে। সবকিছুই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিয়ে গেছে।

ফ্রস্ট : তাই আবার সেই প্রশ্নটা আমাদের সামনে আসে—কেন ওরা সবকিছু লুণ্ঠন করল?

শেখ মুজিব : এর কি জবাব দেব? আসলে ওরা মানুষ নয়। কতগুলো ঠগ, দস্যু, উন্মাদ, অমানুষ আর অসভ্য জানোয়ার। আমার নিজের কথা ছেড়ে দিন। তা নিয়ে আমার কোন ক্ষোভ নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন, ২ বছর—৫ বছরের শিশু, মেয়েরা—কেউ রেহাই পেল না। সব নিরীহ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে। আমি আপনাকে দেখিয়েছি সব জ্বালিয়ে দেওয়া, পোড়াবাড়ি, বস্তি। একেবারে গরিব, না-খাওয়া মানুষ সব বাস করত এই বস্তিতে। বস্তির মানুষ জীবন নিয়ে পালাতে চেয়েছে। আর সেইসব মানুষের উপর চারদিক থেকে মেশিনগান চালিয়ে হাজারে হাজারে হত্যা করা হয়েছে।

ফ্রস্ট : কি আশ্চর্য! আপনি বলছেন, ওদের ঘরে আগুন দিয়ে ঘর থেকে বার করে, খোলা জায়গায় পলায়মান মানুষকে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করেছে।

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, এমনিভাবে গুলি করে তাদের হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট : কোন্ মানুষকে মারল, তার কোন পরোয়া করল না?

শেখ মুজিব : না, তার বিন্দুমাত্র পরোয়া করে নি।

ফ্রস্ট : কেবল হত্যার জন্য হত্যা—যাকে পেয়েছে, তাকেই হত্যা করেছে?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। ওরা ভেবেছে প্রত্যেকেই শেখ মুজিবের মানুষ। তাই প্রত্যেককেই হত্যা করতে হবে।

ফ্রস্ট : আপনি যখন দেখেন, মানুষ মানুষকে এমনিভাবে হত্যা করছে, তখন আপনার কি মনে হয়? আপনি কি মনে করেন, মানুষ আসলে ভালো? কিংবা মনে করেন মানুষ আসলেই খারাপ?

শেখ মুজিব : ভালো-মন্দ সর্বত্রই আছে। মনুষ্যত্ব আছে, এমন মানুষও আমি দেখেছি। কিন্তু আমি মনে করি, পশ্চিম পাকিস্তানের এই ফৌজ—এগুলো মানুষ নয়। এগুলো পশুরও অধম। মানুষের যে পাশবিক চরিত্র না থাকতে পারে, তা নয়। কিন্তু যে-মানুষ, সে পশুর অধম হয় কি প্রকারে? কিন্তু এই বাহিনী তো পশুরও অধম। কারণ, একটা পশু আক্রান্ত হলেই মাত্র আক্রমণ করে। তা নইলে

নয়। পশু যদি মানুষকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে, তবু সে তাকে অত্যাচার করে না। কিন্তু এই বর্বরের দল আমার দেশবাসীকে কেবল হত্যা করে নি। দিনের পর দিন বন্দি মানুষকে অত্যাচার করেছে। ৫ দিন, ৭ দিন, ১৫ দিন নির্মম অত্যাচার করেছে, আর হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট : পাকিস্তানে বন্দি থাকাকালে ওরা আপনার বিচার করেছিল। সেই বিচার সম্পর্কে কিছু বলুন।

শেখ মুজিব : ওরা একটা কোর্ট মার্শাল তৈরি করেছিল। তাতে পাঁচজন ছিল সামরিক অফিসার। বাকি কয়েকজন বেসামরিক অফিসার।

ফ্রস্ট : আপনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনল ওরা?

শেখ মুজিব : অভিযোগ—রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র, আরও কত কী!

ফ্রস্ট : আপনার পক্ষে কোন আইনজীবী ছিলেন? আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন উপায় ছিল?

শেখ মুজিব : সরকারের তরফ থেকে গোড়ায় এক উকিল দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন দেখলাম অবস্থাটা এমনই যে, যুক্তির কোন দাম নেই; দেখলাম, এ হচ্ছে বিচারের এক প্রহসন মাত্র, তখন আমি কোর্টে নিজে দাঁড়িয়ে বললাম : জনাব বিচারপতি, দয়া করে আমাকে সমর্থনকারী উকিল সাহেবদের যেতে বলুন। আপনারা বিলক্ষণ জানেন, এ হচ্ছে এক গোপন বিচার। আমি বেসামরিক লোক। আমি সামরিক কোন লোক নই। আর এরা করছে আমার কোর্ট মার্শাল। ইয়াহিয়া খান কেবল যে প্রেসিডেন্ট, তাই নয়। তিনি প্রধান সামরিক প্রশাসকও। এ বিচারের রায়কে অনুমোদনের কর্তা তিনি। এই আদালতকে গঠন করেছেন তিনি।

ফ্রস্ট : তার মানে, তার হাতেই ছিল সব?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, সে ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তার ইচ্ছাই ইচ্ছা।

ফ্রস্ট : তার মানে, আপনি আদালতে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন?

শেখ মুজিব : তার তো কোন উপায় ছিল না। আমি তো বন্দি।

ফ্রস্ট : হ্যাঁ, তা তো বটেই। আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তো কোন উপায় ছিল না। ওরা কি বিচার শেষ করে, সরকারিভাবে কোন রায় তৈরি করেছিল?

শেখ মুজিব : ৪ঠা ডিসেম্বর ('৭১) ওরা আদালতের কাজ শেষ করে। সাথে সাথে ইয়াহিয়া খান সব বিচারক, যথা লেফটেন্যান্ট, কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার—এদের সব রাওয়ালপিন্ডি ডেকে পাঠাল রায় তৈরি করার জন্য। সেখানে ঠিক করল, ওরা আমাকে ফাঁসি দেবে।

ফ্রস্ট : আর তাই সেলের পাশে কবর খোঁড়া দেখে আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, ওরা ওখানেই আপনাকে কবর দেবে?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, আমার সেলের পাশেই ওরা কবর খুঁড়ল। আমার চোখের সামনে।

ফ্রস্ট : আপনি নিজের চোখে তাই দেখলেন?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, আমি আমার নিজের চোখে দেখলাম, ওরা কবর খুঁড়ছে। আমি নিজের কাছে নিজে বললাম : "আমি জানি, এ কবর আমার কবর। ঠিক আছে। কোন পরোয়া নেই। আমি তৈরি আছি।"

ফ্রস্ট : ওরা কী আপনাকে বলেছিল : "এ তো তোমার কবর?"

শেখ মুজিব : না, ওরা তা বলে নি।

ফ্রস্ট : কী বলেছিল ওরা?

শেখ মুজিব : ওরা বলল : 'না, না। তোমার কবর নয়। ধর যদি বোম্বিং হয়, তাহলে তুমি এখানে শেলটার নিতে পারবে।'

ফ্রস্ট : সেই সময়ে আপনার মনের অনুভূতি কেমন ছিল? আপনি কি এই সারাটা সময়, ন'মাস নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করেছেন?

শেখ মুজিব : আমি জানতাম, যে-কোন দিন ওরা আমায় শেষ করে দিতে পারে। কারণ, ওরা অসভ্য বর্বর।

ফ্রস্ট : এমনই অবস্থায় আপনার কেমন করে কাটত? আপনি কি প্রার্থনা করতেন?

শেখ মুজিব : এমন অবস্থায় আমার নির্ভর ছিল আমার বিশ্বাস, আমার নীতি, আমার পৌনে আট কোটি মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস। তারা আমায় ভালোবেসেছে—ভাই-এর মতো, পিতার মতো। আমাকে তাদের নেতা বানিয়েছে।

ফ্রস্ট : আপনি যখন দেখলেন, ওরা কবর খনন করেছে, তখন আপনার মনে কার কথা আগে জাগল? আপনার দেশের কথা? না, আপনার স্ত্রী-পুত্র পরিজনের কথা?

শেখ মুজিব : আমার প্রথম চিন্তা আমার দেশের জন্য। আমার আত্মীয়-স্বজনদের চাইতেও আমার ভালোবাসা আমার দেশের জন্য। আমার যা কিছু দুঃখ ভোগ, সে তো আমার দেশেরই জন্য। আপনি তো দেখেছেন, আমাকে তারা কি গভীরভাবে ভালোবাসে।

ফ্রস্ট : হ্যাঁ, একথা আমি বুঝি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত বাংলাদেশের আপনি নেতা। আপনার প্রথম চিন্তা অবশ্যই আপনার দেশের চিন্তা। পারিবারিক চিন্তা পরের চিন্তা।

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, জনতার প্রতিই আমার প্রথম ভালোবাসা। আমি তো জানি, আমি অমর নই। আজ, কিংবা কাল, কিংবা পরশু আমাকে মরতে হবে। মানুষ মাত্রকেই মরতে হয়। কাজেই আমার বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে সাহসের সঙ্গে।

ফ্রস্ট : কিন্তু ওরা তো আপনাকে কবর দিতে পারে নি। কে আপনাকে রক্ষা করেছিল সেদিন– আপনার ভবিতব্য থেকে?

শেখ মুজিব : আমার বিশ্বাস সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ই আমাকে রক্ষা করেছেন।

ফ্রস্ট : আমি একটা বিবরণে দেখলাম, আপনাকে নাকি জেলার এক সময়ে সরিয়ে রেখেছিল। ইয়াহিয়া খান যখন আপনাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল তখন আপনাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছিল। একি যথার্থ?

শেখ মুজিব : ওরা জেলখানায় একটা অবস্থা তৈরি করেছিল মনে হচ্ছিল, কতগুলো কয়েদীকে ওরা সংগঠিত করেছিল যেন সকালের দিকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা আমাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। আমার মনে হয়, আমাকে তত্ত্বাবধানের ভার যে-অফিসারের ওপর পড়েছিল, আমার প্রতি তার কিছুটা সহানুভূতি জেগেছিল। হয়ত-বা সে অফিসার এমনও বুঝতে পেরেছিল যে, ইয়াহিয়া খানের দিন শেষ হয়ে আসছে। আমি দেখলাম, হঠাৎ রাত তিনটার

সময়ে সে এসে আমাকে সেল থেকে সরিয়ে নিয়ে তার নিজের বাংলোতে দুদিন যাবৎ রক্ষা করল। এ দুদিন আমার ওপর কোন সামরিক পাহারা ছিল না। দুদিন পরে এই অফিসার আমাকে আবার একটা আবাসিক কলোনির নির্জন এলাকায় সরিয়ে নিল। সেখানে আমাকে হয়ত চার-পাঁচ কিংবা ছ'দিন রাখা হয়েছিল। এই সময়টাতে আমার অবস্থান সম্পর্কে নিম্নপদস্থ কিছু অফিসার বাদে আর কেউ জ্ঞাত ছিল না।

ফ্রস্ট : এ তাদের সাহসেরই কাজ। এখন তাদের কী হয়েছে, তাই ভাবছি।

শেখ মুজিব : আমিও জানিনে। ওদের ওপর কোন আঘাত হানতে ওরা পারবে বলে মনে হয় না। ওদের জন্য যথার্থ শুভকামনা রয়েছে।

ফ্রস্ট : এমন কি শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান যখন ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, তখনো নাকি সে ভুট্টোর কাছে আপনার ফাঁসির কথা বলেছিল? এটা কি ঠিক?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, ঠিক। ভুট্টো আমাকে সে কাহিনীটা বলেছিল। ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার সময়ে ইয়াহিয়া বলেছিল : "মিস্টার ভুট্টো, আমার জীবনের সব চাইতে বড় ভুল হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি না দেওয়া।"

ফ্রস্ট : ইয়াহিয়া এমন কথা বলেছিল!

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, ভুট্টো একথা আমায় বলে তার পরে বলেছিল : "ইয়াহিয়ার দাবি ছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সে পেছনের তারিখ দিয়ে আমাকে ফাঁসি দেবে।" কিন্তু ভুট্টো তার এ প্রস্তাবে রাজি হয় নি।

ফ্রস্ট : ভুট্টো কী জবাব দিয়েছিল? তার জবাবের কথা কি ভুট্টো আপনাকে কিছু বলেছিল?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, বলেছিল।

ফ্রস্ট : কী বলেছিল ভুট্টো?

শেখ মুজিব : ভুট্টো, ইয়াহিয়াকে বলেছিল : "না, আমি তা হতে দিতে পারিনে। তাহলে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবে। এখন আমাদের এক লাখ তিন হাজার সামরিকবাহিনীর লোক আর বেসামরিক লোক বাংলাদেশ আর ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দি রয়েছে। তাছাড়া পাঁচ থেকে দশ লাখ অবাঙালি বাংলাদেশে আছে। মিস্টার ইয়াহিয়া, এমন অবস্থায় আপনি যদি শেখ মুজিবকে হত্যা করেন আর আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি, তাহলে একটি লোকও আর জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত আসতে সক্ষম হবে না। তার প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানেও ঘটবে। তখন আমার অবস্থা হবে সংকটজনক।" ভুট্টো একথা আমাকে বলেছিল। ভুট্টোর নিকট আমি অবশ্যই এ জন্যে কৃতজ্ঞ।

ফ্রস্ট : শেখ সাহেব, আজ যদি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে, আপনি তা হলে তাকে কী বলবেন?

শেখ মুজিব : ইয়াহিয়া খান একটা জঘন্য খুনি। তার ছবি দেখতেও আমি রাজি নই। তার বর্বর ফৌজ দিয়ে সে আমার ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট : ভুট্টো এখন তাকে গৃহবন্দি করেছে। ভুট্টো তাকে নিয়ে এখন কী করবে? আপনার কী মনে হয়?

শেখ মুজিব : মি. ফ্রস্ট, আপনি জানেন, আমার বাংলাদেশে কী ঘটেছে? শিশু, মেয়ে,

বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র—সকলকে ওরা হত্যা করেছে। ৩০ লাখ বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে। অন্ততপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ ভাগ ঘরবাড়ি ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং তারপর সবকিছুকে ওরা লুট করেছে। খাদ্যের গুদামগুলিকে ওরা ধ্বংস করেছে।

ফ্রস্ট : নিহতদের সংখ্যা ৩০ লাখ, এ কথা আপনি সঠিকভাবে জানেন?

শেখ মুজিব : আমার লোকজন তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এখনো আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিনি। সংখ্যা হয়ত একেও ছাড়িয়ে যাবে। ত্রিশ লাখের কম তো নয়ই।

ফ্রস্ট : কিন্তু এমন হত্যাকাণ্ড তো নিরর্থক। মানুষকে ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করা।

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, কাদের ওরা হত্যা করেছে? একেবারে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে। গ্রামের মানুষকে, যে-গ্রামের মানুষ পৃথিবীর কথাই হয়ত কিছু জানত না, সে-গ্রামে পাকিস্তানি ফৌজ ঢুকে পাখি মারার মতো গুলি করে এই মানুষকে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট : আমার মনেও প্রশ্ন : আহা! কেন এমন হলো?

শেখ মুজিব : না, আমিও জানিনে। আমিও বুঝিনে। এ রকম পৃথিবীতে আর ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

ফ্রস্ট : আর এ তো ছিল মুসলমানের হাতেই মুসলমানের হত্যা?

শেখ মুজিব : ওরা নিজেরা নিজেদের মুসলমান বলে। অথচ ওরা হত্যা করেছে মুসলমান মেয়েদের। আমরা অনেককে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। আমাদের ত্রাণ শিবিরে এখনো অনেকে রয়েছে। এদের স্বামী, পিতা—সকলকে হত্যা করা হয়েছে। মা আর বাবার সামনে ওরা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। পুত্রের সামনে মাকে ধর্ষণ করেছে। আপনি চিন্তা করুন। আমি এ কথা চিন্তা করে চোখের অশ্রুকে রোধ করতে পারিনে। এরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে কিভাবে? এরা তো পশুরও অধম। মনে করুন, আমার বন্ধু মশিউর রহমানের কথা। আমাদের দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন তিনি। আমাদের সরকারের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন তিনি। তাঁকে নির্যাতন করে করে হত্যা করা হয়েছে। ২৪ দিন ধরে তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। প্রথমে তার এক হাত কেটেছে। তারপর তার আর একটা হাত কেটেছে। তারপরে তার একটা কান কেটেছে। তারপর পা কেটেছে। ২৪ দিনব্যাপী চলেছে এমন নির্যাতন (শেখ মুজিব কান্নায় ভেঙে পড়েন), কিন্তু এ তো একটা কাহিনী। আমাদের কত নেতা আর কর্মীকে, বুদ্ধিজীবী আর সরকারি কর্মচারীকে, জেলখানায় আটক করে সেখান থেকে নিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচার করে হত্যা করেছে। এমন অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী আমি ইতিহাসে কোথাও শুনি নি। একটা পশু, একটা বাঘও তো মানুষকে হত্যা করলে এমনভাবে হত্যা করে না।

ফ্রস্ট : ওরা কী চেয়েছিল?

শেখ মুজিব : ওরা চেয়েছিল, আমাদের এই বাংলাদেশকে একেবারে উপনিবেশ করে রাখতে। আপনি তো জানেন, মিস্টার ফ্রস্ট, ওরা বাঙালি পুলিশ বাহিনীর লোককে, বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করেছে। ওরা বাঙালি

শিক্ষক, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, বাঙালি ডাক্তার, যুবক, ছাত্র—সবাইকে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট : আমি শুনেছি, যুদ্ধের শেষ অবস্থাতেও ঢাকাতে ওরা ১৩০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে।

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, সারেন্ডারের মাত্র একদিন আগে। কেবল ঢাকাতেই ১৩০ নয়, ৩০০ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, মেডিক্যাল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে। কারফিউ দিয়ে মানুষকে বাড়ির মধ্যে আটক করেছে। আর তারপর বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়ে এই সব মানুষকে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট : তার মানে, কারফিউ জারি করে সকল খবরাখবর বন্ধ করে হত্যা করেছে।

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, তাই করেছে।

ফ্রস্ট : শেখ সাহেব, আপনার কী মনে হয়? ইয়াহিয়া খান কি দুর্বল চরিত্রের লোক, যাকে অন্য লোক খারাপ করেছে, না, সে নিজেই একটা দুস্তরতম খারাপ লোক?

শেখ মুজিব : আমি মনে করি, ও নিজেই একটা নরাধম। ও একটা সাংঘাতিক লোক। ইয়াহিয়া খান যখন প্রেসিডেন্ট, তখন আমি জনসাধারণের নেতা হিসেবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার সময়েই দেখেছি। ...

ফ্রস্ট : তিনি কি তখন আপনাকে বিভ্রান্ত করেন নি?

শেখ মুজিব : আমাকে বিভ্রান্ত করতে তিনি পারেন নি। তিনি কি করতে যাচ্ছেন আমি বুঝেছিলাম, কিন্তু আমিও আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এবং সে-আঘাত তখন তিনি পেয়েছেন।

ফ্রস্ট : কিসের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আপনি?

শেখ মুজিব : পাল্টা আঘাত হানার এবং সে পাল্টা আঘাত তিনি পেয়েছেন।

ফ্রস্ট : বন্দি হওয়ার পর আপনি কি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন? একবারের জন্যেও ?

শেখ মুজিব : না। সে তো মানুষ নামের অযোগ্য।

ফ্রস্ট : মি. ভুট্টোর জন্যে এখন সঠিক কাজ কী হবে আপনি মনে করেন?

শেখ মুজিব : আমি মনে করি, ইয়াহিয়ার পূর্ণাঙ্গ এবং প্রকাশ্য বিচার হওয়া উচিত।

ফ্রস্ট : ইয়াহিয়া এখন গৃহবন্দি। আপনি কি মনে করেন মি. ভুট্টো সেটা করবেন?

শেখ মুজিব : করা উচিত।

ফ্রস্ট : মি. ভুট্টো সম্পর্কে আপনি এখন কী ভাবেন? আপনি কি ভাবেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি কখনো স্বাধীন ঢাকা সফর করবেন? তিনি কি কখনো এখানে কথা বলতে আসবেন?

শেখ মুজিব : আমি জানিনা। কিন্তু তিনি প্রথমে এখন এই বাস্তবতাকে স্বীকার করুন যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। তার এটাও জানা উচিত যে, বাংলা তার ভূখণ্ড—এ চিৎকার করে লাভ নেই। বাংলা তা নয়। কারণ, কোন কেজো উদ্দেশ্যে তারা যদি একক পাকিস্তান দাবি করে, তখনও আপনি জানেন যে,

সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমার রয়েছে, এবং আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার দাবি করতে পারতাম, যেখানে পাশ্চিম পাকিস্তান হতো আমার ভূখণ্ড। তারা যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তাহলে আমি দাবি করতে পারি যে, আমার দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি একটি সভা ডেকে গোটা দেশকে বাংলাদেশ ঘোষণা করতে পারি এবং তাদেরকে বলতে পারি যে, পশ্চিম পাকিস্তান আমার ভূখণ্ড। তুমি, ভুট্টো, বেরিয়ে যাও, আমি গভর্নর নিয়োগ করছি। এটা আমার ভূখণ্ড, তুমি বিদায় নাও, অন্যথায় আমি মিত্রবাহিনীসহ আমার সেনাবহিনী পাঠাব পশ্চিম পাকিস্তান দখল করার জন্যে। এসব ঝামেলা আমি চাই না। ভূখণ্ডের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই। পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে মি. ভুট্টো সুখী থাকুন। বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে আমি সুখী থাকতে চাই এবং বাংলাদেশ এখন একটি সার্বভৌম স্বাধীন দেশ।

ফ্রস্ট : বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের কতজন আজ ক্ষুধার্ত, দুর্ভিক্ষের অবস্থায় রয়েছে?

শেখ মুজিব : আমি মনে করি, শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ ক্ষুধার্ত।

ফ্রস্ট : পঁচাত্তর ভাগ?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, কারণ, তারা সবকিছু ধ্বংস করেছে। নিজেদের ভাণ্ডার থেকে খাওয়া-দাওয়ার সামর্থ্য যাদের রয়েছে, সেই ভাণ্ডারও লুট হয়েছে। মানুষের অর্থ লুট হয়েছে। আমার মনে হয়, এই অংশ ৭৫% নয়, ৮৫%। ৮৫% মানুষ অত্যন্ত কষ্টে রয়েছে। আমার জনগণ অত্যন্ত ভালো এবং শান্তিপ্রিয়। আমার ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে, আমি তাদের জন্য কোন কিছু ব্যবস্থা করব—সে-অপেক্ষা তারা করছে। আমি খুবই আনন্দিত যে, স্বীকৃতি দেওয়ার পর ভারত আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, যাতে আমার ব্যবস্থাগুলো সচল হয়। যোগাযোগব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হওয়া উচিত, কারণ, আত্মসমর্পণ করার আগে পাকিস্তানিরা আমার রেলওয়েকে ধ্বংস করে দেয়, বৃহত্তম ব্রিজগুলো, তেলের ট্যাংক, শিল্পগুলো, মানুষের পক্ষে যা কিছু ধ্বংস করা সম্ভব, তা তারা করেছে।

ফ্রস্ট : একটি নূতন দেশের প্রথম সপ্তাহে আপনার কত কিছু যে করার রয়েছে—যেমন আপনি একটি পতাকা এবং জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করেছেন।

শেখ মুজিব : হ্যাঁ। ওই পতাকাটি অনেকদিন ব্যবহার করা হয়েছে, শুধু একটি ছোট পরিবর্তন এখন করা হয়েছে। আগে থেকে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে জাতীয় সংগীতটিও, কিন্তু আমি সরকারি স্বীকৃতি দিতে চাইছিলাম এবং এখন আমি তা দিয়েছি। জাতীয় পতাকায় আমি একটি ছোট পরিবর্তন করছি, কারণ, এতে ইতঃপূর্বে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র ছিল। কোন দেশ জাতীয় পতাকায় তার ভূখণ্ডের মানচিত্র দিতে পারে না।

ফ্রস্ট : কেন এমনটা?

শেখ মুজিব : পৃথিবীর কোথাও তা হয় নি। আমরা পতাকায় আমাদের ভূখণ্ডের মানচিত্র রাখতে চাই না। আমি যা করেছি এবং আমাদের জনগণও গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে উদীয়মান সূর্যটি রেখে ভূখণ্ডের মানচিত্রটি বাদ দিয়ে দেওয়া।

ফ্রস্ট : আর জাতীয় সংগীতটি কার রচিত?

শেখ মুজিব : এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পুরনো গান।

ফ্রস্ট : ইংরেজিতে এর বক্তব্যটি কি?

শেখ মুজিব : ইংরেজি ভাষায় নিলে বক্তব্য হচ্ছে, "আমি আমার সোনার বাংলাকে ভালোবাসি।" এভাবে এটি শুরু হয়, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।"

ফ্রস্ট : আর এটি এমন একটি গান যা বাংলাদেশে দীর্ঘকাল গাওয়া হয়েছে?

শেখ মুজিব : দীর্ঘকাল। ৭ মার্চ তারিখে যখন রেসকোর্স ময়দানে আমাদের শেষ সভাটি করেছিলাম—যেখানে ১০ লক্ষ লোক উপস্থিত ছিল, এবং তারা "স্বাধীন বাংলা" শ্লোগানগুলো দিচ্ছিল, আর যখন ছেলেরা গানটি গাইতে শুরু করল, আমরা ১০ লাখ লোক দাঁড়িয়ে এ-গানকে অভিবাদন জানিয়েছিলাম। বলা যায়, আমাদের বর্তমান জাতীয় সংগীত আমরা তখনই গ্রহণ করেছিলাম।

ফ্রস্ট : আপনার কি মনে হয় যে, রেসকোর্সে ৭ মার্চ তারিখেই আপনার স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করা ভালো ছিল?

শেখ মুজিব : আমি জানতাম কী ঘটতে যাচ্ছে এবং সে সভায় আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, এবারে আমাদের সংগ্রাম মুক্তির, স্বাধীনতার।

ফ্রস্ট : আপনি যদি বলতেন, আজ আমি স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করছি, তাহলে কী ঘটত?

শেখ মুজিব : সেদিন আমি তা করতে চাই নি, বিশেষত এ-কারণে যে, তাহলে তাদের পৃথিবীকে এটা বলতে দেওয়া হয়ে যেত যে, মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং এখন আমাদের আঘাত করা ছাড়া বিকল্প নেই। আমি চেয়েছিলাম তারা প্রথমে আঘাত করুক এবং প্রতিরোধ করার জন্যে আমার জনগণ প্রস্তুত ছিল।

ফ্রস্ট : কিন্তু আপনি এটা শুরু করতে চান নি?

শেখ মুজিব : না, আমি চেয়েছিলাম তারা শুরু করুক।

ফ্রস্ট : ব্রিটেন কখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে বলে আপনি মনে করেন?

শেখ মুজিব : যে কোন সময়। আমি ব্রিটিশ জনগণকে জানি।

ফ্রস্ট : লন্ডনে মি. হিথের সঙ্গে আপনার আলোচনা হয়েছে?

শেখ মুজিব : মি. হিথের সঙ্গে কথা হয়, মি. উইলসনের সঙ্গে কথা হয়, এবং আলোচনায় আমি খুশি।

ফ্রস্ট : এবং আপনি ব্রিটিশ তামাক সেবন করেন?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, দীর্ঘকাল যাবৎ।

ফ্রস্ট : এটা কোন্ তামাক?

শেখ মুজিব : এরিন মোর।

ফ্রস্ট : আপনি এটা পছন্দ করেন?

শেখ মুজিব : পছন্দ করি। প্রায় চৌদ্দ বছর আমি এ-তামাক সেবন করছি। এমন কি জেলেও আমি তাদের বলেছিলাম যে, এই তামাকটিই আমাকে দিতে হবে। দয়া করে তারা তা দিয়েছিলেন।

ফ্রস্ট : নির্জন কারাকক্ষেও?

শেখ মুজিব : (হাসতে হাসতে) আমি তার জন্যে অন্তত তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ফ্রস্ট : এটা একটি ক্ষুধার্ত নগরী, কিন্তু সুখী। আপনি কি জানেন আপনার কত টাকা প্রয়োজন?

শেখ মুজিব : এ-মুহূর্তে আমি বলতে পারব না। আমি কিছু বলতে পারব না। এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় তারা ব্যাংক নোটগুলোও পুড়িয়ে দিয়ে যায়। ব্যাংকের টাকা নিয়ে নেয়। এবং আত্মসমর্পণের আগে পুড়িয়ে দেয়।

ফ্রস্ট : এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্য টাকাও আছে, আগেও যেটা ছিল, যা পশ্চিম পাকিস্তানে রয়েছে।

শেখ মুজিব : সেখানে কিছু নেই। আমি আমার জনগণকে তাদের যা কিছু আছে, সোনা, দিতে বলছি। তারা তা দেবে।

ফ্রস্ট : তারা সোনা দেবে এবং আপনার সোনার রিজার্ভ গঠন হবে।

শেখ মুজিব : এখন আমার এই একটিই বিকল্প রয়েছে। আগামীকাল কিংবা তার পরদিন আমি জনগণের কাছে আবেদন জানাব। আপনাদের যা আছে, তা থেকে কিছু গহনা দিন। সরকারি ব্যাংকে ওগুলো জমা রাখুন। যাতে আমি একটি রিজার্ভ গঠন করতে পারি। কিন্তু, তাদের কিছুই নেই। দোকান লুট হয়েছে, সোনার দোকান। এর বেশি কিছু আপনাকে বলতে পারছি না।

ফ্রস্ট : কিন্তু, কোত্থেকে মানুষ আপনাকে সোনা দেবে?

শেখ মুজিব : সামান্য যা আছে, তা থেকে।

ফ্রস্ট : পশ্চিম পাকিস্তানে যা রিজার্ভ রয়েছে, তার কোনোটিই আর কখনো আপনি দেখতে পাবেন?

শেখ মুজিব : আপনি জানেন, বিশ্বের কাছে তাদের একটি অঙ্গীকার রয়েছে। তারা ২,০০০ কোটি ঋণ নিয়েছিল, বাংলাদেশে যার সামান্যই তারা ব্যয় করেছে। পাকিস্তান তো রয়ে যাচ্ছে। আমরা আর পাকিস্তানি বাংলাদেশ নয়। আমার কোন দায়িত্ব নেই। তারা যা ঋণ নিয়েছিল, তারা তা শোধ করুক। তাদের অর্থনীতি দেখুন। ২,০০০ কোটি ঋণ শোধ, এবং সেখানে তাদের শিল্পের কোন বাজার নেই—তারা কি দাঁড়াবে? তাদের মারাত্মক বেকারত্ব থাকবে।

ফ্রস্ট : সবাই বলছে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিশাল ক্ষমতা আপনার রয়েছে। ওই পুরনো কথাটিও রয়েছে, পাওয়ার করাপ্টস, অ্যাব্‌সোলিউট পাওয়ার করাপ্টস অ্যাব্‌সোলিউটলি। ক্ষমতা আপনাকে নষ্ট করার সম্ভাবনা থেকে আপনি কিভাবে বাঁচবেন?

শেখ মুজিব : আপনি জানেন যে, ইয়াহিয়া খানের মতো কোন ব্যক্তি যদি দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষমতায় আসেন, তিনি নষ্ট হতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি—একটি প্রক্রিয়ার—সংগ্রাম, দুঃখকষ্ট, লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আসেন, তাকে আপনি যত ক্ষমতাই দিন, তিনি নষ্ট হবেন না। আমার দল এবং আমার ক্ষেত্রে, আমার সব নেতাই জেল খেটেছে, ঘরবাড়ি হারিয়েছে, অনেকে পরিবার-পরিজন হারিয়েছে। ২৪ বছর পর তারা ক্ষমতা পেয়েছে। তারা চূড়ান্ত ক্ষমতা পেলেও, নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই; কারণ, ইয়াহিয়া খান এবং তার সঙ্গীদের থেকে ভিন্নভাবে তারা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসেছে। ইয়াহিয়ারা ক্ষমতায় আসে বন্দুক এবং পশুশক্তির মাধ্যমে। আমার

লোকগুলো বন্দুক নয়, একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে—একটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, ত্যাগ স্বীকার করে তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে, কারণ, তাদের দেশ এবং মানুষের জন্যে তাদের ভালবাসা রয়েছে। আমার নেতা এবং দলীয় কর্মীদের ওপর আমার আস্থা রয়েছে।

ফ্রস্ট : আমাদের আজকের এই আলাপে আপনি নেতা এবং নেতৃত্বের কথা তুলেছেন। যথার্থ নেতৃত্বের আপনি কি সংজ্ঞা দেবেন?

শেখ মুজিব : আমি বলব, যথার্থ নেতৃত্ব আসে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কেউ আকস্মিকভাবে, একদিনে নেতা হতে পারে না। তাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। তাকে মানুষের মঙ্গলের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। নেতার আদর্শ থাকতে হবে, নীতি থাকতে হবে। এই সব গুণ যার থাকে, সে-ই মাত্র নেতা হতে পারে।

ফ্রস্ট : ইতিহাসের কোন্ নেতাদের আপনি স্মরণ করেন, তাদের প্রশংসা করেন?

শেখ মুজিব : অনেকেই স্মরণীয়। বর্তমানের নেতাদের কথা বলছিনে। ...

ফ্রস্ট : না, বর্তমানের নয়। কিন্তু ইতিহাসের কারা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছেন?

শেখ মুজিব : আমি আব্রাহাম লিংকনকে স্মরণ করি। স্মরণ করি মাও সে-তুঙ, লেনিন, চার্চিলকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিকেও আমি শ্রদ্ধা করতাম। ...

ফ্রস্ট : প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সাথে কী আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?

শেখ মুজিব : আমার সাথে ওর সাক্ষাৎ হয় নি, কিন্তু আমি তাঁর বই পড়েছি। আমি তাঁকে পছন্দ করি।

ফ্রস্ট : মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

শেখ মুজিব : মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, কামাল আতাতুর্ক—এঁদের জন্যে আমার মনে গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আমি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা ড. সুকর্নকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম। এই সকল নেতাই তো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নেতা হয়েছিলেন।

ফ্রস্ট : আজ এই মুহূর্তে অতীতের দিকে তাকিয়ে আপনি কোন্ দিনটিকে আপনার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন বলে গণ্য করবেন? কোন মুহূর্তটি আপনাকে সবচাইতে সুখী করেছিল?

শেখ মুজিব : আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে দিনটিই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।

ফ্রস্ট : আপনার জীবনের সব চাইতে সুখের দিন?

শেখ মুজিব : সমগ্র জীবনের সব চাইতে সুখের দিন।

ফ্রস্ট : এমন দিনের স্বপ্ন আপনি কবে থেকে দেখতে শুরু করেন?

শেখ মুজিব : বহুদিন যাবৎ আমি এই স্বপ্ন দেখে আসছি।

ফ্রস্ট : স্বাধীনতার সংগ্রামে আপনি কবে প্রথম কারাগারে যান?

শেখ মুজিব : আমার জেল গমন শুরু হয়, বোধ হয়, সেই ১৯৪৮ সালে। আমি তারপরে ১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাই এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত জেলে থাকি।

১৯৫৪ সালে আমি একজন মন্ত্রী হই। আবার ১৯৫৪ সালেই গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত জেলে থাকি। আবার ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান আমাকে জেলে পাঠায় এবং তখন পাঁচ বছর অন্তরীণ থাকি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ নানা মামলায় আমাকে সরকার পক্ষ বিচার করেছে। ১৯৬৬ সালে আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৩ বছর যাবৎ আটক রাখা হয়। তারপর আবার ইয়াহিয়া খান গ্রেপ্তার করে। এমন দীর্ঘ সংগ্রাম কেবল ব্যক্তিগতভাবেই আমার নয়। আমার বহু সহকর্মীর জীবনেরই এই ইতিহাস।

...

ফ্রস্ট : এবং যখন আপনি গত নয় মাসের মুক্তিসংগ্রামে আপনার কোন-কোন সহকর্মীর জীবনে কী ঘটেছে তা জানতে পান ...

শেখ মুজিব : আমার ৩০ লক্ষ লোককে তারা মেরে ফেলেছে, এটা যখন জানলাম, সেটাই ছিল আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা খারাপ সময়।

ফ্রস্ট : (ছবি দেখিয়ে) এগুলো এমন ছবি যা আমরা কখনো ভুলব না। এগুলো সেই ছবি যা গোটা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। আপনি যখন এ-ছবিগুলো প্রথমে দেখলেন ...

শেখ মুজিব : আপনি আমাকে এগুলো না দেখালেই পারতেন, আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। (কাঁদছেন)

ফ্রস্ট : নিশ্চয় আপনি আবেগপ্রবণ হবেন। এই ছবিগুলো যখন আপনি প্রথমে দেখেন, কী বলেছিলেন তখন আপনি?

শেখ মুজিব : আমি কী বলতে পারতাম? বলার কোন কথা ছিল না আমার। আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আমি কাঁদতে শুরু করেছিলাম। এখনও আমার চোখে পানি আসে। পাক সেনারা নির্দোষ বালক, বালিকা, নির্দোষ মানুষকে ক্ষমাহীনভাবে মেরেছিল। তারা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, আমার মানুষকে ধর্ষণ করে—আমার বোনদের—মায়েদের। সেটা ছিল আমার জীবনের সর্বাধিক খারাপ সময় এবং আমি একজন শক্ত মানুষ। সম্ভবত কেউ আমার চোখে পানি দেখে নি, কিন্তু এখন পানি আসছে এবং আমি আটকাতে পারছিনে।

ফ্রস্ট : বিগত মাসগুলোতে আপনার মানুষের জন্যে আপনি কতবার কেঁদেছেন?

শেখ মুজিব : বহুবার।

ফ্রস্ট : যখন আপনি শুনেছেন কী করা হয়েছে?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ। যতবার আমি এটা স্মরণ করি, আমার চোখে পানি আসে এবং এখনও আসছে। আপনি যখন এই ছবিগুলো দেখালেন, আমি আর এখন কথা বলতে পারছিনে। পাঁচ মাস, এক বছর কিংবা দুবছর বয়সের একটি শিশুকে একজন মানুষ কিভাবে হত্যা করতে পারে? নারীদের, কৃষকদের—যাদের খাবারটুকু পর্যন্ত নেই—কীভাবে হত্যা করতে পারে? আমার বন্ধু, আমি এটা ভাবতে পারি না। বাস্তবেই এটা একটি দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা। ফ্যাসিস্ট জার্মানির যুদ্ধাপরাধীদের এই পৃথিবী দেখেছিল এবং তাদের জন্যে নুরেমবার্গ বিচারের আয়োজন করেছিল। আমি মনে করি জাতিসংঘ কর্তৃক এই লোকগুলোর এবার বিচার হওয়া উচিত। পৃথিবীকে এগুলো দেখার, তদন্ত এবং বিচারের

সুযোগ দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। বিচার নয়, পৃথিবীর সামনে তদন্ত এবং প্রদর্শন। আমি সবসময় ক্ষমা এবং ভুলে যাওয়ায় বিশ্বাস করি। কিন্তু ক্ষমা করা এবং ভুলে যাওয়া এখন আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ, এগুলো ঠাণ্ডা মাথার এবং পরিকল্পিত ধরনের হত্যা, আমার মানুষের ওপর গণহত্যা। আপনি কি মনে করেন কোন মানুষ এগুলো মেনে নিতে পারে? এই লোকগুলোকে শাস্তি দিতেই হবে। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। আমি এখন কথা বলতে পারছি না। আপনি কেন আমাকে এই ফটোগুলো দেখালেন? আমি এটা ভাবতে পারি না। বিশ্বাস করুন, এই বিশেষ ব্যাপারটাতে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি।

ফ্রস্ট : আমি মনে করি, আমিও তা-ই হয়েছিলাম এবং আমি মনে করি আরো অনেক মানুষও তা-ই হবেন।

শেখ মুজিব : অভিভূত! যখন আপনি বহু স্থানে শত-শত, হাজার হাজার মৃত মানুষ দেখবেন। তারা একটি খন্দ খুঁড়েছে, হাজার হাজার মানুষকে মেরে তার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছে। কেউ-কেউ মারাও যায় নি এমন কি। তাদেরকেও ছুঁড়ে ফেলেছে এবং তারা সেখানে কাতরাতে-কাতরাতে মরেছে। (কণ্ঠস্বর উঁচুতে উঠছে) মানব জাতির ইতিহাসে এর চেয়ে বড় বিপর্যয় কি আপনি শুনেছেন? আমার মানুষকে নিয়ে আর কেউ রাজনীতি করুক, এটা আমি চাই না। মানবতার স্বার্থে আমার দুর্ভাগা মানুষকে, যারা এখনও কষ্ট পাচ্ছে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে আমি তাদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। আমার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না। আমি এটা গ্রহণ করতে পারি নি। একজন প্রধানমন্ত্রী কী পায়, যা আমি আমার মানুষের কাছ থেকে পাই নি? গতকাল আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম, আহত মানুষকে দেখলাম—যারা হাত ও পা হারিয়েছে, কিন্তু তারা আমাকে বলল, "আমাদের সব গেছে, তাতে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু, আপনি তো ফিরে এসেছেন। এটাই আমাদের তৃপ্তি। আমরা খুশি।" আপনি কি ভালোবাসা-স্নেহকে হত্যা করতে পারবেন? প্রধানমন্ত্রিত্ব, রাষ্ট্রপতিত্ব আমার কাছে কোন অর্থ রাখে না। আমি আমার মানুষের স্নেহ, ভালোবাসা পেয়েছি। আমি তা-ই নিয়ে মরতে চাই, আর বেশি কিছু চাই না।

আমি খুশি। আমার জনগণ এখন স্বাধীন, তারা নিজেদের উন্নতি করতে পারবে। একটি স্বাধীন দেশে বাস করতে পারবে। আমি কৃতজ্ঞ, সত্যই আমি ভারতীয় জনগণ এবং মিসেস গান্ধীর নিকট কৃতজ্ঞ। যেভাবে তারা আমার এক কোটি লোককে সাহায্য করেছে। যারা ভারতে চলে গিয়েছিল, ভারতের মানুষ তাদের খাবার, আশ্রয়, বাসস্থান দিয়েছে। পৃথিবীর ৮০টি দেশে জনসংখ্যা ১ কোটির কম; কিন্তু আমার ১ কোটি লোককে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয় এবং আপনি জানেন কীরকম দুঃখ-কষ্ট ছিল। আমি তাদের পুনর্বাসিত করতে চাই, মানবিক অনুভূতি যাদের রয়েছে, এজন্যে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি সাহায্য চাই। আমি চাই বিশ্ব এগিয়ে আসুক। কারো প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই। আমি ইতোমধ্যেই আমার পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছি—সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়। আমি আমার দেশকে রক্ষা করতে চাই, আমার জনগণকে বাঁচাতে, তাদের খাবার,

কাপড়, বাড়ি, শিক্ষা, চাকরি দিতে চাই। শোষণ থেকে মুক্ত একটি সমাজ আমি চাই, অন্য কিছু নয়।

ফ্রস্ট : মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, পৃথিবীর মানুষের জন্যে কী বাণী আমি আপনার কাছ থেকে বহন করে নিয়ে যেতে পারি?

শেখ মুজিব : আমার একমাত্র প্রার্থনা—বিশ্ব আমার দেশের মানুষের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে আসুক। আমার হতভাগ্য স্বদেশবাসীর পাশে এসে বিশ্বের মানুষ দাঁড়াক। আমার দেশের মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্যে যেমন দুঃখ ভোগ করেছে, এমন আত্মত্যাগ পৃথিবীর খুব কম দেশের মানুষকেই করতে হয়েছে। মিস্টার ফ্রস্ট, আপনাকে আমি আমার একজন বন্ধু বলে গণ্য করি। আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আসুন। নিজের চোখে দেখুন।

আপনি নিজের চোখে অনেক দৃশ্য দেখেছেন। আরো দেখুন। আপনি আমার এই বাণী বহন করুন—সকলের জন্যেই আমার শুভেচ্ছা। আমি বিশ্বাস করি, আমার দেশের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে এসে বিশ্ব দাঁড়াবে। আপনি আমার দেশের বন্ধু। আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

ডেভিড ফ্রস্ট : জয় বাংলা! আমিও বিশ্বাস করি, বিশ্ববাসী আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। আপনাদের পাশে এসে আমাদের দাঁড়াতে হবে। নয় তো ঈশ্বর আমাদের কোনদিন ক্ষমা করবেন না।

ভাষান্তর : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সূত্র : *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃষ্ঠা ৬১৪-৬২৭) এবং আবদুল মতিন সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কয়েকটি প্রাসঙ্গিকবিষয়, র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, ঢাকা।

বিদেশি টেলিভিশন সাংবাদিকের সাথে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার

ঢাকা, ১৩ মে ১৯৭২

মার্কিন ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (এবিসি) কর্তৃক গৃহীত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারটি ১৫ মে ১৯৭২ সারা যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের সাথে ১৯৭২ সালের ১৩ মে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত দীর্ঘ টিভি সাক্ষৎকারের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

বৈঠকের সম্ভাবনা

প্রশ্নকর্তা : জনাব ভুট্টোর সাথে আপনার বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে কী?

বঙ্গবন্ধু : আপনারা জানেন, শ্রীমতী গান্ধী ও জনাব ভুট্টো বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁদের দুই দেশের সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এই ব্যাপারে আমার মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট। জনাব ভুট্টোকে সর্বাগ্রে বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা করতে হবে। তিনি যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন, তাঁর উচিত এক্ষুণি এই বাস্তব সত্যকে মেনে নেওয়া, আর তাহলে, তাঁর সাথে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার সমস্যাবলি আলোচনা করতে কোন আপত্তি থাকবে না।

ভুট্টোর সাথে যোগাযোগ

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এ পর্যন্ত আপনার ও ভুট্টোর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন যোগাযোগ হয়েছে কিনা?

বঙ্গবন্ধু : প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ রাখা সম্ভবপর নয়। জনাব ভুট্টোর বুঝা উচিত বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনসংখ্যার অংশ আর বাংলাদেশ পাকিস্তান ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে। এখন বাংলাদেশ বাস্তব সত্য। এমনকি বিশ্বের চতুর্থ ভেটো ক্ষমতাধারী শক্তিও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ৭০টিরও বেশি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জনাব ভুট্টো বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা করলে তাঁর সাথে আলোচনায় বসতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

প্রশ্নকর্তা : এক্ষণে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন সমস্যাটিকে আপনি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

বঙ্গবন্ধু : বহু সমস্যা রয়েছে। তারা আমাদের ৪ লাখ নিরীহ মানুষকে আটক রেখেছে। তারা ওদের বন্দি শিবিরে নিয়ে অন্তরীণদশায় ফেলেছে। এ ছাড়া আরও বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। তারা যদি আলোচনা করতে চায়, তবে তারা তা করতে পারে।

যুদ্ধবন্দি নাগরিক বিনিময়

প্রশ্নকর্তা : প্রধানমন্ত্রী, এখন ভারতে প্রায় ৭৩ হাজার যুদ্ধবন্দি রয়েছে, আপনি ও ভারতীয়দের মতৈক্য ছাড়া তাদের ভারতীয়রা ছাড়বে না। পাকিস্তানে আটক

বাঙালিদের ফিরে পাবার জন্য আপনারা অত্যন্ত উদগ্রীব ও আকুল। যুদ্ধবন্দি এবং পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের মধ্যে যারা সত্যিই দেশে ফিরে আসতে চায়, এদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের সম্ভাবনা কিছু আছে কী?

বঙ্গবন্ধু : যুদ্ধবন্দি–যুদ্ধবন্দিই, বেসামরিক নাগরিক বা সামরিক নাগরিক। তাদের লোকও এখানে রয়ে গেছে : অবাঙালি বা বিহারী ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানে জন্মগ্রহণকারী তথাকার লোক বাংলাদেশে রয়ে গেছে। যদি তারা এদের নিতে চায়, তাদের সাদর স্বাগত জানানো হবে। আমার কোন আপত্তি নেই এতে। আমি আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে বলেছি, এসব লোককে নিয়ে যাও এবং আমার লোকদের পাকিস্তান থেকে ছাড়িয়ে আনো। যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে যুদ্ধাপরাধী রয়েছে। তাদের বিচার করা হবে। দুটি দিককে জট পাকিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। তারা বেসামরিক নাগরিক এবং এসব লোক বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে। এরা আমার ৩০ লাখ লোক হত্যা করেছে। তারা আত্মসমর্পণের পূর্বে কারফিউ জারি করে আমার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। এগুলো ছিল ধীর মস্তিষ্কে নরহত্যা। তারা আমার মানুষের ঘর ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলেছে।

ভুট্টোর উৎকণ্ঠা

প্রশ্নকর্তা : জনাব ভুট্টো যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যাপারে অতীব উদ্বিগ্ন, আর আপনি বলছেন, এখানে এদের বিচার করতে আপনি বদ্ধপরিকর।

বঙ্গবন্ধু : আমি সেটা করব। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনি নিজেই কী তাদের ওমনি যেতে দিতে পারেন? এরা যে ক্ষেত্রে ৩০ লাখ লোক হত্যা করেছে, গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছে, এমতাবস্থায় কোন দেশ কী এদের ছেড়ে দিতে পারত?

এমন কোন পথ–

প্রশ্নকর্তা : জনাব, এমন কোন পথ আছে কী যে পন্থায় আপনি হয় সংখ্যার দিক থেকে (যেকোন সংখ্যক লোকের বিচার আপনি করতে পারেন, তাদের অনুপস্থিতিতে বা উপস্থিতিতে) অথবা অন্যভাবে যুদ্ধাপরাধী বিচার সম্পর্কে আপনার এখনকার ভূমিকা রদবদল করতে পারেন?

বঙ্গবন্ধু : এটা বিস্তারিত আলোচনার প্রশ্ন।

প্রশ্নকর্তা : বিস্তারিত মানে?

বঙ্গবন্ধু : হ্যাঁ, এটা বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনার উপযুক্ত প্রশ্ন। অপরাধ সত্য যারা করেছে, যারা দোষী, বিচার তাদের হবেই। নিরপরাধ যুদ্ধবন্দিদের বিচার আমি করব না। যারা ইচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, আমার লোকদের খুন করেছে, আমার সব কিছু বিপর্যস্ত করেছে, আমার মেয়েদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। আমি তাদেরই বিচার করব। আমি বাংলাদেশ থেকে ২ লাখ মেয়ে খুঁজে পেয়েছি, যারা পাক সেনা দ্বারা নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হয়েছে। আপনি কিভাবে আশা করতে পারেন, আমি তাদের বিনা বিচারে ছেড়ে দেব?

যুদ্ধাপরাধীর তালিকা

প্রশ্নকর্তা : ভারত সরকারের কাছে আপনি একটি তালিকা পেশ করেছেন জনাব, আমার বিশ্বাস আপনি যেসংখ্যক যুদ্ধবন্দির বিচার করতে চান, তদুপেক্ষা বেশি লোকের নাম রয়েছে ওই তালিকায়। এ সংখ্যাটি ১,৪০০। এটা জনাব ভুট্টোকে এতই শঙ্কিত করে তুলেছে যে, তিনি বলেছেন, তাঁর দেশে এর প্রতিক্রিয়ায় এক কুজ্ঝটিকা বয়ে যাবে। আপনি কী সংখ্যাটি কমানোর চেষ্টা করবেন?

বঙ্গবন্ধু : দেখুন, এখনো তদন্ত চলছে। এটা ১,৪০০ হতে পারে, ১,০০০ হতে পারে, এমনকি ৫০০ও হতে পারে। তদন্তের উপরই সবকিছু নির্ভর করছে। যারা অপরাধী, যারা আগুন লাগিয়েছে, নরহত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে, একমাত্র সে সব লোকেরই বিচার হবে, গ্রেপ্তারকৃত ৯৩,০০০ লোকেরই বিচার হবে না।

ভুট্টোর সাথে মতৈক্যের প্রশ্ন

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা, প্রধানমন্ত্রী, জনাব ভুট্টোও বলেছেন, কিছু লোক সত্যিই যুদ্ধাপরাধী আর তাদের বিচার হওয়া উচিত। আপনি কী মনে করেন এদিক থেকে জনাব ভুট্টোর সাথে আপনার কোনরূপ সমঝোতার সম্ভাবনা আছে?

বঙ্গবন্ধু : কীভাবে এটা সম্ভব? এখন পর্যন্ত বাস্তবতাকে মেনে নেবার সৌজন্যটুকু ভদ্রলোকটির হলো না। তিনি নিজের সম্পর্কে ভাবছেন কী? আপনি দেখুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দিয়েছে, বন্ধুদেশ ভারত স্বীকৃতি দিয়েছে, ফ্রান্স স্বীকৃতি দিয়েছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে গ্রেটব্রিটেন। বিশ্বের প্রায় সকল বৃহৎ দেশ আমাদের স্বীকৃতি দান করেছে। "শেখ মুজিবের সাথে স্বীকৃতির প্রশ্নে আমি আলোচনা করতে চাই না"–এটা বলে ভুট্টো কী খেলা খেলতে চাইছেন? "স্বীকৃতির বিষয়টি সম্পর্কে" কথাটি দ্বারা তিনি কী বুঝাতে চাইছেন? আমি পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেই কিনা, তাও তো প্রশ্ন। কারণ, জনাব ভুট্টো আর পাকিস্তান নাম দাবি করতে পারে না।

দালাল বিচার

প্রশ্নকর্তা : আমি বলার আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি প্রধানমন্ত্রী, গত জানুয়ারি মাসে এই ব্রডকাস্টিং কোম্পানির সাথে সাক্ষাৎদানকালে আপনি স্বয়ং বলেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন অতীতকে বিস্মৃত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এখন বাংলাদেশে প্রায় ৫০,০০০ দালাল কারাগারে অন্তরীণ রয়েছে, সম্ভবত একমাত্র ঢাকা জেলেই রয়েছে ১০,০০০-এর মতো। যুদ্ধবন্দিসহ এত বিরাট সংখ্যক লোকের বিচার আপনি কীভাবে করবেন, সেই অতীত না হাতড়ে?

বঙ্গবন্ধু : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১০ হাজার লোক আটক রয়েছে, এসব তথ্য আপনারা পান কোত্থেকে আমি জানি না। আমি জানি, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সব মিলিয়ে বন্দির সংখ্যা ৭,০০০-এর বেশি হবে না। আপনারা কোথায় এসব তথ্য পান, আমি জানি না। এসব কিছু জানার জন্য এখানে একটি গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে, মনে হচ্ছে। আমি আপনাকে জানাচ্ছি, এমনকি দালালদের মামলাগুলোও তদন্ত কমিশন যাচাই করবে। বস্তুতপক্ষে, যারা নিরপরাধ, তদন্ত করে আমরা তাদের ছেড়ে দিচ্ছি। একমাত্র, যারা অপরাধবৃত্তি সংঘটনের জন্য দায়ী, তারাই বিচারের সম্মুখীন হবে। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) রাতেও যে লোক এক ডাক্তারের গৃহে ঢুকে, তার স্ত্রীর সামনে ডাক্তারকে টেনে হেঁচড়ে এনে নির্মম অত্যাচার করে অমানুষিকভাবে হত্যা করেছে, আমি তাকে ছেড়ে দিতে পারি না। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমিই বা তাকে ক্ষমা করব কী করে? এসব লোকদের অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। তবে, আমার নিরীহ মানুষদের হত্যার জন্য পাকফৌজ যে সব লোককে ব্যবহার করেছে, কাজে লাগিয়েছে, আমি তাদের অবশ্যই ক্ষমা করে দিয়েছি। এতদুদ্দেশ্যে তাদের বিপুল অস্ত্রশস্ত্র যোগানো হয়েছিল। আমি এ সব লোককে স্পর্শও করি নি। আমি তাদের বলেছি : "শান্তির অনুগত হও, বাংলাদেশের জন্য কাজ কর, এখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ কর। তোমাদের সাদরে বরণ করব।" এসব আমি কী করি নি?

বিশ্বাসের প্রশ্ন

প্রশ্নকর্তা : কথার মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, এক্ষুণি আবার শুরু করছি, (মি. মরিশাস জিজ্ঞাসা শুরু করলেন)।

জনাব প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলেছেন, এতদঅঞ্চলের শান্তি অথবা একটি মতৈক্যের জন্য তাঁকে আপনার বিশ্বাস করতে হবে। আপনি কী ব্যক্তিগতভাবে ভুট্টোকে বিশ্বাস করেন?

বঙ্গবন্ধু : আপনি এসব কল্পনাশ্রয়ী অনুমিত প্রশ্ন ছাড়তে পারেন জনাব? পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার উপর বিশ্বাসের প্রশ্ন নির্ভর করে। আমি একাকী এগুতে পারি না।

প্রশ্নকর্তা : মাফ করবেন, প্রধানমন্ত্রী, ওটা যে নিতান্তই অনুমাননির্ভর প্রশ্ন, এব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আপনি কী ভুট্টোকে বিশ্বাস করেন?

বঙ্গবন্ধু : তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন কী করেন না, এটা কোন প্রশ্ন নয়। এটা মুজিবুর রহমান ও মি. ভুট্টোর মধ্যে ব্যক্তিগত পারস্পরিক আস্থার কোন প্রশ্ন নয়। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের এ-দুদেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি হয়েছে কিনা।

প্রশ্নকর্তা : যুদ্ধ অবসান এবং বাংলাদেশের মুক্তিলাভের পর আপনাকে ছেড়ে দেওয়া এবং দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে অনেকে ভুট্টোকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। অন্যেরা বলছেন, সে সময়ে তাঁর সাথে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল আপনার। এটা কী সত্য?

বঙ্গবন্ধু : হ্যাঁ, আমরা আলোচনা করেছি। আমরা অনেক কিছু আলোচনা করেছি। ভুট্টো যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন আমরা সর্বদাই আলোচনার জন্য প্রস্তুত। কেননা, আলোচনার মাধ্যমেই মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব।

প্রশ্নকর্তা : সমঝোতার জন্যই কী বিশ্বাস করা প্রয়োজন?

বঙ্গবন্ধু : হ্যাঁ, ভুট্টোকে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে প্রথম স্বীকার করে নিতে হবে। আপনারা কেন আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করছেন–আমি বুঝতে অক্ষম। যিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দেয় নি–তাঁকে আমি কী করে বিশ্বাস করতে পারি।

জনাব ভুট্টো এখনও বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান অথবা পূর্ব বাংলারূপে আখ্যায়িত করছেন। তাঁর এভাবে কথা বলার কী অধিকার রয়েছে? যখন সে এইভাবে ব্যবহার করছে– তখন তাকে কী করে বিশ্বাস করতে পারি? তাঁকে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পরস্পর পরস্পরকে বুঝা ও সহযোগিতা করা বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে।

নিক্সনের সফর

প্রশ্নকর্তা : আমি কী বিষয়ের সামান্য পরিবর্তন করতে পারি?

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীন সফর করেছেন ও মস্কো যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি কী ঐসব দেশ বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য সফর করছেন?

বঙ্গবন্ধু : মি. নিক্সন তাঁর দেশের স্বার্থের জন্য ঐসব দেশ সফর করছেন। উপরন্তু তারা বৃহৎ রাষ্ট্র। তাঁরা যা খুশি আলোচনা করতে পারেন–আমার বলার কিছুই নেই। আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে নারাজ।

মার্কিন স্বীকৃতি প্রসঙ্গে

প্রশ্নকর্তা : জনাব প্রধানমন্ত্রী, মি. নিক্সন তো কখনও আপনাকে বৃহৎ শক্তির সাথে দেখেনি, কিন্তু চীন সফর ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর তাঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী পরিবর্তিত হয়েছে?

বঙ্গবন্ধু : আমি অত্যন্ত সুখী যে, যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অবশ্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন স্বীকৃতি দিতে বেশ দেরি করেছেন। কিন্তু আমি জানি যে, মার্কিন জনগণ, সংবাদপত্র ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। তাঁরা আন্তরিকভাবে বাংলাদেশের জন্য কাজ করেছেন। এমনকি কেহ কেহ এক কোটি বাঙালি শরণার্থীকে ভারতে দেখার জন্যও এসেছিলেন।

আমি তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি–অবশ্য মি. নিক্সন পাকিস্তানকে সেই সময় সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। আমি মি. নিক্সনকে সেজন্য ধন্যবাদ দিতে পারি নি।

আমি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি চাই

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু জনাব প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশকে সাহায্যদানকারী দেশসমূহের মধ্যে আমেরিকাই বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য দিচ্ছে ও ভবিষ্যতেও দিতে থাকবে। আপনি এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণভাবে এই উপমহাদেশে ও বিশেষ করে বাংলাদেশ ও আমেরিকার সাথে কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান।

বঙ্গবন্ধু : যুক্তরাষ্ট্র একটি বৃহৎ শক্তি–সে সাহায্য করতে সক্ষমও আমিও সাহায্য নিতে কোন বাধা-বিপত্তি দেখছি না–অবশ্য এই সাহায্য সর্বপ্রকার শর্তহীন হতে হবে। আমেরিকা এখন পর্যন্ত শর্তহীনভাবেই সাহায্য দিয়েছে।

কিছু সাহায্য সরাসরি ও কিছু আনরডের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসছে। এখন স্বীকৃতি এসেছে–আমরা আরও আলোচনা করব–আমি শুধু আমার দেশ সম্বন্ধেই বলতে পারি যেখানে সাড়ে সাত কোটি লোক বসবাস করছে। আমি পূর্ব বা পশ্চিমের কোন ব্লকের সাথে সংযুক্ত নই। আমার নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট–আমি নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী।

আমি সোভিয়েত ও ভারতের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি–কেননা, এই দুটি মহান দেশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

প্রশ্নকর্তা : সোভিয়েত ইউনিয়নের উপস্থিতি সম্পর্কে আপনার কী মতামত? জনাব প্রধানমন্ত্রী, সোভিয়েত নৌ-বাহিনী এখন চট্টগ্রাম বন্দরে উদ্ধারের কাজ করছে ও এই ধরনের সংবাদ শুনা যাচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত মহাসাগর ব্যবহারের জন্য অনুমতি চেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু : আমি এই ধরনের কিছুই জানি না। আপনারা কোথা থেকে এ সংবাদ পেলেন? চট্টগ্রাম বন্দরটিকে পরিস্কার করার জন্য একটি চুক্তি অনুসারে এরা এসেছে ও বন্দরটিতে কাজ করছে। আমার মাটি বা জল ব্যবহার করার জন্য কাউকে কোন অনুমতি দেওয়া হয় নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ধরনের কোন অনুমতিও চায় নি।

আমি শান্তি চাই

প্রশ্নকর্তা : আপনি উপমহাদেশের সমস্ত দেশের কল্যাণের জন্য আপনাদের মধ্যে একটি মৈত্রী চাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু : মৈত্রী সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই উপহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে আমি শান্তি চাই ও কোন বৃহৎ শক্তি আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ না করুক এই আমার কামনা।

তাদের নিজের ব্যাপারে সুখী থাকুক, আমরা তাদের বিরক্ত করব না।

বিরাট পরিমাণে কারো সাহায্য

প্রশ্নকর্তা : জনাব প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে আবার বিরক্ত করছি। আপনি কী মনে করেন যে, কোন দেশ থেকে ব্যাপক আকারে সাহায্য কোন শর্ত ছাড়াই আপনি পেতে পারেন?

বঙ্গবন্ধু : ব্যাপক আকারে সাহায্য? কতটুকু আমি গ্রহণ করব ও হজম করতে পারব তার উপরই সাহায্যের পরিমাণ নির্ভর করছে। ব্যাপক আকারে সাহায্যের অর্থ এই নয় যে, আমার দেশের উপর কেহ সাহায্য চাপিয়ে দেবে। আমার জনগণের জন্য যে পরিমাণ সাহায্য প্রয়োজন তা আমি নেব— ইহা একান্ত আমাদের ব্যাপার।

তিন বছর সময়

প্রশ্নকর্তা : অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব প্রধানমন্ত্রী, আপনি বলেছেন যে, সংঘর্ষ লাগার পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে তিন বছর সময় লাগবে। আপনি কী মনে করেন যে, পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে তিন বছর সময় লাগবে?

বঙ্গবন্ধু : এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

প্রশ্নকর্তা : আরও কম সময় তো লাগতে পারে।

বঙ্গবন্ধু : হ্যাঁ, তাই।

প্রশ্নকর্তা : আপনি কীজন্য এত আশাবাদী?

বঙ্গবন্ধু : আমি যেহেতু জনগণের উপর নির্ভর করি। আমার জনগণ অত্যন্ত ভালো ও তারা আমার কথা মেনে চলে। তারা অত্যন্ত বিশ্বাসী ও কঠোর পরিশ্রম করছে।

সমালোচনা

প্রশ্নকর্তা : জনাব প্রধানমন্ত্রী, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, বিগত চার মাসের কাজের জন্য আপনার সমালোচনা হচ্ছে। যারা স্বাধীনতার সময় সংগ্রাম করেছে ও সে কারণেই যারা সমস্ত দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে–তাদের কী করে আগামী তিন বছর আপনি শান্ত রাখবেন।

বঙ্গবন্ধু : আমি তাদের স্বাধীনতা দিয়েছি–আমি তাদের জীবনে সুখ এনে দেব–তারা কখনও বিভ্রান্ত নয়।

আমি ভুল সংশেধন করতে পারব

প্রশ্নকর্তা : আপনি কী সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে রাখতে পারবেন?

বঙ্গবন্ধু : সবসময় সমালোচকেরা কিছু না কিছু সমালোচনাও করেন। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আমাকে সমালোচনা করতে আমি তাদের অনুমতি দিয়েছি। সমালোচনার ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। কেননা, আমি জনগণকে ভালোবাসি–জনগণও আমাকে ভালোবাসে। সামান্যসংখ্যক লোকের সমালোচনায় আমার কিছুই আসে যায় না। আমি সৎ সমালোচনাকে স্বাগতম জানাই। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী।

আমাকে সমালোচনার অধিকার জনগণের রয়েছে। যদি দেশের কোথাও কোন অন্যায় কাজ হয়– তার জন্য সমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে, তাতে আমার ভুলও সংশোধন হবে।

বিরোধীদল

প্রশ্নকর্তা : আপনি কী বিরোধীদলের কাজকর্মে আস্থাবান?

বঙ্গবন্ধু : যদি আর কাউকে ভোট দিতে পারবে না–এই নীতিতে আমি বিশ্বাসী হতাম, তাহলে বিরোধীদল গঠন করতে নিশ্চয়ই অনুমতি দিতাম না। যেহেতু আমি নির্বাচনে বিশ্বাসী সেইহেতু জনগণ যদি বিরোধীদলের কাউকে চায় ভোট দেবে ও সে বিরোধীদলের আসনেও বসবে–তাতে আমার মনে করার কিছুই নেই।

খাদ্য সমস্যা

প্রশ্নকর্তা : জনাব প্রধানমন্ত্রী, আপনি তো খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। আপনার দেশে তো কেউ অনাহারে নেই; কিন্তু আমরা জানতে চাই যে, আপনি কী করে বেকার সমস্যা সমাধান করছেন? আপনি কী করে চাকরি সৃষ্টি করছেন? বেকার লোকদের চাকরির সংস্থান করতে আপনার কতদিন সময় লাগবে?

বঙ্গবন্ধু : আপনাদের কাছে সব ঘটনার বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। আমার আড়াই কোটি বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে। এক কোটি লোক গৃহহারা হয়ে ভারতে চলে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসেছে। আমাকে তাদের বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ করতে হচ্ছে। স্বভাবতঃই তাদের জন্য সবকিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অত্যন্ত খুশির কথা এই যে, গ্রাম পর্যায়ে সাহায্য সংস্থা গঠন করা হয়েছে— যারা দরিদ্র জনগণের মধ্যে সাহায্য বিতরণ করছে। আমার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে, রেল যোগাযোগ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ও ট্রাক এবং বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও আমার জনগণ কাজ করে চলেছে। অবশ্য সমস্যা রয়েছে ও থাকবে। আমার জনগণ অত্যন্ত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ও অত্যন্ত ভালো।

ষড়যন্ত্র

প্রশ্নকর্তা : জনাব, আপনি এই সেই দিন দেশে ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই ষড়যন্ত্র কী?

বঙ্গবন্ধু : আমি জানি, পৃথিবীর সর্বত্র ষড়যন্ত্র চলে।

প্রশ্নকর্তা : আপনি আরও বলেছেন যে, এই ষড়যন্ত্রের পেছনে কতিপয় বৈদেশিক শক্তি টাকা যোগাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু : আমি কী করে সব বলব? আপনারাই বা কী করে আশা করেন যে, আমি আপনাদের সবকিছু বলব? আমার গোয়েন্দা কর্মরত রয়েছে। আমি জানি কারা আমার কিছু কিছু লোককে টাকা ঘুষ দিয়ে দেশের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

বাংলার প্রতিটি গৃহে আমার মানুষ রয়েছে। কোন দেশের পক্ষেই এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। তবুও কোন কোন দেশ তাদের অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশে যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন এ কাজ হতে পারবে না।

দীর্ঘদিন ধরেই চলছে ষড়যন্ত্র

প্রশ্নকর্তা : ষড়যন্ত্র সম্পর্কে এ ধরনের খোলাখুলি আলোচনা করলে দেশের জনগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি কী হতে পারে না?

বঙ্গবন্ধু : আমার জনসাধারণ জানে যে, বাংলাদেশে দীর্ঘ দিন ধরে ষড়যন্ত্র চলছে–ইহা এক বা দুদিনের বিষয় নয়। কোন কোন দেশ মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ষড়যন্ত্র করছে।

প্রশ্নকর্তা : আপনি কী বৃহৎ শক্তিগুলোর কথা বলছেন?

বঙ্গবন্ধু : আমি এই সম্বন্ধে এখনও কিছু বলতে চাই না। অবশ্য যারা ষড়যন্ত্র করছে– তাদের সাবধান থাকা প্রয়োজন– কেননা, আমি তাদের ধরতে চেষ্টা করছি।

জনতার শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করব

প্রশ্নকর্তা : আপনি কী ষড়যন্ত্রকারীদের মোকাবিলা করতে চান? কিন্তু আপনার তো সংগঠিত পুলিশ বা সেনাবাহিনী নেই।

বঙ্গবন্ধু : আমি নিজেই সংগঠিত। আমার পুলিশের বা সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। কেননা, আপনারা নিশ্চয় জানেন, দেশের জনগণ যখন কোন নেতার পিছনে থাকেন ও তাঁর প্রশাসনকে সমর্থন করেন তখন তাঁকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না। সব শক্তির উৎস হলো জনগণ। যখন দেশের জনগণ কারও পেছনে থাকে, তাকে বিশ্বের কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। এই হলো আমার ধারণা।

খাদ্য দাঙ্গা

প্রশ্নকর্তা : জনাব, আপনার দেশের কোন কোন এলাকায় খাদ্যের জন্য দাঙ্গা হয়েছে ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে–এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কী?

বঙ্গবন্ধু : এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আপনারা এ খবর পেলেন কোথায়?

প্রশ্নকর্তা : আপনার খবরের কাগজে আমরা এ বিষয় জানতে পেরেছি। 'দৈনিক অবজারভার' পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু : খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা হয়েছে এমন কোন খবর আমি জানি না। বাংলাদেশের কোথায়ও এ ধরনের ঘটনা ঘটে নি।

প্রশ্নকর্তা : এই একই সংবাদপত্রে দেশের বিভিন্ন এলাকায় রাহাজানি সম্বন্ধে খবর বের হয়েছে? আপনি পুলিশের প্রয়োজন মনে করেন না? আপনার তো মাত্র দুহাজার পুলিশ রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু : আমার পুলিশ বাহিনী রয়েছে– তারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। আপনারা রাত ১২ টায় বা দুটায় যেখানে খুশি হাঁটুন দেখবেন কোন বিপদ-আপদ নেই। নিউইয়র্কে তো রাত দশটায় চলা যায় না। কেননা, ওখানে যে কোন সময় রাহাজানি সঙ্ঘটিত হতে পারে বা যে কেহ বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। নিউইয়র্কের চেয়ে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো। এতবড় একটা সশস্ত্র বিপ্লবের পর এখানে–সেখানে কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে যা নিতান্তই গৌণ ব্যাপার মাত্র।

কাদের সিদ্দিকী

প্রশ্নকর্তা : ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী সম্বন্ধে আপনার মতামত কী? আমরা তো সিদ্দিকী সম্বন্ধে শুনেছি– তিনি নাকি ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী গড়ে তুলছেন ও অস্ত্রশস্ত্র জমা দেয় নি।

বঙ্গবন্ধু : এ কথা সত্য নয়। ইহা নিছক বাজে কথা। জনাব সিদ্দিকী আমার কাছে ৫৮ ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করেছে।

প্রশ্নকর্তা : জনাব প্রধানমন্ত্রী, আমি কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে বলছি না যে, দেশে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে বা দেশ অবনতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

বঙ্গবন্ধু : আপনারা কোথায় বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতে পেয়েছেন?

প্রশ্নকর্তা : আপনি তো গত জানুয়ারিতে দেশের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির জন্য সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন–সম্ভবত তা হয় নি।

বঙ্গবন্ধু : সবাই অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করেছে। কে বলেছে তা হয় নি? এটা কী তামাশা যে, তারা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার অস্ত্রসমর্পণ করেছে। তারা দুবার অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করেছে। অবশ্য অল্পসংখ্যক লোক রয়েছে যারা অস্ত্র জমা না দিয়ে কোথাও কোথাও চুরি ডাকাতি করছে, এর সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।

বিহারী

প্রশ্নকর্তা : জনাব প্রধানমন্ত্রী, বিহারীদের ভাগ্য সম্বন্ধে কিছু জানাবেন কী? তাদের সমস্যার সঠিক কোন সমাধান আছে কী?

বঙ্গবন্ধু : তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সবাই এমনকি জাতিসংঘের প্রতিনিধিগণ তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছেন। তারা অবাঙালিদের দু অথবা তিনটি এলাকাও প্রত্যক্ষ করেছেন।

আপনারা যদি সৈয়দপুর যান তবে দেখতে পাবেন অবাঙালিরা মিল ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে। আপনারা মিরপুর ও মোহাম্মদপুর দেখুন তারা ওখানে শান্তিতে বসবাস করছে। কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বিহারীদের বিষয়টিকে জোরালো করে তুলছেন, কিন্তু পাকিস্তানে আটকেপড়া সাড়ে চার লাখ বাঙালিদের ভাগ্য সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই বলছেন না।

তারা কোন অন্যায় করে নি, তবুও তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তারা তাদের খাদ্য বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমি আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে যেখানে খুশি যেতে দিচ্ছি। তারা আমাদের রেডক্রসের সহায়তায় সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করছে। অবশ্য আমার জনগণ দরিদ্র, আমি আমার জনগনকে পুরো খাদ্য দিতে পারছি না। মানুষের পক্ষে যা সম্ভব আমি তাই করছি। কিন্তু পাকিস্তানে আমার যে সাড়ে চার লাখ লোক আটকা পড়েছে সে সম্বন্ধে বিশ্বের কোন মহল থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কেউই তাদের জন্য কোন কথা বলছে না। অথচ বিহারীদের জন্য সকলেই অস্থির। বিহারীরা এখানে আরামে বসবাস করছে।

একথা আমি সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে, বাংলাদেশকে যারা মাতৃভূমি বলে স্বীকার করবে তাদের আমি স্বাগত জানাব। বিহারীদের এখানে কাজে থাকতে দিন। আমি নিশ্চিত যে, বিহারীরা আমেরিকার নিগ্রোদের তুলনায় সুখে আছে।

প্রশ্নকর্তা : জনাব প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বঙ্গবন্ধু : ধন্যবাদ।

সূত্র : সংবাদ, ১৫ মে ১৯৭২

"মুজিববাদ" বইয়ের লেখক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস-এর কতিপয় প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু, আমরা দীর্ঘকাল আপনার রাজনৈতিক জীবনের সংস্পর্শে থেকে লক্ষ্য করে এসেছি যে, বাংলাদেশের নিজস্ব ঐতিহাসিক ধারার বিকাশ ও বাঙালি জাতির চেতনার স্তর বিবেচনায় রেখে আপনি এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্যে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দিয়ে আসছেন, নিজস্ব একটি মতবাদ ব্যক্ত করে আসছেন। এখন আমার প্রশ্ন আপনি জিন্নাবাদ, গান্ধীবাদ, নাসেরবাদ, ইহুদিবাদ, মাওবাদ, টিটোবাদ, লেনিনবাদ ও মার্কসবাদের আলোকে আপনার মতবাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে কি ভাবছেন?

উত্তর : দেখুন, ছাত্রজীবন থেকে আজ পর্যন্ত আমার এই সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রাম কতিপয় চিন্তাধারার উপর গড়ে উঠেছে। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী তথা সকল মেহনতী মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাম্য প্রতিষ্ঠাই আমার চিন্তাধারার মূল বিষয়বস্তু। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। কাজেই কৃষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে আমি জানি শোষণ কাকে বলে। এ দেশে যুগ যুগ ধরে শোষিত হয়েছে কৃষক, শোষিত হয়েছে শ্রমিক, শোষিত হয়েছে বুদ্ধিজীবীসহ সকল মেহনতী মানুষ। এ দেশের জমিদার, জোতদার, মহাজন ও তাদের আমলা-টাউটদের চলে শোষণ। শোষণ চলে ফড়িয়া-ব্যবসায়ী ও পুঁজিবাদের। শোষণ চলে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের। এ দেশের সোনার মানুষ, এ দেশের মাটির মানুষ শোষণে শোষণে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের মুক্তির পথ কি? এই প্রশ্ন আমাকেও দিশেহারা করে ফেলে। পরে আমি পথের সন্ধান পাই। আমার কোন কোন সহযোগী রাজনৈতিক দল ও প্রগতিশীল বন্ধুবান্ধব বলেন, শ্রেণী সংগ্রামের কথা। কিন্তু আমি বলি জাতীয়তাবাদের কথা। জিন্নাবাদ এ দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিষবাষ্প। তার জবাবে আমি বলি, যার যার ধর্ম তার তার– এরই ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা। সেই সঙ্গে বলি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সমাজতন্ত্র চাই। কিন্তু রক্তপাত ঘটিয়ে নয়– গণতান্ত্রিক পন্থায়, সংসদীয় বিধিবিধানের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

আমার এই মতবাদ বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করেই দাঁড় করিয়েছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুগোশ্লাভিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে, নিজ নিজ অবস্থা মোতাবেক গড়ে তুলছে সমাজতন্ত্র। আমি মনে করি, বাংলাদেশকেও অগ্রসর হতে হবে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই চারিটি মূল সূত্র ধরে, বাংলাদেশের নিজস্ব পথ ধরে।

আমার উপরোক্ত মতবাদকে অনেকে বলছেন, 'মুজিববাদ'। এ দেশের লেখক, সাহিত্যিক কিংবা ঐতিহাসিকগণ আমার চিন্তাধারার কি নামকরণ করবেন সেটা

তাঁদের ব্যাপার, আমার নয়। নামকরণের প্রতি আমার কোন মোহ নেই। আমি চাই কাজ। আমি চাই আমার চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণ। আমি চাই শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। আমি চাই আমার স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' নির্মাণের পূর্ণ বাস্তবায়ন।

প্রশ্ন : জাতীয়তাবাদ আপনার মতবাদের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু আপনি তো জানেন, জাতীয়তাবাদ উগ্রতা কিংবা সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হলে ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়? তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের প্রতি আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?

উত্তর : আপনি ঠিকই বলেছেন যে, জাতীয়তাবাদ উগ্রতা কিংবা সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হলে হিটলারের জার্মানি, মুসোলিনির ইতালি, ডক্টর ভেরউর্ডের দক্ষিণ আফ্রিকা, পাঞ্জাবি খানদের পাকিস্তান বা ইসরাইলের ইহুদিবাদের মতো অতি জঘন্যরূপ ধারণ করতে পারে। সে জাতীয়তাবাদ দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ। কিন্তু আমার জাতীয়তাবাদ বামপন্থী ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ। নাৎসী জার্মানি, ফ্যাসিবাদী পাঞ্জাব, বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইহুদিবাদের মতো উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের চরিত্র ও তার বিকাশ ধারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ এবং আমলাতন্ত্রবাদ ও জঙ্গিবাদ উগ্র ও সকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মূলশক্তি। তারা গণতন্ত্রেরও শত্রু, সমাজতন্ত্রেরও শত্রু। তাদের জাতীয়তাবাদ শোষকদের জাতীয়তাবাদ। আমার জাতীয়তাবাদ শোষিতের জাতীয়তাবাদ। কারণ, আমার জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে রয়েছেন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত আওয়ামী লীগ। কাজেই যে জাতীয়তাবাদ আমার মতবাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গ, সেই বিপ্লবী ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত হবার কোন ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বাস্তব কারণ নেই।

প্রশ্ন : বিশ্ব সমাজকে একটি সমাজ এবং বিশ্ব মানবকে যদি একটি গোষ্ঠী ধরে নেই, তবে কি জাতীয়তাবাদের চেয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদ উন্নততর পর্যায় নয়?

উত্তর : সাম্প্রদায়িকতাবাদ এ দেশের মাটিতে গভীর শিকড় গেড়ে বসে আছে। তাকে নির্মূল করে তবেই এ দেশের শ্রেণী চেতনার বিকাশ সাধন সম্ভবপর। আর একমাত্র শ্রেণী চেতনাই আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ব শর্ত। এ দেশের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, শ্রেণী-চেতনা বিকাশের পথে সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রধান অন্তরায়। আর সাম্প্রদায়িকতাবাদ নির্মূল করার রণকৌশল হিসাবেই আমি জাতীয়তাবাদী দর্শন অনুসরণ করেছি। এই মতবাদ কার্যকরী হলে, আমার বিশ্বাস, এ দেশের ভাবীকালের মানুষ ক্রমে ক্রমে জাতীয়তাবাদের গণ্ডি পার হয়ে উত্তীর্ণ হবে বিশ্বমানবতাবাদী উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে।

প্রশ্ন : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বলতে আপনি কি বুঝাতে চান?

উত্তর : দেখুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দুইটি পথের কথাই আমরা জানি। একটি হলো শ্রমকি, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ, অপরটি সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ। লেনিন রাশিয়ায় এবং মাও সে তুং চীনে প্রথমোক্ত লাইনে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেচে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ জীবনে সাম্প্রদায়িকতাবাদের অশুভ ভূমিকার দরুন এ দেশে

শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে উঠেনি। এমনকি সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষেও সাম্প্রদায়িতকতাবাদের ভূমিকা ছিল অতিশয় মারাত্মক। তদুপরি দেশটি শিল্পে পশ্চাৎপদ বলে এখানে শিল্প-শ্রমিকও তেমন সৃষ্টি হয় নি, সংগঠিতও হয় নি। এরূপ বাস্তব অবস্তায় বাংলাদেশে শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী সংগ্রামের স্থলে গড়ে উঠেছে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য মেহনতী শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থনে বহু-শ্রেণী ভিত্তিক জাতীয় সংগঠন ও জাতীয় সংগ্রামী দল আওয়ামী লীগ। জমিদারি উচ্ছেদের পর এ দেশের সামন্তবাদ তেমন শক্তিশালী নয়। এখন রয়েছে সামন্তবাদের ভগ্নবিশেষ– জোতদার, মহাজন ও তাদের আমলা-টাউট। আইনের মাধ্যমেই তাদের উচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। ওদিকে আওয়ামী লীগের জাতীয় সরকার ব্যাংক-বীমা, বৃহৎ ও ভারি শিল্প এবং বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ জাতীয়করণ করার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী ও পুঁজিবাদের বিকাশের পথরুদ্ধ হয়েছে। তাদের এমন ক্ষমতা নেই যে, সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে। শোষক শ্রেণীকে দমন করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা দেশবাসীর আছে। সমাজতন্ত্র রাতারাতি হয় না– দীর্ঘদিনের ব্যাপার। শান্তিপূর্ণভাবে এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। রক্তপাত অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা দেশকে ঐক্য, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিতে চাই। এ কাজে আমি মনে করি, শক্তির উৎস বন্দুকের নল নয়, শক্তির উৎস আমার জনগণ।

প্রশ্ন : ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশই সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকে। আপনি কি মনে করেন যে, বাংলাদেশেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে?

উত্তর : দেখুন, পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা। কাজেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলবার চেষ্টা করে। তাদের সঙ্গে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে যুক্ত হয় শোষকদের আন্তর্জাতিক দোসর– সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ। বাংলাদেশেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বৈরী ভূমিকায় আমরা ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করি নি। কারণ, জাতীয় স্বাধীনতার বিরোধিতা করাই তাদের বিঘোষিত নীতি। তবে, সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহেও প্রগতিশীল সংগঠন ও ব্যক্তি আছেন। তাঁরাও তাঁদের দেশে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করছেন। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা তাঁদের সক্রিয় সমর্থন লাভ করেছি। আশা করি, আমাদের সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও শান্তির সংগ্রামেও তাঁদের সক্রিয় সমর্থন আমরা লাভ করব। এ প্রশ্নে দেশের অভ্যন্তরে আমরা সকল প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ। আন্তর্জাতিকভাবেও আমরা ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী।

সূত্র : *মুজিববাদ*, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ : বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা

বঙ্গবন্ধু

অন্নদাশঙ্কর রায়

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবর রহমান ।

[১৯৭১]

প্রতিশোধ

অসীম সাহা

আমাদের কোনো পরিচয় নেই
আমরা কি তবে পিতৃমাতৃহীন?
জন্মের নাড়ি কাটেনি কি কেউ
আমরা আঁধারে রয়েছি ধাত্রীহীন?

আমার কি তবে কুমারী মাতার
অবৈধ প্রেম, পরিচয়হীন ভ্রূণ?
কে তবে আমার অজ্ঞাত পিতা,
আমাদের দেহে যার সংশয়ী খুন?

এখনো পাইনি পরিচয় তার,
এখনো চিনতে পারিনি কিছুই নিজে,
এখনো আমার পরিচয় খুঁজি
পুরনো পাপের অন্ধকারের নিচে!

পিতা হতে পারে অপ্রিয়, অপরাধী;
জন্ম কি তবু অবৈধ হতে পারে?
যার ভ্রূণে এই পৃথিবীতে পরিচয়—
সে আমার পিতা, আমারই রক্তে বাড়ে।

দিকে দিকে কারা চিৎকার করে শুনি,
পিতার রক্ত হাতে মেখে যারা নাচে—
পরিচয়হীন সেই সব কালো কীট
বিপরীত স্রোতে শ্যাওলার মতো বাঁচে।

মধ্যদেশের ক্রীতদাস তারা সব
পিতার প্রাপ্য ভূমিতে দাঁড়িয়ে থেকে
আমাদের সব গৌরবগাথাগুলো
ঢেকে দিতে চায় কৃত্রিম কালো মেঘে।

অন্ধকারের কালো শেয়ালেরা আজ
ঘোরে এই দেশে, হাতে ঘাতকের ছুরি;
এখানে এখন প্রয়োজন অগণিত
পিতার প্রেমের প্রিয় উত্তরসুরি।

প্রতিশোধ ছাড়া প্রেমে সব কিছু জয়
হয় না কখনো, কেড়ে নিতে হবে চাবি;
রক্তের ঋণ শোধ করে দিতে হবে
প্রতি ধূলিকণা জানায় প্রবল দাবি।

নামে সাহস নামেই মায়া

আনজীর লিটন

মুজিব ছাড়া বাংলা বলো
কেমন করে মানতে পারি?
একটা জাতির একটা মুজিব
কোত্থেকে আর আনতে পারি?
মুজিব ছাড়া বাংলা আমার
ছেঁড়াখোঁড়া পালের নাও
মুজিব ছাড়া বাংলা আমার
দুঃখ ভরা সবুজ গাঁও।
মুজিব ছাড়া বাংলার আমার
মিথ্যা ভরা ইতিহাস
মুজিব ছাড়া বাংলা আমার
শুধুই যেন দীর্ঘশ্বাস।
তারপরও এই বাংলাদেশের
জীবন গতি থাকছে সচল
শেখ মুজিবের স্বপ্নমাখা
এদেশ আমার হয়নি অচল।
কারণ হলো শেখ মুজিবের
নামে সাহস, নামেই মায়া
আদর্শেরই পথে মুজিব
বাংলাদেশের শীতল ছায়া।

প্রতিশোধে হ্যামলেট
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

পিতা, জেনে যাও, তোমার এ অবিবেকী অন্যায় হত্যার রক্তঘাতী বিনিময় হবে।
তোমার অগাধ প্রেম, রাজধর্ম, হে জনক, উদারতা-ঈর্ষিত, বিশাল
কালকূট হয়ে, দ্যাখো তোমাকেই করেছে আঘাত!
হায় মানবিক কৃতঘ্নতা!
পশু আর প্রিয়তমা এক হয়ে গেছে
মহত্ত্বের স্নায়ু ছিঁড়ে নিতে।
তোমাদের উদ্বাহু বিশ্বাস, পিতা
কুকুরের খাদ্য দ্যাখো আজ!
চক্ষুহীন স্বর্ণলালসায় চারধারে
মরিয়া কৃতান্তকূল। আমাদের কামনার প্রিয়তমারাও
শুয়োরের বুনো আলিঙ্গনে তৃপ্তি চায় শুধু আজ।
শত্রুকে চিনেছি আমি পিতা! আমাদের এই প্রাসাদের
মান্যবর বাসিন্দা সে আজ : ডেনমার্কের সম্মানিত প্রভু!
অমাত্য, দেহরক্ষী, বৈভব, সম্পদ রানী
রাজদণ্ড পরিবৃত্ত সহজ নাগাল থেকে দূরে।
তোমার প্রাক্তন রানী আমার মায়ের
কলুষ প্রশ্রয়ে (হা ঈশ্বর!)
তোমার শোবার ঘর কলঙ্কিত করে প্রতিরাত্রে
ঘৃণ্য আরোহণে দ্যাখো প্রতিদিন
অপমান করে ডেনমার্কের প্রিয়তম সিংহাসন!

রক্তে বাজে প্রতিশোধ! পিতা, আমি প্রতি পলে
ধূর্ত বেড়ালের মতো প্রাসাদের সতর্ক ছায়ায়
সুযোগের প্রতীক্ষায় হেঁটে ফিরি, উন্মাদের বেশে
এড়াই সন্দেহ; নিদ্রাকে
চিরশত্রু করেছি, দুর্লভ প্রেমকেও অবৈধ অশ্রুর সাথে নিরুদ্ধ করেছি অন্ধকারে!
রক্তে বাজে প্রতিশোধ! প্রতিটি স্নায়ুর
ক্ষুধার্ত চিৎকারে, দাঁতের প্রতিটি
উন্মত্ত কামড়ে উচ্চকিত শিরাদের ক্ষোভে
শরীরময় রক্তকণাদের বন্যতায়
বিনিদ্র চোখের মতো দ্যাখো শুধু প্রতিশোধ জ্বলে!

বঙ্গবন্ধুকে
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

তোমার বিজয় পতাকা এখন মাটির ধূলায় নমিত
তোমার দীপ্ত আদর্শ আজ শকুনির পায়ে দলিত।
আকাশে উড়ালে সূর্য-পতাকা
তাতে আজ শুধু রক্তই মাখা
জয়বাংলার কম্বু কণ্ঠ আজ বাংলায় দমিত
তোমার বিজয় পতাকা এখন মাটির ধূলায় নমিত।

আজ বাংলার ভাগ্যবিধাতা মাটির কবরে শায়িত
দশ কোটি বাঙালি আজ রাজাকার দ্বারা শাসিত।
কুকুর এখন মসনদে বসে

সিংহচর্ম গায়ে দেয় কষে
বিদেশী প্রভুর সেবায় এখন পদানত দাস নিরত
তুমি তো হয়েছো শহীদ বন্ধু বাঙালি হয়েছে নিহত॥
কোথায় তোমার মুক্তিযোদ্ধা? বাঘা ছিদ্দিকী? কর্মী বাহিনী?
কোথায় তোমার বুদ্ধিজীবীরা? তারা তো এখন ক্ষমতা কামিনী
কেউ ঘরে বসে নেতা হতে চায়
বিদেশে কেউবা আসর জমায়
গলাবাজি আর মায়াকান্নায় দেশের বাতাস পীড়িত
জনতা ভ্রান্তঃ তোমার পতাকা মাটির ধূলায় নমিত॥
বঙ্গবন্ধু। তোমার বন্ধু আজ বাংলার জনগণ
টুঙ্গিপাড়ার কবরে শুয়ে কি শোন না তাদের ক্রন্দন?
আর একবার তুমি ডাক দাও।
এই দেশ হতে কুকুর তাড়াও
তুমি ডাক দিলে আবার দাঁড়াবে শিরখাড়া করে জনতা।
জয়বাংলার বজ্রধ্বনিতে প্রাণ পাবে মরা স্বাধীনতা॥

এ কেমন জন্মদিন

আসাদ চৌধুরী

কি না কলম মারছইন গো আল্লাজি
ছাওয়ালিয়ার নছিবে'রে,
কি না লেখন লিখছইন গো আল্লাজি
ছাওয়ালিয়ার চাঁড়াতে রে॥
ময়মনসিংহের হাইট্টারা গান

জন্মদিনে আমার ছেলের দাবি নূতন নূতন
জুতো জামা চাই,
টেবিলে থাকবে কলা, কেক, রসগোল্লা আরো কত কি যে,
আত্মীয় স্বজন এসে রেখে যাবে
দু-একটা পোটলা-পুঁটলি সাজানো টেবিলে।

এ কেমন জন্মদিন, খাঁ খাঁ বুক বেলুন-ফুটকা নাই,
লাল-নীল বাত্তি নাই,
কোনোখানে উৎসবের চিহ্নমাত্র নাই।
হে পিতা, তোমার জন্মদিনে
তোমার ও বাঙালির এ কেমন ভিন্ন আচরণ?
কেউ কেউ চোখ মোছে, কারো চোখে প্রতিশোধ নাচে,
মীর জাফরের মতো আড় চোখে কারবালা দ্যাখে,
তুমি নাই, তবুও তোমার কাছে
কী প্রবল প্রত্যাশায় ভিড় করে বাংলার মানুষ।
তোমার দেবার মতো কিছু নাই, তবু চায় তোমার আশ্বাস।

আমরণ তুমিই বলেছো আমরা তো শুনেছি কেবল,
কেউ কেউ আছে, তারা কোনো দিন কিছুই শোনে না–
এখন কি ভিন্ন কিছু হবে?
তোমার বেলায় জানি সবকিছু একটু-আধটু ভিন্ন ধরনের।
যেমন তোমার জন্মদিনে

জন্ম নয়, আনন্দ উল্লাস নয়–
মধ্যযুগ থেকে উঠে আসা একটি করুণ মৃত্যু
চেতনায়, বোধে, দ্যাখো
কী প্রবল নাড়া দিয়ে যায়।
আমাদের সমবেত পাপ, ভয়
কাপুরুষ-অপরাধ-বোধ নিয়ে
তোমার ফটোর দিকে আজো তাই তাকাতে পারি না।

আমাদের পিতার নামের সাথে
পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা মিশে আছে, জেনো–
নিপীড়িত লাঞ্ছিত যারা
তারা পায় সংগ্রামের, বিপ্লবের বিপুল প্রেরণা।
অন্যায়ের প্রতিবাদে মানাব-ভাষার শ্রেষ্ঠ নাম
মুজিবুর রহমান
প্রগতি ও শান্তির নির্ভুল নাম
মুজিবুর রহমান
শান্তিকামী মানুষের আশীর্বাদে ধন্য এক নাম
মুজিবুর রহমান
পিতার অধিক স্নেহ ঘাতকের প্রতি তারো নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এ কেমন জন্মদিন মৃত্যুদৃশ্য ভেসে ওঠে শুধু
পদ্মা-মেঘনা-যমুনার পলি দিয়ে গড়া
সাগরের লোনা মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া মাটি,
ভাটার পানিটা স'রে গেলে
বাঘের থাবার চিহ্ন,
হরিণের ধাবমান খুর-রেখা,
পিতামহদের দীঘল নিশ্বাস, শত শতাব্দীর অপমান
তুমি তো সেখানে পিতা, পেতেছো বিশাল সিংহাসন–

যে ঘাতক তোমার সুবিশাল ছায়াতলে
থেকে কেড়ে নিলো তোমার নিশ্বাস–
শিশুঘাতী, নারীঘাতী ঘাতকেরে যে করিবে ক্ষমা
তার ক্ষমা নাই–
আমরণ অনুগত,
তোমারই অবাধ্য হবে আজ,
পিতা, অনুমতি দাও।

মুজিব মানে তো

আহমাদ মাযহার

মুজিব মানে তো সংগ্রাম আর
মুজিব মানে তো জয়,
মুজিব মানে তো নির্ভয় আর
না মানে যে পরাজয়।

মুজিব মানে তো উন্নত শির
মুজিব মানে তো ঝড়,

মুজিব মানে তো উৎখাত করা
হানাদার বর্বর।
মুজিব মানে তো শান্তি সবার
নির্মল অন্তর।

মুজিব মানে তো প্রত্যাশা আর
মুজিব মানে তো সুখ,
মুজিব মানে তো বাঙালির প্রাণ
ভালোবাসা ভরা বুক।

মুজিব মানে তো বিশ্বের বুকে
গর্বিত মহাপ্রাণ,
মুজিব মানে তো সোনার বাংলা
মুক্ত মাটির ঘ্রাণ।
মুজিব মানে তো চিরভাস্বর
জীবনের জয়গান।

শেখ মুজিবের মহাপ্রয়াণে

এলাংবম নীলকান্ত

অনুবাদক : এ কে শেরাম

[ভারতের মণিপুরের বর্তমান কবিদের প্রথম সারির কবি এলাংবম নীলকান্ত। অনূদিত কবিতাটি কবির 'তীর্থযাত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, কবিতাটি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে রচিত–অনুবাদক]

হে বঙ্গবন্ধু,
নিষ্ঠুর বুলেটের আঘাতে নিহত হয়েছো শুনে
আমি কাটিয়েছি এক অস্থির সময়,
খোলা জানালা দিয়ে পলকহীন তাকিয়ে থেকেছি
সুদূর আকাশের দিকে
উত্তরহীন এক দীপ্র প্রশ্ন নিয়ে।
বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলে স্বদেশ তোমার
গড়েছিলে এক স্বপ্নময় জগৎ,
কিন্তু এ কোন্ প্রতিদান পেলে তুমি
তোমার নিজেরই হাতে গড়া বাংলাদেশের কাছ থেকে?
হিংসার এক প্রজ্বলিত হোমাগ্নি থেকে
বেরিয়ে এসেছিলো যে বাংলাদেশ
আবার কি সে অগ্নি–আহুতি দিচ্ছে হিংসারই আরেক যজ্ঞে
সীতার মতোই কি ঝাঁপিয়ে পড়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে?
আবার কি তুমি ফিরে আসবে তোমার এ বাংলায়,
হে বঙ্গবন্ধু, জীবনের নতুন কোনো এক রূপে?

কবি বলে গেছেন–
'প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
কেঁদেছিলে তুমি একা হেসেছিলো সবে।
এমন জীবন তুমি করিলে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।'
আমি জানি না, বঙ্গবন্ধু,
তুমি কি সেদিন হেসেছিলে
ঘাতকের উদ্যত মারণাস্ত্রের মুখে?

নাকি তোমার হৃদয় দলিত মথিত হয়েছিলো
অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে
তোমারই হাতে গড়া প্রিয় স্বদেশের জন্যে;
নাকি তখন তুমি অনুভব করেছিলে
নতুন এক জীবনের আলোক বিচ্ছুরণ
তোমার জীবনের সেই অন্তিম সন্ধিক্ষণে?
জানালার ওপাশে ফুটে আছে গোলাপ
আমি চেয়ে আছি– চেয়ে আছি অপলক
আর খুঁজে ফিরছি জীবনের অর্থ।
মৃত্যু কি জীবনের শেষ অধ্যায়
নাকি নবতর সূচনা মাত্র!
জীবনের কি আছে কোনো আদি-অন্ত?
কালের কালো নেকাব সরিয়ে
যিশু খ্রিস্ট, লিংকন, মহাত্মা গান্ধী
এবং সর্বশেষ শেখ মুজিবুর রহমান
একে একে বেরিয়ে এসে
মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন আমাকে–
চিনতে পারো আমাদের?

দু'হাতে চোখ ঢেকে চিৎকার করে উঠি
না–না চিনি না, আমি কাউকে চিনি না।

জানালার ও–পাশে উজ্জ্বল ফুটে আছে গোলাপ
আমি কেবল খুঁজে ফিরছি সত্যকে
জীবনের অতীত এক জীবনকে।
অন্তত এটুকু সত্য জেনো, বঙ্গবন্ধু,
তোমার মহাপ্রয়াণে
অন্ধকারের এক বিশাল যবনিকা নেমে এসেছে
আমাদের এই পৃথিবীর ওপর।

শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিব

কাজী মোস্তফা

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
জাগরণে জেগে উঠেছে অসহযোগ আন্দোলন
রোদের বিপ্লব মানুষের বিপ্লব
গণজোয়ার স্বাধীনতার বিপ্লব
পাখিতে পাখিতে মুখরিত রমনা পার্ক
আর রেসকোর্স ময়দান লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল
অথচ নীরব নিঃশব্দ
আকাশে উঠেছে সূর্য তবে অতি উজ্জ্বল
বাতাসের পাতায় নাচের শব্দ
কত কিছু তবুও চোখে পড়ে শুধু বঙ্গবন্ধু
হিরকের জ্যোতি ফুটেছে ললাটে
চমকিত মনে জেগে উঠে শুধু
সেই অমর ডাক

হাতের ভিতর হাত যার উঠে
ঊর্ধ্বে আকাশে ডাক দেয় যুদ্ধের
শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি যার
নির্দেশে আরম্ভ হলো সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম।
যাদুকর তিনি যার যাদুতে
চাঁদতারা ছুঁড়ে গাঁথলেন পতাকায় সূর্য
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।
তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

বাংলার কবি
কামাল চৌধুরী

একটি কবিতা জনকের নামে লেখা
একটি কবিতা পতাকায় আঁকা ছবি
সবুজে রক্ত একটি কবিতা নদী
একটি মানুষ সারা বাংলার কবি।

পথে একতারা পথে বাউলের গান
একটি কবিতা তমসায় রোদ্দুর
একটি কবিতা অ আ ক খ শতফুল
একটি কবিতা জয় বাংলার সুর।

একটি কবিতা শত্রুর মুখে মুখে ছাই
পদ্মা-গঙ্গা নদী তীরে বরাভয়
একটি কবিতা হিজল তমাল শাখা
একটি মানুষ অম্লান অক্ষয়।

একটি কবিতা শহীদ মিনারে ভোর
একটি কবিতা জনতার জয়ধ্বনি
একটি মানুষ সোনার বাংলা মাগো
একটি মানুষ সাহসের তর্জনী।

একটি কবিতা রক্ত পলাশে লেখা
একটি মানুষ পতাকায় আঁকা ছবি
বুকে একতারা শ্যামা দোয়েলের গান
মুজিবুর আজ সারা বাংলার কবি।

রাখাল রাজার জন্যে
খালেক বিন জয়েনউদ্দীন

১. ঘুম পাড়ানি বনকা পিসি ঢ্যাপের মোয়া খেও
আমার বাড়ি টুঙ্গিপাড়া একটু বসে যেও।
শালুক দেব ইছন বিছন নেইকো শীতল পাটি,
দস্যুসেনা ঘর লুটেছে করছে খাঁ খাঁ গাঁ-টি।

২. ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি কুতুর কুতুর ছা,
টুঙ্গিপাড়া শেখের বাড়ি উইড়া সেথায় যা।
সেই খানেতে রাখাল রাজার ছোট্ট কবর খানি,
সন্ধ্যে সকাল ঝরায় কেবল লক্ষ চোখের পানি।

৩. আপিল চাপিল ঘন্টিমালা পদ্মাবতির ভাই,
রাসেল মনির সোনার ঘুড়ির লাটাই-সুতো নাই।
লাটাই নিলো ডাকাত চিলে করলো আহা গুলি,
এক নিমিষি উধাও প্রাণ উড়লো মাথার খুলি।

৪. উবুর ডুবুর পানকৌড়ি শেখ নেইকো ঘরে,
দস্যুসেনা ধান কাড়লো পদ্মা নদীর চরে।
ধান ফুরুলো পান ফুরুলো খাবার উপায় কী?
আর কটা দিন সবুর কর ঘন্টি বেঁধেছি।

৫. এরোন গোটা ডেরোন গোটা কুনো ব্যাঙের ছাতি,
সিংহাসনে টোপর পরে ছিদাম মেয়ার নাতি।
নাতির বাড়ি ডুগডুগানি আপনি মোড়ল তিনি
পাইক-পেয়াদার পীরিত-চীরিত কম-বেশি তো চিনি।

[মাসিক *সমকাল* থেকে সংকলিত]

তোমার জন্যে হে জনক

খালেদা এদিব চৌধুরী

তোমার জন্যেই সবুজ বাগানে ফুল ফোটে ঝিলমিল
তোমার জন্যেই নদীতে ঢেউ ওঠে কলকল
তোমার জন্যেই অরণ্যের পাতা ঝরে টুপটাপ
পাখি গান গায়
পাখির পালকে ঝরে স্বপ্ন
স্বদেশের শ্যামল মাটি কর্ষিত হয়
অফুরন্ত ভালোবাসা নিয়ে ...

এখনো সূর্যোদয়ে রক্ত ঝরে বিপ্লবের
সংগ্রামের ডাক দিয়ে যায়
তোমার দুর্বার কণ্ঠস্বর

তোমার জন্যেই প্রকৃতি এতোটা উদার ভালোবাসা
নিয়ে জ্বলে ওঠে ঔজ্জ্বল্যে—
এতোটা সাহস সঞ্চার করে বাংলার মানুষ—
তুমি আছো সাহসে, প্রেমে, বিস্ময়ে, জয়ে
তুমি আছো অন্তরে বাহিরে অনন্তর
হে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর।

বঙ্গ-বন্ধু

জসীম উদ্‌দীন

মুজিবর রহমান!
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে
জ্বালায় জ্বলিছে মহা-কালানল ঝঞ্ঝা-অশনি বেয়ে।
বিগত দিনের যত অন্যায় অবিচার ভরা-মার,
হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;
দিনে দিনে হয়ে বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে,
দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান ছিল প্রকাশের মুখে;
তাহাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি
ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরণী ভরি।

মুজিবর রহমান!
তব অশ্বেরে মোদের রক্তে করায়েছি পূত-স্নান!
পীড়িত-জনের নিশ্বাস তারে দিয়েছে চলার গতি,
বুলেটে নিহত শহীদেরা তার অঙ্গে দিয়েছে জ্যোতি।
দুর্ভিক্ষের দানব তাহারে দেছে অদম্য বল,
জঠরে জঠরে অনাহার-জ্বালা করে তারে চঞ্চল।
শত ক্ষতে লেখা অমর কাব্য হাসপাতালের ঘরে,
মুহুর্মুহু যে ধ্বনিত হইছে তোমার পথের 'পরে।
মায়ের বুকের ভায়ের বুকের বোনের বুকের জ্বালা,
তব সম্মুখ পথে পথে আজ দেখায়ে চলিছে আলা।
জীবন দানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনানী পাছে,
তোমার হুকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে।
রাজভয় আর কারাশৃঙ্খল হেলায় করেছ জয়,
ফাঁসির মঞ্চে—মহত্ত্ব তব তখনো হয়নি ক্ষয়।
বাংলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ,
প্রতি বাঙালির হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার তক্ত-তাজ।
তোমার একটি আঙ্গুল হেলনে অচল যে সরকার
অফিসে অফিসে তালা লেগে গেছে—স্তব্ধ হুকুমদার।

এই বাংলায় শুনেছি আমরা সকল করিয়া ত্যাগ,
সন্ন্যাসী বেশে দেশ-বন্ধুর শান্ত-মধুর ডাক।
শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী—জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান
তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর,
জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাংলার।
তোমার হুকুমে রেল-জাহাজের চাকা যে চলেনি আর,
হাইকোর্টের বন্ধ-দরজা খুলিবে সাধ্য কার!

সেনাবাহিনীর অশ্বে চড়িয়া দম্ভ-স্ফীত ত্রাস,
কামান গোলার বুলেটের জোরে হানে বিষাক্ত শ্বাস।
তোমার হুকুমে তুচ্ছ করিয়া শাসন ত্রাসন ভয়,
আমরা বাঙালি মৃত্যুর পথে চলেছি আনিতে জয়।

ধন্য এ কবি ধন্য এ যুগে রয়েছে জীবন লয়ে,
সম্মুখে তার মহাগৌরবে ইতিহাস চলে বয়ে।

ভুলিব না সেই মহিমার দিন, ভাষার আন্দোলনে;
বুলেটের ভয় তুচ্ছ করিয়া ছেলেরা দাঁড়াল রণে।
বরকত আর জব্বার আর সালাম পথের মাঝে,
পড়ে বলে গেলো, "আমরা চলিনু ভাইরা আসিও পাছে।"

উত্তর তার দিয়েছে বাঙালি, জানুয়ারি সত্তরে,
ঘরের বাহির হইল ছেলেরা বুলেটের মহা-ঝড়ে!
পথে পথে তারা লিখিল লেখন বুকের রক্ত দিয়ে,
লক্ষ লক্ষ ছুটিল বাঙালি সেই বাণী ফুকারিয়ে।
মরিবার সে কি উন্মাদনা যে, ভয় পালাইল ভয়ে,
পাগলের মতো ছোটে নর-নারী মৃত্যুরে হাতে লয়ে।

আরো একদিন ধন্য হইনু সে মহাদৃশ্য হেরি,
দিকে দিগন্তে বাজিল যেদিন বাঙালির জয়ভেরী।
মহাহুঙ্কারে কংস-কারার ভাঙিয়া পাষাণ দ্বার,
বঙ্গ-বন্ধু শেখ মুজিবেরে করিয়া আনিল বার।

আরো একদিন ধন্য হইব, ধন-ধান্যতে ভরা,
জ্ঞানে-গরিমায় হাসিবে এদেশ সীমিত বসুন্ধরা।
মাঠের পাত্রে ফসলেরা আসি ঋতুর বসনে শোভি,
বরণে সুবাসে আঁকিয়া যাইবে নকশী-কাঁথার ছবি।
মানুষে মানুষে রহিবেনা ভেদ, সকলে সকলে সকলকার,
এক সাথে ভাগ করিয়া খাইবে সম্পদ যত মার।
পদ্মা মেঘনা যমুনা নদীর রূপালীর তার পরে,
পরাণ ভুলানো ভাটিয়ালী সুর বাজিবে বিশ্বভরে!
আম-কাঁঠালের ছায়ায় শীতল কুটিরগুলির তলে,
সুখ যে আসিয়া গড়াগড়ি করি খেলাইবে কুতূহলে।

আরো একদিন ধন্য হইব চির-নির্ভীকভাবে,
আমাদের জাতি নেতার পাগড়ি ধরিয়া জবাব চাবে,
"কোন অধিকারে জাতির স্বার্থ করিয়াছ বিক্রয়?"
আমার এদেশ হয় যেন সদা সেইরূপ নির্ভয়।

[ঢাকা, ১৬ মার্চ ১৯৭১]

কোন্ ছবিগুলি

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

কোন্ ছবিগুলি সেই স্বপ্ন অবসরে
তুমি দেখেছিলে, দ্রুত, স্মৃতির পর্দায়?
প্রিয়াকে? ছেলেকে? মা-কে? শৈশবের ঘরে
তুলে রাখা রঙিন ঘুড়িকে? কোলকাতায়
'বেকারে'র ছোট কামরা? অথবা ঢাকায়
সেন্ট্রাল জেলের দীর্ঘদিন, দীর্ঘরাত!
অথবা উধাও দিন কাজের চাকায়,
ঘরে ফেরা অনেক রাত্তিরে, ঠাণ্ডা ভাত ...
অথবা এসব কিছু নয়! যে মরণ
জীবনের পায়ে পায়ে ছিল, তুমি যাকে
কখনো পিছনে ফিরে দেখেও দেখোনি,
ঘুম থেকে হঠাৎ ঝাঁকিয়ে সে যখন
বলেছিল, চলো, তার আশ্চর্য স্পর্ধাকে
কি ব'লে জবাব দেবে, সে-ভাষা শেখোনি।

তুমি চলে গেছো বলে

ত্রিদিব দস্তিদার

তুমি চলে গেলে
সাথে নিয়ে গেলে স্বদেশের শোভা
জমির উর্বরতা শস্যের ফসল
পরিপাটি গৃহস্থালি বাসন কোসন।

তুমি চলে গেছো বলে
খেজুর বৃক্ষে ঝুলছে শূন্য হাড়ি
এ বছর হবে ভীষণ খরা
পরিপক্ক ফসলে পোকার উৎপাত।
তুমি চলে গেছো বলে
শিকারীর নিপুণ ফাঁদে
আটকা পড়ছে সমস্ত চতুর হরিণ
তীর বিদ্ধ হচ্ছে অরণ্যের প্রতিটি পাখি
পুকুরের যাবৎ মৎস্য চলে যাচ্ছে
উদরে উদরে।

তুমি চলে গেছো বলে
গোলাপের ঠোঁটে নেই
প্রজাপতির চুম্বন
মৎস্যের লোভে মাছারাঙা পাখির
নিবিষ্ট ধ্যান
লাঙলের পিছু নেই কোন
শালিকের ঝাঁক।

তুমি চলে গেছো বলে
শিল্পের গুদামে বিদেশি পণ্যের মওজুদ
চিত্রকর তার সমস্ত চিত্র নিলাম দিয়েছে
মুদির দোকানে গেছে কবিতার পাণ্ডুলিপি
শিক্ষক পেতেছে পানের দোকান
ছাত্রাবাস হয়ে গেছে সামরিক ঘাঁটি।

তুমি চলে গেছো বলে
হারিয়েছি স্বদেশের শোভা
হারিয়েছি প্রেম,
হারিয়েছি নিজস্ব জমিনের মালিকানা।

বঙ্গবন্ধু

দক্ষিণারঞ্জন বসু

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান–
কী যে এক নাম সারা বাঙলায় এনেছে প্রমত্ত বান!
তিলে তিলে আর মরবে না কেউ আসে উদাত্ত ডাক,
ঐক্যবদ্ধ মিছিল এগোয়, পিছে পড়ে যারা পিছেই থাক।

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান–
এই এক নাম এক করে দিল হিন্দু মুসলমান;
শেখালো মানুষে মানুষ বলেই মানুষের পরিচয়,

ধর্মের নামে পশু–আচরণ ধর্মীয় কভু নয়।

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান–
শোষণক্লিষ্ট বাঙালিরে দিতে স্বাধিকার সম্মান
তোমার জন্ম তোমার জীবন কর্মসাধনা সব,
তুমি এনে দিলে জাতিরে তাহার প্রাপ্য যে গৌরব।

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান–
হৃদয়ে তোমার গান্ধী-মন্ত্র লক্ষ্য মানব-ত্রাণ;
নিঃশেষে ভয় তুচ্ছ করেছ নেই কোনো সংশয়,
কোটি কণ্ঠের গর্জনে তাই শুনি বাঙলার জয়।
[১২ ডিসেম্বর ১৯৭০]

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো

নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে : 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তা হলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?

জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ ...।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, —এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দুর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।

হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের : 'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর -কবিতাখানি :
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

আমার পতাকাই তুমি

পান্না কায়সার

আমার পতাকাই তোমার ছবি, তোমার কথা
আমার জাতীয় সংগীত;
তোমার চেতনা স্ফটিক হয়ে জ্বলে
পবিত্র সংবিধানে, তোমার সান্নিধ্য পাই
মহান সংসদ কক্ষের প্রাণের গুঞ্জনে।

৭ই মার্চের উচ্চারণে
ঘুম ভাঙে অনন্ত ভোর বেলায়,
গাছ-পালা, পাখ-পাখালি
মিলে-মিশে করে যাত্রা
টুঙ্গিপাড়ার ছায়াঘেরা
গাঢ় কুয়াশার সবুজ প্রাঙ্গণে।

বড্ড নিঃসঙ্গ আমি
শিশিরের মতো আদ্রতায়
ঠাঁই খুঁজে ফিরি,
হবে না গান শোনা বৃষ্টির শব্দে
আহ্লাদে নেচে ওঠা, অথবা
হবে না শোনা সমুদ্রের গর্জন;
শুধু তোমার আদর্শ
আর চেতনায় জীবনটাকে
শেষতক টেনে নেয়া;
হে জাতির পিতা।

ভোর বা সন্ধ্যার আকাশে
চির কল্লোলিত হয়ে বেঁচে
থাকতে চাই আমি-
আমরা গোটা বাঙালি
তোমার আদর্শের মোহনায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

প্রত্যয় জসীম

বাংলার সীমার করলো হরণ
বঙ্গবন্ধু তোমায় রে,
জাতির জনক মুজিব আজ
টুঙ্গিপাড়ায় ঘুমায় রে।

তোমার গড়া দেশেতে আজ
বিপর্যয়ের বাণ,
রাজাকার আর হায়েনারা
গায় যে খুশির গান।

সন্ত্রাসের শিকলে আজ
জড়িয়ে গেছে জিভ,
আজকে তোমায় খুব প্রয়োজন–
পিতা শেখ মুজিব।

পঁচাত্তরের যীশু

বাদল ঘোষ

টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নিলো মায়ের কোলে শিশু
স্বাধীনতার স্রষ্টা তিনি পঁচাত্তরের যীশু।

দুষ্টুমিতে শিরোমণি ডানপিটে এই ছেলে
কিশোরবেলায় দেশের জন্য গিয়েছিল জেলে।
দেশের কথা মাটির কথা সবার আগে তাঁর
এমন মানুষ তুমি খুঁজে কোথায় পাবে আর!
পাহাড়সম উদার তিনি, সহজ-সরল মন
এই তুলনা ম্লান হবে যে–সাত রাজারই ধন।
অসীম যে তাঁর সাহস ছিল শত্রু মানে হার
তাঁর ডাকেতেই উঠল জয়ের সূর্য চমৎকার।
লক্ষ ফুলের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে জয়
বঙ্গবন্ধু নামেই যে তাঁর আসল পরিচয়।

যীশুর মতোই ভালোবেসে বিলিয়ে গেলেন প্রাণ
মহাকালে বিশ্বমানব গাইবে যে তাঁর গান।

সে ছিল দিঘল পুরুষ

বাবলু জোয়ারদার

হাত তুললেই
ধরে ফেলতো চাঁদ
আকাশের নীল
ধরে ফেলতো সপ্তর্ষীমণ্ডল কেমন অনায়াসে।

সে ছিল দিঘল পুরুষ
তার বুকের গভীর শব্দে
আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যেতো স্বদেশের মমতায়
আর সাড়ে সাত কোটি মানুষ হয়ে যেতো মন্ত্রমুগ্ধ
হেঁটে যেতো তার সাহসের সীমানায়।

হাত বাড়ালেই
ধরে ফেলতো পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল
সাড়ে সাত কোটি হৃদয়
ধরে ফেলতো বৈশাখী মেঘ কেমন অনায়াসে।

একবার যুদ্ধ জয়ের পর
স্বজনের লাশ গুনতে গুনতে শত্রুর প্রতি
ছুঁড়ে দিয়েছিলো ক্ষমা; তারপর
ক্ষমার আগুনে নিজেই ভস্মীভূত।

দিঘল পুরুষ সে
আজো আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে।

বঙ্গবন্ধু মুজিবর
বিভূতি ভট্টাচার্য

গুলি ও বোমায়, সঙীন খোঁচায় কত প্রাণ কোরবানী
মুজিবর, ওরা পারেনি করতে স্তব্ধ তোমার বাণী,
বঙ্গবন্ধু তুমি বাঙলার, সব সেরা প্রিয় নাম,
পুবের সূর্য, জানাই তোমায় সেলাম, বহু সেলাম।
ঈথারে ঈথারে আওয়াজ তোমার দেশে দেশে ভেসে যায়,
পদ্ম-মেঘনা-ধলেশ্বরীর মাঠ বন সীমানায়,
কর্ণফুলী ও মধুমতি বেয়ে পার হয়ে কত গ্রাম,
এই শহরের আকাশ-বাতাসে ছড়ায় যে অবিরাম।
সূর্য উঠছে, আঁধার পাহাড় আগুন পড়ছে ধসে,
ভ্যাম্পায়ারের ঘুমপাড়ানিয়া ডানাগুলি গেছে খসে,
শেষ হবে আজ দুঃস্বপ্নের অমাবস্যার রাত,
সাত কোটি প্রাণ দেখবেই ওরা এবার সুপ্রভাত।
(১৯৭১)

মানব মহান
বেলাল চৌধুরী

হাজার বছরে হয়তো আসেন তাঁরা, হাতে গোনা দুই একজন
সুকৃতিতে যান ছাপিয়ে অনেক দূর, নিজেরাই নিজেদের-
মানব জীবন ধন্য করে মানব মহান; পতিত জমিন ভরে তোলেন
আবাদ করে সোনার ফসলে!
এমন করেই এসেছিলেন দশদিক আলো করে, শেখ বংশজাত
দুর্গম ও সুদূর পাড়াগাঁয়ের এক জরাজীর্ণ ঘরে মা বাবার কোল জুড়ে,
-জানি মানুষের বয়স বাড়ে, পাল্টায় পরিবেশ মাথা তোলে চারাগাছ ...

নদীরও কি বয়স বাড়ে? জানি না। তবে সর্বদাই সে যে চঞ্চলা একরোখা ও বিদ্রোহিণী
একটানা তার বেপরোয়া কুলুকুলু স্বরে টের পেতে দেরী হয় না মোটেই
কখনো রুদ্রমূর্তি ভয়ঙ্করি, গতি তার দুর্বার ছিপছিপে, সমান্তরালে চলা
বঙ্কিম মধুমতি ...
নিজের নামের মতোই যেমন সুন্দরী আবার নিজেরই বুক চেরা বাইগার
দু'পাশে তার হতশ্রী কুল কিনারা ঘিরে ঝাপসা তরুশ্রেণী
হরেক রকম দৌরাত্ম্যের মাঝে দেমাক ভারী চলন তার
চারিদিকে ক্ষুধা দারিদ্র্য, অনটনের বুক টনটন ধূসর নিসর্গ ছবি

প্রথম প্রহরে ক্লিষ্ট মলিন মুখাবয়বগুলি হৃদয়ঙ্গম করে
বুঝেছিলেন তিনি এইসব 'মূঢ় মূক ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা'

চিরশোষিত জনের মুখে ফোটাতে হবে গোলাপ হাসি রাশি রাশি
–আর সে দুরূহ কাজে ব্রতী হতে হলে হতে হবে তাকে
অকূল সমুদ্রে দুঃসাহসী নাবিক, একাগ্রচিত্ত সংগ্রামী মাঝি

আপস–রফার পথ তাঁর নয়, দুর্গম পথের অভিযাত্রী তিনি
পদে পদে বাধা, সংগ্রামের পর সংগ্রামেই কেটেছে জীবন
কোথায় স্ত্রী কোথায় বা ছেলেমেয়ে কোথায় বা বাবা–মা ভাইবোন আত্মীয় স্বজন

সারাদেশের যিনি, সারা জাতির যিনি, শতাব্দীর সবচেয়ে দীর্ঘদেহী মানুষটি তিনি
দোষে–গুণে নিখাদ বাঙালি, নীলিমার মতোই উদার অসীম অমেয়
কোনো লাভালাভ ক্ষয়ক্ষতি লোভ পক্ষপাত টলাতে পারে না তাঁকে
সমস্ত বাধার বিন্ধ্যাচল গুঁড়িয়ে এগিয়ে চলার মানুষ তিনি
ঋজু টানটান চির উন্নত শির, নিতান্তই সহজ সরল দেশপ্রেমিক

সমগ্র জাতিকে ঋণগ্রস্ত রেখে সঙ্গী সাথী সহযাত্রীদের নিয়ে
পাড়ি জমালেন হাসিমুখে নিজের বুকের তপ্ত শোণিত ঝরিয়ে
–তবু ফোটে যেন হাসি চির শোষিত জনের মুখে

বাংলার মানুষ বড় দুঃখী, বাংলার মানুষের চাওয়া খুবই কম
তারা যেন পারে দেখতে একটুখানি সুখের মুখ, হাসতে পারে মনের সুখে
মাত্র এটুকুই ছিল তাঁর অকৃত্রিম ঐকান্তিক বাসনা সামান্য!

আমি কি বলতে পেরেছিলাম

মহাদেব সাহা

আমার টেবিলের সামনে দেয়ালে শেখ মুজিবের
একটি ছবি টাঙানো আছে
কোনো তেলরঙ কিংবা বিখ্যাত স্কেচ জাতীয় কিছু নয়
এই সাধারণ ছবিখানা ১৭ই মার্চ এ-বছর শেখ মুজিবের
জন্মদিনে একজন মুজিবপ্রেমিক আমাকে উপহার দিয়েছিলো
কিন্তু কে জানতো এই ছবিখানি হঠাৎ দেয়াল ব্যেপে
একগুচ্ছ পত্রপুষ্পের মতো আমাদের ঘরময়
প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে সেদিন রাত্রিবেলা!
আমি তখন টেবিলের সামনে বসেছিলাম আমার স্ত্রী ও সন্তান
পাশেই নিদ্রামগ্ন
সহসা দেখি আমার ছোট্ট ঘরখানির দীর্ঘ দেয়াল জুড়ে
দাঁড়িয়ে আছেন শেখ মুজিব;
গায়ে বাংলাদেশের মাটির ছোপ লাগানো পাঞ্জাবি
হাতে সেই অভ্যস্ত পুরনো পাইপ
চোখে বাংলার জন্য সজল ব্যাকুলতা
এমনকি আকাশকেও আমি কখনো এমন গভীর ও জলভারানত
দেখিনি।

তার পায়ের কাছে বয়ে যাচ্ছে বিশাল বঙ্গোপসাগর
আর তার আলুথালু চুলগুলির দিকে তাকিয়ে
আমার মনে হচ্ছিলো
এই তো বাংলার ঝোড়ো হাওয়ায় কাঁপা দামাল নিসর্গ
চিরকাল তার চুলগুলির মতোই অনিশ্চিত ও কম্পিত
এই বাংলার ভবিষ্যৎ!

তিনি তখনো নীরবে তাকিয়ে আছেন, চোখ দুটি স্থির অবিচল
জানি না কী বলতে চান তিনি,
হঠাৎ সারা দেয়াল ও ঘর একবার কেঁপে উঠতেই দেখি
আমাদের সঙ্কীর্ণ ঘরের ছাদ ভেদ করে তার একখানি হাত
আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে–
যেমন তাঁকে একবার দেখেছিলাম '৬৯-এর গণআন্দোলনে
তিনি তখন সদ্য ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে এসেছেন
কিংবা '৭০-এর পল্টনে আরও একবার '৭১-এর ৭ই মার্চের
বিশাল জনসভায়;
দেখলাম তিনি ক্রমে উষ্ণ, অধীর ও উত্তেজিত হয়ে উঠছেন
একসময় তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ কেঁপে উঠলো
বুঝলাম এক্ষুণি হয়তো গর্জন করে উঠবে বাংলার আকাশ,
আমি ভয়ে লজ্জায় ও সঙ্কোচে নিঃশব্দে মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম।
আমার মনে হলো আমি যেন
মুখে হাত দিয়ে অবনত হয়ে আছি
বাংলাদেশের চিরন্তন প্রকৃতির কাছে,
একটি টলোমলো শাপলা ও দিঘির কাছে,
শ্রাবণের ভরা নদী কিংবা অফুরন্ত রবীন্দ্রসংগীতের কাছে
কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো অভিযোগ নিঃসরিত হলো না;
তবু আমি সেই নীরবতার ভাষা বুঝতে চেষ্টা করলাম
তখন কী তিনি বলতে চেয়েছিলেন, কী ছিলো তার ব্যাকুল প্রশ্ন
ব্যথিত দুটি চোখে কী জানার আগ্রহ তখন ফুটে উঠেছিলো!
সে তো আর কিছুই নয় এই বাংলাদেশের ব্যগ্র কুশলজিজ্ঞাসা
কেমন আছে আট কোটি বাঙালি আর এই বাংলাদেশ!
কী বলবো আমি মাথা নিচু করে ক্রমে মাটির সাথে মিশে
যাচ্ছিলাম–
তবু তাকে বলতে পারিনি বাংলার প্রিয় শেখ মুজিব
তোমার রক্ত নিয়েও বাংলায় চালের দাম কমেনি
তোমার বুকে গুলি চালিয়েও কাপড় সস্তা হয়নি এখানে,
দুধের শিশু এখনো না খেয়ে মরছে কেউ থামাতে পারি না
বলতে পারিনি তাহলে রাসেলের মাথার খুলি মেশিনগানের
গুলিতে উড়ে গেল কেন?
তোমাকে কীভাবে বলবো তোমার নিষ্ঠুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে
প্রথমে জয়বাংলা, তারপরে একে একে ধর্মনিরপেক্ষতা
একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলাভাষাকে হত্যা করতে উদ্যত
হলো তারা,
এমনকি একটি বাঙালি ফুল ও একটি বাঙালি পাখিও রক্ষা পেল না।
এর বেশি আর কিছুই তুমি জানতে চাওনি বাংলার প্রিয়
সন্তান শেখ মুজিব!
কিন্তু আমি তো জানি ১৫ই আগস্টের সেই ভোরবেলা
প্রথমে এই বাংলার কাক, শালিক ও খঞ্জনাই
আকাশে উড়েছিলো
তার আগে বিমানবাহিনীর একটি বিমানও ওড়েনি,
তোমার সপক্ষে একটি গুলিও বের হয়নি কোনো কামান থেকে
বরং পদ্মা-মেঘনাসহ সেদিন বাংলার প্রকৃতিই একযোগে
কলরোল করে উঠেছিলো।

আমি তো জানি তোমাকে একগুচ্ছ গোলাপ ও স্বর্ণচাঁপা
দিয়েই কী অনায়াসে হত্যা করতে পারতো,
তবু তোমার বুকেই গুলির পর গুলি চালালো ওরা
তুমি কি তাই টলতে টলতে টলতে টলতে বাংলার ভবিষ্যৎকে
বুকে জড়িয়ে সিঁড়ির উপর পড়ে গিয়েছিলে?
শেখ মুজিব সেই ছবির ভিতর এতক্ষণ স্থির তাকিয়ে থেকে
মনে হলো এবার ঘুমিয়ে পড়তে চান
আর কিছুই জানতে চান না তিনি;
তবু শেষবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাকে আমার বলতে
ইচ্ছে করছিলো
সারা বাংলায় তোমার সমান উচ্চতার আর কোনো
লোক দেখিনি আমি।
তাই আমার কাছে বার্লিনে যখন একজন ভায়োলিন-বাদক
বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলো
আমি আমার বুক পকেট থেকে ভাঁজ-করা একখানি দশ
টাকার নোট বের করে শেখ মুজিবের ছবি দেখিয়েছিলাম
বলেছিলাম, দেখো এই বাংলাদেশ;
এর বেশি বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানি না!
আমি কি বলতে পেরেছিলাম, তার শেষবার ঘুমিয়ে পড়ার
আগে আমি কি বলতে পেরেছিলাম?

বঙ্গবন্ধু

মুস্তাফা মাসুদ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তিনি
তাঁর কাছে এই দেশের মানুষ
অশেষ ঋণে ঋণী।
বুকভরা তাঁর ছিল ভালোবাসা
চোখের কোণে হাজার স্বপ্ন-আশা
এই দুখিনী দেশ যেন হয়
ধন্যি, গরবিনী।
হাজার বাধা জেল-জুলুম আর ভয়
হাসি মুখেই সব করেছেন জয়;
সবাই তাঁরে আপন-প্রিয়
মানুষ বলেই চিনি।
স্বাধীনতার সূর্য সোনার বরণ
উঠল হেসে—তুচ্ছ হাজার মরণ;
বুকের ভেতর কাঁপন-জাগা
সুরের রিনিঝিনি।
তিনিই দিলেন মুক্ত পাখির ডানা
দৈন্য-দানো আর দেবে না হানা।
বন্ধ দুয়ার দিলেন খুলে যিনি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তিনি।

মুজিবমিনার

মুহম্মদ নূরুল হুদা

অনাদিকালের গভীরতম গভীরতা থেকে
অনাগতকালের শীর্ষতম চূড়ায়
না ছায়াধারী না কায়াধারী
গৌর-অগৌর বর্ণাবর্ণের আলোকহাড়ে গড়া
সুজলাসুফলাশস্যশ্যামলা
বর্শাবল্লমহলসমুদ্যত
এই স্তম্ভ
স্বাধীনতা-স্তম্ভ;

এই স্তম্ভ
বাঙালির উৎস,
বাঙালির বিকাশ,
এই স্তম্ভ
বাঙালির ঐক্য,
বাঙালির জয়,
জয় বাংলার জয়;

এই স্তম্ভ
বঙ্গজনকের হাত থেকে চিরউড্ডীন জোড়া পায়রা,
বঙ্গমাতার গরাদ-আঁচলে রক্তরঙ গঙ্গাপাড়,
বঙ্গকন্যার হাতে প্রজ্জ্বলিত হোমশিখা
বঙ্গপুত্রের অবিনাশী বজ্রহুঙ্কার

এই স্তম্ভ
বাঙালির বুকে বুকে মানসমিনার
জনকের তর্জনী,
মুজিবমিনার।

এই সিঁড়ি

রফিক আজাদ

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিঁড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে—
বত্রিশ নম্বর থেকে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা ব'য়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

মাঠময় শস্য তিনি ভালোবাসতেন,
আয়ত দু'চোখ ছিলো পাখির পিয়াসী
পাখি তার খুব প্রিয় ছিলো—
গাছ-গাছালির দিকে প্রিয় তামাকের গন্ধ ভুলে
চোখ তুলে একটুখানি তাকিয়ে নিতেন,
পাখিদের শব্দে তাঁর, খুব ভোরে, ঘুম ভেঙে যেতো।
স্বপ্ন তার বুক ভ'রে ছিলো,
পিতার হৃদয় ছিলো, স্নেহে-আর্দ্র চোখ—

এদেশের যা-কিছু তা হোক না নগণ্য, ক্ষুদ্র
তাঁর চোখে মূল্যবান ছিলো—
নিজের জীবনই শুধু তাঁর কাছে খুব তুচ্ছ ছিলো;
স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে প'ড়ে আছে
বিশাল শরীর ...

তাঁর রক্তে এই মাটি উর্বর হয়েছে
সবচেয়ে রূপবান দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ
তাঁর ছায়া দীর্ঘ হ'তে-হ'তে
মানচিত্র ঢেকে দ্যায় সস্নেহে, আদরে
তাঁর রক্তে প্রিয় মাটি উর্বর হয়েছে–
তাঁর রক্তে সব কিছু সবুজ হয়েছে।

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিঁড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে–
স্বপ্নের স্বদেশ ব্যেপে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা ব'য়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

বঙ্গবন্ধু

রবীন্দ্র গোপ

বঙ্গবন্ধু জন্ম নিলেন
টুঙ্গিপাড়া গাঁয়
তারই পাশ ঘেঁষে নদী
মধুমতি যায়।
মধুমতি তীরে আছে
ঘন সবুজ বন
তারই কথা মনে হলে
কাঁদে যে আজ বন।
মন কাঁদে বন কাঁদে
কেঁদে যায় নদী
রাখালি বাঁশির সুরে
কাঁদে নিরবধি।

হালকা-পাতলা গড়ন ছিল
সাহস ছিল জবর
কিশোর বেলায় ঘটে গেল
বীরত্বের সে খবর।
ছাত্র ভাইদের দুঃখ-কষ্টে
কাঁদতো যে তাঁর মন
দূর করবেই দুঃখ একদিন
করে বসল পণ।
তাদের দাবি তুলে ধরলেন
প্রধানমন্ত্রী তরে,
কিশোর বেলাই বন্দি জেলে
কাটায় লাল ঘরে।

এক জীবনের অর্ধ জীবন

বন্দিজীবন কাটে
মাঝি ভাইদের পড়ে মনে
নৌকা যখন ঘাটে।
তাঁর ডাকেই কোটি মানুষ
যুদ্ধে চলে যান
সারা বাংলায় জ্বললো আগুন
বলি হলো লক্ষ প্রাণ।
তিরিশ লক্ষ মানুষ গেলো
রক্তনদী বহমান
বিশ্ববুকে বাঙালি নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।

একটি রাতের গল্প

রাজু আহমেদ

বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর সে রাতের কাহিনী!

যার অঙ্গুলীর ইশারা আর কণ্ঠের গর্জন
'... আর যদি একটা গুলি চলে ...' হুঙ্কারে
একদিন বেড়ে গিয়েছিল শত্রুর হার্টবিট।
সেই বঙ্গবন্ধুর বিশাল বক্ষ বিদীর্ণ করল
কুখ্যাত নরপিশাচের উচ্চাকাঙ্ক্ষার
কয়েকটা তাজা বুলেট

বড় লজ্জার, বড় কলঙ্কের সে রাত।

একটি দেশের বিশাল মানচিত্র আঁকা ছিল যে বুকে,
সে বুকটা ঝাঝরা হলো সে রাতে।
যেন সমগ্র দেশটাই নুয়ে পড়ল সিঁড়িতে
একটা কলঙ্কের সাক্ষী হয়ে
রাতটা শেষ হলো।

তারপর, কত রাত এল, চলেও গেল
কিন্তু নুয়ে পড়া দেশটা আজো
পারলো না উঠে দাঁড়াতে।

বঙ্গবন্ধুকে

রাহাত খান

আপনি যতদিন ছিলেন নদীগুলো ছিলো বহতা
আমাদের ঘর-সংসারে অভাব ছিলো, দৈন্য ছিলো না
কাজ সেরে হতাশায় ছিন্নভিন্ন হয়ে ঘরে ফিরে এসে
ভাবতাম, যা-ই হোক না কেন, বঙ্গবন্ধুতো আছেন।

আপনি যতদিন ছিলেন, অপরাধীদের ভয় ছিলো
হত্যাকারীরা আত্মগোপনের চেষ্টা করতো সর্বাত্মক,
এখন বাংলাদেশ স্বাধীনতা-বিরোধীদের ক্ষুদ্রস্বর্গ
এখন বঙ্গবন্ধুতো নেই যে গর্জে উঠবেন সাহসে?

আপনি যতদিন ছিলেন খুব বড় ছিলো দেশের চৌহদ্দি

এখন গুটিয়ে এসেছে ভূগোল ও ইতিহাস দুই-ই
এখন সত্যি-সত্যি বানরে সংগীত গায়, শিলা ভাসে জলে
হত্যাকারীর কাছে শুনতে হয় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ।

আপনি নেই বঙ্গবন্ধু, কেউ থাকে না এই মরজগতে
কিন্তু আমরা বহুকোটি মানুষ আপনাকে খুব ভালোবাসি
আমাদের একেকটি হৃদয় হয়ে যায় সর্বাংশে বাংলাদেশ
সেখানে আপনার স্থান গভীর গভীরতম শ্রদ্ধায়।

১৫ আগস্টের এলিজি

শওকত ওসমান

"Here is a mourning Rome, a dangerous Rome"–Shakespeare
("এই এক শোকাতুর রোম, বিপজ্জনক রোম"–'জুলিয়াস সিজার' নাটকে সিজার-হত্যার পর মার্ক অ্যান্টনির উক্তি।)

ইতিহাস নয়
অদৃষ্টের পরিহাস,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
তোমার ঘাতকেরা আজ
নিজেদের সেবক রূপে জাহির করে। ...
উপনিবেশ পূর্ব পাকিস্তান
তার মাথার উপর ডাণ্ডা ঘোরাতো
ব্যারাক-নির্মিত যে সৈন্যদল
তাদের পদলেহী
দাসমনোবৃত্তির চরমতম জঘন্য প্রকাশ
নরাধম প্রাণীর দল
চোরের মায়ের বড় গলা
এখন চিৎকাররত এই দেশের মানুষের,
তারা নাকি আসল হিতাকাঙ্ক্ষী
মিত্র, স্বজন।

এমন নির্লজ্জ বেহায়াপনার সমর্থকও
মেলে এই ভূখণ্ডে।
ইনসাফের তৌলদণ্ড
যাদের হাতে ন্যস্ত
তারা পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যায়
ধর্মব্যবসায়ীদের আলখেল্লার ঝলকে।
অথবা
ইহ-জাগতিক তরক্কির
শ্রীবৃদ্ধির আকর্ষণে।

তখন বিবেকের অবলম্বনের জন্য
আর কোথায় বাড়াব হাত?
ইতিহাস নয়, অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া
আর কোন পরিচয় হতে পারে
এমন পটভূমির?
তবে তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,

রবীন্দ্রপ্রেমিক ছিলে তুমি,
তাঁরই বাণী, 'প্রতিকারহীন
মনুষ্যত্বের পরাভবকে চরম বলে
বিশ্বাস করা আমি অপরাধ মনে করি,'

–আজ আমাদেরও সান্ত্বনা।
তোমার আর এক প্রিয় কবি
যে নজরুলকে তুমি কাছে এনেছিলে
শেষ বয়সে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্যে
তাঁকে 'জারজ,' 'শয়তান,' 'ধর্মদ্রোহী'
ইত্যাদি গালাগালে সজ্জিত করেছিলো
যে স্যোশাল ফোর্স বা
সামাজিক চাপ-শক্তি
সেই অপশক্তির মুখে থুতু দিয়ে
আজ তিনি আমাদের 'জাতীয় কবি,'
যথাসম্মানে বিভূষিত।
সেই স্যোশাল ফোর্স
রূপকথার রাক্ষসের মতো প্রাণপ্রাপ্ত
তোমাকে বিনাশের আয়োজনে
ব্যাপৃত ছিলো,
ইতিহাস সাক্ষী।
সেখানেই আমাদের সান্ত্বনা নিহিত,
তুমিও ফিরে আসবে বৈকি
যথামর্যাদায় সার্থকনামা, বঙ্গবন্ধু।
তাইত আজও দৈনন্দিন প্রাণ ধারণ করি।
তাইত আজ
তুলে নিয়েছি কণ্ঠে তোমার স্লোগান :
জয় বাংলা!
জয় বাংলা!!

পিতা হত্যার বদলা নেবোই

শাফিকুর রাহী

গতকাল মধ্যরাতের রাজধানীকে মনে হলো এক ভূতুড়ে নগরী
যেন নরকের নর্তকি নৃত্য করে প্রিয়তমা মৃত্তিকার কোমল অঙ্গজুড়ে
অঘোষিত যুদ্ধের এক অশনি সংকেতে উদ্বিগ্ন জাতির
আত্মার আগুনে কেঁপে ওঠে মুখোশধারি গণতন্ত্রের রঙ্গমঞ্চ।
যে প্রিয় মাতৃভূমির জন্য ত্রিশলক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল
বিজয়ী অধ্যায়ের রক্তাক্ত ইতিহাসকে কি ভুলে গেছে বীর বাঙালি?
ভুলে গেছে একাত্তরের পাক দস্যুদলের আগ্নেয়াস্ত্রের নারকীয় উল্লাসের
দানবীয় তাণ্ডব? না, এ আমি মানি না, মানতে পারি না।

আজো স্বজন হারানো প্রিয়জনের দগ্ধ আত্মার চিৎকার ধ্বনিত হয়
আজো শ্যামলিমা বোন আমার, কালের প্রহর গুনে গুনে
মাঝরাতে ডুকরে ওঠে। আর নৈরাজ্যের অবর্ণনীয় ভয়াল আঁধার
গ্রাস করে আমার মায়ের ভালোবাসার কামিনী কানন।
এ অমানবিক অত্যাচার আর নিপীড়নের করাল থাবার বিরুদ্ধে
দাঁড়াতে হবে আমাকে, আর হারিয়ে যাওয়া অধিকারকে

ছিনিয়ে আনার দীপ্ত প্রত্যয় বলীয়ান হয়ে ভাঙব এ অনিয়মের খড়্গ।
এ অবরুদ্ধ রাজ পথে আমি পাথরে পাথর ঘষে
তোমার মুক্তির অগ্নি মশাল জ্বালাবো জন্মভূমি জননী আমার।
আর তারুণ্যের তুমুল বিদ্রোহে ফাটাবো স্বৈরতন্ত্রের নীল
নকশার সিংহাসন।
সাহসী উচ্চারণে কুচক্রিদের কূটকৌশলের সমস্ত বিষদাঁত
ভেঙ্গে জবাব দেবো
আজ আমি তাবেদার বেশ্যার দালাল, পা-চাটা সারমেয়দের
সমূলে বিনাশের সানাই বাজাবো
আর কতোকাল আমাকে মরিচপেশা করবে ফ্যাসিবাদী কায়দায়
আমি এর প্রতিশোধ নেবো।

আর কতোকাল আমার মুখের গ্রাস কেড়ে ভিন্নপথে
বাইজীর নগ্ন নিতম্বের নৃত্যে নেশার আড়ৎ গড়বে?
আর প্রাচুর্যের অহঙ্কারে নিরিহ কৃষক শ্রমিকের বুকে গুলি ছুঁড়বে?
না, এসব মানবতা বিরোধী ফ্যাসিশক্তির ভিত কাঁপিয়ে
আমি দাঁড়াবো আমার জায়গায়।
বাধার সকল প্রাচির ভেঙ্গে উড়াবো আমি সাফল্যের বিজয়ী নিশান।
আমি আমার পিতা হত্যার বদলা নেবোই, যতো দীর্ঘ হোক
এই শোকের রক্তাক্ত সড়ক, জেনে রেখো একদিন প্রতিশোধের আগুন
ছড়িয়ে পড়বে, আর জয় বাংলার বজ্রকঠিন শব্দ উচ্চারণে
ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়বে স্বৈরতন্ত্রের তামাম তামাশা।

ধন্য সেই পুরুষ

শামসুর রাহমান

ধন্য সেই পুরুষ, নদীর সাঁতার পানি থেকে যে উঠে আসে
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে;
ধন্য সেই পুরুষ, নীল পাহাড়ের চূড়া থেকে যে নেমে আসে
প্রজাপতিময় সবুজ গালিচার মতো উপত্যকায়;
ধন্য সেই পুরুষ, হৈমন্তিক বিল থেকে যে উঠে আসে
রঙ-বেরঙের পাখি ওড়াতে ওড়াতে।
ধন্য সেই পুরুষ, কাহাতের পর মই-দেয়া ক্ষেত থেকে যে ছুটে আসে
ফসলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

ধন্য আমরা, দেখতে পাই দূর দিগন্ত থেকে এখনো তুমি আসো
আর তোমারই প্রতীক্ষায়
ব্যাকুল আমাদের প্রাণ, যেন গ্রীষ্মকাতর হরিণ
জলধারার জন্যে। তোমার বুক ফুঁড়ে অহঙ্কারের মতো
ফুটে আছে রক্তজবা, আর
আমরা সেই পুষ্পের দিকে চেয়ে থাকি, আমাদের
চোখের পলক পড়তে চায় না,
অপরাধে নত হয়ে আসে আমাদের দুঃস্বপ্নময় মাথা।

দেখ, একে একে সকলেই যাচ্ছে বিপথে অধঃপাত
মোহিনী নর্তকীর মতো
জুড়ে দিয়েছে বিবেক-ভোলানো নাচ মনীষার মিনারে,
বিশ্বস্ততা চোরা গর্ত খুঁড়ছে সুহৃদের জন্যে
সত্য খান খান হয়ে যাচ্ছে যখন তখন
কুমোরের ভাঙা পাত্রের মতো,

চাটুকারদের ঠোঁটে অষ্টপ্রহর ছোটে কথার তুবড়ি,
দেখ, যে কোন ফলের গাছ
সময়ে-অসময়ে ভরে উঠছে শুধু মাকাল ফলে।
ঝলসে-যাওয়া ঘাসের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে মমতা
দেখ, এখানে আজ
কাক আর কোকিলের মধ্যে কোনো ভেদ নেই।
নানা ছল-ছুতোয়
স্বৈরাচারের মাথায় মুকুট পরাচ্ছে ফেরেব্বাজের দল।

দেখ, প্রত্যেকটি মানুষের মাথা
তোমার হাঁটুর চেয়ে এক তিল উঁচুতে উঠতে পারছে না কিছুতেই।
তোমাকে হারিয়ে
আমরা সন্ধ্যায় হারিয়ে যাওয়া ছায়ারই মতো
হয়ে যাচ্ছিলাম,
আমাদের দিনগুলি ঢেকে যাচ্ছিলো শোকের পোশাকে,
তোমার বিচ্ছেদের সঙ্কটের দিনে
আমরা নিজেদের ধ্বংসস্তূপে ব'সে বিলাপে ক্রন্দনে আকাশকে ব্যথিত
করে তুলেছিলাম ক্রমাগত; তুমি সেই বিলাপকে
রূপান্তরিত করেছো জীবনের স্তুতিগানে কেননা জেনেছি
জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত তুমি।

ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে
চিরকাল, গান হয়ে
নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা; যাঁর নামের ওপর
কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পাখা মেলে দেয়
জ্যোৎস্নার সারস,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা।
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।

মুজিব তুমি

শেখ হিজবুল্লাহ

মুজিব তুমি স্বাধীন বাংলার স্থপতি
টুঙ্গিপাড়ার দামাল ছেলে খোকা
মুজিব তুমি-ব্রিটিশ আন্দোলন
'৪৯-এর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
'৫২-র ভাষা আন্দোলন, অনশন ধর্মঘট
পূর্ব বাংলা হতে-পূর্ব পাকিস্তান করার প্রতিবাদ।

মুজিব তুমি—
পূর্ব পাকিস্তান বাতিল, বাংলাদেশ দাবি
'৬২ সালে জানুয়ারির গোপন বৈঠক
৩রা জুলাই পল্টন ময়দানের বক্তৃতা
'৬৬ তে লাহোরে ৬-দফা পেশ
'৭০-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ।
মুজিব তুমি—

'৭১-এর ৭ই মার্চ বিশাল জনসভা
স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তির ডাক
হানাদার পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী যুবক।

বাংলাদেশের ইতিহাসে, মানচিত্রে
দেয়ালে-পোস্টারে, হৃদয়ে-হৃদয়ে
লেখা আছে, লেখা থাকবে চিরদিন
একটি নাম—
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ফিরে আসছেন শেখ মুজিব

সিকান্দার আবু জাফর

মুক্তিকামী মানুষের শুভেচ্ছার পথে
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক
শেখ মুজিবুর রহমান
ফিরে আসছেন বাংলাদেশে।

ফিরে আসবেন জানা ছিলো
জানা ছিলো ব্যর্থ হতে পারে না কখনো
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কণ্ঠে
সমন্বয় বিশ্বের জাগ্রত গণদাবি।

মানুষে অমানুষে সংঘর্ষের প্রস্তরফলক পেরিয়ে
ফিরে আসছেন তিনি ইতিহাসে অসনাক্ত পথে।
পেরিয়ে আসছেন সশস্ত্রের অস্ত্রে-ঝরা
নিরস্ত্রের রক্তের নদী,
কোটি কোটি দীর্ঘশ্বাসের ঝড়-সওয়ার
তিনি আসছেন বঙ্গবন্ধু বিজয়ী মুজিব,
পায়ে পায়ে বেজে উঠছে ইতস্ততঃ করোটি কঙ্কালের
প্রতিজ্ঞার জয়ধ্বনি।

ফিরে আসছেন বধূ ভগ্নী জননীর
লুণ্ঠিত নারীত্বের আর্তনাদ পেরিয়ে
অগ্নিদগ্ধ গ্রাম-কুটিরের অগণিত
সংসার-ভস্মের অভ্যর্থনা ছুয়ে
বাঙালির শতচূর্ণ স্নেহপ্রীতি মমতা প্রেমের
সমাধি-সঙ্কুল রাজপথে
ফিরে আসছেন তিনি ভারত প্রিয় রাষ্ট্রপতি মুজিব,
নিমুণ্ড নিশ্চক্ষু বিদীর্ণ-উদর বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গ নর
অথবা বিধ্বস্ত-যোনী খণ্ডিত কর্তিত স্তনী
লক্ষ রমণীর

অপমানে নিষ্কন্টক পথে
ফিরে আসছেন দুর্বার মুজিব।
মানবিক চেতনার শ্মশান-শৃগাল
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কান্নার পাথরে গড়া
সুমসৃণ পথে ফিরে আসছেন তিনি
ফিরে আসছেন বঙ্গ ভারতের
সম্মিলিত রক্তস্নাত মহাপুণ্য পথে

বাংলাদেশের মরণ বিজয়ী-মুক্তিসেনানী
ছাত্র জনতার

করতালি মুখরিত পথে
ফিরে আসছেন তিনি জাতির জনক
সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশে
নির্ভয় ভবিষ্যতের স্বপ্নদীপ্ত
নিরঙ্কুশ প্রত্যাশার পথে।

বাপের বেটা

সুকুমার বড়ুয়া

বাপের বেটা বলে কাকে
চিন্তা করে দেখ্
বাংলাদেশের জন্মদাতা
শেখ মুজিবুর, শেখ ...।
হাজার-হাজার বছর গেলে—
হঠাৎ পাবে এমন ছেলে
আমরা পেলাম তেমন নেতা
লাখের মাঝে এক।

বজ্রকণ্ঠ জাদুর ছোঁয়ায়
বীর বাঙালি জাগে,
এমন শক্তি এমন সাহস
কেউ দেখে নি আগে।
ধন্য মুজিব ধন্য তুমি
ধন্য হলো মাতৃভূমি।

এই বাঙালির অন্তরে যার
হচ্ছে অভিষেক,
বাপের বেটা বলে কাকে
চিন্তা করে দেখ্।
বাংলাদেশের জন্মদাতা
শেখ মুজিবুর, শেখ ...।

রূপকথা হার মানে

সুজন বড়ুয়া

টুঙ্গিপাড়ায় লুঙ্গি পরা এক ছিল রাজকুমার,
বাইরে ঘরে তার ছিল না সঙ্গী সাথীর শুমার,
ফুল পাখি লোক সবার সাথে তার ছিল ভাব পাতা,
মন যেন তার জ্যোৎস্না ধোয়া শুভ্র কোনো খাতা,
বুক ভরা তার রোদ ছিল আর ছিল মাটির মায়া,
চোখের কোণে কাঁপত নিবিড় নীল আকাশের ছায়া,
দূর সাগরের গর্জনে তার কণ্ঠ যেন গড়া,
তার ডাকে ঘুম ভাঙত সবার জীবন পেত মড়া,
পাহাড় চূড়ার মতো ছিল তার দুটো তর্জনী,
অনাচারের ভূত রুখে সে হলো চোখের মণি।

সে যেন ঠিক ছিল হ্যামিলনের বাঁশিঅলা,
তার ডাকে সব করল শুরু স্বাধীন পথে চলা,
স্বাধীনতার আনল আলো যুগের আঁধার থেকে,
ঘন সবুজ জমিনে লাল সূর্য দিল এঁকে,
আঁকল সে মানচিত্র দেশের বুকের রক্ত–বানে,
তার সে কীর্তি-গাথার কাছে রূপকথা হার মানে,
তাকে আড়াল করে এমন নেই হিমালয় কোনো,
আকাশে আর বাতাসে তার ডাক শোনো, নাম শোনো।

ডাকিছে তোমারে

সুফিয়া কামাল

এই বাংলার আকাশ বাতাস, সাগর গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু? ফিরিয়া আসিতে যদি
হেরিতে এখনও মানব হৃদয়ে তোমার আসন পাতা
এখনও মানুষ স্মরিছে তোমারে, মাতা পিতা বোন ভ্রাতা।

যত অসহায় অক্ষম আর উপেক্ষিতরা সব
করুণ নয়নে হেরিছে এ-দেশে বিলাসের উৎসব
শূন্য উদরে সুরম্য পথে চলিতে চলিতে তারা
ভাবিছে তোমার এ-দেশে আবার আসিয়া বসিল কারা?

তোমার জীবন যৌবন ভরি সুদীর্ঘ কারাবাস
মুক্ত করিল, স্বাধীন করিল মুক্তির নিশ্বাস
ত্যজিয়া মানুষ বাংলার মাটি বাংলার এ বাতাসে
তোমারই দেওয়া মুক্তির বাণী জীবনের আশ্বাসে
গাহিয়া উঠিল গান
তোমার বিহনে ব্যাহত হয়েছে লক্ষ মানব প্রাণ।

বাংলার গান, বাংলার ধান বাঙালির খাদ্যকণা
লুট হয়ে যায়, বিনিময়ে তার আসিয়াছে নকল সোনা,
জাহাজ আসিছে, আসে সম্ভার যত মেকি ঝলমল
সোনা চলে যায় সাগরের পারে, আবার গৃধ্রদল
বাংলার বুকে হানা দিয়ে আসে, তোমার বজ্র স্বরে
সেই মুষিকেরা লুকাইয়াছিল অন্ধ গুহার ঘরে
তারা আসে আজ, তোমার আওয়াজ ধ্বনিবে না আরবার
যত বেঈমান এই বাংলারে করেছিল ছারখার
দিবস রাতে দস্যুর দল হানা দিয়ে ঘরে ঘরে
নিত্যই দেখি এখানে সেখানে মৃতদেহ আছে পড়ে
তোমার শোণিতে রাঙানো এ মাটি কাঁদিতেছে নিরবধি
তাইত তোমারে ডাকে বাংলার কানন গিরি ও নদী।

আমার পরিচয়

সৈয়দ শামসুল হক

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আল্‌পথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, 'কোথা থেকে তুমি এলে?'

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে।
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।

এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে।
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির-বেদি থেকে।
এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ থেকে।
এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে।

আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারভূঁইয়ার থেকে।
আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি', 'মহুয়ার পালা' থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত থেকে।
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে।

এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে।
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন্ ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।
আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে।
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে।
শুধাও আমাকে, 'এতদূর তুমি কোন্ প্রেরণায় এলে?'

তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি শোনো নাই—
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজো একসাথে থাকবোই—
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবোই।

পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের—
কখনোই ভয় করিনিকো আমি উদ্যত কোনো খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রেও শাণ দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসিমুখে বাজিয়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস;
আপস করিনি কখনোই আমি—এই হলো ইতিহাস।

এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান;
তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি—
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।

মানুষের নাম শেখ মুজিবুর রহমান

হাবিবুল্লাহ্ সিরাজী

সব কিছুর একটা না একটা নাম থাকে।
নক্ষত্রের নাম থাকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলে
মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়ে বৃষ্টির নাম
জ্যোৎস্নায় শিশির পতনের নাম
হাওয়ার দাপটে থাকে পল্লব ও পুষ্পের নাম
দূরে যাবার নাম, বিষয় বিজ্ঞানের নাম
পরিস্থিতি ও পরাজয়ের নাম
নাম, ধাতু ও ধৈর্যের—

কার নাম নেই?
সুন্দরবনের বাঘ? পদ্মার ইলিশ?
রবীন্দ্রনাথের গল্প? নাটোরের সন্দেশ?
না, নামহীন কিছু নেই—থাকে না।
নাম এক প্রকার ভালোবাসাবাসি
কার সঙ্গে কার ভাব বোঝা দায়!
নাম দীর্ঘ হয়, নাম বাড়ে, নাম ভাঙ্গে নতুন পুরানো নিয়ে
নামে নামে কাড়াকাড়ি হয়;
এভাবেই একদিন দেশের নাম বাংলাদেশ হয়ে যায়
মানুষের নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিবের এপিটাফ

হায়াৎ মামুদ

আমরা দেবতা নই। তুমিও কি ছিলে?
ভুল—সে তো করে মানুষেই।
অপার ক্ষমার ভুলে যেই মাশুল দিলে
তার দায় আমাদের শুধতে হবেই।

স্খলন ও ভ্রান্তির শেষে মানুষ গেলেও
(যেমন গিয়েছ তুমি ইতিহাসে)
বেঁচে থাকে বৃক্ষলতা, ধূলিকণা—সেও
তারই ঘ্রাণে, স্মৃতি ও সুবাসে।

আমরাও বেঁচে থাকি স্মৃতি নিয়ে তোর,
তোর রক্ত ফুল হবে আঙিনায় ভোর।

শেখ মুজিবুর রহমান

হীরালাল বালা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
কালজয়ী ইতিহাস বুকে
দাঁড়িয়ে আছেন
অক্ষয়, অব্যয়, অম্লান
শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতা-দ্রষ্টা, স্বাধীনতা-স্রষ্টা
সে এক মহান কবি, বীর অকুতোভয়,
বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাঙালি যখন
রক্ত দিয়েছে, আরও দেবে,
স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবেই আনবে।

ডাকে তাঁর জেগে ওঠে কোটি মানুষ,
যুদ্ধে নামে লক্ষ যোদ্ধা,
ডাকে তাঁর স্বাধীন হয় একটি দেশ,
তিনি পিতা সেই দেশের,
নেতা তিনি বিশ্বের।

বিশাল হৃদয়ের বিশালদেহী যে মানুষ,
যার ভালোবাসা দিগন্তপ্রসারী
রামধনু রঙে আঁকা, স্বপ্নমধুর যাঁর কণ্ঠস্বর,
তাকেও দিতে হয় প্রাণ হায়েনার হাতে?
তিনি তো আছেন জেগে বিশ্ব-ইতিহাসে
মধ্যাহ্ন গগনে সূর্যের মতো,
অক্ষত, অম্লান
জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. *আমার ভালবাসার দেশ*, অন্নদাশঙ্কর রায়, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১
২. *ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে*, জসীম উদ্‌দীন, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
৩. *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ষষ্ঠ সংস্করণ : মার্চ ১৯৯৯
৪. *নির্বাচিতা, নির্মলেন্দু গুণ*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ : জুলাই ২০০০
৫. *মহাদেব সাহার শ্রেষ্ঠ কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
৬. *বত্রিশ নম্বর*, বেলাল চৌধুরী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
৭. *কবিতাসমগ্র*, আসাদ চৌধুরী, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০০
৮. *বাঙালির শুদ্ধ নাম শেখ মুজিবুর রহমান*, বেবী মওদুদ সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
৯. *বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা*, কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত, পাভেল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল : ২৬ মার্চ ২০০০
১০. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ১৫ আগস্ট ১৯৯৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা
১১. *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু : শোক-গাথা*, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, জাতীয় শোক দিবস ১৫ আগস্ট ১৯৯৬ উপলক্ষে প্রকাশিত ১৯ বর্ষ ১১ সংখ্যা 'শিশু' পত্রিকার বই আকারে পুনর্মুদ্রণ
১২. *অগ্রপথিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, সৃজনশীল মাসিক পত্রিকা, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯৮
১৩. *বঙ্গবন্ধু তোমাকেই নিবেদিত পঙ্‌ক্তিমালা*, নীলকমল বিশ্বাস সম্পাদিত, বিশাকা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ৩০ অক্টোবর ১৯৯৬
১৪. *বঙ্গবন্ধুর জন্য যত কবিতা*, শেখ বদরুল আলম সম্পাদিত, আলো প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৭ মার্চ ১৯৯৭
১৫. *অমর তোমার নাম*, বেবী মওদুদ ও আসলাম সানী সম্পাদিত, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট, ৩২ নং সড়ক, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০১
১৬. *আগস্ট, শোকের মাস, কাঁদো*, বেবী মওদুদ সম্পাদিত, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট, ৩২ নং সড়ক, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৫
১৭. *দুই বাংলার কবিতায় বঙ্গবন্ধু*, আখতার হুসেন সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৫

মুক্তির গান

১

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি।
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি।
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি॥

জাগো নাগিনীরা জাগো
জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ
কাঁপুক বসুন্ধরা,

দেশের সোনার ছেলে খুন করে
রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না – না – না
খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি॥

সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষ
রাতজাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলোকনন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা
তাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের বুকে
দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে॥
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়।
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি।
একুশে ফেব্রুয়ারি॥

কথা : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
সুর : আলতাফ মাহমুদ

২

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের কর্‌ব রে বিকল॥

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দি হতে নয়,
ওরে ক্ষয় কর্‌তে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে কর্‌ব মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল॥

তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস,
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছো বিধির শক্তি হ্রাস!
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার আনবো মাভৈঃ-বিজয়-মন্ত্র বল-হীনের বল॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়;
সেই ভয়ের টুটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়!
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা,
এ যে মুক্ত-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা!
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥
[নজরুলসংগীত]

৩

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা,
আমরা তোমাদের ভুলব না।
দুঃসহ এ বেদনার কন্টক পথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা,
আমরা তোমাদের ভুলব না॥

যুগের এ নিষ্ঠুর বন্ধন হতে
মুক্তির এ বারতা আনলে যারা,
আমরা তোমাদের ভুলব না॥

কিষাণ-কিষাণীর গানে গানে
পদ্মা, মেঘনার কলতানে
বাউলের একতারাতে আনন্দ ঝংকারে
তোমাদের নাম ঝংকৃত হবে।

নতুন স্বদেশ গড়ার পথে
তোমরা চিরদিন দিশারী রবে-
আমরা তোমাদের ভুলবো না॥
কথা : গোবিন্দ হালদার
সুর : আপেল মাহমুদ

৪

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা॥

ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার প'রে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি, অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা॥

ও মা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা–
তবু জানি নে—যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥
[রবীন্দ্রসংগীত]

৫

ও আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই
জয় বাংলা বলিয়া আইসো রঙিন পাল উড়াই।
আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই॥

ও মাঝি ও, ওরে ছয় দাঁড়েতে নৌকা চলে
মুখে আল্লাজি
ওরে বাছা নায়ের হাল ধইরাছে
গোপালগঞ্জের মাঝি॥

ও মাঝি ও, গোপালগঞ্জের নায়ের মাঝি
বাংলাদেশের নাইয়া
সে যে সব দুঃখীরে পার কইরা দেয়
জয় বাংলা গান গাইয়া॥

ও মাঝি ও, সে নায়েতে পার হইতে
জলদি কইরা আয়
ওরে অনেক দিনের স্বপ্ন ঘেরা
যাইতে সোনার গাঁয়
আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই॥

কথা ও সুর : হাফিজুর রহমান

৬

ও তোর ভয় নাইরে জোরে মার টান
এই নৌকার কাণ্ডারী আছে মুজিবুর রহমান॥

নিলুয়া বাতাসেরে মাঝি নায়ের বাদাম ওড়ে
ঢেউয়ের মাথা কাইটারে নাও চলছে অতি জোরে
হেইয়ারে হেইয়া হেইয়ারে॥

মাঝি মাল্লা বৈঠা মার সমানে সমান
বাহুর বলে ধরে তোলো সংগ্রামী নিশান
জোরে চালাও আরো জোরে কিসের ঝড় তুফান
'মুজিব' নামে যাবে নৌকা চলিয়া উজান
হেইয়ারে হেইয়া হেইয়া হো॥

নবীন জোশে ধর কশে হাইলের বৈঠাখান
বীর সেনানী নও জোয়ানী বৈঠায় মারো টান
পাপের ভারে পাছে পইড়ে থাকবেরে বেঈমান
জয় বাংলা বলিয়া আমি জীবন করব দান॥

কথা : রজ্জব আলী দেওয়ান
সুর : সরদার আলাউদ্দিন আহমেদ

৭

ওরা আমার মুখের কথা
কাইড়া নিতে চায়
ওরা কথায় কথায় শিকল পরায়
আমাদেরই হাতে পায়॥

কইত যাহা আমার দাদায়
কইছে তাহা আমার বাবায়
এখন কও দেখি ভাই
মোর মুখে কি অন্য কথা শোভা পায়॥

সইমুনা আর সইমুনা
অন্য কথা কইমুনা
যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান,
এই জানের বদল রাখমুরে ভাই
বাপ দাদার জবানের মান।
ও হো হো হো বাপ দাদার জবানের মান।

যে শুইনাছে আমার দেশের
গাও গেরামের গান
নানান রঙ্গে নানান রসে
ভইরাছে তার প্রাণ॥

ঢপ কীর্তন ভাসান জারী
গাজীর গীত আর কবির সারী
আমার এই বাংলাদেশের বয়াতিরা
নাইচা নাইচা কেমন গায়॥

তারি তালে তালে হৈ
ঢোল করতাল বাজে ঐ
বাঁশী কাঁশী খঞ্জনী শানাই।
এখন কও দেখি ভাই এমন শোভা
কোথায় গেলে দেখতে পাই
ও হো হো হো কোথায় গেলে দেখতে পাই॥

পূবাল বায়ে বাদাম দিয়া
লাগলে ভাটির টান
গায়রে আমার দেশের মাঝি
ভাটিয়ালী গান (ভাইরে)
তার ভাটিয়াল গানের সুরে
মনের দুঃখ যায়রে দূরে
বাজায় বাঁশি সেই না সুরে
রাখাল বনের ছায়॥

টুং টুঙা টুং দোতারা আর
সারিন্দা বাজাইয়া
গাঁয়ের যোগী ভিক্ষা মাগে
প্রেমের সারী গাইয়া (গো)
একতারা বাজাইয়া বাউল
ঘুচায় মনের সকল আউশ
ওরা তাদের মুখেও মারে লাথি
এই দুঃখ কি সওয়া যায়॥

আরেক কথা মনে হইলে আংখি ঝইরা যায়
ঘুম পাড়াইনা গাইতো যে গান মোর দুখিনী মায়
(ও মায়) সোনা মানিক যাদু বলে
চুমা দিয়া লইতো কোলে
(আরো) আদর কইরা কইতো মোরে
আয় চান আমার বুকে আয়॥
ওরা মায়ের মুখের কথা
কাইড়া নিতে চায়॥

কথা ও সুর : আবদুল লতিফ

৮

ক'জনকে তুই দিবি ফাঁসি
বন্দি করবি কর
আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে লক্ষ মুজিবর॥

এক মুজিবকে দিবি ফাঁসি
লক্ষ মুজিব আসবে হাসি
সাত কোটি ভাই বাঙালি ভুলেছি ভয় ডর॥

শিখছি মোরা রক্ত দিতে
আর করিনা ভয়
এবার তোদের মরার পালা
জয় বাংলার জয়।

করবি তোরা যত বন্দি
আঁটবি তোরা যত ফন্দি
তোদের সাথে মোদের সন্ধি
হবেনা বর্বর॥

কথা ও সুর : আবদুল লতিফ

৯

১

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল্, কর্ রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পুজোর পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।

২

গাজনের বাজ্না বাজা!
কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দেয় সাজা
মুক্ত-স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পর্‌বে ফাঁসি?
সর্বনাশী
শিখায় এ হীন্ তথ্য কে রে?

৩

ওরে ও পাগ্‌লা ভোলা!
দে রে দে প্রলয়-দোলা
গারদগুলা
জোর্‌সে ধ'রে হেঁচ্‌কা টানে!
মার্‌ হাঁক্‌ হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক্‌ ও রে ডাক্‌
মৃত্যুকে ডাক্‌ জীবন পানে!

৪

নাচে ঐ কাল-বোশেখী,
কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি'!
লাথি মার্‌, ভাঙ রে তালা!
যত সব বন্দি-শালায়–
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্‌ উপাড়ি'।
[নজরুলসংগীত]

১০

গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা,
ও তার দুই চোখে দুই জলের ধারা
মেঘনা যমুনা।

একই আকাশ একই বাতাস
এক হৃদয়ে একই তো শ্বাস।
দোয়েল কোয়েল পাখির ঠোঁটে
একই মূর্ছনা।

এপার ওপার কোন পারে জানি না
ও আমি সব খানেতে আছি
গাঙ্গের জলে ভাসিয়ে ডিঙা
ও আমি পদ্মাতে হই মাঝি।
শঙ্খচিলের ভাসিয়ে ডানা
ও আমি দু নদীতে নাচি

একই আশা ভালোবাসা
কান্না হাসির একই ভাষা
দুঃখ সুখের বুকের মাঝে
একই যন্ত্রণা।

কথা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : ভূপেন হাজারিকা

১১

চাষাদের মুটেদের মজুরের
গরিবের নিঃস্বের ফকিরের
ছোটদের বড়দের সকলের
গরিবের নিঃস্বের ফকিরের
আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের॥

নেই ভেদাভেদ হেথা চাষা আর চামারের,
নেই ভেদাভেদ হেথা কুলি আর কামারের।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান দেশ মাতা এক সকলের।

লাঙলের সাথে আজ চাকা ঘোরে এক তালে
এক হয়ে মিশে গেছি আমরা সে যে কোন প্রাণে
মন্দির মসজিদ গির্জার আবাহনে
বাণী শুনি একই সুরে॥

চাষাদের মজুরের ফকিরের
ফকিরের নিঃস্বের গরিবের
আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের।
বড়দের ছোটদের সকলের
ছোটদের বড়দের সকলের
আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের॥

কথা : আলী মহসীন রেজা
সুর : রথীন্দ্রনাথ রায়

১২

জগৎবাসী একবার আসিয়া
বাংলাদেশকে যাও দেখিয়ারে।

সোনার বাংলা করল শশ্মানরে
ওরে পাকিস্তানের বর্বর ইয়াহিয়া
মেশিনগান আর বুলেট বেয়নেট দিয়া॥

বাঙালিদের পয়সা দিয়া বাঙালিদের গুলি
ওরে অত্যাচারের প্রতিশোধ নে তুলি
বাঙালি তুই বুকের রক্ত দিয়া॥

মায়ের রক্ত বোনের রক্ত ভাইয়ের রক্ততে
ওরে মুক্ত করতে মুজিবরের বঙ্গভূমিকে
বাঙালি তুই দাঁড়া অস্ত্র নিয়া॥

কথা : শহিদুল ইসলাম
সুর : আব্বাসউদ্দীনের "ও কি একবার আসিয়া সোনার চাঁদ মোর"- গানের সুরের অনুকরণে

১৩

জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।
জনতার সংগ্রাম চলবেই॥

হতমানে অপমানে নয়, সুখ-সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে

দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই,
জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই॥

প্রতারণা প্রলোভন প্রলেপে,
হোক না আঁধার নিশ্ছিদ্র
আমরা তো সময়ের সারথি
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র।

দিয়েছি তো শান্তি আরও দেবো স্বস্তি
দিয়েছি তো সম্ভ্রম আরও দেবো অস্থি
প্রয়োজন হ'লে দেবো এক নদী রক্ত
হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত
অবিরাম যাত্রার চির-সংঘর্ষে
একদিন সে-পাহাড় টলবেই।
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

হতে পারি পথ-শ্রমে আরও বিধ্বস্ত
ধিক্কৃত নয় তবু চিত্ত
আমরা তো সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী,
চলবার আবেগেই তৃপ্ত।

আমাদের পথরেখা দুস্তর দুর্গম
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী
বেদনার কোটি কোটি অংশী
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নি
সকল বিরোধ-বিধ্বংসী।

এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনোদিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া আনবোই,
আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নূতন সূর্যশিখা জ্বলবেই
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

কথা : সিকান্দার আবু জাফর
সুর : শেখ লুৎফর রহমান

১৪

জয় বাংলা জয় বাংলা বইলা রে
মাঝি বাদাম দাও তুলিয়া
আল্লার নাম লইয়া নৌকায়
কাছি দাও খুলিয়া মাঝি রে॥

ওরে পদ্মা মেঘনা ধল্লার মাঝি রে
ও মাঝি বৈঠা চালাও কৈশা

বিপদ বালার ভাবনা চিন্তা
আর কইরো না বইসা মাঝি রে॥

এবার নতুন সুরুজ উদয় হইল রে
মাঝি বইছে নতুন বাও
দাড়ের ঘায়ে তুফান ভাইঙ্গা
সামনে বাইয়া যাও মাঝি রে॥

ওরে তোমার আমার এই না বাংলা রে
ও মাঝি আর তো কারো নয়
মনের মতো বাইয়া চলো
নাইকো বাঁধা ভয় মাঝি রে॥

আমরা বাংলাদেশে বসত করি রে
মাঝি বাংলার কামাই খাই
বাংলা ভাষায় হাসি কান্দি
বাংলাতে গান গাই মাঝি রে।

ও রে জনম নিলাম বাংলাদেশে রে
ও মাঝি বাংলার গরব করি
বাংলা মায়ের কোলে যেন
মরণ কালে মরি মাঝি রে॥

কথা ও সুর : হাফিজুর রহমান

১৫

জয় বাংলা জয় বাংলা বলিয়ারে
তরী দিলাম ছাড়ি
সেই তরীতে হাইল ধইরাছে
গোপালগঞ্জের মাঝি॥

উথাল পাথাল গাঙ্গের পানি
নাও চলে উজান
ভয় কিরে তোর আসুক তুফান
শক্ত হাতে হুঁশিয়ার মাঝি
হাইল আছে ধরি॥

ঝড় তুফানে চলবে তরী
চলবে উজান পানে
উঠুক না মেঘ আসুক ঝঞ্ঝা
পাড়ি দিব মোরা
আল্লার নাম স্মরি॥

পুব আকাশে সূর্য উঠছে
ফর্সা চারিদিক হইয়াছে
আর ভয় নাইরে তোর
নাইরে তোর ভয়
'জয় বাংলার জয়'॥

কথা ও সুর : হরলাল রায় [সারিগান]

১৬

জয় বাংলা বাংলার জয়
হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়।
কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য ওঠার এই তো সময়॥

বাংলার প্রতি ঘর ভরে দিতে চাই মোরা অন্নে,
আমাদের রক্ত টগবগ দুলছে
মুক্তির দীপ্ত তারুণ্যে।
নেই ভয়–
হয় হউক রক্তের প্রখ্যত ক্ষয়
(তবু) করি না করি না করি না ভয়॥

অশোকের ছায়ে যেন রাখালের বাঁশরী
হয়ে গেছে একেবারে স্তব্ধ,
চারিদিকে শুনি আজ নিদারুণ হাহাকার
আর ঐ কান্নার শব্দ।

শাসনের নামে চলে
শোষণের সুকঠিন যন্ত্র,
বজ্রের হুঙ্কারে শৃঙ্খল ভাঙতে
সংগ্রামী জনতা অতন্দ্র।

আর নয়–
তিলে তিলে বাঙালির এই পরাজয়
(তবু) করি না করি না করি না ভয়।
জয় বাংলা বাংলার জয়॥

ভুখা আর বেকারের মিছিলটা যেন ঐ
দিন দিন শুধু বেড়ে যাচ্ছে,
রোদে পুড়ে জলে ভিজে অসহায় হয়ে আজ
ফুটপাথে তারা ঠাঁই পাচ্ছে।
বার বার ঘুঘু এসে খেয়ে যেতে দেব না তো আর ধান,
বাংলার দুশমন তোষামোদী চাটুকার
সাবধান সাবধান সাবধান!

এই দিন–
সৃষ্টির উল্লাসে হবে রঙিন।
(আর) মানি না মানি না কোনো সংশয়॥

মায়েদের বুকে আজ শিশুদের দুধ নেই
অনাহারে তাই শিশু কাঁদছে,
গরিবের পেটে আজ ভাত নেই ভাত নেই
দ্বারে দ্বারে তাই ছুটে যাচ্ছে।

মা-বোনের পরনে কাপড়ের লেশ নেই
লজ্জায় কেঁদে কেঁদে ফিরছে,
ওষুধের অভাবে প্রতিটি ঘরে ঘরে
রোগে শোকে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

অন্ন চাই বস্ত্র চাই
বাঁচার মতো বাঁচতে চাই
অত্যাচারী শোষকদের আজ
মুক্তি নাই মুক্তি নাই মুক্তি নাই॥

কথা : গাজী মাজহারুল আনোয়ার ও সুর : আনোয়ার পারভেজ

১৭

তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর
পাড়ি দেব রে,
আমরা ক'জন নবীন মাঝি
হাল ধরেছি শক্ত করে রে॥

জীবন কাটে যুদ্ধ করি
প্রাণের মায়া সাঙ্গ করি
জীবনের সাধ নাহি পাই।
ঘর-বাড়ির ঠিকানা নাই
দিন-রাত্রি জানা নাই
চলার সীমানা সঠিক নাই।
জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে
আমি যে সাগর-মাঝি রে॥

জীবনের রঙ মনকে টানে না
ফুলের ঐ গন্ধ কেমন জানি না
জ্যোৎস্নার দৃশ্য চোখে পড়ে না
তারাও তো ভুলে কভু ডাকে না।
বৈশাখের ঐ রুদ্র ঝড়ে
আকাশ যখন ভেঙে পড়ে
ছেঁড়া পাল আরও ছিঁড়ে যায়।
হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়
হঠাৎ কে যে শঙ্খ শোনায়
দেখি ঐ ভোরের পাখি গায়।
তবু তরী বাইতে হবে
খেয়া পাড়ে নিতে হবে
যতই ঝড় উঠুক সাগরে॥

কথা ও সুর : আপেল মাহমুদ

১৮

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

২

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥

৩

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

৪

গিরি-সঙ্কট, ভীরুযাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছে যে মহাভার!

৫

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

৬

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।
[নজরুলসংগীত]

১৯

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে
তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায় তুমি
আজ ঘরে-ঘরে এত খুশি তাই
কি ভালো তোমাকে বাসি আমরা
বলো কি করে বুঝাই।

এদেশকে বলো তুমি
বলো কেন এত ভালোবাসলে
সাত কোটি মানুষের
হৃদয়ের এত কাছে কেন আসলে
এমন আপন আজ বাংলার
তুমি ছাড়া কেউ আর নাই
বলো কি করে বুঝাই।

সারাটা জীবন তুমি নিজে শুধু
জেলে-জেলে থাকলে
আর তবু স্বপ্নের
সুখি এক বাংলার ছবি শুধু আঁকলে
তোমার নিজের সুখ-সন্ধ্যার
কিছু আর দেখলে না তাই
বলো কি করে বুঝাই।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে
তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায় তুমি
আজ ঘরে-ঘরে এত খুশি তাই
কি ভালো তোমাকে বাসি আমরা
বলো কি করে বুঝাই।

কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
গীতিকার : আবিদুর রহমান

[সূত্র : অডিও ক্যাসেট]

২০

বাংলার দুর্জয় জনতা
মুজিবের মন্ত্রের দীক্ষায়
ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে॥

সাত কোটি ধমনিতে রক্ত
টগ-বগ, টগ-বগ ফুটছে
ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে।
বাংলার দুর্জয় জনতা॥

বাংলার ইতিহাস রক্তের ইতিহাস (২)
রক্তেরই অক্ষরে তাই প্রতি ঘরে-ঘরে
জীবনের প্রতিলিপি উড়ছে
ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে।
বাংলার দুর্জয় জনতা ॥

পশ্চিমা হানাদার বাংলার গ্রামে আর
শহরেতে বসিয়েছে হত্যার যজ্ঞ (২)
পথ-ঘাট পুকুরের পাড়ে আর
কুকুরের-শিয়ালের ভোজ
মৃত মানুষের বক্ষ।
বাংলার দুর্জয় জনতা ॥

দয়া-মায়া কিছু নেই পিশাচের দলে (২)
বাংলার ঘরে-ঘরে ঢুকে-ঢুকে জোর করে
লাখ-লাখ মা-বোনের ইজত লুটছে
ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে।
বাংলার দুর্জয় জনতা॥

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
গীতিকার : আবিদুর রহমান
[সূত্র : অডিও ক্যাসেট]

২১

বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ,
বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান–
আমরা সবাই বাঙালি॥

তিতুমীর, ঈসাখাঁ, সিরাজ
সন্তান এই বাংলাদেশের,
খুদিরাম, সূর্য সেন, নেতাজি,
সন্তান এই বাংলাদেশের,
এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে
বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিল কার সে কণ্ঠস্বর–
মুজিবর সে যে মুজিবর।
জয়বাংলা বোলোরে ভাই॥

ছয়টি ছেলে বাংলাভাষার চরণে দিল প্রাণ–
তারা বলে গেল ভাষাই ধর্ম ভাষাই মোদের মান।
মাইকেল, বিশ্বকবি, নজরুল,

সন্তান এই বাংলাদেশের,
কায়কোবাদ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ
সন্তান এই বাংলাদেশের,
এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে,
বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিলো কার সে কণ্ঠস্বর
মুজিবর সে যে মুজিবর–
জয় বাংলা বোলোরে ভাই॥

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং সুর : শ্যামল গুপ্ত

২২

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা।
তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির,
তোমার কারাগারের পেষণ
শুধবে তারা ওজনে-তা
এই জনতা॥

তোমার সভায় আমির যারা
ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলবে তারা
তোমার রাজা মহারাজা
করজোড়ে মাগবে বিচার
ঠিক জেনো-তা
এই জনতা॥

তারা নতুন প্রাতে প্রাণ পেয়েছে,
তারা ক্ষুদিরামের রক্তে ভিজে প্রাণ পেয়েছে,
তারা জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে,
তারা ফাঁসির কাষ্ঠে জীবন দিয়ে প্রাণ পেয়েছে
তারা গুলির ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে প্রাণ পেয়েছে
প্রাণ পেয়েছে
এই জনতা॥

নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে
সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে
ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে নামিয়ে মাথা
হে বিধাতা–
রক্ত দিয়ে শুধতে হবে নামিয়ে মাথা
হে বিধাতা!
ঠিক জেনো তা–
এই জনতা॥

কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী

২৩

মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে
একটু সহানুভূতি কী মানুষ পেতে পারে না, ও বন্ধু॥

মানুষ মানুষকে পণ্য করে, মানুষ মানুষকে জীবিকা করে
পুরোনো ইতিহাস ফিরে এনে, লজ্জা কী তুমি পাবে না, ও বন্ধু॥

বলো কী তোমার ক্ষতি জীবনের অথই নদী
পার হয় তোমাকে ধরে দুর্বল মানুষ যদি॥
মানুষ যদি সে না হয় মানুষ, দানব কখনো হয় না মানুষ
যদি দানব কখনও বা হয় মানুষ, লজ্জা কী তুমি পাবে না, ও বন্ধু॥
কথা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : ভূপেন হাজারিকা

২৪

মানুষ হ' মানুষ হ'
আবার তোরা মানুষ হ'
অনুকরণ খোলস ভেদি
কায় মনে বাঙালি হ'।
শিখে নে দেশ বিদেশের জ্ঞান
তবু হারাস নে মা'র দান–
বাংলা ভাবে পূর্ণ হয়ে
সুধন্য বাঙালি হ'॥

করে বাংলা–জাত প্রাণ
খেটে বাংলা–সেবায় দান
বাংলা ভাষায় বুলি বলে
বাংলা ধাঁচে নেচে খেলে
ষোল আনা বাঙালি হ'
বিশ্ব মানব হবি যদি
শাশ্বত বাঙালি হ'॥
কথা ও সুর : গুরুসদয় দত্ত

২৫

মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হলো বলিদান
লিখা আছে অশ্রু জলে
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা
বন্দিশালার ঐ শিকল ভাঙা
তারা কি ফিরিবে, আজ সুপ্রভাতে
কত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে॥

যারা স্বর্গগত তারা এখনও জানে
স্বর্গ-এর চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি
এসো স্বদেশ ব্রতের মহাদীক্ষালভি
সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি।

যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগাল আশা
মৌন মলিন মুখে জাগাল ভাষা
সেই রক্ত কমলে গাঁথা মাল্য খানি
আজি বিজয় লক্ষ্মী দেবে তাদেরই গলে॥
কথা ও সুর : শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

২৬

মুজিব বাইয়া যাওরে

নির্যাতিত দেশের মাঝে
জনগণের নাও ওরে
মুজিব বাইয়া যাও রে॥

ও মুজিব রে, ছলে বলে চব্বিশ বছর রক্ত খাইল চুষি
জাতিরে বাঁচাইতে যাইয়া
মুজিব হইল দোষী রে।
মুজিব বাইয়া যাও রে॥

ও মুজিব রে, ক্ষিধার জ্বালা হৃদয় কালা
রক্ত কালা মুখে
কথায় কথায় চালায় গুলি
বাঙালিদের বুকে রে।
মুজিব বাইয়া যাও রে॥

ও মুজিব রে, আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে কান্দেরে বাঙালি
নিপীড়িত মানুষ কাঁন্দে
মুজিব মুজিব বলি রে।
মুজিব বাইয়া যাও রে॥

ও মুজিব রে, বাঙালিদের ভাগ্যাকাশে এলো দুঃখের নিশি
তুমি বাংলার চির সম্রাট
অন্ধকারের শশী রে।
মুজিব বাইয়া যাও রে॥

ও মুজিব রে, অত্যাচারীর উৎপীড়নে দিক না যতই ব্যথা
সাত কোটি বাঙালির প্রাণে
মুজিব তুমি নেতা রে।
মুজিব বাইয়া যাওরে ॥

কথা : মোহাম্মদ শফি
সুর : 'মাঝি বাইয়া যাও রে'–গানের সুরের অনুকরণে

২৭

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালোবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
(এমন কোথা আর আছে গো।)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥

ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা,
(মরি হায়, হায় রে!)
আছে কৈ এমন ভাষা, এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা॥

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন;
(আরও কত মধুপ গো!)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা॥

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনলে মালা জগৎ জিনে,
(গরব কোথায় রাখি গো!)
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া–আসা।

ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্‌নু মায়ে 'মা', 'মা' বলে;
ঐ ভাষাতেই বলব হরি, সাঙ্গ হ'লে কাঁদা-হাসা॥

কথা ও সুর : অতুলপ্রসাদ সেন

২৮

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি।
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি॥

যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা,
যার নদী জল ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা,
যে দেশের নীল অম্বরে মোর মেলেছে পাখা,
সারাটি জনম সে মাটির গানে অস্ত্র ধরি॥

মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি।
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি।
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি।
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি॥

যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে,
যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে,
যে গৃহকপোত সুখ স্বর্গের দুয়ার খোলে,
সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি॥

কথা : গোবিন্দ হালদার
সুর : আপেল মাহমুদ

২৯

যায় যদি যাক প্রাণ
তবু দেব না দেব না
দেব না গোলার ধান।
দেব না আমার মাঠের সবুজ আর
খামারে সাজানো ফসলের সম্ভার
আমি দেব না অবুঝ সবুজ সোনালি
রূপালি গোলার গান॥

রক্তের দামে কিনেছি
আমার প্রিয়তম স্বাধীনতা
রক্তেই আমি রাখবো যে তার মান,
তবু দেব না গোলার ধান॥

দেব না আমার পাখির মধুর গান
ঝিরি ঝিরি ঐ তটিনীর কলতান
আমি দেব না অবুঝ সবুজ সোনালি
রূপালি ফুল বাগান॥

কথা ও সুর : আবু হেনা মোস্তফা কামাল

৩০

রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি
বাংলাদেশের নাম
মুক্ত ছাড়া তুচ্ছ মোদের
এই জীবনের দাম॥

সংকট আর সংঘাতে
আমরা চলি সব এক সাথে
জীবন মরণ পণ করে সব
লড়ছি অবিরাম, বাংলাদেশের নাম।

রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেবো
রক্তের প্রতিশোধ মোরা নেবোই নেবো
ঘরে ঘরে আজ দুর্গ গড়েছি
বাংলার সন্তান সইবো না আর
সইবো না মোরা জীবনের অপমান।

জীবন জয়ের গৌরবে
মুক্ত স্বাধীন জীবন গড়া
মোদের মনস্কাম॥

কথা : আবুল কাসেম সন্দ্বীপ
সুর : সুজেয় শ্যাম

৩১

লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয়
শোষিত মানুষের একতার জয়।
রাখবো না রাখবো না শোষণের চিহ্ন
রাখববো না রাখব না কলুষতা দৈন্য
থাকবে না দারিদ্র্য দীনতার ভয়
জয় নিপীড়িত মানবের জয়॥

মানুষের বাঁচবার অধিকার কেড়ে নিয়ে
যারা করে জীবনের পথ অবরুদ্ধ
অসহায় শোষিতের সঞ্চিত শক্তিতে
ভাঙে তার শোষণের মহলটা সুদ্ধ।

মেহনতী জনতার ঐক্যে
আমরা এগিয়ে যাই লক্ষ্যে
ক্ষমতার দম্ভের তাই পরাজয় (আজ)
জয় মানবতা সাম্যের জয়॥

কথা : মতলুব আলি ও সুর : শেখ লুৎফর রহমান

৩২

শোনো, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিববের কণ্ঠ ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ॥

সেই সবুজের বুকচেরা মেঠো পথে
আবার এসে ফিরে যাবো,
(আমার) হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।

শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে
হায়রে এমন সোনার দেশ॥

বিশ্ব কবির সোনার বাংলা,
নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা,
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।
'জয় বাংলা' বলতে মনরে আমার এখনো কেন ভাবো,
(আমার) হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
অন্ধকারে পুব আকাশে উঠবে আবার দিনমণি॥

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : অংশুমান রায়

৩৩

সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনাতে নজরুল
যতই আসুক বিঘ্ন বিপদ হাওয়া হোক প্রতিকূল
এক হাতে বাজে অগ্নিবীণা কণ্ঠে গীতাঞ্জলি
হাজার সূর্য চোখের তারায় আমরা যে পথ চলি॥

এই সেই দেশ একদা যেখানে উপনিষদের ঋষি
সমতার গান গেয়েছিল আর শুনেছিল দশদিশি
প্রপিতামহের ভাষাতেই আজো আমরা যে কথা বলি॥

এই সেই দেশ এখনো এখানে ওঠে আজানের ধ্বনি
গীতা বাইবেল ত্রিপিটক আর শোনা যায় রামায়নি
কবি কালিদাস ইকবাল আর গালীবের পদাবলী॥

কথা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : ভূপেন হাজারিকা

৩৪

সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম
মুজিবর, মুজিবর, মুজিবর।
সাড়ে সাত কোটি প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম
জয় বাংলা, জয় মুজিবর, জয় বাংলা, জয় মুজিবর।
এ যে শপথের রক্তের স্বাক্ষর
এ আগুনের মন্ত্রের অক্ষর
অগ্রগামী মুক্তিকামী মনস্কাম–মুজিবর।

এ যে লাঞ্ছিত নিপীড়িত গণসত্তায় জাগরণ
এ যে নির্ভয় দুর্জয় গণসংগ্রাম আমরণ,
এ যে সূর্যের দীপ্তিতে ভাস্বর
এ যে আত্মার মতো অবিনশ্বর
চলে হুঙ্কার জয় বাংলার নগর গ্রাম মুজিবর
জয় বাংলা, জয় মুজিবর, জয় বাংলা, জয় মুজিবর।

কথা : শ্যামল গুপ্ত
সুর : বাপ্পী লাহিড়ী

৩৫

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হে বিধাতা
তোমায় নমস্কার। (২)
মুজিবর এই নামের পতাকা (২)
উড়াইলাম এবার–তোমায় নমস্কার।
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হে বিধাতা
তোমায় নমস্কার।

তোমার কণ্ঠে চাষি মজুর
পাইল যে তার ভাষা (২)
তোমার ভাষায় বাঙালি জাত
পাইল নতুন আশা।
তুমি রাম, তুমি রহিম (২)
করলা একাকার– তোমায় নমস্কার।
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হে বিধাতা
তোমায় নমস্কার ॥

নিজ-ভূমে পরবাসি হইয়া রইছি কতদিন
বুকের খুনে সুরজ দিয়া করছি গো রঙিন
নিজ-ভূমে পরবাসি হইয়া রইছি কতদিন

তুমি কত না যে অত্যাচার
সইলা মোদের তরে (মুজিবর ... ২)
এবার মুক্ত করছি বাংলা (২)
আসন তোমার তরে
বুকে-বুকে পাতছি গো মোরা (২)
লও হে তুলে ভার– তোমায় নমস্কার।
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হে বিধাতা
তোমায় নমস্কার ॥

মুজিবর এই নামের পতাকা
উড়াইলাম এবার– তোমায় নমস্কার॥
কণ্ঠ : মান্না দে
সূত্র : অডিও ক্যাসেট

৩৬

সালাম সালাম হাজার সালাম
সকল শহীদ স্মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে॥

মায়ের ভাষায় কথা বলাতে,
স্বাধীন আশায় পথ চলাতে,
হাসিমুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ,
সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান
তাদের বিজয় মরণে॥

ভাইয়ের বুকের রক্তে আজিকে
রক্ত-মশাল জ্বলে দিকে দিকে,
সংগ্রামী আজ মহাজনতা
কণ্ঠে তাদের নব বারতা
শহীদ ভাইয়ের স্মরণে॥

বাংলাদেশের লাখো বাঙালি
জয়ের নেশায় চলে রক্ত ঢালি,
আলোর দেয়ালী ঘরে ঘরে জ্বালি,
ঘোচাবে মনের আঁধার কালি
শহীদ স্মৃতি বরণে॥

কথা : ফজল-এ খোদা
সুর : আবদুল জব্বার

৩৭

সোনা, সোনা, সোনা, লোকে বলে সোনা
সোনা নয় তত খাঁটি–
বলো যত খাঁটি তার চেয়ে খাঁটি
বাংলাদেশের মাটি রে।
আমার জন্মভূমির মাটি॥

ধন ধন ধন বলো যত ধন দুনিয়াতে,
হয় কি তুলনা বাংলার কারো সাথে?
কত মার ধন মাণিক রতন
কত জ্ঞানী গুণী কত মহাজন
এনেছে আলোর সূর্য এখানে
আঁধারের পথ কাটি রে
আমার বাংলাদেশের মাটি।
আমার জন্মভূমির মাটি॥

এ মাটির তলে ঘুমায়েছে অবিরাম
রফিক শফিক বরকত কত নাম
কত তিতুমীর কত ঈশা খান
দিয়েছে জীবন, দেয়নি তো মান।
রক্তশয্যা পাতিয়া এখানে
ঘুমায়েছে পরিপাটি রে
আমার বাংলাদেশের মাটি,
আমার জন্মভূমির মাটি॥

কথা ও সুর : আবদুল লতিফ

৩৮

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে॥

এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত মাঠ স্বপ্ন সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি
কোথাও নেই কো পার, কোথাও নেই কো পার॥

মারী ও মড়ক, মন্বন্তর ঘন ঘন বন্যায়
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

[পঙক্তি বিন্যস্ত হলো গানের ঢঙে]
কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সুর : অজিত রায়

৩৯

বাংলাদেশ [BANGLADESH]

জর্জ হ্যারিসন [GEORJE HARRISON]

চোখে বিষাদ নিয়ে
আমার বন্ধু আমার কাছে এসেছিল,
বলেছিল, তার সাহায্য চাই
তার দেশের মৃত্যু এসেছে ঘনিয়ে

যদিও তার বেদনাকে আমি বুঝতে পারি নি,
আমি জানতাম চেষ্টা করতে হবে আমাকে
আজ আপনাদের সকলের কাছে
আমি সাহায্য চাই–
কিছু জীবন বাঁচাতে হবে

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ–
যেখানে এত মানুষ কী দ্রুত মরছে
কী গোলযোগের দৃশ্য–
আমি কখনো দেখিনি এরূপ দুর্দশা
এখন তোমরা কী বাড়াবে না হাত, চাইবে না বুঝতে–
বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করতে

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ–
এত বড় বিপর্যয় – আমি বুঝি না;
তবে নিশ্চয় – এ এক গোলযোগের দৃশ্য–
আমি কখনো দেখিনি এরূপ দুর্দশা
এখন দয়া করে চলে যেও না, আমি চাই তোমরাও বলো
বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করতে

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ–
মনে হতে পারে আমাদের এখান থেকে কত দূরে!
তথাপি; আমরা এ দৃশ্য প্রত্যাখ্যান করতে পারি না,
পারি না এ বেদনা উপেক্ষা করতে
এখন উপবাসীর খাওয়ার জন্যে তুমি কী কিছু রুটি দেবে না
বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করতে

কথা, সুর ও কণ্ঠ : জর্জ হ্যারিসন

ভাষান্তর : ড. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র : I ME MINE by Georje Harrison, Chroniole Books, San Francisco, USA, 2002 year, page no 224.

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ [সংগীত অনুষ্ঠান] ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন, নিউইয়র্ক, আমেরিকা

তারিখ	:	১ আগস্ট ১৯৭১
মূল উদ্যোক্তা	:	বিশ্ববিখ্যাত সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশংকর
মূল আকর্ষণ	:	জর্জ হ্যারিসন ও বব ডিলান [বিটলস সংগীত দলের পুরোধা]
শ্রোতা উপস্থিতি	:	৪০ হাজার
অর্থ সংগ্রহ	:	২,৪৩,৪১৮.৫০ ডলার
অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য	:	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, উদ্বাস্তু ও শিশু সাহায্য তহবিলে অর্থদান
অনুষ্ঠান শুরু	:	পণ্ডিত রবিশংকর–এর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও 'বাংলাদেশ ধুন' নতুন একটি সুর উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে
সারোদে যুগলবন্দি	:	ওস্তাদ আলী আকবর খান
তবলায় ছিলেন	:	বিখ্যাত আল্লারাখা
তানপুরায় ছিলেন	:	কমলা চক্রবর্তী
অনুষ্ঠানের শিল্পীবৃন্দ	:	'বিটলস' সংগীত দলের সদস্য রিঙ্গো স্টার, লিওন রাসেল, এরিক ক্লাপ্টন, বিলি প্রেস্টন, ডন প্রেস্টন গান গেয়েছেন ও গিটার বাজিয়েছেন। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাসহ জর্জ হ্যারিসন গেয়েছেন ৬টি গান। গানের রাজা বব ডিলানও গেয়েছেন ৬টি গান।

সূত্র : *প্রথম আলো*, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩

৪০

যশোর রোডে সেপ্টেম্বর [SEPTEMBER ON JESSORE ROAD]

অ্যালেন গিন্সবার্গ [ALLEN GINSBERG]

লক্ষ শিশু দেখছে আকাশ অন্ধকার
উদর স্ফীত, বিস্ফারিত চোখের ধার
যশোর রোড– বিষণ্ন সব বাঁশের ঘর
ধুঁকছে শুধু কঠিন মাটি নিরুত্তর।

লক্ষ পিতা ভিজছে হিমেল বৃষ্টিতে
লক্ষ মাতা দুঃখ দেখে দৃষ্টিতে
লক্ষ ভাইয়ের হৃদয় শুধু যন্ত্রণা
লক্ষ বোনের নেইকো ঘরের সান্ত্বনা।

লক্ষ মাসী ভাতের জন্যে যায় মরে।
লক্ষ মাতুল মাতাল হয়ে শোক করে
লক্ষ পিতামহের গৃহ চূর্ণপ্রায়
পিতামহী হচ্ছে পাগল নিঃসহায়।

হাঁটছে পাকে লক্ষ পিতার কন্যারা
অবোধ শিশু ভাসিয়ে নিল বন্যারা
লক্ষ মেয়ে করছে বমন আর্তনাদ
লক্ষ পরিবারের আশা চূর্ণ সাধ

লক্ষ প্রাণের উনিশ শত একাত্তর
উদ্বাস্তু যশোর রোডে সব ধূসর
সূর্য জ্বলে ধূসর রঙে মৃতপ্রায়
হাঁটছে মানুষ বাংলা ছেড়ে কলকাতায়

সেপ্টেম্বরে যশোর রোড ধরে ট্যাক্সিতে
হাড্ডিসার গরুর গাড়ি ভরা কয়লাতে
ডুবে যাওয়া মাঠ ভেসেছে জলে বৃষ্টির
ঘষিতে লোপা বৃক্ষ আর প্লাস্টিকে ছাওয়া কুড়েঘর

সিক্ত মিছিল হাঁটছে মানুষ নিঃসহায়
ত্রস্ত ভীত ক্ষুব্ধ বালক থমকে চায়
স্তব্ধ আঁখি শীর্ণদেহ অস্থিসার
মানববেশ এ ক্ষুধার্ত সব ফেরেশতার!

কাঁদছে মাতা উঁচিয়ে আঙুল ঐ দেখায়
দাঁড়িয়ে আছে সন্ন্যাসিনীর মতোই প্রায়
সন্তানের শীর্ণপদে প্রার্থনায়
পাঁচটি মাসের অন্নবিহীন যন্ত্রণায়।

ছোট্ট শূন্য পাত্র পড়ে আছে ঘরের মাদুরে
অসহায় পিতার হাত গিয়ে ঠেকে কপালে
মায়েরও চোখ ভরে আসে শেষে জলে
মায়ার মাতৃমন বেদনায় কেঁদে ফেলে

দুইটি শিশু দাঁড়িয়ে আছে বৃক্ষছায়
নীরব চোখে আমায় শুধু দেখেই যায়
অন্ন জোটে সপ্তাহেতে একটি বার
দুধের গুঁড়ো ক্লান্ত শিশু চায় না তার!

সব্জিবিহীন অন্ন খেয়েই কাটছে দিন।
সপ্তাহেতে তিনটি দিনই অন্নহীন
দুধের ছেলে করছে উপোষ মৃতপ্রায়
যা কিছু খায় করছে বমি যন্ত্রণায়।

সামনে আমার কাঁদছিল মা অন্ন চাই,
বাংলা ভাষায় ডাক দিল কে 'শুনুন ভাই'
পরিচয়ের পত্র ছেড়া মাটির গায়
ক্যাম্প অফিসের দ্বারে স্বামী দাঁড়িয়ে ঠায়।

খেলছে শিশু বানের পানি চারটি ধার
শেষ হয়েছে দেবে না আজ খাদ্য আর
আমার ব্যাগে পয়সা–একি আমার পাপ
শিশুর চোখে দেখছি মোদের মৃত্যুশাপ।

হাজার বালক লাইন দিয়েছে একটি ধার
খাদ্য দেবে প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে তার
হল্লা কিছু করছে ছেলে নিরন্তর
উঁচিয়ে লাঠি ছুটছে পুলিশ ক্রুদ্ধস্বর।

লাইন ভেঙে ঝাঁপ দিয়ে ঢুকে পড়ে
বৃত্তমধ্যে কোনো এক চর্মসার গরু
মাটির মঞ্চে সমতালে নাচে দুই ভাই
বাঁশি বাজিয়ে তাদের তাড়া করে প্রহরীর দল

এমনি করে দাঁড়িয়ে এ কোন শিশুর দল
হল্লা করে দিচ্ছে কিউ ঝড়বাদল
মাথায় নিয়ে কান্না হাসির মাঝখানে।
খাদ্য কেন হচ্ছে দেওয়া এইখানে।

অফিস থেকে বেরিয়ে এলো একটি লোক
হাজার বালক দেখল চেয়ে কী উৎসুক
প্রার্থনা এ? 'আজ আর কোনো খাদ্য নাই'
হল্লা করে হাজার ছেলে লক্ষ ভাই।

ছুটল সবাই তাঁবুর ঘরে প্রতীক্ষায়
বসেই আছেন মাতাপিতা একটি ঠায়
কঠিন খবর ছুঁড়ল ছেলে—খাদ্য শেষ
রুগ্ন শিশু চমকে ওঠে জীর্ণ বেশ।

অপুষ্টি অনেক মাস হাড়গুলো বের করে,
আমাশয় মুহূর্তে পেটটাকে ফাঁকা করে
রোগের নাম নার্স দেখায় কার্ড থেকে, এনটেরোস্ট্রেপ
সিরাপ নেই, বিকল্পে চলতে পারে ক্লোরোস্ট্রেপ

মাতার কোলে নবজাতক শিশুর শব
অদ্ভুত সব রোগে এখন ভুগছে সব
দুঃখশোকের মদ গিলে আজ সব মাতাল
শরণার্থী শিবিরটাই তো হাসপাতাল।

সেপ্টেম্বর যশোরের সড়কে রিকসাতে
একটি মাত্র তাবুতে পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোক
বাঁশের ঘর সারিসারি বন্যাতে
খোলা নালা, জবজবে বসে আছে, খাবার চাই

সীমান্তে আজ বানের পানি তা থৈ থৈ
সব ডুবেছে, খাদ্য দেবে পথটা কৈ?
মার্কিন সব দেবতারা কোথায় আজ?
বিমান থেকে শিশুর গায়ে ছুঁড়ছে বাজ?

মার্কিনি সাহায্যের বিমান কই উড়ছে গো?
ব্যাঙ্ককের সবুজে চালান দেয় মাদক সব।
মার্কিনের বিমানের আলোকের বহর কই?
সারা বেলা ফেলছে কী বোমাগুলো লাওসে?

রাষ্ট্রপতি, কোথায় তোমার সৈন্যদল?
বিমানবহর নৌবাহিনী অর্থবল?
তারা কী আজ খাদ্য ওষুধ আনতে চায়?
ফেলছে বোমা ভিয়েতনামে নিঃসহায়?

মোদের চোখের অশ্রু কই? এ-ব্যথায় কাঁদছে কে?
বৃষ্টিতে সব যাবে কোথায়?
যশোর রোডের শিশুরা করছে বন্ধ চোখ বড় বড়–
মরলে বাপ, আমরা সব ঘুমুতে পাব কোথায়?

কার কাছে পাতবো হাত চালের জন্যে দু-মুঠো?
বানভাসি এ গর্তে কে আনবে রুটি টুকরো এক?
বৃষ্টিতে ভিজছে একা লক্ষ শিশু!
বেদনায় কাঁদছে তারা লক্ষ শিশু!

তাদের দুঃখে তোলো আওয়াজ পৃথিবীর কণ্ঠসব
অজানা কণ্ঠ হোক, ভালোবাসার তোলো আওয়াজ
তোলো আওয়াজ বৈদ্যুতিক বেদনার ঘন্টাতে
তোলো আওয়াজ সচেতন মার্কিনি মগজে।

হারিয়ে যাচ্ছি আমরা কত শিশু জন
হচ্ছে ভূত দেখতে পাই কোন পিতার কন্যারা?
যত্ন নেই– কী রকম আত্মা সব আমাদের?
সংগীতে তোলো আওয়াজ, সাহসে কান্নাকে

ভাঙা ঘরের পাশে বসে বৃষ্টিতে নর্দমায় কান্নারা
ভেজা মাটি বৃষ্টিতে কী বিশাল পাইপে যায় নিদ্রাটি
বসে আছে চাপকলের কাছটিতে, পরোয়া কী পৃথিবীর!
মার বুকে কুঁকড়ে যে-শিশুরা উপোষ দেয়

অতীতে এরূপই আচরণ করেছি কী নিজেকে?
কী করব– প্রশ্ন করি সুনীল কবিকে
চলে যাব, ত্যাগ করে, পয়সা দুটো না দিয়ে?
নিজের জন্যে আর কত করব এই পরোয়া?

নগরী আর গাড়িকে করব কী পরোয়া?
মঙ্গল ও – গ্রহটিতে পা রেখে কিনব কি?
নিউইয়র্কে কত অযুত মানুষেরা বসে-বসে
শুয়রের মাংস আর হাড় গেলে টেবিলে?

জননীর সমুদ্রে কত অযুত বিয়ার ক্যান
ছোঁড়ে তারা? কত বেশি দাম তারই?
সিগার আর গ্যাসোলিনে, অ্যাসফল্ট গাড়ি নিয়ে খোয়াবে
পচাচ্ছে পৃথিবী, বানাচ্ছে তারাদের কী ম্লান যে

শেষ কর বক্ষেরই ভেতরে যুদ্ধ যে দীর্ঘ এক নিঃশ্বাসে
অশ্রুজলের স্বাদ নিতে চলে এসো চোখ মেলে মানবিক
চোখে দেখা অযুত-এ ভূতগুলো পাক তোমার করুণা
পৃথিবী টিভি-তে সংসারে উপবাসী

হে প্রভু, দেখ তুমি আমাদের কল্যাণী মাতাদের সম্মুখে
শিশু আরো কত অযুত প্রাণ হারায়?
কত-কত সুপিতা খাজনা দেয় সেনাদের বাহিনী
পুনরায় গড়ে নিতে, গৌরব যা করে শিশু হত্যাতে?

মায়া-র মধ্যে হেঁটে যায় কত প্রাণ বেদনায়,
কত শিশু প্রতারক বৃষ্টিতে?
পরিবার কতগুলো শূন্য চোখ হারিয়ে যায়?
কতজন দাদীমা ভূত বনে?

কতজন ভালোবাসার রুটি নেই চিরদিনই?
কতজন খালা-ফুফীর মস্তকে ফুঁটো বেজায়?
কত বোনের খুলি গড়ায় মাটিতে?
কত দাদু চিরনীরব হয়ে যায়?

কত বাবা দুঃখে রয়?
কত ছেলে নিরাশ্রয়?
কত মেয়ে উপবাসী?
কত চাচা হাঁটু ফুলে পড়ে রয়?

লক্ষ শিশু বেদনায়
লক্ষ মা বৃষ্টিতে
লক্ষ ভাই দুঃখে শেষ
লক্ষ শিশু নিরাশ্রয়

নিউইয়র্ক, নভেম্বর ১৪-১৬, ১৯৭১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ একাত্তরে বাংলাদেশে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞ ও ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের স্বচক্ষে দেখে 'যশোর রোডে সেপ্টেম্বর' নামে একটি মর্মস্পর্শী দীর্ঘ কবিতা লিখে বাংলাদেশের মর্মন্তুদ বিভীষিকাময় জঘন্য সংবাদ বিশ্বসম্প্রদায়ের সামনে তাঁর নিপুণ হাতে তুলে ধরেন।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি কলকাতাসংলগ্ন ভারতীয় সীমান্ত ধরে বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চলে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

স্মরণযোগ্য যে, বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে অর্থ সহায়তা করার জন্যে তিনি বিশিষ্ট রুশ কবি ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কোর-এর সঙ্গে একটি যৌথ কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছিলেন।

আরো উল্লেখ্য যে, অ্যালেন গিন্সবার্গ তাঁর এই বিখ্যাত কবিতাটি নিজেই সুর দিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে বহুবার তিনি গেয়েছেন । বর্তমানে উক্ত গানটি আমরা মৌসুমী ভৌমিকের কণ্ঠে অডিও ক্যাসেটে শুনতে পাই।

কবিতাটির অংশবিশেষ অকালপ্রয়াত তরুণ কবি খান মোহাম্মদ ফারাবি এবং বাকি অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন।

নিম্নে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধাকালীন কবিতাটির বিশেষ অবদান উল্লেখিত

পোস্টার : আর. কে. যোশী কর্তৃক পরিকল্পিত।
মোহন মুদ্রণালয়, এ্যাকমি এস্টেট, সিউরি পূর্ব, '৭১-এর নভেম্বরে বোম্বে থেকে অশোক শাহানি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মূল্য–যার পক্ষে যতটা প্রদান করা সম্ভব। প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশ শরণার্থীদের পুনর্বাসনে ব্যয় করা হবে।
সূত্র : *মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর*, ৫ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. *গীতবিতান* (অখণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
২. *নজরুল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ২৫ মে ১৯৯৬
৩. *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, সেলিম রেজা সম্পাদিত, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
৪. *স্বাধীনতা দিবসের গান*, মোস্তফা জামান আব্বাসী সম্পাদিত, বাংলাদেশ লোকসংগীত সমিতি, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ : ১৭ মার্চ ১৯৭২
৫. *গণসংগীত স্বরলিপি*, সংকলন ও সম্পাদন : বুদ্ধদেব রায় ও সুব্রত রুদ্র, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৭
৬. *মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের নির্বাচিত গানের স্বরলিপি*, স্বরলিপি সংকলন ও সম্পাদনা : মকবুল হোসেন, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪০৪
৭. বিপ্লব দে সম্পাদিত *জনপ্রিয় সংগীত সংকলন, ঢাকা*
৮. *বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমের গান*, সম্পাদনা : আখতার হুসেন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০০১

ঐতিহাসিক দলিলপত্র

লাহোর প্রস্তাব, ২৩ মার্চ ১৯৪০

১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে মোহাম্মদ আলি জিন্নার সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশন শুরু হয়। ২৩ মার্চ তারিখের অধিবেশনে শের-এ বাংলা এ কে ফজলুল হকের মাধ্যমে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক রূপ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। এর মূল কথা হলো ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন অঞ্চলগুলির যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলিকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এই অঞ্চলগুলি পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, শুল্ক প্রভৃতি বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে। সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে এই প্রস্তাবকে 'লাহোর প্রস্তাব' (Lahore Resolution) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তখনো পর্যন্ত 'পাকিস্তান' কথাটির উল্লেখ ছিল না। তবে সম্মেলনের পরপরই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ নিয়ে একে অপরকে দায়ী, চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজ নিজ অবস্থান সংহত করতে সচেষ্ট হন। নেতৃবৃন্দের কূটবিতর্কের আড়ালে সাম্প্রদায়িক বিভক্তিই বৃদ্ধি পায়। জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভক্তির প্রস্তাব কৃত্রিম পাকিস্তান সৃষ্টির পথ রচনা করে। – সম্পাদনা পরিষদ

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশনে গৃহীত এবং সাধারণভাবে পরিচিত **'পাকিস্তান প্রস্তাব'টি** নিম্নরূপ :

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এই অধিবেশন সংবিধান প্রশ্নে ১৯৩৯ সালের ২৭ আগস্ট, ১৭ এবং ১৮ সেপ্টেম্বর, ২২ অক্টোবর এবং ১৯৪০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল এবং ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাকে অনুমোদন এবং সমর্থন করছে। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এই অধিবেশন জোর দিয়ে পুনর্ব্যক্ত করছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বিবৃত ফেডারেশন পরিকল্পনা এই দেশের বিশিষ্ট অবস্থার সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং অচল, এবং মুসলিম ভারতের নিকট অগ্রহণযোগ্য।

এই অধিবেশন আরও জোর মতো লিপিবদ্ধ করছে যে, মহান সরকারের পক্ষে ১৯৩৯ সালের ১৮ অক্টোবর ভাইসরয় কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণায় যদিও বলা হয়েছে যে, ১৯৩৯ সালের ভারত শাসন আইন যে পরিকল্পনা ও নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে পুনর্বিবেচিত হবে, কিন্তু গোটা সাংবিধানিক পরিকল্পনা নতুনভাবে পুনর্বিবেচিত না হলে মুসলিম ভারত সন্তুষ্ট হবে না, এবং তাদের অনুমোদন এবং সম্মতি নিয়ে গঠিত না হলে কোন সংশোধিত পরিকল্পনা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুবিবেচিত মতো হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত মৌল-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনা এ দেশে কার্যকর এবং মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এই মৌল-নীতি হলো : ভৌগোলিকভাবে নিকটবর্তী রাজ্যগুলোকে অঞ্চলে বিভক্ত করা হবে, এমনভাবে সেগুলো পুনর্গঠিত হবে, যে-এলাকাগুলোয় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলে, সেগুলোকে একত্র ক'রে 'স্বাধীন রাষ্ট্র' গঠন করা হবে, যাদের উপাদান-রাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম।

এই অঞ্চল এবং রাজ্যগুলোর সংবিধানে সংখ্যালঘুদের জন্যে পর্যাপ্ত, কার্যকর এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক নিরাপত্তা বিশেষভাবে প্রদান করতে হবে–তাঁদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার রক্ষার জন্য, তাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে। এবং ভারতের অন্যান্য অংশে, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সেখানে সংবিধানে মুসলমান এবং অন্য সংখ্যালঘুদের জন্যে কার্যকর এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক নিরাপত্তা বিশেষভাবে দিতে হবে, তাঁদের সাথে আলোচনাক্রমে, তাঁদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য।

এই অধিবেশন ওয়ার্কিং কমিটিকে এই সব মৌলিক নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে সংবিধানের একটি পরিকল্পনা তৈরির অধিকার দিচ্ছে, যাতে করে নিজ-নিজ অঞ্চল শেষ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়, যোগাযোগ, রাজস্ব এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য সকল ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে।

প্রস্তাব পেশ করেন : সম্মানিত মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

সমর্থন করেন : চৌধুরী খালিকুজ্জামান, এম. এল. এ. (ইউ.পি.)

অন্য সমর্থনকারী : মৌলানা জাফর আলি খান, এম. এল. এ. (সেন্ট্রাল)

: সরদার আওরঙ্গজেব খান, এম. এল. এ. (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)

: হাজী স্যার আবদুল হারুন, এম. এল. এ. (সেন্ট্রাল)

: কে বি নওয়াব ইসমাইল খান, এম. এল. সি. (বিহার)

: কাজী মোহাম্মদ ঈসা খাঁন, সভাপতি, বেলুচিস্তান প্রদেশিক মুসলিম লীগ

: আবদুল হামেদ খান, এম. এল. এ. (মাদ্রাজ)

: আই আই চুন্দ্রিগর, এম. এল. এ. (বোম্বাই)

: সৈয়দ আবদুর রউফ শাহ, এম. এল. এ. (সি. পি.)

: ড. মোহাম্মেদ আলম, এম. এল. এ. (পাঞ্জাব)

: সৈয়দ জাকির আলি, (ইউ. পি.)

: বেগম সাহিবা মৌলানা মোহাম্মদ আলি

: মৌলানা আবদুল হামিদ কাদরী, (ইউ. পি.)

ভাষান্তর : ড. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২ ও ৩ (আরও দেখুন : *পাকিস্তান মুভমেন্ট- হিস্টরিক ডকুমেন্টস*, পৃ. ১৭২)

যুক্তফ্রন্ট ও একুশ-দফা, ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের মোকাবিলা করার জন্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল।

ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের উক্ত কাউন্সিল অধিবেশন কেবলমাত্র 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্তের জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, ওই কাউন্সিল অধিবেশনেই ঐতিহাসিক একুশ-দফা গৃহীত হয়েছিল।

১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকার তা বিলম্বিত করছিল। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবিতে সরকার নিজেদের জয় সম্পর্কে আস্থাহীন হয়ে উক্ত নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা শুরু করে। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের নির্বাচনী ধারায় সংশোধনী আনয়ন করে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন ধার্য করা হয়। মুসলিম লীগকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নিজামই ইসলামী ও বাম গণতন্ত্রী পার্টি এই চারটি দল মিলিতভাবে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর 'যুক্তফ্রন্ট' আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

নির্বাচনে 'নৌকা'কে প্রতীক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং এই অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একুশ-দফা গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঐতিহাসিক একুশ-দফার পটভূমি এভাবেই রচিত হয়েছিল। 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনে ও নির্বাচনে জয়লাভে তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও কঠোর সাংগঠনিক তৎপরতা স্মরণীয়। – সম্পাদনা পরিষদ

একুশ-দফা

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষিদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির-শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র এক যোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারীর ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনা বিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাঁহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্ব দান করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার-বাহিনীকে স্বতন্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৪(১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে যুক্তফ্রন্ট প্রচার দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত)

বাঙালির মুক্তিসনদ ঐতিহাসিক ছয়-দফা, ১৯৬৬

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনফারেন্সে পূর্ববাংলার স্বাধিকার এবং সায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত ছয়-দফা উত্থাপন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এ পর্যায়ে তিনি ওই লাহোরেই ৫ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলন করে ছয়-দফা প্রচার করে ঢাকায় ফিরে আসেন। ১৯৬৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে উক্ত ছয়-দফা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনা থেকেই পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হিসেবে বিবেচিত করার বিষয়টি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। বিশেষত ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সঙ্ঘটিত পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি মোটেও দৃষ্টি দেয় নি, পূর্ববাংলা তখন খুবই অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। তা ছাড়া ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২), ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি, মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র অভিনব পন্থার উদ্ভাবন, এবং অবশেষে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের নিদারুণ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে ছয়-দফার মতো ঐতিহাসিক কর্মসূচি প্রণয়নের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করতে হয়েছে। – সম্পাদনা পরিষদ

ছয়-দফা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তিসনদ ঐতিহাসিক ছয়-দফা ঘোষণা করেন লাহোর, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

১. **শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি**
দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং এর ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের। আইন পরিষদের (Legislatures) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম। এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

২. **কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা**
কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে–যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

৩. **মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা**
মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুটির যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে :

ক. সমগ্র দেশের জন্যে দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা

খ. বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে কেবল একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

৪. **রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা**

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সবরকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

৫. **বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক ক্ষমতা**

ক. ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

খ. বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকবে।

গ. কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মেটাবে।

ঘ. অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা-নিষেধ থাকবে না।

ঙ. শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৬. **আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা**

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

সূত্র : *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যালবাম*, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, রাস্তা ৩২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশকাল : ১ আগস্ট ১৯৯৭

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের এগার-দফা, ১৯৬৯

পাকিস্তানকালে জাতীয় রাজনীতিতে অগ্রসর এবং সংঘবদ্ধগোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র সমাজ যে কোন আন্দোলনে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৪৮-'৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং অবশেষে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের এগার-দফা আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৬৬ সালে ছয়-দফা ভিত্তিক আন্দোলনেও ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হলে ছাত্র সমাজ আবার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু), ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের ঘোষণা দেন এবং এতে ডাকসুর সহ-সভাপতি, তোফায়েল আহমেদ (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ); ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক, নাজিম কামরান চৌধুরী (জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন); আবদুর রউফ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ; খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ; সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া); সামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া); মোস্তফা জামাল হায়দার, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন); দীপা দত্ত, সহ-সম্পাদিকা, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) স্বাক্ষর করেন। তবে উক্ত সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার আগেই এগার-দফা প্রণীত হয়। উল্লেখ্য ছাত্র সমাজের এগার-দফার মধ্যে ছয়-দফাও অন্তর্ভুক্ত হয়। – সম্পাদনা পরিষদ

এগার-দফা

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘ দিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে-শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র-জনতা ছাত্র-গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত এগার-দফার দাবিতে ব্যাপক ছাত্র-গণআন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি :

১. ক. সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

খ. শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়েল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

গ. প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই এ, আই এস সি, আই কম ও বি এ, বি এস সি, বি কম, এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এম এ ও এম কম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

ঘ. ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

ঙ. হল, হোস্টেলের ডাইনিং ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

চ. হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ছ. মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলাভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

জ. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিত হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাইতে হইবে।

ঝ. মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল আর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ঞ. প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাশ দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ট. পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

ঠ. টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই.ই.আর. ছাত্রদের দশ-দফা; সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম.বি.এ. ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

ড. কৃষিবিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষিডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ঢ. ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেসনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকেটেও এই 'কন্সেসন' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেরও শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধা-সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে।

ণ. চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

ত. কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

থ. শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩. নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে :

ক. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

খ. ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

গ. দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঘ. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের

আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

ঙ. ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

চ. পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদরদপ্তর স্থাপন করিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করত সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোটবহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে

আবদুর রউফ
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

খালেদ মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

সাইফুদ্দিন আহমেদ
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

সামসুদ্দোহা
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

মোস্তফা জামাল হায়দার
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

দীপা দত্ত
সহ-সম্পাদিকা
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

তোফায়েল আহমেদ
সহ-সভাপতি
ডাকসু।

নাজিম কামরান চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
ডাকসু।

সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৫-৪০৮(১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত এগার দফার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান সংবলিত সংগ্রামী ছাত্র সমাজের প্রচারপত্র)

স্বাধীনতার ঘোষণা

ঢাকা, ২৬ মার্চ ১৯৭১

পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা, ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

শেখ মুজিবুর রহমান

২৬ মার্চ ১৯৭১

সূত্র : *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যালবাম*, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, রাস্তা ৩২, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১ আগস্ট ১৯৯৭

DECLARATION OF INDEPENDENCE

Dhaka, 26 March 1971

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

[Message embodying Declaration of Independence sent by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to Chittagong shortly after midnight of 25th March, i.e. early hours of 26th March, 1971 for transmission throughout Bangladesh over the ex-EPR transmitter.]

সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১ (স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র হতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা। বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা- *"বঙ্গবন্ধু স্পিক্‌স"*)

*স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত)

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সঙ্ঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের

*১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে ইংরেজিতে প্রণীত Proclamation of Independece মুজিবনগরে ঘোষিত ও জারিকৃত এবং ২৩ মে, ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থ, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদররূপে গঠন করিলাম,

এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপন ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবীকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্দ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমন্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

সূত্র : পরিশিষ্ট ১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০০ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সংশোধিত

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকার
একটি সংখ্যার (৩ ডিসেম্বর ১৯৭১) প্রথম পৃষ্ঠা

চারটি জেলা মুক্ত

সকল রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি

যশোর দুর্গের মুক্তি আসন্ন

সোহরাওয়ার্দীর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে

—প্রধানমন্ত্রী

আজাদের অভিযানে যে গৌরব—অর্জন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এক মুক্তিবাহিনী উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ এক বাণীতে বলেন :

"স্বাধিকারের এক অবিস্মরণীয় প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলা দেশের অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের অগ্রদূত জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন মুক্তিবাহিনী আমাদের এই বিশ্বের দেশের সর্বত্র শান্তির প্রাণ হয়েছে। শান্তির পাকিস্তানী, পাকিস্তানীরা সকল প্রকারের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ একমাত্রাজন্মদাতা বিশ্বাস, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সোহরাওয়ার্দীর আহমেদ ও দেশবাসীর নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য

(১৬-এর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

[জয়বাংলার প্রতিবেদক]

বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসেবে কামানের গোলাবর্ষণ শক্তি আরেক মুক্তি করার জন্য কামানেরগুলী ও কামানের সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযানে, রাজশাহী ও পাবনা জেলা কার্যতঃ মুক্ত হয়েছে। আসন্নদিকে মুক্তিবাহিনী টাঙ্গাইল জেলার শত্রুকবল মুক্ত করেছেন।

সম্প্রতিকে বাংলাদেশে দ্বিতীয় ফ্রন্টের ও পাকিস্তানী হানাদার কামানেরগুলোর পতন আসছে। মুক্তিবাহিনী রাজধানী থেকে হানাদার কামানেরগুলোকে নিয়ে যেতেছে এবং ঘাঁটির ও আবাস থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছেন।

ঢাকার সাথে হানাদার কামানেরগুলোর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। কাল রাত্রের থেকে শত্রু বাহিনীর ঢাকার বা সড়কপথ সাতের পথ কার্যতঃ বন্ধ হয়ার পথে। অধিক তুলনা ও

(১৬-এর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইন্দিরা গান্ধীর পর বঙ্গবন্ধু মোজিবুর রেহমান বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন

ইন্দিরার দাবী

হানাদার হটাও

"বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানের হানাদারদের পাকিস্তানকে বাংলাদেশ থেকে সসম্মান বৈধ সরিয়ে নিতে হবে এবং সেইটের হবে শান্তির সাথে প্রকৃত সমাধান।" গত ৪৮শে নভেম্বর বাংলাদেশের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে প্রশ্নের

প্রধান সেনাপতির প্রত্যয়

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্ণেল উসমানী সরকারের মুখপাত্র জেলার বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের পরে এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশের পবিত্র ভূমি থেকে শত্রু হানাদারদের বিদায় ও সম্পূর্ণ বিশিষ্ট হওয়ার দিন এসে গেছে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তানী হানা (বিশেষত হানা) আরেক ও বাংলাদেশের জনগণের হাত সরকার হানা। আর আরেক ও বাংলাদেশের জনগণ যে ঘটনার অন্তরায় কার্যতঃ মুক্ত ও স্বাধীন জীবন যাত্রা মুক্তির পাবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চয়তা।"

(বেজিঃ নং ১) (বাংলাদেশ সরকার)

দাম : ২৫ পয়সা

জয়বাংলা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

১ম বর্ষ ৫০শ সংখ্যা, মুক্তিসনাম, শুক্রবার ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিশুদের আদর করছেন

'অশুভ পরিণতির জন্য প্রেরকরাই দায়ী থাকবেন'

বাংলাদেশে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক প্রেরণের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের হুঁশিয়ারী

[জয়বাংলা প্রতিবেদক]

১৩ অক্টোবর কাতারী হকারে কর্মী নামক ইন্দোনেশিয়া শাসনের অনুরোধে বাংলাদেশে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক প্রেরণের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক প্রেরণের প্রস্তাবটি "একটি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র" বলে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন "এটা হচ্ছে সেনাদের দুরভি নিয়ে সাম্রাজ্যিক চক্রের ষড়যন্ত্র একটি

(১৬-এর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রসনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর নিকট ৯১,৫৪৯ জন সৈন্যসহ আত্মসমর্পণের পর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক দলিল

INSTRUMENT OF SURRENDER SIGNED AT DACCA AT 1631 HOURS (IST) ON 16 DEC 1971

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

Jagjit Singh

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

AAK Niazi Lt Gen

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

সূত্র : সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা, একটি জাতির জন্ম, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এফ আর জেকব, আনিসুর রহমান অনূদিত, ইউপিএল, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯২০

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে (বর্তমানে থানা) এক অভিজাত মুসলিম শেখ পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও শেখ সাহারা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিব। বাবা-মা আদর করে ডাকতেন 'খোকা'। খোকার শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায়।

১৯২৭

৭ বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন।

১৯৩৪

১৪ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর একটি চোখ কলকাতায় অপারেশন করা হয় এবং চক্ষুরোগের কারণে তাঁর লেখাপড়ায় সাময়িক বিরতি ঘটে।

১৯৩৭

চক্ষুরোগে চার বছর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়ার পর শেখ মুজিব পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন।

১৯৩৮

১৮ বছর বয়সে শেখ মুজিব ও বেগম ফজিলাতুন্নেসার (রেণু) আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়। তাঁরা দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলের জনক-জননী।

১৯৩৯

অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-এ বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং শিক্ষামন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শনে এলে স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি পড়া সারাবার জন্য ও ছাত্রাবাসের দাবি স্কুল ছাত্রদের পক্ষ থেকে তুলে ধরেন ওই স্কুলের ছাত্র শেখ মুজিব।

১৯৪০

শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাঁকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।

১৯৪২

শেখ মুজিব এন্ট্রেন্স (এস এস সি) পাস করেন। অতঃপর তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। এই বছরেই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৩

এ বছর শেখ মুজিব সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

১৯৪৪

শেখ মুজিব কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সম্মেলনে যোগদান এবং গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেন। কলকাতাস্থ ফরিদপুরবাসীদের একটি সংস্থা 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি।

১৯৪৬

শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জি এস) নির্বাচিত হন।

১৯৪৭

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান বি এ পাশ করেন। ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে কলকাতায় দাঙ্গা প্রতিরোধ তৎপরতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশ ভাগের কয়েকদিন পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন।

২৮ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব ও ফজিলাতুন্নেসার প্রথম সন্তান শেখ হাসিনার জন্ম হয়।

১৯৪৮

৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্র লীগ প্রতিষ্ঠায় তিনি সবিশেষ ভূমিকা রাখেন। ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে। ২৫ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ঘোষণা দেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত।' খাজা নাজিম উদ্দিনের এই বক্তব্যে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব মুসলিম লীগের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কর্মতৎপরতা শুরু করেন। ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি যোগাযোগ করেন।

২ মার্চ ভাষা প্রশ্নে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে শেখ মুজিবের প্রস্তাবক্রমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলাভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। ১১ মার্চ বাংলাভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিব ৬৯ জন সহকর্মীদের সাথে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। শেখ মুজিবসহ ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তারে সারা দেশের ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে এই শুরু হয় শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার হওয়া ও কারাভোগ জীবন। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে শেখ মুজিবসহ গ্রেপ্তারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তিনি ১৫ মার্চ মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র-জনতার এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন। সভাশেষে ছাত্রদের শোভাযাত্রা প্রাদেশিক পরিষদ অভিমুখে অগ্রসর হয়। প্রধানমন্ত্রী পেছনের দরজা দিয়ে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন। ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর পুলিশ হামলা করে। তার প্রতিবাদে ১৭ মার্চে ঢাকায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৪৯-১৯৫১

২১ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান কারাগার থেকে মুক্তি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে শেখ মুজিব ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৭ জন ছাত্রকে নানা শাস্তি দেয়। শেখ মুজিবের হয় ১৫ টাকা জরিমানা। ১৭ এপ্রিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি শেষ হলে এই নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় যে, ক্ষমা চাইলে শাস্তি মাফ হবে। কিন্তু শেখ মুজিব ও আরো পাঁচ জন এই রকম মুচলেকা দিতে অস্বীকার করেন। শেখ মুজিব এরপর আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃপ্রবেশ করলেন না। ১৯ এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার কারণে তিনি গ্রেপ্তার হন।

২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান এ দলের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই মাসের শেষের দিকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

জেল থেকে বেরিয়েই দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তিলাভ করেন। দেশে বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলিম

লীগ জোর আওয়াজ তোলে। ১৪ অক্টোবর আরমানিটোলা ময়দানে এক প্রতিবাদ সভায় নেতাদের ধর-পাকড় শুরু হয়। শেখ মুজিব গ্রেপ্তার এড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নির্দেশে পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করে দুই মাস সেখানে জাতীয় নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন।

১৯৫০ সালের নববর্ষে তিনি পূর্ববাংলায় প্রত্যাবর্তন করলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি পূর্ববাংলা নিরাপত্তা আইনে কারাবন্দি থাকেন।

১৯৫২

২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিম উদ্দিন ঘোষণা করেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। শেখ মুজিব তখন ঢাকা জেলে বন্দি। ফেব্রুয়ারিতে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য ছিলেন। সেখানে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সুযোগ হয় এবং তিনি এই ঘোষণার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে উৎসাহ দেন। ছাত্রদের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত বিক্ষোভের সমর্থনে এবং জেলের অন্যান্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অনশন ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। এই উদ্যোগে তাঁর সহযোগী হন আর এক রাজবন্দি পিরোজপুরের মহিউদ্দিন আহমদ। ১৬ তারিখ এই দুই রাজবন্দিকে ঢাকা থেকে ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে ১৭ ফেব্রুয়ারিতে তারা অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলে বন্দি রাজনৈতিক নেতাকর্মী যথাক্রমে নেপাল সাহা, ডা. মারুফ হোসেন, চুনিলাল চক্রবর্তী, সত্যমিত্র এবং পুর্ণেন্দু দে কানুনগো অনশনে যোগদান করলে পাকিস্তান সরকার বেকায়দায় পড়ে যায়। তখন ডাক্তারি পরীক্ষায় উভয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারকে প্রতিবেদন দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়ায় জনমনে সরকারের প্রতি ক্ষোভ বেড়ে যাওয়ায় সরকার ২৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমদকে মুক্তির ঘোষণা দেয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে শেখ মুজিব ফরিদপুর জেল থেকে ছাড়া পান।

২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ অনেকে শহীদ হন।

২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২২ তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দারাবাদ থেকে এর নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন। তবে তিনি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর দাবি সমর্থন করেন। এই অবস্থান আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। জুন মাসে শেখ মুজিব সুস্থ হওয়ার পর করাচিতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে এই বিষয়ে বোঝাপড়া করেন এবং সোহরাওয়ার্দী তার মত পরিবর্তন করে বাংলাভাষার দাবি সমর্থন করে বিবৃতি দেন যা সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে ২৯ জুন প্রকাশিত হয়।

ডিসেম্বর মাসে শেখ মুজিব পিকিং-এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯৫৩

৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমান দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পাকিস্তান গণপরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী, শের-এ বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা হয়। এই লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর দলের বিশেষ কাউন্সিল ডাকা হয় এবং এতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় ও ২০ ডিসেম্বরে একুশ-দফা ইশতেহার গৃহীত হয়।

১৯৫৪

৭ ও ৮ মার্চ প্রথম প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি আসন। গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৫ মে তিনি প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্বলাভ করেন। ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। ৩০ মে শেখ মুজিবুর রহমান করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৫৫

৫ জুন শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়।

২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন।

২৫ আগস্ট পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রতিষ্ঠা বিষয়ক বিল সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। 'পূর্ববাংলা' নামটি বিসর্জন দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণে তিনি জোর আপত্তি করেন। একই সঙ্গে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিব দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহারের প্রস্তাব পেশ করলে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬

২৯ ফেব্রুয়ারিতে শাসনতন্ত্র বিল গণপরিষদে পাশ হয়। আওয়ামী লীগ এই বিলের পক্ষে ভোট দিতে বিরত থাকে এবং আরো ১১ জন সদস্যসহ আওয়ামী লীগের ১৩ জন সদস্য ওয়াক আউট করেন। তাদের আপত্তি ছিল চারটি বিষয়ে ১. জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যায় প্যারিটি নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অর্থনীতি, প্রশাসন বা সামরিক বাহিনীতে এই নীতির বাস্তবায়নের পক্ষে কোন বিধান রাখা হয় নি। ২. রাষ্ট্রপতির স্ববিবেচনার ক্ষেত্র হয় বৃহৎ এবং এত ক্ষমতা সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী ছিল, ৩. যুক্ত নির্বাচনের বিষয়টি ঝুলে থাকে এবং ৪. শাসনতন্ত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে অবহেলা করে।

১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি আনেন শেখ মুজিব।

৪ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিহত হয়।

কয়েকদিনের জন্য সেপ্টেম্বরেই তিনি স্টকহোমে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দেন এবং লন্ডন ভ্রমণ করেন।

কে এস পি'র আবু হোসেন সরকার খাদ্য সমস্যা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে তার সমর্থনও দুর্বল ছিল। তাই ৬ সেপ্টেম্বর কে এস পি সরকারের পরিবর্তে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বলাভ করেন।

১৯৫৭ ও ১৯৫৮

৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় কাগমারিতে এবং একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল সাংস্কৃতিক সম্মেলন। কাউন্সিলে বিদেশ-নীতি নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় ও স্বল্পদিনের মধ্যেই মওলানা ভাসানী সভাপতি হিসেবে পদত্যাগ করেন। জুলাই মাসে তিনি নূতন দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব তখন বর্তে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের উপর।

৩০ মে দলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, একই ব্যক্তি এক সঙ্গে সরকার ও সংগঠনের দুটো পদে থাকতে পারবেন না। শেখ মুজিব দলকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

৭ আগস্ট তিনি চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীন সফর করেন।

এই বছর একটি বাণিজ্য মিশনের সদস্য হিসেবে তিনি দিল্লি সফর করেন।

মার্কিন লিডারশিপ প্রোগ্রামে তিনি ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে আমেরিকা সফর করেন। এই ভ্রমণকালে তিনি কিছুদিন লন্ডনে থাকেন এবং জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যও ভ্রমণ করেন।

৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা দেশে সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬১

চৌদ্দ মাস জেলে থাকার পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে সব মামলায়ই তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। তবে একটি মামলায় ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর শাস্তি হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে ১৯৬১ সালে তিনি সসম্মানে অব্যাহতি পান।

১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালে তিনি জেলের বাইরে থাকেন তবে পুলিশের নজরদারিতে তাঁকে অবস্থান করতে হয়। রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় এই সময় তিনি গোপনে রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত থাকেন। এই সময়ে তিনি আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন।

সামরিক শাসনের অধীনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকায় ও দেশের নেতৃত্বে বাঙালিদের ভূমিকা বিলুপ্ত হওয়ায় শেখ মুজিব ক্রমেই পাকিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত হন এবং স্বাধীন বাংলার ধারণা তখন থেকেই তাঁর চিন্তাধারায় শক্ত হতে থাকে।

১৯৬২

৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ২ জুন আইয়ুব খান পাকিস্তানে একটি নতুন সংবিধান প্রবর্তন করে। আইয়ুব খান চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটালেও এই অগণতান্ত্রিক সংবিধান দিয়ে তিনি স্বৈরতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করার নতুন ব্যবস্থা করেন। ১৮ জুন জেল থেকে শেখ মুজিব মুক্তিলাভ করেন। ২৫ জুন শেখ মুজিবসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ জুলাই পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিব আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব লাহোর যান, এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে শেখ মুজিব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সারা বাংলা সফর করে ব্যাপক জনসংযোগ করেন।

১৯৬৩

সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য লন্ডন যান। ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন।

১৯৬৪

২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি এবং সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সংবলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। শেখ মুজিব তখন লন্ডন সফরে যান কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তড়িৎ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ওই সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ প্রদেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে ১১ মার্চ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়।

দাঙ্গার পর আইয়ুব বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য শেখ মুজিব উদ্যোগ নেন। আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বেগম ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে সম্মিলিত বিরোধীজোট কপ গঠনে তিনি সবিশেষ ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৬

৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয়-দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ছয়-দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ।

১৮ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর রহমান ছয়-দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা পূর্ববাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাঁকে

সিলেট, যশোহর, ময়মনসিংহ ও ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বার বার গ্রেপ্তার করা হয়। শেখ মুজিব এ বছরের প্রথম তিন মাসে আট বার গ্রেপ্তার হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। এবার তিনি একনাগাড়ে প্রায় তিন বছর কারাবাস করেন।

৭ জুন শেখ মুজিব ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে এবং ছয়–দফার সমর্থনে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকার তেজগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে মনুমিয়াসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়। এই দিনই ছয়-দফা বাংলাদেশের মহাসনদে (ম্যাগনাকার্টা) পরিণত হয়।

১৯৬৮

৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে প্রহসনের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেট থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে আন্দোলন-বিক্ষোভ শুরু হয়।

১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচার কার্য শুরু হয়। শেখ মুজিব তাঁর জবানবন্দিতে যে বিবরণ তুলে ধরেন তা অত্যন্ত সাহসী, দৃঢ় ও স্বাধীনচেতা রাজনৈতিক নেতার পরিচয় বহন করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি চলাকালে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের কাহিনী আরো প্রচারিত হয় এবং একই সঙ্গে প্রকাশ পায় গ্রেপ্তারকৃত রাজসাক্ষী ও বন্দিদের প্রতি পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের নির্যাতন। নভেম্বরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিরোধী আন্দোলনই রূপান্তরিত হয় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে। এবার আইয়ুবের স্বেচ্ছাচার ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতা পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে। মওলানা ভাসানীও অবশেষে ডিসেম্বর মাসে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের প্রতি সমর্থন পরিত্যাগ করে তার বিরুদ্ধে হলেন সোচ্চার।

১৯৬৯

৫ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। একই সঙ্গে সমুদয় রাজনৈতিক দল ঢাকায় এক অধিবেশনে গঠন করে ড্যাক (Democratic Action Committee) এবং একটি আট-দফা দাবিনামা ঘোষণা করে। ১৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সারাটি ছয়-দফা অন্তর্ভুক্ত করে ঘোষণা দেয় এগার-দফা– পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক জাতীয় সনদ। সরকারি দমননীতি, ১৪৪ ধারায় নিষেধাজ্ঞা জারি, লাটিচার্জ, গুলিবর্ষণ, ধরপাকড় ও সর্বশেষে কারফিউ এই অভ্যুত্থানের মোকাবিলায় ব্যর্থ হলো। ২০ জানুয়ারিতে মোহাম্মদপুরে আসাদের শাহাদাৎ এবং ২৪ জানুয়ারির গণ-জাগরণ এই মহা-অভ্যুত্থানকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ১ ফেব্রুয়ারি তার মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যর্থতা স্বীকার করে জাতীয় সংকট সমাধানের জন্য ডাকলেন গোল-টেবিল বৈঠক। ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি শেখ মুজিবকে প্যারোলে ছাড়বার ব্যবস্থা নিলেন। কিন্তু জনতার দাবি ছিল আগরতলা মামলা খারিজ এবং শেখ মুজিব প্যারোলে বেরুতে হলেন অসম্মত। ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার হলো এবং শেখ মুজিব ৩৪ মাস পরে মুক্তি পেলেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্র-জনতার এই ঐতিহাসিক সংবর্ধনা মহাসমাবেশ অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবে সদ্য কারামুক্ত জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে **'বঙ্গবন্ধু'** উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্সের ভাষণে ছাত্রসমাজের এগার-দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

২৮ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে গোল-টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এবং ঈদ শেষে হলো কার্যকরী অধিবেশন ১০ থেকে ১৪ মার্চে। বঙ্গবন্ধু লাহোর গেলেন ৭ মার্চে ড্যাকের প্রস্তুতি সভায়।

বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ছয়-দফা ও ছাত্রসমাজের এগার-দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন, 'গণঅসন্তোষ নিরসনে ছয়-দফা ও এগার-দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।' পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয় এবং ১৪ মার্চ তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট পদ থেকে আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন।

২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন করেন।

৫ ডিসেম্বর ঢাকায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ববাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, "একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি–আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে 'পূর্ব পাকিস্তানে'র পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।"

১৯৭০

৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ছয়-দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' প্রতীক নির্ধারণ করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ২৮ অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশে বেতার–টিভি ভাষণে ছয়-দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। ১২ নভেম্বরের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে (গোর্কিতে) উপকূলীয় এলাকায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং আর্তমানবতার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র সমালোচনা জানিয়ে এর নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন। তিনি গোর্কি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহবান জানান।

৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের মহিলাসহ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে।

১৯৭১

৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ছয়-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি অনুগত থাকার শপথ গ্রহণ করেন। ৫ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তাঁর সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিন দিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান।

১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ববাংলার জনগণ।'

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহবান করা হয়। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান।

৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।" ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহবান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।" তিনি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি প্রকাশ্য হয়ে যায় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ববাংলার তথা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জনগণের মানসিক দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়।

শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার আহবান জানান তিনি। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। পূর্ববাংলার অফিস-আদালত এবং বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, স্কুল-কলেজ, রেলগাড়ি, শিল্প-কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ স্বাধীন দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দপ্তর ও রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার আগে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ট্রান্সমিটার যোগে চট্টগ্রাম ইপিআর হেড কোয়ার্টারসহ দেশের অনেক জায়গায় প্রেরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর উক্ত ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the pepole of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours."

[বঙ্গানুবাদ : 'সম্ভবত এটাই আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আহবান জানাচ্ছি, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যা-ই তোমাদের হাতে আছে তার দ্বারাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হবে। যতক্ষণ না পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ ব্যক্তি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে, তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।']

এই ঘোষণা চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের অনেক স্থানে ট্রান্সমিটারযোগে প্রেরিত হয়।

এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলায় নিম্নলিখিত একটি ঘোষণা পাঠান :

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ—দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক যোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই আহবান বেতার যন্ত্র মারফত তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারাদেশে পাঠানো হয়। রাতেই এই

বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করা হয় এবং চট্টগ্রামে সাইক্লোস্টাইল কপি করে ২৬ মার্চ জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেরণের পর পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তাঁকে বন্দি অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাস থেকেই পাকিস্তানে নিয়ে লায়ালপুর (বর্তমানে ফায়সালাবাদ) জেলে বন্দি করে রাখে।

২৬ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে।

২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি প্রথমে দুপুর বেলা একবার পাঠ করেন, সন্ধ্যার সময় কালুরঘাট বেতার উপকেন্দ্র চালু হলে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি কলেজের প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম সন্দ্বীপ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি ২৭ মার্চ অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় প্রধান মেজর জিয়াও বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার উপকেন্দ্র থেকে আরও একবার পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) এবং তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। নবগঠিত বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত ২৬ মার্চকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিবস ঘোষণা করে।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা।

১১ আগস্ট লায়ালপুর জেলের কাছে একটি সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার শুরু হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট আদালতের চারজন (আদালতের একমাত্র বেসামরিক সদস্য অনুপস্থিত থাকেন) ৪ ডিসেম্বর তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেন। তাকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে স্থানান্তর করা হয় মিয়ানওয়ালি জেলে। সেখানে গোপনে এই দণ্ডাদেশ কার্যকরী করার পদক্ষেপও নেওয়া হয়। তবে বাংলাদেশে যুদ্ধের তীব্রতার কারণে সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলা হয়, "শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই তাঁকে বন্দি করে রাখার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে।"

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়াকে পদচ্যুত করে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সামরিক শাসক নিযুক্ত করে। ভুট্টো নিউইর্য়ক থেকে প্রত্যাবর্তন করে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের মসনদে বসে ২৭ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে একটি বিশ্রামাগারে নিয়ে যান ও তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর মুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৭২

৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন পাঠানো হয়। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রা বিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছলে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত

নয়নে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৩ জানুয়ারি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার ঐতিহাসিক প্রথম বৈঠকে জাতীয় পতাকা (সংশোধিত), জাতীয় সংগীত (আমার সোনার বাংলা) ও কুচকাওয়াজ সংগীত (চল্ চল্ চল)-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৪ জানুয়ারি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঘোষণা দেন, যে-কোন বিদেশি সাহায্য শর্তহীন হতে হবে এবং তিনি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে গঠন করতে চান। ১৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ অফিসের কর্মীসভায় বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে রেসকোর্স ময়দানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘোষণা দেন। ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু সকল মুক্তিযোদ্ধাদের ১০ দিনের মধ্যে তাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভারত সফর করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, "পরিবার পিছু একশত বিঘার বেশি জমি রাখা চলবে না।" ২৬ ফেব্রুয়ারি জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধু আবেদন জানান, "নির্যাতিত মা-বোনদের সমাজে টেনে নিন।"

২৯ ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান।

১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করতে শুরু করে ১৫ মার্চে তা সম্পূর্ণ হয়। ১৯ মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্ব-স্ব দেশের পক্ষে ২৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ৩০ মার্চ বঙ্গবন্ধু বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান, "আমলা নয় মানুষ সৃষ্টি করুন।"

১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিযাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ গণপরিষদের ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অধিবেশনে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "শাসনতন্ত্রে গণঅধিকার স্বীকৃত হবে।" ১১ এপ্রিল বাংলাদেশ গণপরিষদে সংবিধান প্রনয়ন কমিটিসহ চারটি কমিটি গঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণে বলেন, "গণতন্ত্রের জন্যই বিরোধীদল থাকা উচিত।"

১ মে স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে মহান মে দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ দেন এবং এভাবেই 'মে দিবস' বাংলাদেশে জাতীয় দিবসের মর্যাদালাভ করে। জাতির উদ্দেশে এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেন।

৬ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ডাকসু বঙ্গবন্ধুকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান করেন। এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ২৪ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে।

২৪ মে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে আগত স্বাধীন বাংলাদেশে ধানমণ্ডির কবিভবনে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান বঙ্গবন্ধু। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ও দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল।

৩ নভেম্বর মস্কোর প্যাট্রিক লুমুম্বা মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভ্লাদিমির এফ স্তানিশ গণভবনে বঙ্গবন্ধুকে লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের একটি বিশেষ পদকে ভূষিত করেন।

৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে সংবিধান সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং এ দিনই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন।

২৫ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এক বিশেষ সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি প্রদান করে।

১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশে সংবিধান কার্যকর হয় এবং বঙ্গবন্ধু মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতিদানকারী বীর শহীদদের স্মরণে সাভারে "জাতীয় স্মৃতিসৌধ"-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিজয় দিবসের জনসভায় বঙ্গবন্ধু "বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সসহ সকল কলাকানুন বাতিল" ঘোষণা করেন।

১৭ ডিসেম্বর সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করেন। ২২ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু মিরপুরে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতিদানকারী বীর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে "শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ"-এর ফলক উন্মোচন করেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদি উদ্যোগ বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেন। এছাড়া মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, দুস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিট জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার জোর প্রয়াস গ্রহণ করেন।

অতি অল্প সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১৯৭৩

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩ আসন লাভ করে। ১৬ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নয়া মন্ত্রিসভা শপথগ্রহণ করেন। ৭ এপ্রিল বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ-এর ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অধিবেশনে "বলিষ্ঠ সংসদীয় ঐতিহ্য স্থাপনের সংকল্প" ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু।

২৩ মে বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু বলেন, "বিশ্বের সকল শান্তিকামী শক্তি সুসংহত হোক।"

৩ আগস্ট কানাডার রাজধানী অটাওয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমাদের শান্তির প্রতিশ্রুতি সর্বাত্মক।"

৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়।

৯ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সংহতির এবং নির্যাতিত জনগণ ও তাদের ন্যায়ের সংগ্রামের সমর্থকদের সপক্ষে।"

১৭ অক্টোবর তিনি জাপান সফরে যান।

১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সুমহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ খেতাব প্রদানের তালিকা সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

১৯৭৪

১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অনেক দেশি-বিদেশি কবি-সাহিত্যিকদের মিলনমেলা বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "মূল্যবোধের এই সংকট কাটাতেই হবে।"

২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি প্রদান করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গমন করেন এবং শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি।"

১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু কুমিল্লা সেনানিবাসে দেশের প্রথম সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।

১৬ মে দিল্লিতে বঙ্গবন্ধু ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ-ভারত ঐতিহাসিক সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

৭ জুন শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কুদরাত-এ-খোদার নিকট থেকে কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রহণ করেন।

১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এই উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আমেরিকা সফর করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ দেন। ২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শিল্পী-সংস্কৃতিসেবীদের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য দুঃস্থ শিল্পী-সংস্কৃতিসেবীদের কল্যাণার্থে সরকারিভাবে "বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন" গঠিত হয়। দেশে ব্যাপক বন্যায় ফসল উৎপাদনের বিপর্যয় ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসহযোগিতার ফলে দেশে মারাত্মক খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ফলে বঙ্গবন্ধু দেশের সার্বিক সংকট উত্তরণে জাতীয় রাজনীতির পরিবর্তনে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন।

১৯৭৫

২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জাতীয় সংসদের বিদায়ী নেতা বঙ্গবন্ধু সংসদে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ২৬ জানুয়ারি জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি ও এম মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে সতের সদস্যের মন্ত্রিপরিষদ ও নয় জন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগদান করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে মন্ত্রীদের সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে বলে যুগান্তকারী এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু নব গঠিত এই জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহবান জানান।

বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন বঙ্গবন্ধু। তাই স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন-যার লক্ষ্য ছিল-দুর্নীতি দমন, ক্ষেতে-খামারে ও কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে বঙ্গবন্ধু সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চ তৈরি করেন।

৮ মার্চ টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মওলানা মোহাম্মদ আলী সরকারি কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতেই বঙ্গবন্ধু ঘোষিত "দ্বিতীয় বিপ্লব"-এর প্রতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেন।

২২ মার্চ "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু এক অধ্যাদেশ জারি করেন।

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ অবদানের জন্য শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও বেতারকর্মীদের মধ্য থেকে বাংলাদেশের ১৮ জন ও ভারতীয় ৪ জনসহ মোট ২২ জনকে 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়।

১৮ এপ্রিল ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে ও অনুমোদনে বাংলাদেশ-ভারত পানিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশ ফারাক্কা থেকে শুষ্ক মওসুমে ৪৪ হাজার থেকে ৪৯ হাজার কিউসেক পানি প্রবাহ নিশ্চিত করে।

৩ মে জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।"

৬ জুন বঙ্গবন্ধু জাতীয় দল "বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ"-এর কার্যনির্বাহী ও কেন্দ্রীয় কমিটি এবং গঠনতন্ত্র ঘোষণা দেন।

১৯ জুন বঙ্গভবনের দরবার হলে "বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ"-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "বিদেশ হইতে আমদানি করা 'ইজম' বা 'সিস্টেম' নহে, দেশের মাটির সাথে সংযোগ রাখিয়াই শোষণহীন সমাজ গড়িব।" ২২ জুন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১ সেপ্টেম্বর থেকে দেশে নয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে ৬০টি নতুন জেলার নাম ও জেলার অন্তর্ভুক্ত

থানার নাম সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ১৬ জুলাই বঙ্গবন্ধু নব গঠিত জেলার গভর্নরদের নাম ঘোষণা করেন। ২১ জুলাই বঙ্গভবনে দরবার হলে নবনিযুক্ত গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু।

৭ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য দুঃস্থ ক্রীড়াবিদদের কল্যাণার্থে "বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন" গঠন করে সরকার।

৯ আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু চালনা বন্দরে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণার্থে "চালনা বন্দর শ্রমিক কল্যাণ তহবিল" গঠন করেন।

১৫ আগস্ট ভোরে হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩২ নং ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিশ্বাসঘাতক উচ্চাভিলাষী অফিসারের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, দ্বিতীয় পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ আবু নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, কনিষ্ঠ পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিল, পুলিশ কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান এবং কিশোর রিন্টুসহ ১৭ জনকে ঘাতকরা হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির জনক মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেওয়া হয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার।

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার থেকে রেহাই দিয়ে এক সামরিক অধ্যাদেশ জারি করে অবৈধ মোশতাক সরকার। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের কূটনৈতিক পদে নিযুক্তি দেয় জেনারেল জিয়ার সমারিক সরকার। অবশেষে ১৯৯৬ সালে দেশের প্রচলিত আইনে এই খুনিদের বিচার শুরু হয়। ১৯৯৮ সালে জেলা ও দায়রা জজ গোলাম রসুল তার রায় প্রদান করেন (আসামিদের ২০ জন জীবিত ও ৪ জন মৃত)। কিন্তু আইনি দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্বৃত্ত খালেদা-নিজামী সরকারের অনীহার কারণে বিচার প্রক্রিয়া এখনো চূড়ান্ত হয় নি।

সংযুক্তি ১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে কারাবাস

শেখ মুজিবের প্রথম কারাবাস হয় ব্রিটিশ আমলে। ১৯৩৮ সালে তিনি গোলাপগঞ্জে গ্রেপ্তার হয়ে ৭ দিন জেল খাটেন।

পাকিস্তানের ২৩ বছরের বেশি সময়ই তাঁর কাটে কারাগারের অন্তরালে। সেই অভিজ্ঞতার সূচনা হয় ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে এবং তার অবসান হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে। তাঁকে বহুবার মাসের পর মাস জেলে থাকতে হয়। এছাড়াও মুক্ত অবস্থায়ও তাঁকে পুলিশের নজরদারির মধ্যে বহুদিন থাকতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয় বিস্তর এবং সব মামলাই ছিল রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক। শুধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই চলে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। এক নাগাড়ে বেশি দিন তিনি জেলে থাকেন ১৯৫০-৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬৬-৬৯ এবং ১৯৭১-৭২ সালে।

- ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি গোপালগঞ্জে তিনি প্রথম রাজবন্দি হন। তখন প্রধানমন্ত্রী শেরে এ কে ফজলুল হক ও শিক্ষামন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ সফরে আসছিলেন। তাদের সফরসূচি পণ্ড করার ব্যবস্থা নেয় কংগ্রেস। শেখ মুজিব কংগ্রেসের উদ্যোগকে প্রতিহত করতে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। তিনি সাত দিনের জন্য জেল খাটেন।
- ১৯৪০ সালে গোপালগঞ্জে স্কুলে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবার কারণে তিনি গ্রেপ্তার হন ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি পান।
- তৃতীয় বার গোপালগঞ্জে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসেমের ভ্রমণ উপলক্ষে সভায় গোলযোগের মিথ্যা অজুহাতে তিনি আবার কারাবাস করেন।

- পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে ১১ মার্চ তিনি আরো ছাত্রসহ ৫ দিন জেলে ছিলেন।
- ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি আবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৯ সালের শুরুতে মুক্তি পান।
- ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দান কালে ১৯ এপ্রিল তিনি গ্রেপ্তার হন এবং জুলাই মাসে মুক্তি পান।
- ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে ঢাকায় আসলে তাঁকে বিগত অক্টোবরে ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেবার কারণে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারে দু বছর পর ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি অসুস্থ শরীরে মুক্তি পান।
- ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করার পর ৩১ মে-তে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং জামিন পেলেও মুক্তি পান নি। অবশেষে ২৮ ডিসেম্বরে তিনি মুক্তি পান। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ এর শেষ ভাগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন মুক্ত ও স্বাধীন।
- ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে ১২ অক্টোবর তিনি আবার গ্রেপ্তার হন এবং প্রায় চৌদ্দ মাস পরে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে তাঁর মুক্তি হয়।
- ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকেন। ঢাকার বাইরে যেতে হলে তাঁকে পুলিশকে জানিয়ে যেতে হতো। পুলিশ নিয়মিত তাঁর হাজিরা নিত।
- ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারিতে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন এবং আইয়ুবের শাসনতন্ত্র ঘোষিত ও বাস্তবায়িত হবার পর ১৮ জুনে তাঁর মুক্তি হয়।
- ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সালের মে পর্যন্ত গভর্নর মোনেম খানের সুনজরে পড়ে তাঁকে প্রায় ৭৭টি মামলার মোকাবিলা করতে হয় এবং প্রায়ই একদিন দুদিনের জন্য জামিন না পাওয়া পর্যন্ত জেল খাটতে হয়।
- ১৯৬৪ সালে দাঙ্গা প্রতিরোধ উদ্যোগকালে এবং ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অভিযানকালে তিনি দুবার গ্রেপ্তার হন ও জামিনে মুক্ত হন।
- ১৯৬৬ সালে ছয়-দফা ঘোষণার পর তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে কারাগারে যান তবে জামিনে মুক্তি লাভ করেন।
- ১৯৬৬ সালের ৮ মে-তে তাঁকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে আগরতলা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার পরিবর্তন করে ১৯৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্দি রাখা হয়। ১৯৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা খারিজ হলে তিনি মুক্তি পান।
- ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ভোরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বর্ষশেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে কারাবাসী করা হয়। বন্দি অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয় ও মামলায় তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মিয়ানওয়ালী জেলে তাঁর জন্য কবরও খনন করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়ার পতনের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারিতে মুক্তি দিয়ে লন্ডন প্রেরণ করেন। লন্ডন থেকে ১০ জানুয়ারি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

সংযুক্তি ২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেশ ভ্রমণ

বঙ্গবন্ধু প্রথম বিদেশ যান ১৯৫২ সালে চীনে একটি বেসরকারি শান্তি মিশনে যার নেতৃত্ব দেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর প্রথম লন্ডন সফর হয় ১৯৫৬ সালে। পরবর্তীতে লন্ডনে তিনি অনেকবার যান।

স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর প্রথম সফর হয় ভারতের কলকাতায় এবং তাঁর সর্বশেষ সফর হয় জ্যামাইকায় কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে।

- তাঁর প্রথম বিদেশ ভ্রমণ ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে পিকিং এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনে অংশ নিতে।
- ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি বিশ্বশান্তি কাউন্সিলের সম্মেলনে সুইডেনের স্টকহোমে যান। এবারই তার প্রথম লন্ডন সফর হয়।

- ১৯৫৭ সালে তিনি একটি বাণিজ্য মিশনে ভারত যান।
- ১৯৫৭ সালে তিনি দ্বিতীয়বার চীন সফর করেন।
- ১৯৫৮ সালে তিনি দুই মাসের জন্য আমেরিকায় বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণে তিনি লন্ডন, জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যও যান।
- ১৯৬৩ সালে অসুস্থ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে তিনি লন্ডন যান।
- ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের পর তিনি লন্ডন যান কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তড়িৎ প্রত্যাবর্তন করেন।
- ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে তিনি যুক্তরাজ্য সফর করেন।
- তার পরবর্তী সব সফরই বাংলাদেশের রাষ্ট্র অথবা সরকার প্রধান হিসেবে। ১৯৭২ সালে ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি লন্ডনে যান এবং দিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকার আসেন।
- প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম সফর হয় ভারতের কলকাতায় ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি।
- ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত রাশিয়া সফরে যান।
- ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে চিকিৎসার্থে তিনি লন্ডনে যান এবং আগস্টে কিছুদিন জেনেভায় অবস্থান করে ১৩ সেপ্টেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।
- ১৯৭৩ সালের ২৮ জুলাই তিনি ৫ দিনের সফরে যুগোস্লাভিয়া যান।
- ১৯৭৩ সালের আগস্টে তিনি কানাডার অটাওয়াতে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন।
- ১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে তিনি যোগ দেন।
- ১৯৭৩ সালের ১৭ অক্টোবর তিনি এক সপ্তাহের জন্য জাপান সফর করেন।
- ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি পাকিস্তানের লাহোরে যান ইসলামি দেশের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে।
- ১৯৭৪ সালের ১২ মে-তে তিনি পাঁচ দিনের সফরে ভারত যান।
- ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি নিউইয়র্কে যান জাতিসংঘে বাংলাদেশ সদস্যপদ পেলে সাধারণ পরিষদে বক্তব্য রাখতে।
- উপরোক্ত সফরকালে তিনি ১ অক্টোবরে ওয়াশিংটনে দু দিনের সফরে যান।
- ১৯৭৪ সালের ১১ নভেম্বর তিনি যান মিশর, ইরাক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে।
- তাঁর শেষ সফর ছিল ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে জ্যামাইকার কিংস্টনে।

সংযুক্তি ৩

বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যায় অভিযুক্ত খুনিদের তালিকা

মৃত : ১। খন্দকার মোশতাক আহমদ, ২। মাহবুব আলম চাষী, ৩। ক্যাপ্টেন মোস্তফা, ৪। রিসালদার সৈয়দ সারওয়ার হোসেন, ৫। লে. ক. মোহাম্মদ আজিজ পাশা (বিচার চলাকালে পলাতক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়)

জীবিত : ৬। লে. ক. সৈয়দ ফারুক হোসেন, ৭। লে. ক. সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, ৮। লে. ক. মহিউদ্দিন (আর্টিলারি), ৯। অনারারি ক্যাপ্টেন আবদুল ওহাব জোয়ারদার, ১০। তাহের উদ্দিন ঠাকুর, ১১। জোবায়দা রশীদ, ১২। লে. ক. খন্দকার আবদুর রশীদ (পলাতক), ১৩। মেজর বজলুল হুদা, ১৪। লে. ক. এইচএমবি নূর চৌধুরী (পলাতক), ১৫। লে. ক. শরিফুল হক ডালিম (পলাতক), ১৬। লে. ক. এমএ রাশেদ চৌধুরী (পলাতক), ১৭। মেজর এ কে এম মহিউদ্দিন আহম্মদ, ১৮। রিসালদার মুসলেহ উদ্দিন/মোসলেম উদ্দিন, ১৯। মেজর আহমদ শরিফুল হোসেন (পলাতক), ২০। ক্যাপ্টেন মো. কিসমত হাসেম (পলাতক), ২১। ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন, ২২। ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ (পলাতক), ২৩। দফাদার মারফত আলী শাহ (পলাতক), ২৪। এলডি আবুল হাসেম মৃধা (পলতাক)।

সংযুক্তি ৪

বাংলাদেশের স্রষ্টা এবং বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বংশ পরিচয়

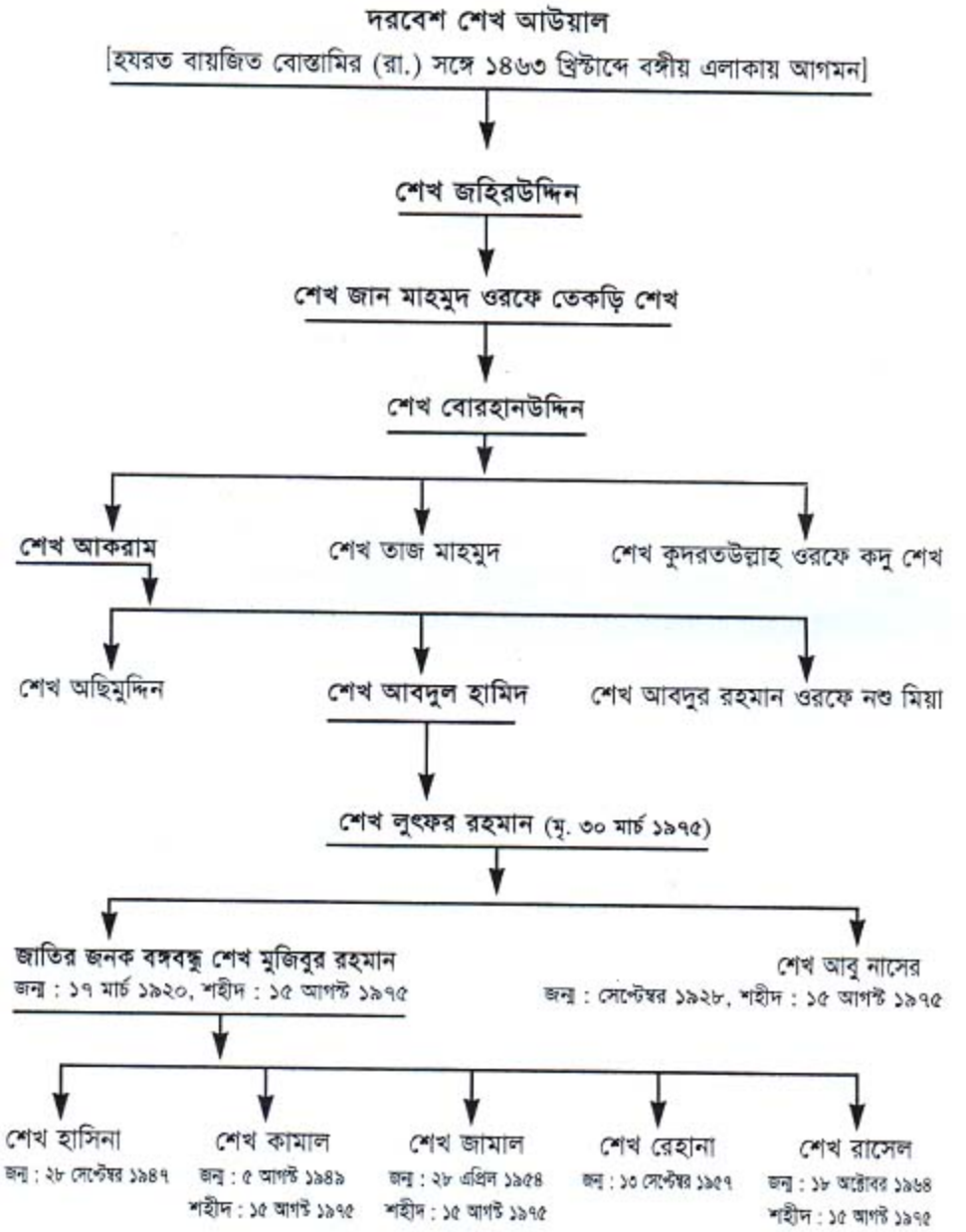

*[সূত্র : কাজী লতিফুর রহমান ও শাহজাহান বিন মোহাম্মদ (*জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী ১৭ মার্চ ১৯৯৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন থেকে সংকলিত।)]

সূত্র : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত *'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যালবাম'* থেকে আবুল মাল আবদুল মুহিত কর্তৃক সম্পাদিত।

বঙ্গবন্ধুর আলোকচিত্র

ফুটবল খেলোয়াড় শেখ মুজিব (X চিহ্নিত) ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স ক্লাবের ফুটবল দলে, ১৯৪০

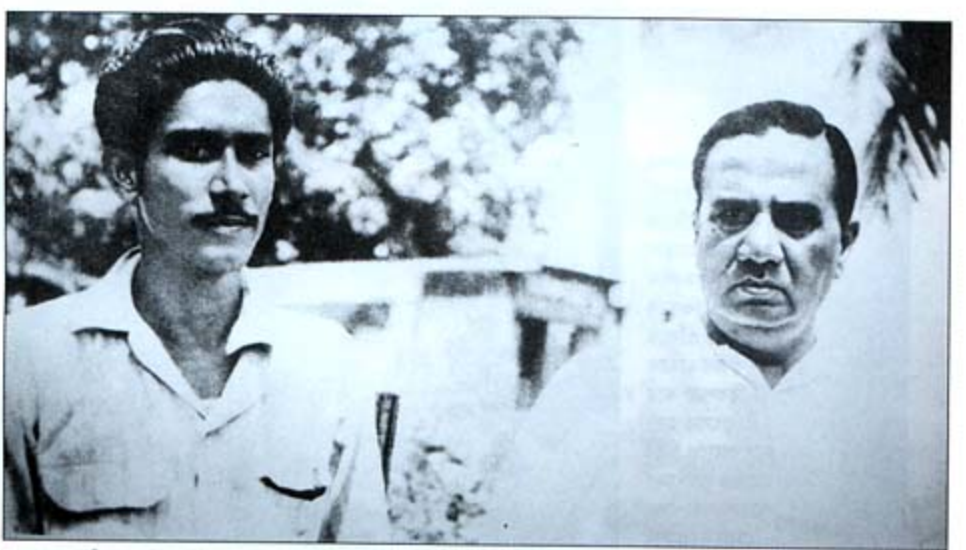

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৪৫

কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রতিবাদে অনশন করছেন মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পেছনে (ডানে দাঁড়ানো) তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৪৭

সচিবালয়ের ১ নম্বর গেটে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রদের অবস্থান কর্মসূচি চলাকালীন বর্বর পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে আহত একজন ছাত্রকে রিকশায় করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন সেদিনের তরুণনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১১ মার্চ ১৯৪৮

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদ : সামনের সারিতে– খয়রাত হোসেন, শেখ মুজিবুর রহমান, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান, শরৎচন্দ্র মজুমদার, মাহমুদ আলী, পেছনের সারিতে– হাসিম উদ্দিন আহমদ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, মশিউর রহমান (যশোর) প্রমুখ, ১৯৫৪

শান্তির সন্ধানে শেখ মুজিব। পিকিং শান্তি সম্মেলনে মানকী শরীফের পীর সাহেব, হানিফ খান, জি এম সৈয়দ ও খান লুন্দখোর, ১৯৫২

শেখ মুজিবুর রহমান
পিকিং-এ চীনা কমিউনিস্ট
পার্টির চেয়ারম্যান
মাও সে তুং-এর
সাথে করমর্দন
করছেন
১৯৫৭

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশ সফর উপলক্ষে করাচির পথে পিআইএ বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব সোহরাওয়ার্দী, উজীরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান, রাজস্বসচিব জনাব মসিউর রহমান, শিল্পসচিব জনাব মনসুর আলী, খাদ্যসচিব জনাব গৌরচন্দ্র বালা, ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল মি. উইলিয়মস এবং পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় সদস্য ঢাকা বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ সফর করিবেন। মার্কিন সরকারের নেতৃবিনিময় পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফর করিবেন, ৩ এপ্রিল ১৯৫৮

আমেরিকার
বোস্টনে শেখ
মুজিবুর রহমান ও
অধ্যাপক মুনীর
চৌধুরী
(মধ্যভাগে), মুনীর
চৌধুরীর পাশে
মতিউল ইসলাম
সিএসপি
১৯৫৮

কারামুক্তির পর এনডিএফ গঠনের প্রাক্কালে জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ব্যাপক জনসংযোগ করেন। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সোহরাওয়ার্দীর পাশে শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৬২

শেখ মুজিবসহ অন্যরা জানাজার জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শবাধার (মৃতদেহের বাক্স) গাড়ি হইতে নামাচ্ছেন ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৩

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন গ্রহণের পর মিস জিন্নাহ ও বিরোধীদলীয় নেতৃবর্গ। বাম হইতে : চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, খাজা নাজিমউদ্দিন, মওলানা ভাসানী, মিস ফাতেমা জিন্নাহ, শেখ মুজিবুর রহমান ও নওয়াবজাদা নসরুল্লা খান
সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

নৌকায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান
১৯৫৪

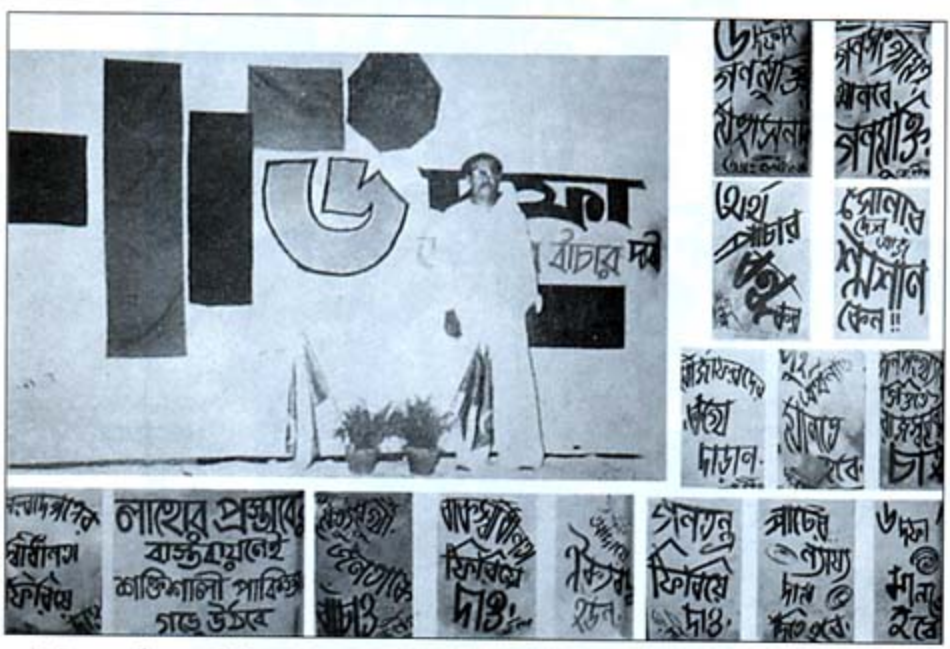

হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের মঞ্চসজ্জা ও পোস্টারের দৃশ্য। মঞ্চে শেখ মুজিবুর রহমান, ১৮ মার্চ ১৯৬৬

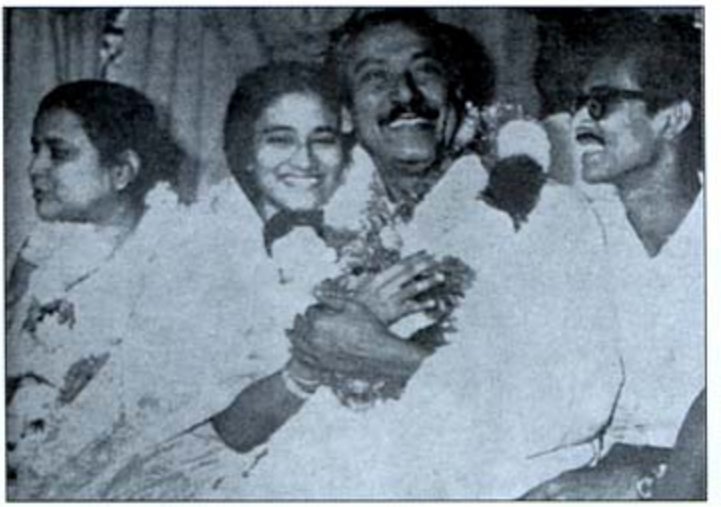

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সদ্যমুক্ত হয়ে নিজ বাসভবনে স্বজনদের মাঝে জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সদ্যমুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে একান্ত বৈঠকে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

দৈনিক ইত্তেফাক কার্যালয়ে একটি অন্তরঙ্গ পরিবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে জনাব তফাজ্জল হোসেন, জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন ও একজন সাংবাদিক ১৯৬৯

রমনা রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত গণ-সংবর্ধনায় আগরতলা মামলা থেকে সদ্য কারামুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পর বিশাল জনসভায় ভাষণরত, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সদ্য মুক্তির পর আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে তেজগাঁও বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পার্শ্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শেখ হাসিনা ও স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা এবং অপর পার্শ্বে জনাব ভুট্টো। একই বিমানে বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টো লাহোরে গমন করেন, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মরহুমের মাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন : "আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।" ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯

ভোট দিচ্ছেন আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০

নিজ লাইব্রেরিতে গভীর মনোনিবেশ সহকারে বই পড়ছেন আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাশে বেগম মুজিব কি যেন বলতে চাচ্ছেন সেদিকে বঙ্গবন্ধুর কোন খেয়ালই নেই, ১৯৭০

৩২ নম্বর বাড়িতে : সামনের সারির বাম দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান, বঙ্গবন্ধু, শেখ রাসেল, বঙ্গবন্ধুর মাতা ফাতুন ও বেগম মুজিব। পেছনে বামদিক থেকে বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহকারী আমিনুল হক বাদসা, বঙ্গবন্ধুর ভাগিনেয় বাবুল, ড. এম এ মিয়া, শেখ রেহানা ও শেখ হাসিনা, ১৯৭০

আন্দোলন সংগ্রামের
কৌশল নিয়ে ভাবছেন
আওয়ামী লীগ প্রধান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
জানুয়ারি ১৯৭১

বাংলার মুখ
আমি দেখিয়াছি
১৯৭০

রমনা রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে ৫০ মিনিট দীর্ঘ নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৩ জানুয়ারি ১৯৭১

অমর একুশের অনুষ্ঠানমালা শুরুর পূর্ব মুহূর্ত : বামদিক থেকে সৈয়দ মুর্তজা আলী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও কবীর চৌধুরী প্রমুখ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

পল্টনের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, ৩ মার্চ ১৯৭১

রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", ৭ মার্চ ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির বারান্দা থেকে আগত বীর বাঙালির অভিনন্দন গ্রহণ করছেন, ১৯৭১

জনতার অভিনন্দনের জবাবে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির বারান্দা থেকে হাত নাড়াচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পেছনে জ্যেষ্ঠা কন্যা শেখ হাসিনা, ২৩ মার্চ ১৯৭১

৩২ নম্বর ধানমন্ডির নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় আগত উৎফুল্ল জনতার মাঝে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে ধরলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৩ মার্চ ১৯৭১

২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী কর্তৃক আটক অবস্থায় করাচি বিমানবন্দরে মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১

১৬ ডিসেম্বর রমনা রেসকোর্স ময়দানে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ দলিলে প্রথম স্বাক্ষর দিচ্ছেন পাক বাহিনীর জেনারেল নিয়াজী, পাশে জেনারেল অরোরা। পিছনে মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকার ও মেজর হায়দারসহ মিত্রবাহিনীর অফিসারবৃন্দ ১৯৭১

দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি কারাগারে বন্দিত্বের পর মুক্ত হয়ে ৮ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন পৌঁছেন। সেখানে তিনি এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন, ১৯৭২

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম লন্ডন যান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ১৯৭২

পাকিস্তানের কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রমনা রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন : "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা," ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

প্রধান বিচারপতি জনাব সায়েমের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিচ্ছেন বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, এ সময় বঙ্গবন্ধুকে পাশে বসা দেখা যাচ্ছে (বামে) ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শপথ গ্রহণ করাচ্ছেন নয়া রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী (ডানে), ১২ জানুয়ারি ১৯৭২

বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ সভায় জাতীয় পতাকা সংশোধন, জাতীয় সংগীত ও কুচকাওয়াজ সংগীতসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে এই প্রথম সাংবাদ সম্মেলন করেন। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলব', ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২

বঙ্গবন্ধু পরিবারের সাথে মিত্রবাহিনীর মেজর তারা। দুঃসাহসিকভাবে অন্তরীণ অবস্থা থেকে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে উদ্ধার করেন মেজর অশোক তারা, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭২

টাঙ্গাইলে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিসেনাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার পর জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হানাদার বাহিনীর ত্রাস বাঘা সিদ্দিকী (আব্দুল কাদের সিদ্দিকী) সমভিব্যাহারে অস্ত্র-শস্ত্র পরিদর্শন করছেন, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২

সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে তাসখন্দের অদূরে অবস্থিত একটি যৌথ খামার পরিদর্শনকালে খামার প্রধান উজবেক জাতীয় পোশাক প্রদান করলে সানন্দে তা পরিধান করেন জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মার্চ ১৯৭২

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অনুষ্ঠানে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাহিনী প্রধান জনাব আবদুর রাজ্জাক, ১৪ মার্চ ১৯৭২

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোলে অতি আদরের নাতি জয় ১৯৭২

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে শুভেচ্ছা সফরে এলে জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে অভ্যর্থনা জানান
১৬ মার্চ ১৯৭২

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইন্দিরা মঞ্চে বসে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম ফজিলাতুন্নেসা ও শেখ রাসেল
১৭ মার্চ ১৯৭২

১৪ চৈত্র ১৩৭৮ (২৮ মার্চ ১৯৭২) ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম বিবাহবার্ষিকী। ১৩৩৮ সনে বঙ্গবন্ধুর বয়স যখন মাত্র ১৩ বছর তখন তাঁর বিয়ে হয়। বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে কোন প্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় নি। অতিনিকট আত্মীয়রা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর স্ত্রীকে তাঁদের বিয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অবশ্য বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর বিয়ের দিন তারিখ এমন কি বিয়ের অনুষ্ঠানাদির কথাও এখন আর মনে নেই। কেননা, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তিন বছর
২৮ মার্চ ১৯৭২

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তৃতা করছেন দলের সভাপতি জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭ এপ্রিল ১৯৭২

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জেলে থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুর বাড়ি লুটপাট হওয়াতে অনেক মূল্যবান বইপত্র হারায় এবং সেই বইপত্র হারুনুর রশিদ নামে এক হকার ছেলে খরিদ করে রাখে। এ বইগুলো বঙ্গবন্ধুকে ফেরত দিলে বঙ্গবন্ধু তাকে জড়িয়ে ধরে রাখেন, ২৮ মে ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে যোগদানের জন্য পরিষদ কক্ষের দিকে যাচ্ছেন। পিছনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্রমুখ, ১০ এপ্রিল ১৯৭২

ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করে খাতায় স্বাক্ষর করছেন জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৬ মে ১৯৭২

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে সদ্য বাংলাদেশে আগত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি শুভেচ্ছা জানাতে ধানমন্ডির কবিভবনে যান, উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগেই বিদ্রোহী কবি বাংলাদেশে আসেন, ২৩ মে ১৯৭২

গণভবনে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মায়া রায়, ১০ জুন ১৯৭২

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১০ এপ্রিল ১৯৭২

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যে পল্লিকবি জসিমউদ্‌দীন

লন্ডনে ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর শয্যা পাশে বেগম মুজিব, ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. নুরুল ইসলাম ও কর্তব্যরত সেবিকাবৃন্দ, ৫ আগস্ট ১৯৭২

গণভবনে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যে শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বঙ্গবন্ধুর নাতি জয়কে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আদর করছেন, ৮ অক্টোবর ১৯৭২

জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সত্যজিৎ রায়

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংসদে উত্থাপিত খসড়া সংবিধানে স্বাক্ষর দিচ্ছেন ১৯৭২

বিজয়ের ১ম বার্ষিকীতে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধের ফলক উন্মোচন করছেন জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২

জাতির জনক
প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
নিজ জন্মভূমি
গোপালগঞ্জ গেলে
বিশাল জনতা তাঁকে
পুষ্পমাল্য
দিয়ে প্রাণঢালা
অভিনন্দন জানান
৬ জানুয়ারি ১৯৭৩

রাজশাহী জেলার নাটোরে উত্তরা গণভবনে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৩

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে
দলীয় মনোনয়ন লাভের
আবেদনপত্রে জাতির
জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানকে
স্বাক্ষর করতে
দেখা যাচ্ছে
২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩

শহীদ দিবসে শহীদের
আত্মার মাগফেরাত
কামনা করে দোয়া
পড়ছেন জাতির জনক
প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমান
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ স্বাধীন
বাংলাদেশের প্রথম জাতীয়
সংসদ নির্বাচনে ভোট
দিচ্ছেন জাতির জনক
প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
৭ মার্চ ১৯৭৩

নির্বাচন কমিশনের নিকট জাতীয় সংসদের মহিলা আসনের সংরক্ষিত পনেরটি আসনের জন্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশের প্রাক্কালে তাঁরা সচিবালয়ে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন, মার্চ ১৯৭৩

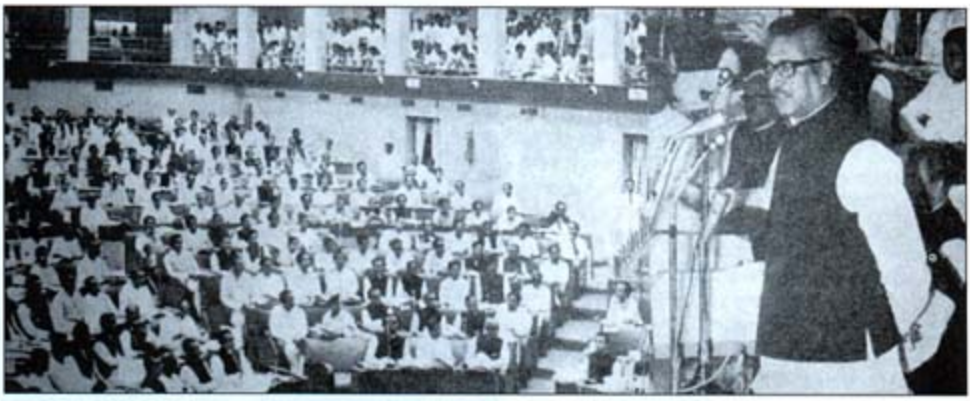

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্বোধনী ভাষণ দেন, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩

জাতির জনক
প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
ফরিদপুরের
ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত
গ্রামগুলি পায়ে হেঁটে
ঘুরে দেখেন
১৫ এপ্রিল ১৯৭৩

গণভবনে জাতির জনক
প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎকারে
প্রখ্যাত ফরাসি বুদ্ধিজীবী ও
কূটনীতিক আঁদ্রে মালরো
২৪ এপ্রিল ১৯৭৩

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব মি. রমেশচন্দ্র 'জুলিও কুরি' পদক পরিয়ে দেন ২৩ মে ১৯৭৩

গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক বিজয়ী শিল্পী সাহাবুদ্দিনের বুকের পদকটি দেখছেন জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৬ জুন ১৯৭৩

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যোগাযোগমন্ত্রী জনাব মনসুর আলীর সহিত সিরাজগঞ্জ রক্ষা বাঁধ ও সেচ প্রকল্প পরিদর্শন করেন, ৩১ মে ১৯৭৩

কানাডার রাজধানী অটোয়ায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান শেষে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মি. হুইটলাম ও শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মিসেস বন্দরায়েক, ৪ আগস্ট ১৯৭৩

আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছেন জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের লবিতে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কিউবার প্রধানমন্ত্রী ড. ফিডেল ক্যাস্ট্রো, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে পরাজিত পাক সেনারা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করবার অপপ্রয়াসে মেতেছিল আত্মসমর্পণের সময়কে দীর্ঘতর করবার জন্য এবং তাদের সে অপকর্মের স্বাক্ষর বহন করছিল ভৈরব সেতু। দীর্ঘ ২০ মাস পর বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে পুনর্নির্মাণের পর জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এ সেতুটির উদ্বোধন করতে দেখা যাচ্ছে, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

আলজিয়ার্সে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমন জাপানের প্রধানমন্ত্রী মি. কাকুই তানাকার সাথে তাঁর সরকারি বাসভবনে আলোচনারত অক্টোবর ১৯৭৩

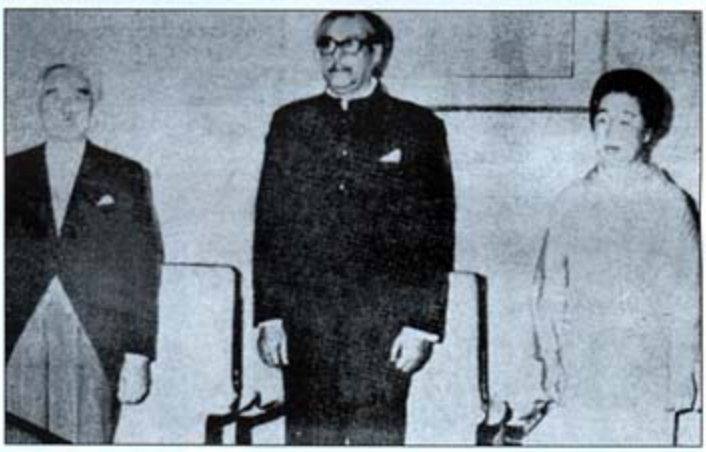

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে জাপানের ইম্পেরিয়াম প্রাসাদে সম্রাট হিরোহিতো ও সম্রাজ্ঞী নিগাকো ২ অক্টোবর ১৯৭৩

কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রাজ্জাক অভ্যর্থনা জানান ২৪ অক্টোবর ১৯৭৩

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলকে নিয়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ উপভোগ করছেন, ৬ নভেম্বর ১৯৭৩

সাভারের জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩

ঢাকা বিমানবন্দরে আনন্দঘন হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মি. কার্ক
১ জানুয়ারি ১৯৭৪

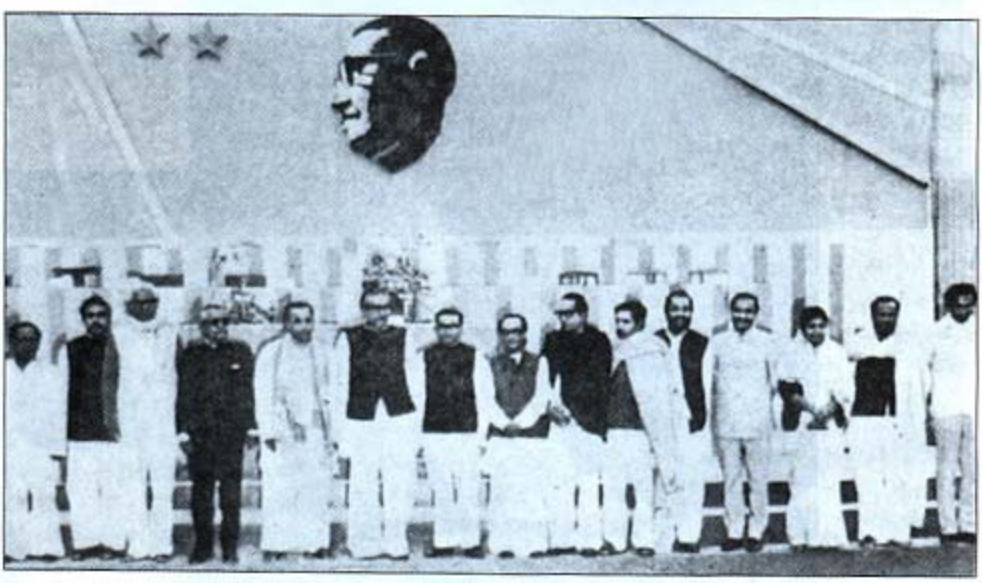

আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতিসহ অন্যান্য দলীয় কর্মকর্তাদের মাঝে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২০ জানুয়ারি ১৯৭৪

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিমানবন্দরে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটোকে সংবর্ধনা জানান ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৪

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী দিবসে যুবলীগ কর্মীদের দেওয়া অভিবাদন গ্রহণ করছেন জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাশে শেখ ফজলুল হক মনি, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

বাংলা একাডেমী আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাশে রয়েছেন সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়, শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী, কবি জসিমউদ্‌দীন, ড. মাজহারুল ইসলাম ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের সম্মানে পাকিস্তানের লাহোরের সালিমার উদ্যানে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা সভার দিকে যাচ্ছেন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন, জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিনকে স্বাগত জানাচ্ছেন জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৯ মার্চ ১৯৭৪

দিল্লি বিমানবন্দরে (বাম দিক থেকে) শেখ রাসেল, শেখ রেহানা, বেগম মুজিব, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ১০ এপ্রিল ১৯৭৪

মস্কোর ক্রেমলিনে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন ৮ এপ্রিল ১৯৭৪

মস্কোর ক্রেমলিনে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান লিওনিদ ব্রেজনেভ ৯ এপ্রিল ১৯৭৪

ঢাকা বিমানবন্দরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুটি নিকটতম প্রতিবেশী দেশের দুই মহান নেতা জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বার্মার প্রেসিডেন্ট নে উইন ২৬ এপ্রিল ১৯৭৪

দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১১ মে ১৯৭৪

বঙ্গভবনে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সেনেগালের প্রেসিডেন্ট সেনঘর, ২৬ মে ১৯৭৪

গণভবনে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রদান করছেন ৭ জুন ১৯৭৪

বঙ্গভবনে এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ১৫ জুন ১৯৭৪

বঙ্গভবনে প্রদত্ত নৈশভোজে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৮ জুন ১৯৭৪

দাফন শেষে মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরীর কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ২ জুলাই ১৯৭৪

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

মিসরের আবেদিন প্রাসাদে প্রেসিডেন্ট প্রদত্ত ভোজসভায় জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত নভেম্বর ১৯৭৪

কুয়েতের সেইফ প্রাসাদে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং কুয়েতের আমীর শেখ সাবাহ আল-সালেম আল-সাবাহ অন্তরঙ্গ পরিবেশে নব্বই মিনিট স্থায়ী এক আলোচনায় মিলিত হন ৯ নভেম্বর ১৯৭৪

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিমানবন্দরে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান মি. হর্স্ট সিভারম্যান ও মিসেস সিভারম্যানকে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সংবর্ধনা জানান, ২৬ নভেম্বর ১৯৭৪

ঢাকা বিমানবন্দরে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মালয়েশিয়ার মাহমান্য রাজা ইয়াং দি পার্তুয়ান এ্যাগাংকে অভ্যর্থনা জানান, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪

আরব আমিরাত সফরকালে আবুধাবীর ম্যানহাল প্যালেসে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ জায়েদ বিন-সুলতান আল-নাহিয়ান, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪

বাংলাদেশ সফরশেষে দেশে ফিরে যাচ্ছেন ভুটানের রাজা। মহামান্য অতিথিকে বিদায় সংবর্ধনা জানাতে ঢাকা বিমানবন্দরে এসেছেন রাষ্ট্রপতি জনাব মুহাম্মদুল্লাহ ও জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৫

জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লা সেনানিবাসে শহীদ লে. ক. এস.আর. চৌধুরী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সামরিক একাডেমীর প্রথম জেন্টলম্যান ক্যাডেট দলের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠান শেষে শ্রেষ্ঠ ক্যাডেট হিসেবে সিনিয়র আন্ডার অফিসার ক্যাডেট মোহাম্মদ জহুরুল আলমকে সম্মানসূচক তরবারি (সোর্ড অব অনার) প্রদান করেন (বামের ছবি), প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু একই অনুষ্ঠানে জুনিয়র আন্ডার অফিসার ক্যাডেট মঈনউদ্দিন আহমদকে আর্মি চিফ অব স্টাফস কেইন প্রদান করেন (ডানের ছবি) ১১ জানুয়ারি ১৯৭৫

বাংলাদেশে নৌ-বিহারে জাতির জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মি. হুইটলাম, ২০ জানুয়ারি ১৯৭৫

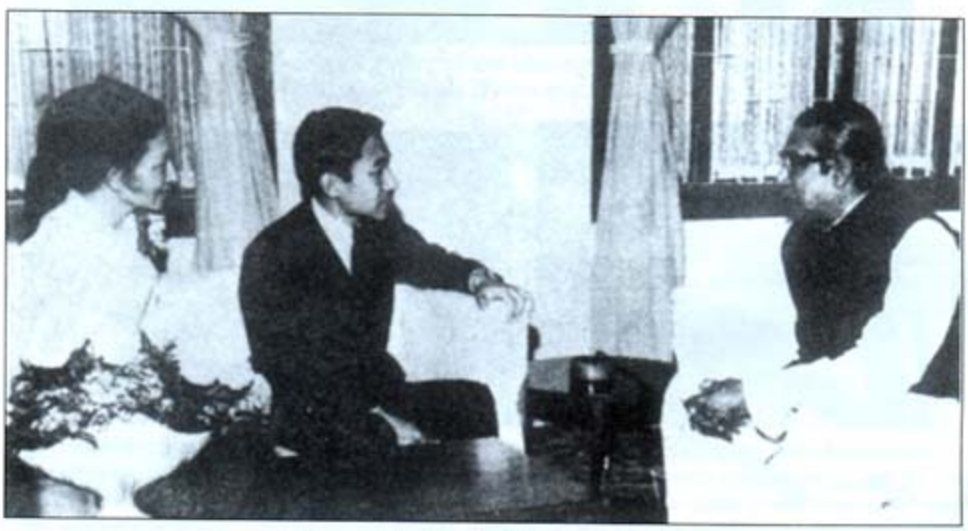

গণভবনে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে জাপানের যুবরাজ আকিহিতো ও যুবরাজ্ঞী মিচিকো, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুষ্পমাল্য অর্পণের পর সাংবাদিকদের বলেন : 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক' ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

হাজারো কাজের ফাঁকে বঙ্গবন্ধু পোষা পায়রাদের যত্ন নিতে ভোলেন নি মার্চ ১৯৭৫

স্নেহময় পিতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অতি আদরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল ১৭ মার্চ ১৯৭৫

টাঙ্গাইলে 'কাগমারি মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ' সরকারিকরণ অনুষ্ঠানে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, ৮ মার্চ ১৯৭৫

অসুস্থ পিতার পাশে দুই সহোদর শেখ মুজিব ও শেখ নাসের। মাঝখানে তোফাজ্জল আহমদ মার্চ ১৯৭৫

পিতা ও মাতার সাথে বঙ্গবন্ধু। পাশে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।

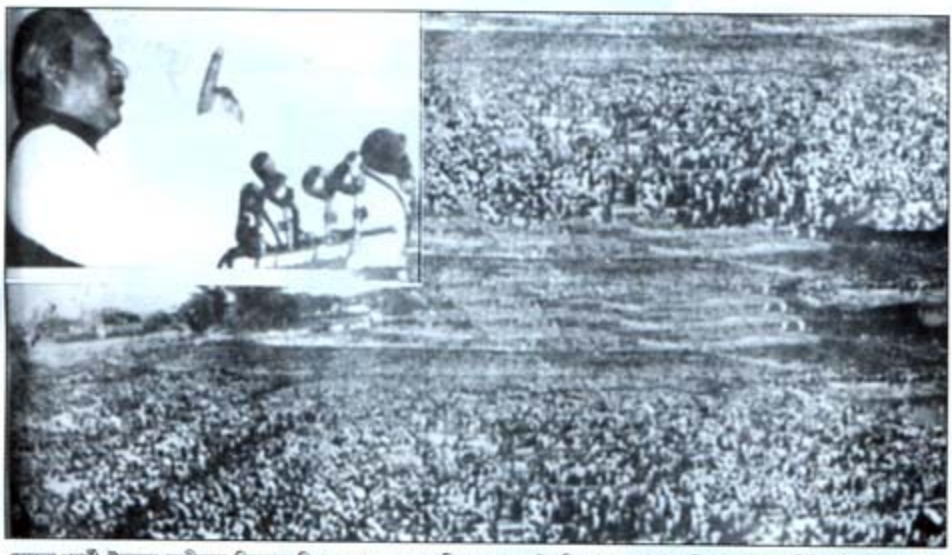

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা দিবসের বিশাল জনসমুদ্রে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন। জীবনের শেষ জনসভায় বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের ব্যাপক বিশ্লেষণ করেন, ২৬ মার্চ ১৯৭৫

কিংস্টনের পথে নয়াদিল্লিতে স্বল্পকাল অবস্থানের সময় জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের রাষ্ট্রপতি জনাব ফখরুদ্দিন আলী আহমদ ২৭ এপ্রিল ১৯৭৫

কিংস্টনে জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী মি. মাইকেল ম্যাসলে কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সম্মানে একটি সংবর্ধনা আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মি. মাইকেল ম্যাসলে ২৯ এপ্রিল ১৯৭৫

কমনওয়েলথের বিদায়ী সেক্রেটারি জেনারেল মি. আর্নল্ড স্মিথের সম্মানে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের দেওয়া মধ্যাহ্নভোজের অনুষ্ঠানে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঞ্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. জুলিয়াস নয়্যারেরে মে ১৯৭৫

জান্নাতবাসী পিতা শেখ
লুৎফর রহমানের চেহলামে
জাতির জনক রাষ্ট্রপতি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমান নিজ হাতে
জনসাধারণকে
খাওয়াচ্ছেন
১০ মে ১৯৭৫

জাতীয় দলের চেয়ারম্যান জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গভবনের দরবার হলে আয়োজিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় বক্তৃতা করছেন। তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তথা জাতীয় দলের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব এম মনসুর আলী, ১৯ জুন ১৯৭৫

জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র জামাল-এর সহিত সংস্থাপন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব এটিএম সৈয়দ হোসেনের কনিষ্ঠা কন্যা পারভিন হোসেন রোজীর শুভ বিবাহ গণভবনে সম্পন্ন হয়। জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব-এর সঙ্গে সপত্নীক তাঁদের দুই পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামাল, ১৭ জুলাই ১৯৭৫

বঙ্গভবনের দরবার হলে জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দিচ্ছেন। পাশে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী ও বাকশালের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব এম মনসুর আলী, ২১ জুলাই ১৯৭৫

বাংলাদেশ স্কাউট প্রতিনিধিরা গণভবনে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান স্কাউট হিসাবে অভিষিক্ত করেন
৩০ জুলাই ১৯৭৫

গণভবনে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত মি. সোইয়ং চুং সাক্ষাৎ করেন
১৪ আগস্ট ১৯৭৫

ISBN 984 70006 0014 1